সহজ ইন আমুলবারী

শরহে বুখারী মাগাযী ও তাফসীর অংশ

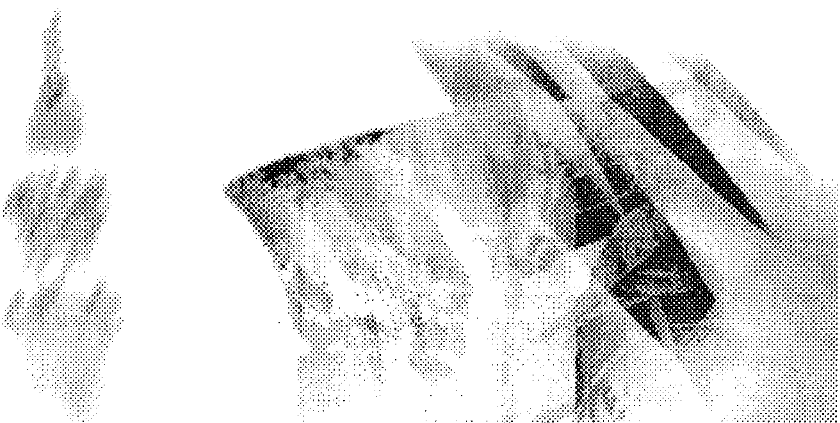

অনুবাদ ও সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন

ফাযেলে দারুল উলূম দেওবান্দ

মুহাদ্দিস্ জামি'আতুসসুন্নাহ দক্ষিণকান্দি

বাহাদুরপুর শিবচর মাদারীপুর

মাকতাবায়ে এমদাদিয়া-ঢাকা

www.e-ilm.weebly.com

প্রথম মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০০৭ ইং

প্রকাশক ▶ **মাওলানা শরীফুল ইসলাম**, মাকতাবায়ে এমদাদিয়া,
ইসলামী টাওয়ার ১১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। কম্পিউটার ঃ এম. হক. কম্পিউটারস
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭১১-৩৭৮৫৩৩, ০১৭১৬-৭৪৪৭১১, ফোন ঃ ৭১৭৩৪২৭
স্বত্ব ▶ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

হাদিয়া ঃ দুইশত চল্লিশ টাকা মাত্র

SAHAJ INAMUL BARI : Writer Mawlana Muhammad Amin (Rh.). Translated by Mawlana Alamgir Hossain Published By Mawlana Muhammad Shariful Islam Maktaba-E-Emdadia. 11 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication November 2007. Mob : 01711-378533, 01716-744711, Phone : 7173427

PRICE : TAKA TWO HUNDRED FORTY ONLY
www.e-ilm.weebly.com

অনুবাদকের কথা

নিঃসন্দেহে আজ শুভদিন। এ শুভ মুহূর্তে স্মরণ করছি সকল শুভাশুভের মালিক আল্লাহকে। কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে। আল্লাহ্ পাকেরই অসীম রহমত ও তাওফীকের ফলে বক্ষমাণ গ্রন্থটি ছাত্র সমাজের খেদমতে পেশ করা সম্ভব হলো। আলহামদুলিল্লাহ্।

গ্রন্থটি মূলত উর্দূ ভাষায় লিখিত। চট্টগ্রামের স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম দেওবন্দের কৃতি সন্তান, পরম শ্রদ্ধাভাজন হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন (রহ.) এ অমূল্য গ্রন্থের রচয়িতা। গ্রন্থটি স্বল্প সময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সকল অঞ্চলের দাওরায়ে হাদীস জামাতের ছাত্রদের প্রয়োজন পূরণ ও তাদের হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছে এ অসামান্য গ্রন্থটি। সম্মানিত লেখকের পাকানো খানাই মাতৃভাষার আদলে রূপান্তর করে রুচীবর্ধক মসলা যোগে তা ছাত্রভ্রাতাদের মুখে উঠিয়ে দিলাম মাত্র। অতএব যা কিছু তৃপ্তির ও স্বাদের তা মূল লেখকের। তিক্ত ও বিস্বাদগুলো শুধু আমার। আমিই তার দায়িত্ব কাঁধে উঠিয়ে নিলাম।

'ইনআমুল বারী' গ্রন্থটি সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টিতে পড়ে দারুল উলূম দেওবন্দে। সেখানে অধ্যয়নকালে বিপুল সংখ্যক ছাত্রকে এ গ্রন্থটির প্রতি অনুরক্ত ও আগ্রহী দেখে নিজেও আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। গ্রন্থটি যতই মুতালা করতে থাকি, বিষয়বস্তু ও তথ্যসম্ভারে ততই চমৎকৃত হই। বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড তথা কিতাবুল মাগাযী ও কিতাবুত্ তাফসীর হলের জন্য এটি একটি উত্তম সহায়ক গ্রন্থ। গুরুত্বপূর্ণ হাদীস ও হাদীসাংশের তথ্যনির্ভর ব্যাখ্যা লেখক অত্যন্ত সাফল্যের সাথে উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোথাও বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনাও করেছেন। জটিল বিষয়গুলোর সরল সমাধান ও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বুখারী ছানী হলের জন্য উর্দূ গ্রন্থের মধ্যে এটি সত্যই একটি চমক ও অনুপম সহায়ক গ্রন্থ।

এ গ্রন্থ কারো মৌলিক যোগ্যতা বাড়াবে-এ অসার দাবী আমাদের নয়। তবে এতটুকু সত্য যে, ইলম পিপাসুক এখানে বিক্ষিপ্ত অনেক জ্ঞানের সন্ধান পাবে। ছাত্র সমাজের ঐ সিংহভাগ ছাত্রের জন্য এ গ্রন্থ, যারা গভীরভাবে না হলেও হাল্কাভাবে বুখারীর বিষয়বস্তু ও তন্মধ্যকার আলোচনা বুঝতে চায়, জানতে ইচ্ছুক কিন্তু শরাহ আরবী ও উর্দূ নির্ভর হওয়ায় তারা তা হতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারে না। বস্তুত এ শ্রেণীর ছাত্র ভ্রাতাদের হৃদয়ের চেপে রাখা আকুতি এবং অপেক্ষাকৃত ভালছাত্রদের দয়ানির্ভর হওয়া থেকে তাদের রক্ষার্থেই আমাদের এই প্রয়াস-'উর্দূ টু বাংলা'।

www.e-ilm.weebly.com

আমাদের একান্ত বিশ্বাস যারা মাতৃভাষাকে ভালবাসেন এবং ইলমই যাদের কাছে মুখ্য কথা, তাদের কাছে 'মাতৃভাষা' ইলমের বাহন ও ভাষা হওয়াটা নিঃসন্দেহে কোন প্রশ্নের সৃষ্টি করবে না। আরবীই একমাত্র শরয়ী ও প্রাধান্যপ্রাপ্ত ভাষা। তাছাড়া সকল ভাষা সমান। আরবী ছাড়া এমন কোন ভাষা নেই, যার উপর অন্য ভাষার প্রাধান্য হতে পারে। বরং প্রত্যেক জাতির কাছে আরবী ভাষার পর তার মাতৃভাষাই সর্বাধিক পবিত্র মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্য ভাষা। আরবী ভাষা ছাড়া যদি অন্য কোন ভাষাকে ইলম অর্জনের বাহন বানানো যায় বা হতে পারে, তবে বাংলা ভাষা কেন ইলম অর্জনের জন্য পুঁথিগত, লেখ্য ও কথ্য ভাষা হতে পারবে না? মাতৃভাষা বাংলা হিসেবে আমাদের জন্য বাংলাই কি শিক্ষার বাহন হওয়ার অধিক দাবী রাখে না? যারা বুঝেও বুঝতে চায় না তাদের জন্য শত দলীল-যুক্তিও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কিন্তু সচেতন-জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

আমাদের কথা সুস্পষ্ট। আরবী শরাহ্ পড়তে সক্ষম-এমন ছাত্রদের সামনে এ গ্রন্থ পেশ করে আমরা তাদের ক্ষতি করতে চাই না। অবশ্যই তাদের আরবী শরাহ্ দেখা কর্তব্য। কিন্তু যারা তা পারে না আমরা কেবল তাদের সাহায্য করতে চাই। যেন বাংলা ভাষাতে হলেও তারা বুখারীর কিছু ফয়েজ লাভ করতে পারে। অর্জন করতে পারে বিক্ষিপ্ত ইলম! যদি আরবীর পরিবর্তে উর্দূ ভাষায় শরাহ্ লেখাটা অপরাধ না হয়ে থাকে এবং তা সময় উপযোগী পদক্ষেপ হয়, তাহলে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, মাতৃভাষা 'বাংলার' আশ্রয় নিয়ে আমরাও কোন অপরাধ করিনি; বরং বর্তমান সময়েরই ডাকে 'লাব্বায়িক' বলেছি মাত্র।

প্রায় ছয় বছর পূর্বে পাণ্ডুলিপি তথা অনুবাদ কার্য সম্পন্ন হয়। মূল কাজ দেওবন্দেই শুরু ও শেষ হয়। পরবর্তীতে রিভাইজ দেয়ার সময় না হওয়ায় দীর্ঘদিন পাণ্ডুলিপি অসংশোধিত অবস্থায় পড়ে ছিল। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আকস্মিক এক জরুরী তাগাদা অনুভব করি। আল্লাহ্‌র রহমতে রিভাইজ শেষ না হতেই মাকতাবায়ে এমদাদিয়া প্রকাশনার স্বত্তাধিকারী হযরত মাওলানা শরীফুল ইসলাম গ্রন্থটি প্রকাশের আগ্রহ প্রকাশ করে পাণ্ডুলিপি চান। প্রকাশকের সদিচ্ছায় স্বল্প সময়ে গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়ে আসতে সক্ষম হয়। আমি সম্মানিত প্রকাশকের শুকরিয়া আদায় করছি। হয়ত তিনি এভাবে এগিয়ে না এলে গ্রন্থটি প্রকাশে আরও বিলম্বিত হতো। আল্লাহ্ তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তাকে ইসলাম ও ইলেমের খেদমতের জন্য কবুল করুন।

বিনীত॥
আলমগীর
মনিরামপুর, যশোর।

www.e-ilm.weebly.com

জিহাদের প্রকৃত স্বরূপ ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

জিহাদ ইসলামের রক্ষাকবচ। নিখিল বিশ্বের সর্বত্র ইসলামকে বলীয়ান, সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠাই জিহাদের মূল লক্ষ্য। বিরুদ্ধবাদীদের করাল গ্রাস, নীল নক্সা ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে ইসলামকে রক্ষায় জিহাদের বিকল্প নেই। অতীতে ইসলাম যখনই আক্রান্ত হয়েছে, জিহাদ তখনই পূর্ণ শক্তি দিয়ে তার মোকাবেলা করেছে। যুগে যুগে জিহাদ একেক রূপে আবির্ভূত হয়ে ইসলামকে সমুন্নত ও শত্রুপক্ষকে পরাস্ত ও নিস্তব্ধ করেছে। জিহাদের সাথে ইসলামের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রগাঢ়। জিহাদ ব্যতীত ইসলামের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। এ কারণে ইসলামে জিহাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হিসেবে বিবেচিত। কেয়ামত পর্যন্ত তা আপন গতিতে চলছে ও চলবে। এটাই হাদীসের ভাষ্য।

হযরত রাসূলে আকরাম (স.)[১] এর জীবনের এক ষষ্ঠাংশ ব্যয়িত হয়েছে জিহাদের ময়দানে ময়দানে। তাঁর কুশলী কমান্ড অনুপম রণকৌশল আর অভূতপূর্ব শৌর্য-বীর্য রণাঙ্গনের প্রতিটি বালুকণা বিস্ময়ভরে প্রত্যক্ষ করেছে। ৫৩ থেকে ৬৩ এ দশ বছরে তাঁকে হাতে তুলে নিতে হয়েছে নাঙ্গা তলোয়ার। ছুটে বেড়াতে হয়েছে বদর থেকে উহুদ, উহুদ থেকে খন্দক, খন্দক থেকে হুদায়বিয়া-এভাবে ক্রমান্বয়ে এক ময়দান থেকে আরেক ময়দানে। মাত্র দশ বছরের জিহাদী দাস্তান হলেও তা ছিল এক বিশাল জিহাদী জগত। যুগে যুগে বিদগ্ধ মুহাদ্দিসীনে কিরাম সচেষ্ট হয়েছেন তাঁদের তুলিতে সে দশ বছরের খুনঝরা রক্তাক্ত দাস্তান চিত্রিত করতে। এ পর্যায়ে প্রথমেই মনে পড়ে হযরত ইমাম বুখারীর নাম। বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রায় অর্ধেক ময়দানে তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে এঁকেছেন রসূল (স.)-এর জিহাদী জীবনের দুর্লভ ও লোমহর্ষক ঘটনা-চিত্র। মুসলমান হিসেবে তাঁর জিহাদী জীবন সম্পর্কে জানা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। জিহাদী আদর্শ মূলত আমাদেরকে এখান থেকেই আহরণ ও গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে তাকে বাস্তবরূপ দিতে হবে।

জিহাদের আভিধানিক অর্থ ঃ জিহাদ আরবী শব্দটি জুহদুন ক্রিয়ামূল থেকে নির্গত। এর অর্থ কোন কাজে সর্বাত্মক চেষ্টা ও পূর্ণ সামর্থ ব্যয় করা।

জিহাদের পারিভাষিক অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত, দ্বীন-ইসলাম রক্ষা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৈহিক, আর্থিক, মৌখিক এবং কলমীশক্তি সর্বাত্মকভাবে ব্যয় করাকে শরীয়তের পরিভাষায় জিহাদ বলে।

টীকা ঃ ১. হযরত রসূলে আকরাম (স.), জন্ম ঃ ৫৭০ খ্রীস্টাব্দ। ইন্তেকাল ঃ ৬৩৩ খ্রীস্টাব্দ। ১১তম হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

পরিভাষায় 'জিহাদ' যদিও আল্লাহ্র পথে আগত সকল অন্তরায় মোকাবেলা ও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কিন্তু বর্তমানে জিহাদ বলতে কেবল ইসলামের শত্রু তথা কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করাকেই বুঝা হয়।

জিহাদের প্রকারভেদ ঃ আল্লামা ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.)[১] বলেন, জিহাদ তিন প্রকার। (১) আল্লাহ্র প্রকাশ্য শত্রুর মোকাবেলা; (২) শয়তান ও তার উদ্ভুত কু-চিন্তার মোকাবেলা; (৩) নিজ আত্মপ্রবৃত্তির মোকাবেলা। (মা'আরেফুল কুরআন)।

জিহাদ ফরযের নেপথ্য ঃ মানব জাতির ইহ ও পারলৌকিক উন্নতি ও কল্যাণের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে দুনিয়ায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। ইসলামের ঐকান্তিক কামনা হলো, মানব জাতিকে এমন ইলম, আমল, আকীদা ও আখলাক শিক্ষা দেয়া, যার মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে মানব জাতি উভয় জগতে নান্দনিক জীবন যাপন করতে পারে। কোথাও যেন তাদের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে না হয়। বরং আল্লাহ্র মারেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) অর্জন করত আত্মিক উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ সোপান অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা ও ইতিহাস সাক্ষী যে, ইসলামের এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের পথে শয়তান ও তাগুতী শক্তি সর্বদা বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিহাস আরও প্রমাণ দেয়, যখন এবং যেখানেই এই তাগুতী শক্তি মাথা উঁচু করেছে তথা কুফরী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে দুনিয়া জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। ফেৎনা-ফাসাদ, অন্যায়-অবিচার, হত্যা-নিধন আর অস্থিরতা-অশান্তিতে ছেয়ে গেছে পুরো সমাজ এবং রাষ্ট্র।

মূলতঃ কুফর আর তাগুত-এ দু'পরাশক্তি সারা বিশ্বের জন্য এক বিষাক্ত ও বিপদজনক ফোঁড়া। এর অপারেশন ব্যতিরেকে পৃথিবীর দেহ সুস্থ হতে পারে না। বরং বিশ্বের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য। তাই এ কুফরী শক্তি যখন প্রবল শক্তি নিয়ে ইসলামের প্রতি আক্রমণোদ্যত হয় অথবা তা ইসলাম, মুসলমান এবং বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়, তখন ইসলাম নির্দেশ প্রদান করে যে, 'এ সকল কুফর ও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই কর।' যাতে মুসলমান ও অন্যান্য বনী আদমের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষিত এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে যায়। হক ও সত্য জয়লাভ করে। অন্যায়-অবিচার দূর হয়ে সুবিচার প্রতিষ্ঠা পায়। মানুষ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগে আল্লাহ্র ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য কাফেরদের মুসলমান বানানো নয়, বরং তাদের শান-শওকাত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, জাঁকজমক, গর্ব-অহংকার চূর্ণ করা এবং তাদেরকে মুসলমানদের অনুগত হতে বাধ্য করা।

টীকা ঃ ১. আল্লাম রাগেব ইস্পাহানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৫০২ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্‌র বাণী সমুন্নত তথা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র দ্বীন ও বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জগতের উন্নতি ও কল্যাণ সাধন এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও বিপর্যয় রোধ করা। অবিচার, অনাচার এবং ফিৎনা-ফাসাদের মূলোৎপাটন করে দেশে শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং সুবিচার ন্যায়বিচারের পরিবেশ তৈরী করত দুনিয়াকে জান্নাতের স্বর্গোদ্যানে পরিণত করা।

মহানবী (স.)-এর জিহাদী জীবন ঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম বিদ্বেষী কুচক্রী মহল, যারা নাম স্বর্বস্ব মুসলমান এবং ইসলাম সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখে না, জিহাদের নাম শুনলেই তারা ঘাবড়ে যায় এবং এর উপরে নানা রকম অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন এবং ধৃষ্টতামূলক উক্তি পর্যন্ত করে, এ সকল জ্ঞানপাপী মহানবী (স.) এর যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি আমূল কটাক্ষ করে বলে, ধর্মীয় নেতাদের কাজ শুধু দ্বীনের প্রচার-প্রসার। অর্থাৎ তাদের সকল কার্যক্রম মসজিদ-মাদ্রাসা আর খানকায়ে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। পৃথিবীর রাজা-বাদশাদের মত রাজ্য অধিকার কিংবা জয়ের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া তাদের পক্ষে মোটেও শোভনীয় নয়। শুধু তাই নয়, আরো এক ধাপ আগে বেড়ে তারা এ মিথ্যাচার করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না যে, ইসলাম তার আপন স্বকীয়তা ও মাধুর্যতায় প্রসার লাভ করে নি; বরং তরবারির জোরে প্রসারিত হয়েছে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ ও নাঙ্গা তলোয়ারের মুখে মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হয়েছে।

মানুষের এ উদ্ভট ও ভিত্তিহীন ধারণা এবং জ্ঞানপাপী মহলের প্রোপাগাণ্ডার মোকাবেলায় এ পর্যায়ে নবীজী (স.)-এর সংগ্রামী জীবনের উপর এক সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা সংগত মনে করছি। যাতে নবীজীর যুদ্ধ-বিগ্রহ আর ইসলামী জিহাদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে যায় এবং এ জাতীয় কটাক্ষকারী ও বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডার মুখোশ খুলে যায়। সাথে সাথে যেন দিবালোকের ন্যায় সুপ্রতিভাত হয়ে যায় যে, জিহাদ মানব জাতির জন্য মূলত ভরপুর রহমত এবং তাদের একাল-সেকালের সার্বিক উন্নতি ও অনুপম কল্যাণের প্রকৃত আঁধার।

অতীব স্বর্তব্যের বিষয় হলো, কুরআন-হাদীস গভীর অধ্যয়নে এ সত্য উদ্ভাসিত হয় যে, আল্লাহ্ বিমুখ লোকদেরকে আল্লাহ্‌মুখী করতে দাওয়াত প্রদান, সত্য-ন্যায়ের বাণী উন্নীত করা, ন্যায়-ইনসাফ কায়েম করা, অনৈক্য-অবক্ষয়ের মূলোৎপাটন করা, অনাচার-অবিচার দূরীভীত করা, ভাল কাজের প্রসার ও মন্দ কাজের প্রতিরোধ-ই ছিল মহানবী (স.)-কে রসূলরূপে দুনিয়ায় প্রেরণের মৌলিক উদ্দেশ্য।

এ লক্ষ্যার্জনে মহানবী (স.) দীর্ঘ ১৩ বছর অব্যাহতভাবে মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেন। উপদেশ-অনুরাগের মাধ্যমে মানুষকে তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতি

www.e-ilm.weebly.com

আহ্বান এবং মূর্তি পূজা হতে নিষেধ করেন। ক্রমে হক-বাতিল আর গোমরাহীর মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার ফলে সৌভাগ্যবান একটি দল ইসলামের ছায়াতলে চলে আসেন। এতে মক্কার মুশরিক বিশেষত কুরাইশরা জ্বলে ওঠে এবং রসূল (স.) ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি নির্মম নির্যাতন চালায়। এখানেই শেষ নয়; তারা ক্রোধ-জিঘাংসা চরিতার্থ করতে খোদ রসূল (স.)-এর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রে পর্যন্ত লিপ্ত হয়। তাঁকে ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে মুছে দিতে নীল নক্সা প্রণয়ন করে। রসূল (স.) মোটেও বিচলিত হন না। তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে ধৈর্য ও সংযমের চূড়ান্ত পরিচয় দেন। প্রতিশোধের স্পৃহা অবদমিত রাখেন। সকল নির্যাতন-নিষ্পেষণ মুখ বুজে সহ্য করেন। কোনরূপ প্রতিরোধ কিংবা প্রতিবাদ পর্যন্তও করেন না।

আল্লাহ্ পাকের নির্দেশক্রমে এক সময় মহানবী (স.) ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করেন। স্বদেশ ত্যাগ করে এলেও কাঙ্ক্ষিত স্বস্তি লাভ করতে পারেন না। এখানেও ষড়যন্ত্র চলে। মক্কার মুশরিকরা মদীনার ইহুদীদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলাম বিরোধী চক্রান্ত দ্বিগুণহারে বৃদ্ধি করে। সীমাহীন এ নাজুক পরিস্থিতিতে শুধু আত্মরক্ষার্থে রসূল (স.) এ অনুমতি লাভ করেন যে, যারা প্রথমে যুদ্ধের সূচনা করে, আপনারা কেবল তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারেন। অনুমতি সম্বলিত এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير -

"অন্যায়ভাবে যারা আক্রমণের শিকার, তাদেরকে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হলো। আর আল্লাহ্ তাদের মদদ যোগাবার নিশ্চিত ক্ষমতা রাখেন।" (সূরা হজ্জ্ব ঃ আয়াত-৩৯)

অবশ্য পরে এ শর্ত প্রত্যাহার করে নেয়া হয় এবং ঢালাও এ অনুমতি দেয়া হয় যে, কাফেররা যুদ্ধের সূচনা করুক বা না করুক, তাদের সাথে যে কোন পরিস্থিতিতে জিহাদ করা যাবে।

এখানে যেটা দেখার বিষয় তা হলো, রসূল (স.) ও সাহাবীগণকে জিহাদের যে অনুমতি দেয়া হলো, এর ফলাফল কি দাঁড়ালো? বিশ্ব এ বিধান থেকে কি পেল? আল্লাহ্‌র এ অনুমতি যে ফলাফল বয়ে এনেছিল তা দেখে দুনিয়া আজও বিস্ময়ের ঘোরে নিপতিত। কারণ, সারা দুনিয়া চাক্ষুভাবে অবলোকন করে যে, মহানবী (স.) যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু করার পর থেকে পুরো বিশ্বের চিত্রই পাল্টে যায়। অসৎ কর্মের স্থান সৎকর্মগুলো দখল করে নেয়। অন্যায়-অবিচার লেজ গুটিয়ে নেয়। দিকে দিকে ইনসাফ ও ন্যায়ের রাজ কায়েম হয়। হক ও সত্যের জবান খুলে যায়। দূরাচার-অশান্তি বিদায় নেয়। ধরণী নিরাপত্তা ও সুখের পুষ্পকাননে পরিণত হয়।

www.e-ilm.weebly.com

রক্তপিপাসু বর্বর মানুষগুলো ফেরেশতাসুলভ গুণে গুণান্বিত হয়ে। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির গৌরবময় মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে। আল্লাহ্ বিমুখ মানুষ একত্ববাদের আবেহায়াত আকণ্ঠ পান করে চির ধন্য হয়। বিশ্ব ইতিহাসে মহানবী (স.) ব্যতীত আর কেউ পেরেছে কি দুনিয়ার বুকে এমন তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফলের নজির পেশ করতে !

ভারতের প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা আব্দুল মাজীদ দরিয়াবাদী (রহ.) এর একটি উক্তি বড়ই বাস্তবসম্মত ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, রসূল (স.) দশ বছর কালের ন্যূনতম সময়ে দুনিয়ার বুকে এক ঐতিহাসিক বিপ্লব সাধন করে গেছেন। বিদায়কালে ১২ লক্ষ বর্গমাইলব্যাপী একটি আদর্শ রাষ্ট্র উপহার দিয়ে গেছেন। আর তা লাখো মানুষের রক্তের বিনিময়ে না ; এমনকি হাজার মানুষেরও জীবনের বিনিময়ে নয়; বরং কান খুলে শুনুন, সমস্ত রণাঙ্গনে শত্রু-মিত্র মিলিয়ে সর্বমোট এক হাজার আঠারো (১০১৮) জন মানুষের জীবনাবসান ঘটে মাত্র। মুসলিম শিবিরের ২৫৯জন আর শত্রুশিবিরের ৭৫৯ জন।

ইনসাইক্লোপেডিয়া বৃটেনিকা-এর এগারতম এডিশনের বলিষ্ঠ উচ্চারণ ও অকপট ভাষ্যও এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ঃ

কঔঝ্ ওক ওখউউঝওওএখী্ এ হীী ৗঝীঅঐভৃখও ঝৌওূহীঅকঅঝও.

অর্থাৎ দুনিয়ার বুকে আবির্ভূত ধর্মীয় মনীষীদের মধ্যে তিনিই [মুহাম্মাদ (স.)] সবচে সফল ব্যক্তিত্ব। আরও উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

কঔঝ্ ওক ঘঅউঝীচ ৗঝইউ ঈৃঅৃ কঔঝ ঘৃীউ.

অর্থাৎ তাঁর আনীত গ্রন্থ 'কুরআন শরীফ' বিশ্বের সবচে অধিক পঠিত গ্রন্থ।

আর যে উম্মত তাঁর নাম স্মরণ করে, তাঁর প্রতি দুরুদ পড়ে তাদের সংখ্যা একশ' কোটির (বর্তমানে সোয়াশ কোটির) কাছাকাছি প্রায়। এমন ব্যক্তিত্বের পুরো জীবনকালকে যদি বিস্ময়কর এবং সর্বোচ্চ মোজেযা না বলা হয়, তবে আর কি বলা হবে!

উপরের আলোচনা হতে সুপ্রতিভাত যে, মহানবী (স.)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ দুনিয়ার রাজা-বাদশাদের যুদ্ধের মত দুনিয়ার জন্য অভিশাপ ছিল না। বরং ভরপুর রহমতই ছিল। তদুপরি কথা হলো, মহানবী (স.) এর এ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ রাজ্যশাসনের লিপ্সা ও অত্যাচার প্রসারের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং মানবের কল্যাণ, মুক্তি এবং সফলতা সূর্যের শুভোদয়ের জন্য ছিল। অন্যথা তা এমন বিস্ময়কর ফলাফল কখনো বয়ে আনত না এবং ইসলাম ধর্ম বিশ্বে জ্যোতির্ময় ও স্থিতিশীল ধর্ম হিসেবে এভাবে সর্বজন সমাদৃত ও সুপ্রতিষ্ঠা পেত না। যারা নবী করীম (স.)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ইসলামের জিহাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করে, বিষোদগার ছড়িয়ে ফেরে তাদের মূল টার্গেট জিহাদ নয়; বরং তারা মূলত ইসলামকেই সহ্য করতে পারে না। তারা মনে প্রাণে চায় না যে, ইসলামের বিজয় ও উন্নতি হোক, মুসলিম জাতি বিশ্বে মাথা

www.e-ilm.weebly.com

উঁচু করে দাঁড়াক, উন্নত ও সমৃদ্ধশালী জাতি হিসেবে বিবেচিত হোক, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের হাতে এসে যাক; বরং তারা ইসলামের অপমৃত্যু চায়। তাদের আন্তরিক কামনা হলো, মুসলমানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক। আল্লাহ্‌র দল পরাজিত ও ধ্বংস হোক। এর বিপরীতে শয়তানের দোসররা প্রভাব-বলয় বিস্তার করুক। মুসলমানদের জিহাদী প্রেরণা স্তিমিত ও তপ্ত খুন শীতল করাই এদের মূল উদ্দেশ্য। যাতে তাদেরকে যথেচ্ছা নির্যাতন-অত্যাচারের ব্লাকবোর্ড বানালেও তারা কোনরূপ প্রতিবাদ কিংবা টু-শব্দ পর্যন্ত করতে না পারে। বিরুদ্ধবাদীদের এই ব্যর্থ হীন উদ্দেশ্যের কথা আল্লাহ্ পাক এক আয়াতে এভাবে ফাঁস করে দিয়েছেন যে ঃ

يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لو كره الكافرون -

"তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ কাফেরদের অসহ্যকর হলেও আল্লাহ্ তার জ্যোতি পূর্ণতার সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত করবেনই।" (সূরা ছফ ঃ আয়াত-৮)

জনৈক কবির কণ্ঠে কত সুন্দরভাবে ঝংকৃত হয়েছে ঃ

چراغے راکہ ایزد برفروزد * کسے کس تف زند ریشش بسو زد -

"যে বাতিটি জ্বলে ওরে আদেশবলে খোদ বিধাতার,
সে বাতি যে নিভাতে চায় দাড়িই কেবল পুড়ে তার।"

اگر گیتی سراسر باد گیرد * چراغے مقبلا ہرگز نمیرد -

নিভবে না সে বাতি কভু জ্বেলেছেন যা আল্লাহ্ মহান,
যদিও তাতে বাঁধ সাধে ফুঁৎকার দেয় সারা জাহান।

কিন্তু মুসলিম জাতি সিংহের জাতি। তারা ভালভাবেই অবগত যে, এ জিহাদী প্রেরণাই তাদের আত্মিক শক্তির মূল উৎস। ইতিহাস সাক্ষী, যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের অভ্যন্তরে এ ঐতিহ্যবাহী জাতীয় প্রেরণা উজ্জীবিত ছিল, ততদিন বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা বিজয়ী এবং উন্নত শিরই ছিল। তাদের সামনে বিশ্বের পরাশক্তিসমূহ মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের কথা, যখন থেকে জাতি এ বিরাট দৌলত হারাতে বসেছে, ঠিক তখনই তারা চতুর্দিক হতে অপমান-অবহেলার শিকার হয়েছে। এটাই হলো মহানবীর (স.) উক্তির নিগূঢ় তাৎপর্য ঃ الجهاد ماض مذ بعثنى الله عـعالى الى يوم القيامة অর্থাৎ আমার আবির্ভাব হতে সুদূর কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে জিহাদী কার্যক্রম চলতেই থাকবে। এ জিহাদী প্রেরণাই মুসলমানদের বিরাট দৌলত, তারা এ দৌলত কোন মূল্যেই হাতছাড়া করতে পারে না। কারণ, তখনই তাদের পতন ঘন্টা বেজে উঠবে। বিপর্যয় হবে অনিবার্য। জনৈক কবি চমৎকার ভাষায় বলেছেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

فنافی اللہ کی تہ میں بقا کا رازمضمر

جو جینا ہے تو مرنے کیلئے تیار ہو جاؤ -

অনন্ত জীবন লভিবে তুমি উৎসর্গ তবে আল্লাহ্‌র তরে,

মৃত্যু-আলিঙ্গনে হও প্রস্তুত যারা দুনিয়ার পরে।

بنا کردند خوش رسمے بخاك وخون غلطیدن

خدا رحمت کند آں عاشقان پاك طینت را

অনুপম আদর্শের ভিত্তি প্রস্তর হয় রক্ত-মাটির হোলি খেলায়,

প্রেমিক প্রবর পূতঃমাটির বরকত সব লুফে নেয়।

জিহাদের উপকারিতা ও তাৎপর্য ঃ আল্লাহ্‌ মানুষের প্রবৃত্তির যে সমস্ত প্রেরণা ও চাহিদা মজ্জাগতভাবে করেছেন, তা অনর্থক ও ফালতু নয়, বরং তার মধ্যে নিহিত রয়েছে বিরাট বিরাট রহস্য আর নিগূঢ় তাৎপর্য। উদাহরণস্বরূপ (১) ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঠাণ্ডা, গরমের অনুভূতি মানুষের নিজের অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও তা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

(২) জৈবিক লিপ্সা, সন্তানের প্রতি প্রকৃতিগত টান বংশ টিকিয়ে রাখার স্বার্থে।

(৩) দয়া, স্নেহ-মমতা, ধৈর্য-সহনশীলতা, নিজের উপর অন্যের স্বার্থ প্রাধান্য দান ইত্যাদি সবই পরিবার ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ও পরিশুদ্ধের লক্ষ্যে।

অনুরূপভাবে ক্রোধ, রাগ, বিদ্বেষ, শত্রুতা, প্রতিশোধস্পৃহা ইত্যাদি প্রেরণা শত্রু প্রতিহত করার জন্য।

এখানে একটি বিষয় প্রনিধানযোগ্য যে, এ সকল মনুষ্য প্রেরণা বাস্তবায়নের যেরূপ সঠিক খাত রয়েছে, তদ্রূপ বেঠিক খাতও রয়েছে। যদি উপরোক্ত প্রেরণাগুলো সঠিক খাতে ব্যয়িত হয়, তাহলে তা থেকে উপকার ও ভাল ফলাফল লাভ হয়। পক্ষান্তরে ভুল খাতে ব্যয় করার দ্বারা অযাচিত ফল প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ, মানুষ যদি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় হালাল রিযিক খায় বা পান করে, তবে তা মানুষকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। পক্ষান্তরে হারাম রিযিক খেলে তা মানুষকে অন্যায় ও গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

এখানে আরও স্মরণযোগ্য যে, মানুষ যদি নিজ নিজ প্রবৃত্তিগত প্রেরণাকে তার সঠিক খাতে ব্যয় না করে, তাহলে ঐ প্রেরণা তাকে ভুল পথে পরিচালনা করবেই। যেমন মানুষ যদি আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সম্পদ আল্লাহ্‌র মর্জি মোতাবেক ব্যয় না করে, তবে তা অন্যায় পথে তথা খেলা-ধুলা, আনন্দ-ফূর্তি, বিনোদন এবং শরীয়ত বিরোধী কাজে ব্যয়িত হবে।

www.e-ilm.weebly.com

অনুরূপভাবে মানুষ যদি রাগ-ক্রোধ, বিদ্বেষ এবং শত্রুতাসুলভ মানসিকতাকে তার সঠিক খাত-আল্লাহ্র দুশমনদের পরাস্ত ও বিপর্যস্ত করার কাজ অর্থাৎ আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদে ব্যয় না করে, তবে তার অনিবার্য পরিণতি এই হবে যে, অন্যায় খাত তথা আপোসে বিবাদ-বিসম্বাদ শত্রুতা এবং পরস্পর মতানৈক্য ইত্যাদি অনৈতিক কাজে ব্যয়িত হবে। মোটকথা, মানুষ যদি তার রাগ-ক্রোধ ইত্যাদি প্রেরণার সঠিক খাত তথা জিহাদকে বর্জন করে, তবে বিপরীত অনিবার্য পরিণতি হিসেবে পরস্পরে বিভেদ, গৃহযুদ্ধ এবং শত্রুতার রূপে তা প্রকাশ পাবেই।

এ জন্য 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' মুসলিম জাতির বিভিন্নমুখী কঠিন রোগ (অর্থাৎ পরস্পরে বিবাদ, বিভেদ-বিভক্তি, শত্রুতা এবং মতানৈক্য)-এর অব্যর্থ সুবিচিকিৎসা। সাথে সাথে পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি এবং একতা সৃষ্টির একটি সফল মাধ্যমও বটে।

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)[১] বলেন, জিহাদের দৃষ্টান্ত ঐ পরনালার (নলের) ন্যায়, যা ছাদের পানি নিষ্কাশনের জন্য সংস্থাপন করা হয়। এটা এজন্য প্রয়োজন যে, যদি তা না থাকে, তবে বৃষ্টি ইত্যাদির পানি ছাদে জমে জমে এক সময় তা ছাদ চুইয়ে চুইয়ে ঘরের ভেতরে পড়ে। আল্লাহ্র শত্রুর সাথে মোকাবেলা মানুষের রাগ-ক্রোধ ইত্যাদি প্রেরণার পরনালা স্বরূপ। যদি এ রাগ-ক্রোধ শত্রুর মোকাবেলা তথা জিহাদের পথে না বের করে দেয়া হয় অর্থাৎ শত্রুর সাথে জিহাদে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে তার প্রতি অন্তরে পুঞ্জীভূত ক্রোধ-মানসিকতাকে যদি প্রতিফলিত না করা হয়, তবে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা, বিদ্বেষ ইত্যাদি সৃষ্টির মাধ্যমে তা অবশ্যই প্রতিফলিত হবে।(মা'আরেফুল কুরআন)

টীকা ঃ '১. শাহ্ ওলীউল্লাহ (রহ.), জন্ম ঃ ১১১৪ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১১৭৬ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
كتاب المغازى যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্ব	১৯
باب غزوة العشيرة أو العسيرة উশাইরা বা উসাইরা যুদ্ধ	২০
একটি জরুরী জ্ঞাতব্য	২১
fi تعداد غزوات النبى রসূল (স.)-এর জিহাদের সংখ্যা	২২
সামঞ্জস্য বিধান	২২
اول الغزوت সর্বপ্রথম যুদ্ধ	২৩
গাযওয়া ও সারিয়্যার ক্রমবিন্যাস	২৪
সারিয়্যাহ ও বিভিন্ন স্থানে বাহিনী প্রেরণের সংখ্যা	২৫
বদরের যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে মহানবী (স.)-এর আগাম ঘোষণা	২৫
باب قصة غزوة بدر বদর যুদ্ধের ঘটনা	২৭
বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট	২৭
বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা	২৮
বদর যুদ্ধের ফলাফল	২৯
ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব	২৯
শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল	৩৫
باب عدة أصحاب بدر বদরী সাহাবীদের সংখ্যা	৩৫
মতান্তরের সমাধান	৩৬
উল্লেখিত আটজন ব্যক্তিত্ব	৩৬
তালূতের কাহিনী	৩৬
কুরাইশ কাফিরদের প্রতি মহানবী (স.)-এর বদদোয়া	৩৭
ماب قتيل أبى جهل আবু জাহেলের হত্যা	৩৮
"قوله اعمد من رجل قتلتموه" বাক্যের অর্থসমূহ	৩৯
আবু জাহেলের হত্যাকারী কে?	৩৯
বহুমুখী বর্ণনার সুরাহা	৪০
উমাইয়া হত্যার বিবরণ	৪৪
উমাইয়ার হত্যাকারী কে?	৪৪
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	৪৫
মৃতের শ্রবণ প্রসঙ্গ	৪৮
কুরানিক আয়াতের জবাব	৪৯

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত আয়েশা (রযি.) কর্তৃক বর্ণনার জবাব	৫১
مسئلة تعذيب الميت ببكاء أهله পরিবারের ক্রন্দনে মৃতকে শাস্তিদান প্রসঙ্গ	৫২
باب فضل من شهد بدرا বদর রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণকারীর মর্যাদা	৫৪
قصة حاطب بن أبى بلتعة হাতেব বিন আবী বালতাআর ঘটনা	৫৫
باب شهود الملائكة بدرا বদর রণাঙ্গনে ফেরেশতাদের উপস্থিতি	৬৪
باب অধ্যায় (শিরোনাম বিহীন)	৬৬
حكم الماع والغناء গান ও তা শ্রবণের বিধান	৭০
باب حديث بنى نضير বনূ-নযীর ঘটনার বিবরণ	৮৫
বনূ নযীর অভিমুখে কোচ করার কারণ	৮৬
واقعة بنى نضير বনূ নযীর ট্রাজেডী	৮৬
বনূ নযীর যুদ্ধের ফলাফল	৮৮
নবী করীম (স.) এর পরিত্যাজ্য সহায়-সম্পত্তি	৯০
মালে ফাই ব্যয়ের খাত	৯১
হাদীসের উপর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জবাব	৯৩
باب قتل كعب بن الأشرف কা'ব বিন আশরাফ হত্যাকাণ্ড	৯৫
কাব বিন আশরাফ হত্যার বৈধতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জওয়াব	৯৬
باب قتل أبى رافع আবু রাফে হত্যাকাণ্ড	৯৭
কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়	৯৮
باب غزوة أحد উহুদ যুদ্ধ	৯৯
উহুদ যুদ্ধের পটভূমি	৯৯
উহুদ যুদ্ধের ফলাফল	১০০
শহীদদের জানাযা নামায প্রসঙ্গ	১০১
জানাযা নামায প্রবক্তাদের প্রমাণাদি	১০২
জানাযা বিরোধীদের দলীল ও তার জওয়াব	১০২
যাবের (রযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের স্বতন্ত্র জওয়াব	১০৩
জানাযা বিরোধীদের আরও তিন দলীল ও তার জওয়াব	১০৩
الصلاة على الغائب গায়েবানা জানাযা	১০৫
الصلاة على القبر কবরের উপর জানাযা	১০৬
باب ذكر أم سليط উম্মে সালীত আলোচনা প্রসঙ্গ	১১৫

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
باب قتل حمزة رضـ হযরত হামযা (রযি.)-এর হত্যা প্রসঙ্গ	১১৫
باب ماأصاب النبى fi من الجوارح নবী করীম (স.) এর আঘাতপ্রাপ্তি	১১৭
একটি সূক্ষ্ম তথ্য	১১৮
আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দানকারীগণ প্রসঙ্গ	১১৯
باب من قتل من المسلمين يوم احد উহুদ যুদ্ধের শহীদ যারা	১১৯
باب أحد يحبنا ونحبه উহুদ ও আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা প্রসঙ্গ	১২০
باب غزوة الرجيع রযী' যুদ্ধ	১২১
রযী' যুদ্ধের পটভূমি	১২২
বীরে মাউনা ঘটনার বিবরণ	১২২
مسئلة القنوت কুনূত প্রসঙ্গ	১২৪
হিজরতের ঘটনা	১৩১
باب غزوة الخندق খন্দক যুদ্ধ	১৩৩
খন্দক হতে নবীর (স.) প্রত্যাবর্তন ও বনূ কুরাইজা অভিমুখে রওনা	১৩৯
باب غزوة ذات الرقاع জাতুর-রিকা যুদ্ধ	১৪৩
باب غزوة بنى المصطلق বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ	১৪৭
জানার বিষয়	১৪৮
আযল ও বার্থ কন্ট্রোল	১৪৮
আযল বনাম বার্থ কন্ট্রোল	১৫২
باب غزوة انمار আনমার যুদ্ধ	১৫৪
باب حديث الإفك ইফকের বিবরণ	১৫৪
باب غزوة الحديبية হুদায়বিয়া যুদ্ধ	১৫৮
হুদায়বিয়া যুদ্ধের পটভূমি	১৫৮
নেককারদের কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে বরকত হাসিল	১৬৩
باب قصة عكل و عرينية উক্ল্ ও উরায়নার ঘটনা	১৭১
হলফদান প্রসঙ্গে ইমামদের অভিমত	১৭২
باب غزوة ذى قرد জী-করাদ যুদ্ধ	১৭৪

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
باب غزوة خيبر খয়বার যুদ্ধ	১৭৫
মুতা হারাম প্রসঙ্গ	১৮১
ইসলামে ঘোড়ার বিধান	১৮৫
প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধের বণ্টন বিধান	১৮৭
ছাগলের গোশতে বিষ মিশিয়ে খয়বারে রসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	১৯৬
باب غزوة زيد بن حارثة যায়েদ বিন হারেসা যুদ্ধ	১৯৭
باب عمرة القضاء উমরাতুল কাযা প্রসঙ্গ	১৯৭
باب غزوة موته মুতা যুদ্ধ	২০১
রসূল (স.) কর্তৃক উসামাকে হুরুকা গোত্রের প্রতি প্রেরণ	২০২
باب غزوة الفتح মক্কা বিজয় যুদ্ধ	২০৩
باب غزوة الفتح فى رمضان রমযানে মক্কা বিজয় যুদ্ধ	২০৫
রসূল (স.) পতাকা কোথায় স্থাপন করেন?	২০৬
মক্কার উর্দ্ধপ্রান্ত দিয়ে মহানবীর (স.) প্রবেশ	২১২
باب منزل النبى fi يوم الفتح বিজয়ের দিন মহানবীর (স.) আবাস	২১২
باب অধ্যায় (শিরোনাম বিহীন)	২১২
বিজয়কালীন সময়ে মহানবীর (স.) মক্কায় অবস্থান	২১৩
باب قول الله تعالى "ويوم حنين" "হুনাইন যুদ্ধ" প্রসঙ্গ	২১৫
باب غزوة اوطاس আওতাস যুদ্ধ	২১৮
باب غزوة الطائف তায়েফ যুদ্ধ	২১৯
باب السرية التى قبل نجد নাযদ অভিমুখে প্রেরীত সারিয়্যাহ	২২৪
রসূল (স.) কর্তৃক খালিদকে (রযি.) বনূ জাযীমার প্রতি প্রেরণ	২২৪
باب سرية عبد الله بن حزافة আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সারিয়া	২২৫
হযরত আবু মূসা ও মুয়াজকে (রযি.) ইয়ামানে প্রেরণ	২২৫
হযরত আলী ও খালিদকে ইয়ামানে প্রেরণ	২২৭
باب غزوة ذى الخلصة জুল খালাচা যুদ্ধ	২২৯
باب عزوة ذات السلاسل জাতুস সালাসীল যুদ্ধ	২৩০

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
باب ذهاب جرير رض إلى اليمن ইয়ামানে হযরত যারীরের (রযি.) গমন	২৩১
باب غزوة سيف البحر সমুদ্র উপকূলবর্তী যুদ্ধ	২৩২
হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ্বব্রত পালন	২৩৪
باب وفد بني تميم বনী তামীম প্রতিনিধি দল	২৩৫
باب অধ্যায় (শিরোনাম বিহীন)	২৩৫
باب وفد عبد القيس আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দল	২৩৬
باب قصة الاسود العنسي আসওয়াদ আনসীর ঘটনা	২৪০
باب قصة أهل نجران নাযরানবাসীদের ঘটনা	২৪১
باب قصة عمان و والبحرين উম্মান ও বাহরাইনের ঘটনা	২৪২
باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن আশয়ারী ও ইয়ামানীদের আগমন	২৪২
তঈ প্রতিনিধি দল ও আদী বিন হাতেমের কাহিনী	২৪৫
باب حجة الوداع বিদায় হজ্জ	২৪৫
উমরার দ্বারা হজ্জ বাতিল সংক্রান্ত মতভেদ	২৫০
তাবুক যুদ্ধ বা উসরা (ভীষণ কষ্টাত্মক) যুদ্ধ	২৫৮
باب حديث كعب بن مالك কা'ব বিন মালেকের কাহিনী	২৬০
باب نزول النبي الحجر হিযরে মহানবীর (স.) অবতরণ	২৬১
কিসরা ও কায়সারের প্রতি মহানবীর (স.) পত্র	২৬১
fi باب مرض النبي মহানবীর (স.) অন্তিম পীড়া	২৬৩
রসূল (স.) কর্তৃক উসামাকে (যুদ্ধের জন্য) প্রেরণ	২৭৪
মাগাযীর সংক্ষিপ্ত তালিকা	২৭৬
সারিয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকা	২৭৭
كتاب التفسير তাফসীর পর্ব	২৭৯
ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে আলোকপাত	২৮২
سورة البقرة সূরা বাকারা	২৮৪
কেবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ	২৯১
সূরা আল ইমরান	৩১৪
পবিত্র কুরআনে আয়াতে মুতাশাবিহাত অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য	৩১৬
সূরা নিসা	৩২১
সূরা মায়েদা হলফ বা শপথের হাদীস	৩২৫

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা আন'আম	৩৩০
সূরা আ'রাফ	৩৩৫
সূরা আনফা	৩৩৮
সূরা বারাআত (তওবা)	৩৪০
কুরআন সংকলণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৩৫০
সূরা ইউনুস	৩৫২
রাসূল (সা.)-এর যুগে কোরআন-সংরক্ষণ	৩৫৩
রসূল (স.)-এর যুগে কুরআন লিখন	৩৫৪
হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যুগে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ	৩৫৯
হযরত উসমান (রযি.)-এর যুগে কুরআন একত্রীকরণ	৩৬৩
সূরা হুদ	৩৬৯
সূরা ইউসুফ	৩৭০
সূরা র'দ	৩৭২
সূরা ইব্রাহীম	৩৭২
সূরা হিয্‌র	৩৭৩
সূরা নাহল	৩৭৪
সূরা বনী ইসরাঈল	৩৭৫
সূরা কাহফ	৩৭৫
সূরা মারয়াম	৩৭৮
সূরা ত্বহা	৩৭৯
ইসমাতে আম্বিয়া বা নবীগণের নিষ্পাপতা	৩৮২
সূরা হজ্জ	৩৮৩
সূরা নূর	৩৮৭
কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	৩৮৮
সূরা ফুরকান	৩৯০
সূরা আহযাব	৩৯০
সূরা সাবা	৩৯১
সূরা ইয়াসিন	৩৯১
সূরা হা-মিম সাজদা	৩৯৩
সূরা শূরা	৩৯৪
সূরা যাছিয়া	৩৯৪
সূরা নযম	৩৯৫
সূরা ক্বমার	৩৯৯

www.e-ilm.weebly.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَغَازِىْ

যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্ব

مَغَازِىْ (মাগাযী)-এর আভিধানিক অর্থ ঃ اَلْمَغَازِىْ শব্দটি مَغْزًى এর বহুবচন। এটি ظَرْف হওয়ার সম্ভাবনা রাখলেও এখানে মাসদার তথা ক্রিয়ামূল। ব্যাকরণে পড়া হয়– غَزَا يَغْزُوْ غَزْوًا وَمَغْزًى وَمَغْزَاةً শব্দটির আভিধানিক অর্থ ঃ ইচ্ছা করা, উদ্দেশ্য নেয়া, পরিকল্পনা গ্রহণ, সংকল্প করা প্রভৃতি। লোকে বলে॥ مَغْزَى الْكَلَامِ; এর অর্থ কথার উদ্দেশ্য।

مَغَازِىْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ খোদ মহানবী (স.)-এর নেতৃত্বে অথবা তাঁর নির্দেশে অন্য সেনাপতির নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর কাফিরদের মোকাবেলায় রওনা হওয়া; চাই বাস্তবে যুদ্ধ সংঘটিত হোক বা না হোক। (১) হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) মাগাযীর এক ব্যাপক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ وَالْمُرَادُ بِالْمَغَازِىْ هٰهُنَا مَا وَقَعَ مِنْ قَصْدِ النَّبِيِّ ﷺ الْكُفَّارَ بِنَفْسِهٖ أَوْ بِجَيْشٍ مِنْ قِبَلِهٖ অর্থাৎ, খোদ নবী (স.) অথবা তাঁর পক্ষ হতে প্রেরিত মুসলিম বাহিনী কর্তৃক কাফিরদের মোকাবেলা করতে গিয়ে যা কিছু ঘটেছে (যুদ্ধ, সন্ধি, অবরোধ, চুক্তি প্রভৃতি) এখানে মাগাযী বলতে তার সবই উদ্দেশ্য। তবে সাধারণত যে সমস্ত জিহাদে নবীজী (স.) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন বা তাঁর নিজের নেতৃত্বে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাকে 'গাযওয়া' বলা হয়। আর যে সমস্ত জিহাদে নবী করীম (স.) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না, বরং তাঁর পক্ষ হতে নিযুক্ত অন্য কোন সাহাবীর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে, তাকে 'সারিয়্যাহ' বলা হয়। তবে (২) ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে এতদুভয়ের মাঝে কোন প্রভেদ নেই। তাই তিনি এ অধ্যায়ে যেমন 'গাযওয়া'-এর আলোচনা করেছেন, তেমনি 'সারিয়্যাহ' ও দূত প্রেরণ ঘটনারও উল্লেখ করেছেন।

গাযওয়া বা জিহাদের অনুমোদন ঃ (৩) ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, জিহাদের অনুমতি সম্বলিত পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হচ্ছে ঃ أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ....الخ অর্থাৎ, আক্রান্তদের জিহাদ করার অনুমতি দেয়া হলো, কারণ তাঁরা অত্যাচারিত....। (সূরা হজ্ব ঃ ৩৯) আল্লামা কস্তালানী (রহ.) 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে লিখেন ঃ দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাসের

www.e-ilm.weebly.com

১২ তারিখে রসূলুল্লাহ (স.) কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুমতি সর্বপ্রথম লাভ করেন। (ফাতহুল বারী, আইনী, লামিউদ্দারারী)

بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ

উশাইরা বা উসাইরা যুদ্ধ

الْعُشَيْرَةُ أَوِ الْعُسَيْرَةُ ঃ শব্দটি শীন (ش) যুক্ত হবে না সীন (س) যুক্ত হবে? তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ঃ ইনি মুহাম্মাদ বিন ইসহাক বিন ইয়াসার আল মাদানী আত-তাবেয়ী। তিনি হলেন ইমামুল মাগাযী (সমর ঐতিহাসিক) এবং ইমাম বুখারী (রহ.)-এর উস্তাদ। তিনি বাগদাদে হাদীসের দরস দেন। ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম আবু হানীফা গোরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

الْاَبْوَاءُ ঃ মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী 'ফরা' নামক স্থানের এক বসতির নাম اَلْاَبْوَاءُ (আল আবওয়া)। হিজরী দ্বিতীয় সনের সফর মাসে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার গতিরোধ করতে রসূল (স.) ২০০* সাহাবীসহ মদীনা হতে রওনা হন। কিন্তু বাণিজ্যিক দলের সাক্ষাৎ মেলেনি। বনী জমরার সাথে সন্ধি করে রসূল (স.) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

রাসূলে আকরাম (স.) এ সময়ে মোট ১৫ রাত মদীনার বাইরে অবস্থান করেন। এটাই রসূল (স.)-এর সর্বপ্রথম গাযওয়া (যুদ্ধ)। এর অপর নাম 'ওদ্দান যুদ্ধ'। 'আবওয়া' আর ওদ্দান পাশাপাশি দু'টি এলাকা।

اَلْبُوَاطُ ঃ সিরিয়ার গমনাগমন পথে ইয়ানবু-এর সন্নিকটে জুহাইনা পর্বতমালার দু'শাখা বিশিষ্ট একটি পাহাড়ের নাম بواط (বাওয়াত/বুওয়াত)। রসূল (স.) ২০০ সাহাবী নিয়ে কুরাইশ বাণিজ্য দলের গতিরোধ করতে হিজরী দ্বিতীয় সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা হতে যাত্রা করেন। কিন্তু এ যুদ্ধেও কুরাইশ কাফেলার সাক্ষাৎ মেলেনি।

اَلْعُشَيْرَةُ ঃ ইয়ানবুয়ের নিকটস্থ একটি স্থানের নাম اَلْعُشَيْرَةُ (উশাইরা)। কুরাইশদের একটি দল বাণিজ্যসম্ভার নিয়ে মক্কা থেকে সিরিয়া রওনা হয়েছে।এ মর্মে গোপন সূত্রে সংবাদ পেয়ে রসূল (স.) ২০০ সাহাবীসহ তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে মদীনা থেকে রওনা হয়ে উশাইরায় উপনীত হন। রসূল (স.) জুমাদাল উখরার কয়েক দিন তথায় অবস্থান করেন। কুরাইশ কাফেলার সাথে এবারও সাক্ষাৎ হয়না। কয়েক দিন পূর্বেই কাফেলা উক্ত স্থান অতিক্রম করে চলে যায়। এ বাণিজ্য কাফেলাই আবার যখন সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন রসূল

টীকা ঃ *লেখক ওখানে ২০০ সাহাবীর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বহু ইতিহাস গ্রন্থ খুঁজেও এর সমর্থন মেলেনি। অপরদিকে সীরাতুল মুস্তাফা গ্রন্থে তবকাতে ইবনে সাদের সূত্রে ৬০ জন মুহাজির সাহাবীর কথা এসেছে। (সিরাতুল মুস্তফা-১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭, তবকাতে ইবনে সাদ-২য় খণ্ড. পৃ. ৩) (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

(স.) পুনরায় তাদের গতিরোধ করতে যাত্রা করেন। যার ফলে এক পর্যায়ে সংঘটিত হয় ঐতিহাসিক যুদ্ধ 'বদর'। (আসাহ্হুস্ সিয়ার)

قُلْتُ فَأَيُّهُمْ ঃ আল্লামা কস্তলানী (রহ.) বলেন ঃ ব্যাকরণগত দিক দিয়ে فَأَيُّهُنَّ বা فَأَيَّتُهُنَّ অথবা فَأَيُّهَا হওয়াই সমীচীন। এজন্য (প্রশ্ন এড়াতে) কেউ কেউ এখানে مُضَافٌ উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ, فَأَيُّ غَزْوَتِهِمْ । তবে যে সনদে ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীস এখানে উল্লেখ করেছেন, হুবহু সে সনদে তিরমিযীতেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে فَأَيَّتُهُنَّ শব্দ এসেছে। এ জন্য ইবনে হাজার (রহ.) বলেন ঃ এ থেকে জানা যায় যে, মূল হাদীস এটাই (অর্থাৎ, তিরমিযীর হাদীস)। বুখারীতে এ ব্যাখ্যা হয়ত ইমাম বুখারী অথবা তাঁর শাইখ থেকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

একটি জরুরী জ্ঞাতব্য

রসূল (স.) সর্বপ্রথম কুরাইশদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন? রসূল (স.)-এর যুদ্ধ-দাস্তান পাঠ করলে একথা প্রভাতরশ্মির মতো সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আরবের সর্বপ্রথম যে গোত্রের মুখোমুখী তিনি হন, তা ছিলো কুরাইশ গোত্র। নেপথ্যে কারণ ছিলো, নবুওয়াত লাভ করে রসূল (স.) যখন প্রথমত গোপনে ও পরে প্রকাশ্যে মানুষদেরকে সত্যের প্রতি দাওয়াত দিতে শুরু করেন এবং যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবসম্মত বক্তব্যের পরশে তাদেরকে প্রতিমা-উপাসক থেকে আল্লাহ্র উপাসকে পরিণত করার প্রাণপণ প্রয়াস চালান, তখন সর্বপ্রথম যে গোত্র তীব্র প্রতিবাদমুখর হয়ে রসূল (স.)-এর সরাসরি বিরোধিতা করে, তারা ছিলো এই কুরাইশ গোত্র। তারা রসূল (স.)-এর তাবলীগী মিশনকে ব্যর্থ করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। দ্বীনের প্রচার-প্রসারে অন্তরায় সৃষ্টি করে বিবিধ নির্যাতন-নিপীড়ন চালায়। রসূলুল্লাহ (স.)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। তাদের এহেন ন্যাক্কারজনক আচরণ সত্ত্বেও রসূল (স.) নবুওয়াতের মহান লক্ষ্য থেকে বিন্দুমাত্র পিছপা না হলে তারা তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার নীলনক্সা প্রণয়ন করে— নাউযুবিল্লাহ। এতেই তারা ক্ষান্ত হয় না; বরং যে সকল আল্লাহ্র বান্দা শরাব, মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করত নবী করীম (স.)-এর অনুসারী হন তাঁদের প্রতি নির্যাতনের এমন স্টীমরোলার তারা চালায়, যার নজীর ইতিহাসে বিরল।

১৩ বছরের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যখন প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত ও এক আল্লাহ্র ইবাদাত পুরোপুরি স্বীকৃতি পেলো না, আল্লাহ্র বাণীর সুমহানতায় উত্তরোত্তর অন্তরায় বৃদ্ধি পেলো, তাবলীগী মিশন প্রশ্নে মক্কাভূমি সংকীর্ণ হয়ে গেলো, এমনকি কুরাইশরা রসূলে করীম (স.)-কে হত্যার জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা পর্যন্ত গ্রহণ

www.e-ilm.weebly.com

করলো, তখন আল্লাহ্র আদেশে নবীয়ে আকরাম (স.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। হিজরতোত্তর দাওয়াতের কাজ নতুন উদ্যোগে রসূল (স.) শুরু করলে এই কুরাইশরা মদীনার আশপাশে বসবাসরত ইহুদীদের সাথে ষড়যন্ত্র করে পুনরায় তাদের ঘৃণিত অভিলাষ পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে থাকে এবং ইসলামকে চিরতরে দুনিয়া থেকে মিটিয়ে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এ নাজুক পরিস্থিতিতে তাবলীগী মিশনের উন্নতি-অগ্রগতির পথে আগত এ চরম অন্তরায়ের আশু অপসারণ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এটা সর্বজনবিদিত যে, কুরাইশ কাফিররা ইসলাম ও রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যে হীন ষড়যন্ত্র ও বিশাল রণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে তার পিছনে মক্কা থেকে সিরিয়া গমনাগমনকারী কুরাইশ কাফেলার বাণিজ্যিক আয় সবচে বেশি মদদ জোগায়। এ বিপুল উপার্জন থেকে বঞ্চিত হলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়তে কস্মিনকালেও কুরাইশরা হিম্মত করতো না। তাই রসূল (স.) চেয়েছিলেন, প্রথমেই এ উৎস-মুখ সীল করে দিয়ে কুরাইশদের প্রতি অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করতে। মূলত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে রসূল (স.) সর্বপ্রথম কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন করতে মদীনা থেকে রওনা হন।

تَعْدَادُ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

রসূল (স.)-এর জিহাদের সংখ্যা

রসূল (স.)-এর জিহাদের সংখ্যা নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়। যথা ঃ

(১) সমর ইতিহাসবেত্তা (ইমামুল মাগাযী) মূসা বিন উকবা[১], মুহাম্মাদ বিন ইসহাক[২], ওয়াকিদী[৩], ইবনে সাদ, ইবনুল জাওযী[৪], আদ্ দিমইয়াতীল ইরাকী[৫] প্রমুখের মতে-২৭টি। সূত্র ঃ —দীবাযাতুল ইস্তেআব।

সামঞ্জস্য বিধান

(১) প্রত্যেক রাবী নিজের জানা তথ্য ব্যক্ত করেছেন।

(২) রাবীদের ধর্তব্যের ভিত্তিতে এ বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। অতএব কেউ এক সফরের অধীনে সংঘটিত সকল যুদ্ধকে একই যুদ্ধ গণনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, মক্কা বিজয় সফরে মক্কা ব্যতীত তায়িফ, হুনাইন এবং আওতাস যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেগুলো তারা একই যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। এ দৃষ্টিকোণে যুদ্ধ-সংখ্যা ২৭-এর নীচে নেমে আসে।

টীকা ঃ ১. মূসা বিন উকবা (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৪১ হিঃ;
২. মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.) মৃত্যু ঃ ১৫১/১৫২/১৫৩ হিঃ;
৩. আল্লামা ওয়াকিদী (রহ.) মৃত্যু ঃ ২০৭ হিজরী;
৪. ইবনুল জাওযী (রহ.) মৃত্যু ঃ ৫৯৭ হিঃ;
৫. আদ দিমইয়াতিল ইরাকী, মৃত্যু ঃ ৭০৫/৭০৬ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

(২) ইবনে ইসহাক থেকে বুকায়ীর বর্ণনা মতে ২৬টি।

(৩) ইবনে মুসাইয়িবের[১] বর্ণনাক্রমে ২৪টি।

(৪) কারো মতে-২৫টি।

(৫) তবরানী (রহ.) এর বর্ণনায় এসেছে-২২টি।

(৬) হযরত জাবের (রযি.) এর বর্ণনাক্রমে-২১টি।

(৭) হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রযি.)-এর আলোচ্য বর্ণনাক্রমে-১৯টি।

(৩) আল্লামা সুহাইলী[২] বলেন ঃ অতীব সন্নিকট হেতু কেউ কেউ দু'যুদ্ধকে এক যুদ্ধ বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ, 'আবওয়া' ও 'বুওয়াত' মিলে এক যুদ্ধ। উহুদ ও হামরাউল আসাদ মিলে এক যুদ্ধ। খন্দক আর কুরাইজা মিলে এক যুদ্ধ। খাইবর ও ওয়াদীল্-কুরা মিলে এক যুদ্ধ এবং তায়িফ ও হুনাইন মিলে এক যুদ্ধ।

এ হিসেবে যুদ্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২। হযরত জাবির (রযি.)-এর বর্ণনায় আগত ২১ সংখ্যাও ঠিক এভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজারের ভাষ্য ঃ وَلَعَلَّ السِّتَّةَ الزَّائِدَةَ مِنْ هٰذَا الْقَبِيْلِ অর্থাৎ, সম্ভবত (২১ এর উপর) বাড়তি ৬ সংখ্যা এ প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত। আর হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রযি.) এর বর্ণনায় যে ১৯ সংখ্যা এসেছে। তার সমাধান হলো, হয়তো বয়স কম থাকায় আবওয়া ও বুওয়াত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ ছিলেন না।

اَوَّلُ الْغَزَوَاتِ

সর্বপ্রথম যুদ্ধ

ইমাম বুখারী (রহ.) যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্ব "بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ اَوِ الْعُسَيْرَةِ" দ্বারা শুরু করে প্রথমে হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রযি.)-এর হাদীস উল্লেখ করেছেন। হাদীসে 'উশাইরা' সর্বপ্রথম যুদ্ধ হবার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর কাতাদা[৩] (রহ.)-এর উক্তির মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো সুদৃঢ় করা হয়েছে। কেননা, হযরত কাতাদা (রহ.) উশাইরা সর্বপ্রথম যুদ্ধ হবার বিষয়টিকে নাকচ করে দেননি; শব্দটি শুদ্ধ করে দিয়েছেন মাত্র। এ থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহ.) এর মতে সর্বপ্রথম যুদ্ধ উশাইরা। তবে মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকদের নিকট 'আবওয়া' সর্বপ্রথম যুদ্ধ হিসেবে অধিক প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। হাদীস ব্যাখ্যাকারকগণ এ তারতম্যের নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন—

(১) ইবনুত-তীন বলেন ঃ এখানে ভাষ্য উহ্য রয়েছে। মূল ভাষ্য হবে। مَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا وَاَنْتَ مَعَهُ। সুতরাং সর্বপ্রথম যুদ্ধ বলতে রসূল (স.) পরিচালিত সর্বপ্রথম যুদ্ধ কোন্টি ছিলো, তা জিজ্ঞাসা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং

টীকা ঃ ১. ইবনে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.), মৃত্যু ঃ ৯৪ হিঃ;
২. আল্লামা সুহাইলী (রহ.), মৃত্যু ৫৮১ হিঃ
৩. হযরত কাতাদা (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১৭/১১৮ হিঃ;

www.e-ilm.weebly.com

উদ্দেশ্য হলো, সর্বপ্রথম যুদ্ধ কোন্‌টি যাতে আপনিও সাহাবীদের সাথে শরীক ছিলেন? এরই প্রত্যুত্তরে যায়িদ বিন আরকাম বলেন॥'উশাইরা'। ইবনে হাজার (রহ.)ও এ ব্যাখ্যাকে সঠিক আখ্যা দিয়েছেন। (ফতহুল বারী)

(২) আল্লামা আইনী[১] (রহ.) বলেন ঃ ঐতিহাসিকগণ উশাইরার পূর্বে যে তিন যুদ্ধের কথা (আবওয়া, বুওয়াত ও বদরে উলা) উল্লেখ করেন॥হতে পারে যায়িদ বিন আরকাম তাঁর বয়সের স্বল্পতা বা তখন ইসলাম গ্রহণ না করায় অথবা এ সকল যুদ্ধ প্রসিদ্ধ না হওয়ার কারণে এ সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফ ছিলেন না।

(৩) হতে পারে এ সকল যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তা উল্লেখ করেননি। —আয়নী।

(৪) শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া[২] (রহ.) বলেন ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক প্রথমে بَابُ غَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ উল্লেখ ও তন্মধ্যে হযরত যায়িদ বিন আরকাম (রহ.)-এর হাদীস উল্লেখ করার দ্বারা 'সর্বপ্রথম যুদ্ধ উশাইরা' প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং তাঁর উদ্দেশ্য, বদরুল্ কুবরা (বদর যুদ্ধ)-এর ঘটনা বর্ণনা করা। যেহেতু উশাইরা ছিলো বদর যুদ্ধের পটভূমিকা, তাই পূর্বাভাসস্বরূপ উশাইরার উল্লেখ করেছেন মাত্র। শুধু যায়িদ বিন আরকাম (রযি.)-এর হাদীস দ্বারা উশাইরা সর্বপ্রথম যুদ্ধ হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হয় বিধায় পরবর্তীতে মুহাম্মাদ বিন ইসহাকের উক্তি এনে সেই ধারণাকে দূর করে দিয়েছেন। —লামিউদ্-দারারী।

গাযওয়া ও সারিয়্যার ক্রমবিন্যাস

ইবনে সা'দ (রহ.) সারিয়্যা ও গাযওয়ার ক্রমবিন্যাস এভাবে বর্ণনা করেছেন॥

(১) সারিয়াহ-হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব (হিজরতের সপ্তম মাস) (২) সারিয়্যাহ উবায়দা ইবনুল হারিছ (হিজরতের অষ্টম মাস) (৩) সারিয়্যাহ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (হিজরতের নবম মাস) (৪) গাযওয়ে আব্‌অ (হিজরতের বারতম মাস) (৫) গাযওয়ায়ে বাঅত (হিজরতের তেরতম মাস) (৬) গাযওয়ায়ে সফওয়ান (যার অপর নাম গাযওয়ায়ে বদরুল উলা)। এ যুদ্ধে রসূল (স.) কুরয বিন জাবির আল ফিহরীর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন (মদীনার চতুষ্পদ প্রাণী ডাকাতি করার কারণে) [দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস] (৭) গাযওয়ায়ে উশাইরা (দ্বিতীয় হিজরীর জুমাদাল উলা] [হিজরতের ১৬তম মাস]

হাফেয ইবনে কাইয়ুম 'যাদুল মা'আদ, আল্লামা কস্তলানী 'মাওয়াহিব' আর আল্লামা যারকানী[৩] (রহ.) 'শরহুল মাওয়াহিবে' উপরোক্ত ক্রমবিন্যাসের সাথে

টীকা ঃ ১. আল্লামা আইনী (রহ.) জন্ম ঃ ৭৬২ হিঃ, মৃত্যু ঃ ৮৫৫ হিঃ।
২. হযরত যাকারিয়া (রহ.), জন্ম ঃ ১৩১৫ হিঃ,মৃত্যু ঃ ১৪০২ হিঃ।
৩. আল্লামা যারকানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১২২ হিঃ।
* হাফেজ ইবনুল কাইয়ুম (রহ.) জন্ম ঃ ৬৯১ মৃত্যু ঃ ৭৫১ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে ইবনে ইসহাকের মতে মাগাযীর সূত্রপাত আবওয়া দ্বারা। তিনি সারিয়্যাহ হামযা, সারিয়্যাহ উবাইদা ও সারিয়্যাহ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস গাযওয়ায়ে আবওয়ার পরে হবার প্রবক্তা। ইবনে হিশামেরও মত এটা। তাঁদের মতে এ সমস্ত ঘটনা দ্বিতীয় হিজরীর। (লামিউদ দারারী, আসাহহুস্ সিয়ার প্রভৃতি)

সারিয়্যাহ ও বিভিন্ন স্থানে বাহিনী প্রেরণের সংখ্যা

গাযওয়ার ন্যায় সারিয়্যার সংখ্যা নির্ণয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। যথা ঃ (১) ইবনে সাদ[১] (রহ.)-এর মতে-৪৭। (২) ইবনে আব্দুল বার (রহ.)[২]-এর মতে-৩৫। (৩) ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর মতে-৩৬ [ফতহুল বারী] (৪) ইবনে ইসহাক থেকে বুকায়ীর বর্ণনায় এসেছে ৩৫। (৫) ওয়াকীদীর মতে ৪৮। (৬) ইবনুল জাওযীর মতে ৫৬। (৭) মাসউদীর মতে ৬০। (৮) মুহাম্মাদ বিন নসরুল মারওযীর মতে ৭০। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন ঃ আমি মোগলতাঈর পাণ্ডুলিপির লেখা পড়েছি। তাতে গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যাসমষ্টি বর্ণিত হয়েছে ১০০। (লামিউদ্ দারারী)

بَابُ ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُقْتَلُ بِبَدْرٍ

বদরের যুদ্ধে নিহতদের ব্যাপারে মহানবী (স.)-এর আগাম ঘোষণা

হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, বাবের হাদীসে উমাইয়ার নিহতের যে ভবিষ্যৎ বাণী উল্লিখিত হয়েছে, তা বদর যুদ্ধের একমাস পূর্বে করা হয়। আল্লামা আইনী বলেন, এটা রসূল (স.)-এর এক বিরাট মুজিযা। মুসলিম শরীফে হযরত উমর (রযি.)-এর একটি রেওয়ায়েত এ মর্মে এসেছে যে, রসূল (স.) বদর যুদ্ধের পূর্ব রাতে আমাদের ঘুরে ঘুরে দেখান যে, এটা অমুক কাফিরের পতনভূমি, ওটা অমুক কাফিরের মৃত্যুস্থান। হযরত উমর (রযি.) বলেন, রসূল (স.) যেখানে যার চিহ্ন দেন, পরবর্তীতে আমরা সেখানেই তাকে মরে পড়ে থাকতে দেখেছি। (ফাতহুল বারী)

وَقَدْ اٰوَيْتُمُ الصُّبَاةَ (তোমরা আশ্রয় দিয়েছ ধর্মত্যাগকারীদের) ঃ صُبَاةٌ এটা صَابِئ-এর বহুবচন। এক ধর্ম হতে অন্য ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারীকে 'সাবী' বলে। মুসলমানরা তাদের পৈত্রিক ধর্ম বর্জন করত ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় উমাইয়া মুসলমানদেরকে সাবী বলে অভিহিত করে।

اِنَّهُمْ قَاتِلُوْكَ (তাঁরা তোমাকে কতল করবে) ঃ আল্লামা কিরমানী (রহ.)[৩]-এর মতে اِنَّهُمْ-এর ضَمِيْر (সর্বনাম) আবু জাহেল ও তার অনুচরদের

টীকা ঃ ১. ইবনে সা'দ (রহ.), মৃত্যু ঃ ২৩০ হিঃ।
২. ইবনে আব্দুল বার (রহ.), মৃত্যু ঃ ৪৬৩ হিঃ।
৩. আল্লামা কিরমানী (রহ.), জন্ম ঃ ৭১৭ হিঃ, মৃত্যু ঃ ৭৮৬ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

দিকে ফিরেছে। যেহেতু বাস্তবে আবু জাহেল ও তার অনুচরেরা উমাইয়াকে কতল করেনি তাই তিনি আপন উক্তির ব্যাখ্যা এভাবে দেন যে, যদিও তারা তাকে হত্যা করেনি, তবে তার হত্যার কারণ ছিলো। ইবনে হাজার (রহ.) বলেন ঃ কিরমানীর এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ, হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান যে, উমাইয়া তার স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে ঃ إِنَّ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর সাহাবাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে হত্যা করবে। এ উক্তিটি স্পষ্টত প্রমাণ করে যে, أَنَّهُمْ-এর ضَمِير রসূল (স.) ও তাঁর সাহাবীদের দিকে ফিরেছে।

اِسْتَنْفَرَ أَبُوْ جَهْلِ النَّاسَ (আবু জাহেল লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য রওনা হতে অনুরোধ করলো) ঃ আল্লামা কস্তলানী (রহ.) বলেন, আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হতে মক্কা প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে রাসূলে আকরাম (স.) গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উক্ত কুরাইশ কাফেলাকে আটক করতে মুসলমানদের আহ্বান করেন। আবু সুফিয়ান গোয়েন্দা সূত্রে এ সংবাদ পেয়ে জমজম বিন আমর আল-গিফারীকে মক্কার কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করে, যেন তারা আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়িক কাফেলা রক্ষায় ব্যবস্থা নেয়। জমজম মক্কা পৌঁছে তার উটের নাক কেটে ও জামা ফেঁড়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَمْوَالُكُمْ مَعَ أَبِيْ سُفْيَانَ قَدْ عَرَضَ لَهَا مُحَمَّدٌ - اَلْغَوْثَ اَلْغَوْثَ

অর্থাৎ, কুরাইশ সম্প্রদায়! আবু সুফিয়ানের অধীনে তোমাদের পণ্য-সম্ভারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মুহাম্মাদ। অতএব সাহায্য কর! সাহায্য কর!! এ সময় আবু জাহেল সমবেত লোকদেরকে আদেশ দেয় যে, তোমরা সবাই বেরিয়ে পড়; তাদের বাঁচাও!

لَايَنْزِلُ مَنْزِلًا إِلَّا عَقَلَ بَعِيْرَهُ (প্রতিটি মঞ্জিলে উমাইয়া তার উট বাঁধত) ঃ উমাইয়া কেন উট বাঁধত-এ প্রশ্নের জওয়াব ফয়জুল বারীতে এসেছে ঃ যাতে সে প্রয়োজনের মুহূর্তে ভাগবে। আর লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছেঃ এক মঞ্জিল থেকে অন্য মঞ্জিলে যাওয়ার জন্য সে উট বাঁধতো। গ্রন্থকার আরও বলেন, যদি বাস্তবেই তার প্রত্যাবর্তনের খেয়াল থাকতো, তবে উট বাঁধতো না; সুযোগ পেলেই চলে আসতো। (লামিউদ্-দারারী)

حَتَّى قَتَلَهُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ (শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাকে বদর প্রান্তেই হত্যা করেন) ঃ অর্থাৎ, বদর প্রান্তে তার নিহত হওয়া আল্লাহ্র পূর্ব ফায়সালা ছিলো। (আইনী)

উমাইয়া বিন খলফের নিহত হবার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্রই আসবে।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ قِصَّةِ غَزْوَةِ بَدْرٍ

বদর যুদ্ধের ঘটনা

'বদর' মক্কা আর মদীনার মধ্যবর্তী একটি প্রসিদ্ধ বস্তির নাম। বদর বিন মুখাল্লাদ বিন নযর বিন কিনান নামে এক ব্যক্তি এখানে বসতবাড়ী স্থাপন করেন। পরবর্তীতে তার নাম অনুসারে এ বস্তির নাম হয় বদর। অথবা বদর একটি কূপের নাম। কথিত আছে, বদর বিন হারেছ বা বদর বিন কালদার নামানুসারে বদরকে বদর বলা হয়। কিন্তু ওয়াকেদী (রহ.) এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেউ কেউ বলেন, বদরে অবস্থিত কূপটি গোলাকার হওয়ায় চাঁদের নামে তার নামকরণ হয়েছে। কেউ কেউ এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, উক্ত কূপের পানি এতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিলো যে, চাঁদ তাতে প্রতিবিম্ব হত, আর সে কারণে তার নাম হয় বদর।

–(ফাতহুল বারী, আইনী)

বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

মক্কায় ১৩ বছর মুশরিকদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র বিশেষ আদেশে মুসলমানগণ প্রিয় স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে মদীনা আসেন। কিন্তু এতেও কাফিররা তাদের পিছু ছাড়ল না। কারণ, বরাবরই তাদের চিন্তা-চেতনা ছিলো যে, কিভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের মূলোৎপাটন করা যায়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও চৌকস সর্দার আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে সিরিয়ার বাণিজ্যধারা চালু রাখে এবং তা জোরদার করে। উদ্দেশ্য, বাণিজ্য থেকে অধিক মাত্রায় মুনাফা অর্জন করে উক্ত অভিলাষ পূরণ করা। বাস্তব সত্য এই যে, সিরিয়ার এই বাণিজ্যই ছিলো কুরাইশদের সকল শক্তি ও উন্নতির প্রধান উৎস। এ সুবাদেই তারা ইসলামের মূলোৎপাটন এবং নবী ও মুসলমানদের নাম-নিশানা পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। বস্তুত এ পরিকল্পনা সার্বক্ষণিক তাদের মন-মনন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের এ বাণিজ্যধারার গতি রুদ্ধ করা ছিলো অপরিহার্য। যাতে তারা অর্জিত বিপুল মুনাফা থেকে লাভবান এবং তাকে পুঁজি করে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার সাহস না করতে পারে। বস্তুত এ উদ্দেশ্যেই রসূল (স.) আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছে শুনে তাদের আটক করতে সাহাবীদের নিয়ে মদীনা হতে রওনা দেন।

এদিকে আবু সুফিয়ান রসূল (স.)-এর মতিগতি আঁচ করতে পেরে তৎক্ষণাৎ জমজম বিন আমর আল গিফারীকে মক্কায় এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, সে কুরাইশদেরকে তাদের মাল-সম্পদ রক্ষার জন্য ঘটনাস্থলে আসতে প্ররোচিত করবে। কুরাইশরা জমজমের মাধ্যমে আবু সুফিয়ানের নাজুক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে মদীনা অভিমুখে যাত্রা করলো। অপরদিকে বাণিজ্য কাফেলা অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে চিরাচরিত পথ ত্যাগ করে সমুদ্রের

www.e-ilm.weebly.com

উপকূলবর্তী পথে চললো এবং মুসলমানদের পৌঁছানোর পূর্বেই নিরাপদ স্থানে চলে যেতে সক্ষম হলো। কাফেলা বিপদমুক্ত হয়ে কুরাইশদের কাছে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করলো যে, আমরা মুসলমানদের সমূহ বিপদ এড়াতে সক্ষম হয়েছি। তোমরা ফিরে এসো। কিন্তু আবু জাহেল গং যারা গর্ব, অহঙ্কার ও দাপটের সাথে মক্কা থেকে রওনা হয়েছিলো, তারা ফিরে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় সংকল্প নিলো এবং অবশেষে বদর প্রান্তরে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করলো।

রসূল (স.) যখন 'ছুফরা' অতিক্রম করে ওয়াদী-জাফরান পৌঁছলেন, তখন তিনি কুরাইশদের অভিপ্রায় ও অবস্থা সম্বন্ধে অবগত হলেন। রসূল (স.) সাহাবাদের সাথে সৃষ্ট পরিস্থিতি নিয়ে জরুরী বৈঠক করলেন। তিনি সাহাবাদের পূর্ণ প্রস্তুতি ও আগ্রহ দেখে সামনে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিলেন। মুসলমানগণ ওয়াদী-জাফরান থেকে কোচ করে বদরের নিকটে এসে শিবির স্থাপন করলেন। এভাবে আল্লাহ্‌র মর্জি মোতাবেক হক ও বাতিলের ঐতিহাসিক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, পবিত্র মদীনা হতে বদরের দূরত্ব প্রায় ৮০ মাইল। মদীনা হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ইহা অবস্থিত। (অনুবাদক)

বদর যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা

ইবনে ইসহাক বলেন, আবু সুফিয়ান ত্রিশজনের একটি ব্যবসায়ী দল নিয়ে সিরিয়ায় বাণিজ্য করতে যায়। প্রত্যাবর্তন করে বিপুল মালামাল নিয়ে। রসূল (স.) এ সংবাদ পেয়ে সাহাবাদেরকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে উদ্বুদ্ধ করলেন। আবু সুফিয়ান গুপ্তচর (সি.আই.ডি) মারফত রাসূলের (স.) এ পরিকল্পনা অব্যাহত হয়ে কুরাইশরা যাতে তাদের মাল-সম্পদ রক্ষা করতে এগিয়ে আসে তার জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে তৎক্ষণাৎ জমজম বিন আমর আল গিফারীকে মক্কায় প্রেরণ করে। ফলে এক হাজারের এক বাহিনী রওনা হলো। ১০০ অশ্ব ছিল তাদের সঙ্গে। অপর দিকে আবু সুফিয়ান এক নয়া কৌশল অবলম্বন করলো। সমুদ্র উপকূলবর্তী পথ ধরে মুসলমানদের পৌঁছার আগেই তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে সক্ষম হলো। বিপদমুক্ত হয়ে আবু সুফিয়ান অনুরোধ জানাল কুরাইশদের ফিরে যেতে। কিন্তু আবু জাহেল বাঁধ সাধলো। রসূল (স.) রমযান মাসের ১২ তারিখ শনিবার দিন মদীনায় উম্মে মাকতুমকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে বদর অভিমুখে রওনা হন। সাথে ছিলো ৭০ টি উট, ২টি অশ্ব, ৬টি বর্ম আর ৮টি তরবারী। মুসলমান ছিলেন ৩১৩ জন। মুহাজির ৭৭, আর আনসার ২৩৬ জন। অপরদিকে মুশরিকরা ছিলো ৯৫০ জনের এক বিরাট সশস্ত্র বাহিনী। তাদের অশ্ব ছিলো ১০০। রসূল (স.) আবু বকর (রযি.) কে নিয়ে নিজ তাঁবুতে আসার পর ওহী মারফত বিজয়ের সুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ফলে তিনি সাহাবাদের যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে নিজেও ময়দানে অবতীর্ণ হন এবং অস্ত্র হিসেবে বৃক্ষের একটি ডাল হাতে তুলে নেন। তিনি এ ডাল দ্বারাই কুরাইশদের মোকাবেলা করেন আর মুখে উচ্চারণ করেন, شَاهَتِ الْوُجُوهُ অর্থাৎ, কুরাইশরা

www.e-ilm.weebly.com

লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হোক এবং شدوا অর্থাৎ, এক যোগে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং প্রচণ্ড আক্রমণ চালাও।

কুরাইশরা পরাজিত হলো। ৭০ জন নিহত ও অপর ৭০ জন বন্দী হলো তাদের। ৮ জন আনসার ও ৫ জন মুহাজির শহীদ হলেন। রসূল (স.) গনীমত বণ্টন করে দিলেন। নফল (বোনাস) হিসেবে নিলেন 'জুল ফাকার' নামীয় তরবারীটি। গনীমত হিসেবে লাভ করেন আবু জাহেলের উট।

বদর যুদ্ধের ফলাফল

বদর যুদ্ধে ৭০ কুরাইশ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। নিহত হয় ৭০ জন। এদের অধিকাংশই ছিল নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী। সাহাবাদের মধ্যে ১৪ জন শাহাদাত লাভে ধন্য হন। ৮ জন আনসার আর ৬ জন মুহাজির।

(তারিখুল ইসলাম ঃ মাওলানা আশেক ইলাহী মিরাঠী)

আল্লাহ্ তা'আলা এ যুদ্ধের মাধ্যমে মুসলমানদের এক মহান বিজয় দান করেন। যার ফলে সমগ্র আরবে ইসলামের প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং ধর্ম হিসেবে সুসংহত ও সুদৃঢ় হয় ইসলাম। আরবের লোকদের অন্তরে নবীজী (স.) ও সাহাবীদের ব্যাপারে এক ধরনের বৈপ্লবিক ধারণা জন্মে। কাফিররা চরমভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়। প্রকৃত সত্য এটাই যে, বদর যুদ্ধের পর হতেই ইসলামের প্রকৃত উন্নতি-অগ্রগতির সোনালী অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে বদর যুদ্ধ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেননা ১৩ বছর মক্কী জীবনে রসূল (স.) নবুওয়াতের লক্ষ্য অর্জনে দ্বীনী শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও ওয়াজ-নসীহত ইত্যাদির ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন ঠিকই, কিন্তু এসবের দ্বারা উদ্দেশ্য পূরণ, কিংবা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি। প্রতিমা পূজা চলতে থাকে। সত্যের নিরংকুশ বিজয় অর্জিত হয়নি। তাই রসূল (স.) মদীনায় হিজরতের পর তাবলীগী মিশন সফলে আরো জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপরদিকে কাফিররা এ মিশন ব্যর্থ করতে নিয়োগ করে সর্বাত্মক শক্তি। এতে উভয় শিবিরে টানটান উত্তেজনা শুরু হয়। ক্রমশ পরিস্থিতি যুদ্ধের দিকে মোড় নেয়। রসূল (স.) তাদের মোকাবেলা করতে স্থির সিদ্ধান্ত নেন। ফলে এভাবে বাতিলের সাথে সাথে প্রথম জিহাদ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের ভাগ্যের চাকা ঘুরে যায়। কাল যে মুসলমানরা নিজেদের আত্মরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত ছিলো, বদর যুদ্ধের পর তারা দ্বীনের প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করার অবারিত সুযোগ পেয়ে যায়। তাই একদিকে মুসলমানরা আল্লাহ্র জমিনে আল্লাহ্র হুকুম বাস্তবায়নে তৎপর হয় আর অপরদিকে সুবর্ণ সুযোগ মিলে অমুসলিমদের ইসলামের ছায়াতলে

www.e-ilm.weebly.com

আশ্রয় নেবার। ইসলামী জগতের চিত্র বদলে যায়। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূলে চলে আসে মুসলমানদের। সমগ্র বিশ্বে ইসলামের বিজয় ডঙ্কা বেজে উঠে এবং চির সমুন্নত হয় সত্য ধর্মের বাণী।

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (যখন আপনি মুমিনদের বললেন) ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) ও অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এ আয়াতের সম্পর্ক অপর আয়াত ঃ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ (অর্থাৎ, মনোবল হারিয়ে ফেললে আল্লাহ্ বদর প্রান্তরে তোমাদের (মনোবল বৃদ্ধি ও দৃঢ় করে) সাহায্য করেছেন)-এর সাথে। তখন উক্ত আয়াত বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত হবে। কারো কারো মতে উক্ত আয়াত অপর এক আয়াত ঃ وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ (অর্থাৎ, স্মরণ করুন যখন আপনি প্রত্যুষে পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধের জন্য রণাঙ্গনে মুসলমানদের ব্যূহ বিন্যাস করছিলেন)-এর সাথে। এ সময় উক্ত আয়াত হবে উহুদ যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। এটাই হযরত ইকরামা (রযি.) ও অন্যান্য আলিমের অভিমত। কিন্তু ইবনে আবী হাতেম সহীহ্ সনদে ইমাম শা'বী থেকে বর্ণনা করেছেন, বদর যুদ্ধের দিন যখন মুসলমানদের কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, কুরজ্ বিন জাবির আল ফিহ্রী মুশরিকদের সাহায্য করবে, তখনই আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। এ বর্ণনাটি প্রথম অভিমতকে দৃঢ় করে।

قَالَ وَحْشِىْ قَتَلَ حَمْزَةُ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِىْ (ওয়াহ্শী বলেন, হামযা তুয়াইমা বিন আদীকে হত্যা করেন) ঃ এই ওয়াহ্শী হলেন যুবাইর বিন মুতইমের গোলাম ওয়াহ্শী বিন হারব। বদরের যুদ্ধে শহীদ-সম্রাট হযরত হামযা (রযি.) তুয়াইমা বিন আদীকে হত্যা করলে তার মুনিব তাকে বলে ঃ 'হামযাকে হত্যা করতে পারলে তুমি আযাদ।' তাই উহুদের দিন ওয়াহশী হামযাকে (রযি.) কাপুরুষের মত শহীদ করেন।

وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ (الاية) (আর যখন আল্লাহ্ দু'গ্রুপের এক গ্রুপকে তোমাদের অধীনস্ত করার অঙ্গীকার করেন) ঃ طَائِفَتَيْنِ (দু'গ্রুপ) দ্বারা উদ্দেশ্য॥(১) কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা, যারা আবু সুফিয়ানের সাথে সিরিয়া হতে এসেছিলো। (২) কুরাইশ বাহিনী, যারা উতবা বিন রবীয়ার নেতৃত্বে মুসলমানদের হাত থেকে তাদের মাল উদ্ধারের লক্ষ্যে মক্কা থেকে যাত্রা করেছিল। আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন ঃ যখন রসূলুল্লাহ (স.) জানতে পারেন যে, কুরাইশরা রওনা দিয়েছে, তখন আল্লাহ্ এ দু'গ্রুপের এক গ্রুপকে অধীন অর্থাৎ, তাদের উপর বিজয় লাভের ওয়াদা দিয়ে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। কিছু সংখ্যক মুসলমান আবু সুফিয়ানের গ্রুপটিকে কব্জা করতে চেয়েছিলেন। এ গ্রুপে ৫০ জন লোক এক সহস্র উট, ৫০ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, আবু সুফিয়ানের সাথে যে গ্রুপটি আসছে, তাদের ধরাশায়ী করতে মুসলমানদের বেগ পেতে হবে না।

www.e-ilm.weebly.com

لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا (রসূল (স.)-এর সাথে সকল যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম) ঃ আল্লামা কিরমানী (রহ,) বলেন, এখানে غَيْر শব্দটি صِفَةٌ ; اِسْتِثْنَاء নয়। অর্থাৎ, হযরত কা'ব (রযি.) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স.) যতো যুদ্ধ করেছেন তন্মধ্যে তাবুক ছাড়া সকল যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। তবে আমার বদরে অনুপস্থিতিটা তাবুকে অনুপস্থিতি থেকে ভিন্নতর ছিলো। অর্থাৎ, শুধু বদর ও তাবুকে আমি রসূল (স.)-এর সাথে ছিলাম না। তবে এ দুই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাটা এক রকম ছিলো না; বরং উভয়ের কারণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্য তিনি উভয় অনুপস্থিতির কথা একত্রে উল্লেখ করেছেন। কেননা, (১) তাবুকের প্রতি মুসলিম বাহিনীর মনোনিবেশের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ করা। বদর ছিল এর ব্যতিক্রম। কারণ, বদরের প্রতি মনোনিবেশের উদ্দেশ্য ছিলো আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করা মাত্র। (২) তাবুকের জন্য সৈন্য সংগ্রহের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিলো। পক্ষান্তরে বদরে এমন কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি; (৩) তাবুকে অনুপস্থিতদের ব্যাপারে শাস্তির বিধান এসেছিলো; পক্ষান্তরে বদরে অনুপস্থিতদের বেলায় এমন কিছু আসেনি।

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ (যখন আল্লাহ্ তোমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন করেন) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তন্দ্রা রণাঙ্গনে আল্লাহ্র পক্ষ হতে প্রশান্তির উপলক্ষ, আর নামাযে শয়তানের ধোঁকা স্বরূপ। হযরত সাহ্ল বিন আব্দুল্লাহ বলেন ঃ اَلنُّعَاسُ يَحُلُّ فِى الرَّأْسِ مَعَ حَيَاةِ الْقَلْبِ وَالنَّوْمُ يَحُلُّ فِى الْقَلْبِ بَعْدَ نُزُوْلِهِ مِنَ الرَّأْسِ অর্থাৎ, তন্দ্রা মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হয় অন্তর জাগ্রত থাকা অবস্থায়। আর ঘুম মস্তিষ্ক হতে নীচে এসে আত্মাকে ঘিরে ফেলে।

—আইনী।

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً (আর তিনি আকাশ থেকে তোমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করেন) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত, বদরের দিন মুসলিম বাহিনী বালুকাময় প্রান্তরে ক্যাম্প স্থাপন করেন। সেখানে মুসলিম সৈন্য ও তাদের বাহনের পা পিছলে যেতে থাকে। চলাফেরা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, আগেভাগেই মুশরিকরা জলাভূমি নিজেদের কব্জায় নিয়ে নিয়েছিলো। তদুপরি মুসলমানদের কেউ কেউ প্রত্যুষে নাপাক ও বে-উজু হওয়ায় পবিত্রতা অর্জনের জন্য তাদের পানির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ নাজুকতাকে সামনে রেখে শয়তান মুসলমানদের কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হবার দাবী করো, অথচ আজ তোমাদের অবস্থা এতোই করুণ যে, নাপাক অবস্থাতেই তোমরা নামায পড়ছো আর ওদিকে পানি মুশরিকদের কব্জায়। এহেন অবস্থায় কিভাবে আশা রাখ যে, কাফিরদের উপর তোমরা বিজয়ী হবে?

www.e-ilm.weebly.com

চতুর্মুখী এ করুণ অবস্থায় আল্লাহ্ পাক বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে বালু জমে গিয়ে পা পিছলা রোধ হলো। মুসলমানরা নিজেরাও পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করলো এবং তাদের চতুষ্পদ প্রাণীদেরও পান করালো। মুসলমানদের অন্তর থেকে শয়তানী ওয়াস্ওয়াসা দূর হয়ে গেলো। অপরদিকে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে কাফিরদের চরম ক্ষতি হলো। চলাফেরা তাদের জন্য দুষ্কর হয়ে পড়লো। (আইনী)

شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ مَشْهَدًا (আমি মিকদাদ বিন আসওয়াদকে একটি উক্তি করতে শুনেছি)ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত মিকদাদের পিতার নাম আমর বিন ছা'লাবাহ আল কিনদী। জাহেলী যুগে হযরত আসওয়াদ তাঁকে পালক পুত্র বানিয়েছিলেন। এজন্য তিনি এখানে আসওয়াদের দিকে সম্বন্ধিত হন। (কস্তলানী)

উপরোক্ত বাক্যের মর্মার্থ হলো হযরত ইবনে মাসউদ[১] (রযি.) বলেন, আমি হযরত মিকদাদকে এমন উক্তি করতে শুনেছি, যা বলা আমার কাছে দুনিয়ার সমস্ত নেয়ামত অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। অতএব যদি আমাকে এই উক্তি বনাম দুনিয়ার বাকী সমগ্র নেয়ামত (ঐশ্বর্য) গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়, তবে আমি দুনিয়ার ঐশ্বর্যের মোকাবেলায় এই উক্তিকারী হওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করব। এর দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদের উদ্দেশ্য হলো হযরত মিকদাদের উক্ত উক্তির গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করা।

وَهُوَ يَدْعُوْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ (আর তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মুসলমানদের আহ্বান করছিলেন) ঃ লামিউদ দারারীর প্রতিলিপি এরূপ ঃ وَهُوَ يَدْعُوْ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ কথিত আছে, এটাই প্রকৃত প্রতিলিপি। এর মর্মার্থ হলো হযরত মিকদাদ (রযি.) নবী করীম (স.)-এর নিকট তখন আসেন যখন রসূল (স.) মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করছিলেন। কিন্তু মূল কিতাবে وَهُوَ يَدْعُوْ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ, "عَلَى" শব্দযোগে এসেছে। তাই আসল ইবারত এভাবে মানতে হবে ঃ "يَدْعُو النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِيْنَ يُعَرِّضُهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُشْرِكِيْنَ" অর্থাৎ, নবী করীম (স.) মুসলমানদের আহ্বান করে তাদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করতে থাকেন। —লামিউদ্-দারারী।

لَانَقُوْلُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى (বনী ইসরাঈলরা যা বলেছিলো আমরা তা বলবো না) ঃ ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, হযরত মিকদাদ (রযি.) এ উক্তি ঐ সময় করেন, যখন রসূল (স.) ছুফরা নামক স্থানে অবস্থান করেন এবং একদিকে কুরাইশরা বদরে অপেক্ষমান আর অপরদিকে আবু সুফিয়ান তার গ্রুপ নিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়ার খবর প্রকাশ পায়। প্রিয়নবী (স.) সাহাবাদের নিয়ে বৈঠকে

টীকা ঃ ১. ইবনে মাসউদ (রযি.)-এর পূর্ণ নাম ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ আল-হুজালী (রযি.)। তিনি মদীনায় ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। —অনুবাদক

www.e-ilm.weebly.com

বসলেন। সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর (রযি.) এক বক্তব্য দিলেন। এরপর হযরত উমর (রযি.) গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। অতঃপর মিকদাদ (রযি.) যে বক্তব্য পেশ করেন তা হাদীসে বিবৃত হয়েছে। রাসূলে আকরাম (স.) বললেন ঃ أَشِيْرُوْا عَلَيَّ অর্থাৎ, আমাকে পরামর্শ দাও। এ কথায় তারা বুঝতে পারলেন যে, নবীজী (স.) আনসারদের অভিমত জানতে চাচ্ছেন। কেননা আনসারদের ব্যাপারে রসূল (স.) সন্দিহান ছিলেন যে, হয়তো তারা তাঁকে সমর্থন করবে না। কেননা মদীনার বাইরে গিয়ে প্রিয়নবী (স.)-এর সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আনসাররা বাইআত গ্রহণ করেনি। তাঁরা শুধু এ বিষয়ে বাইআত গ্রহণ করেন যে, মদীনার ভিতরে কোন কওম রসূল (স.)-এর প্রতি আক্রমণোদ্যত হলে কেবল তাদের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করবেন। তাই হযরত সা'দ বিন মুআজ (রযি.) বলেন ঃ اِمْضِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لِمَا اُمِرْتَ بِهٖ فَنَحْنُ مَعَكَ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র রসূল! কর্তব্য পালনে আপনি এগিয়ে চলুন, আমরা আছি আপনার সাথে। (ফতহুল বারী, কস্তলানী)

إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ (আপনি আর আপনার প্রভু যান) ঃ আল্লামা কস্তলানী (রহ.) বলেন—বনী ইসরাঈলরা এ উক্তি হয়তো আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে ব্যঙ্গোক্তি ও তাচ্ছিল্য হিসেবে করেছে। অথবা ইবারত এভাবে মানতে হবে ঃ إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ يُعِيْنُكَ فَإِنَّا لَا نَسْتَطِيْعُ قِتَالَ الْجَبِرَةِ অর্থাৎ, আপনি যান, আপনার প্রভু আপনাকে সাহায্য করবেন; এ জালিমদের সাথে যুদ্ধ করতে আমরা অক্ষম নই। আল্লামা সমরকন্দী (রহ.) এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে, إِذْهَبْ أَنْتَ وَسَيِّدُكَ هَارُوْن অর্থাৎ, আপনি আর আপনার মান্যবর হারুন যান। কেননা, "رَبٌّ" শব্দটি سيد (নেতা, অভিভাবক, মান্যবর) অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর হযরত হারুন (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর চেয়ে দুই বা তিন বছরের বড় ছিলেন। –(কস্তলানী)

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ (বদরের দিন রসূল (স.) বলেন) ঃ বদর যুদ্ধের দিন রসূল (স.) নিজ বাহিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তাঁরা ছিলেন ৩০০ থেকে কিছু বেশি। পক্ষান্তরে কাফির বাহিনীর দিকে তাকালেন। তারা ছিলো হাজারের উর্ধ্বে। নবী করীম (স.) কিবলামুখী হয়ে দোয়ায় মগ্ন হন। আল্লামা সুহাইলী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স.) ফিরিশতাদের যুদ্ধে সক্রিয় থাকতে আর আনসারদের জীবনবাজি রেখে ঘোরতর লড়াই রত দেখলেন। যুদ্ধপ্রথা হলো, সেনাপতি সাথে থেকে যুদ্ধ করেন না। এমনিভাবে জিহাদ কখনও অস্ত্রের দ্বারা হয় আবার কখনও দোয়ার দ্বারা হয়। তাই রসূল (স.) দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন।

–(ফাতহুল বারী, কস্তলানী)

اَللّٰهُمَّ اُنْشِدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ (আল্লাহ্, আমি আপনার কৃত ওয়াদা ও অঙ্গীকার পূরণের অনুরোধ করছি) ঃ হে আল্লাহ্! আমি আপনার দরবারে করুণ

www.e-ilm.weebly.com

ফরিয়াদ করছি যে, মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করুন, নবীদের সাহায্য প্রদান এবং ইসলাম ধর্মকে সমুন্নত রাখার যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার আপনি করেছেন, তা এখন পূরণ করুন।

ইতঃপূর্বে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঃ যথা—(১) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِيْنَ অর্থাৎ, পয়গাম্বরদের ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্ত ইতঃপূর্বেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে যে, (২) اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُوْرُوْنَ وَاِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُوْنَ অর্থাৎ, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনী বিজয়ী হবে। অনুরূপ আল্লাহ্ ওয়াদা করেছিলেন وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ـ الاٰية অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দেন যে, দু'দলের একদল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে....। —কস্তলানী।

اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ (আল্লাহ্, আপনার ইবাদত না হোক-এই যদি চান) ঃ এ ইবারতের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে— (১) اِنْ شِئْتَ لَاتُعْبَدُ بَعْدَ هٰذَا الْيَوْمِ يَتَسَلَّطُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ, কাল থেকে আপনার ইবাদত না হোক॥এই যদি হয় আপনার অভিপ্রায়, তবেই কেবল কাফিরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করুন। —আইনী, কস্তলানী।

(২) মুসলিম শরীফে এসেছে ঃ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُهْلِكَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ لَمْ تُعْبَدْ অর্থাৎ, এই দলকে ধ্বংস করার মনস্থ করলে আপনার ইবাদত আর পালিত হবে না। (৩) কেউ কেউ ইবারত এভাবে ফিট করেছেন ঃ إِنْ شِئْتَ أَنْ لَاتُعْبَدَ فَاَهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ অর্থাৎ, আপনার ইবাদত পালিত না হোক এই যদি চান, তবেই এ দলকে ধ্বংস করে দিন। রসূলুল্লাহ (স.)-এর এ কথা বলার কারণ হলো, তিনি খাতামুন্নাবিয়্যীন তথা সর্বশেষ নবী। তার অব্যাহতির পর নতুন কোন নবীর আবির্ভাব হবে না। অতএব যদি তিনি ও তাঁর সাথীগণ ধ্বংস হয়ে যান, তাহলে আল্লাহ্ আর এমন কোন ব্যক্তিকে পাঠাবেন না, যিনি মানুষদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান জানাবেন। —কস্তলানী।

فَأَخَذَ أَبُوْ بَكْرٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ حَسْبُكَ (আবু বকর প্রিয় নবী (স.)-এর হস্ত ধারণপূর্বক বললেন, আপনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট)।

মুসলিম সৈন্যগণ বদর কূপের সন্নিকটস্থ এক উঁচু স্থানে রসূল (স.)-এর জন্য ক্যাম্প তৈরী করেন। ক্যাম্পে রাসূলে আকরাম (স.) ও আবু বকর (রযি.) অবস্থান করেন। আল্লাহ্র দরবারে রসূল (স.) তাঁর সাহায্য লাভের আকুতি এখানেই পেশ করেন! আলোচ্য ভাষ্যকে কেন্দ্র করে যদি প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এ ঘটনা থেকে রসূল (স.)-এর আস্থার তুলনায় আবু বকর (রযি.)-এর আস্থা বেশি অনুমিত হয়! তবে তার প্রত্যুত্তর হবে—

www.e-ilm.weebly.com

(১) ইবনুল আরাবী[১] বলেন—ঐ সময় রসূল (স.) পেরেশানীতে ছিলেন। পক্ষান্তরে আবু বকর ছিলেন পেরেশানমুক্ত।

(২) সাহাবায়ে কিরাম যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রতুলতার দরুন অত্যন্ত উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। রসূল (স.) তাদের সান্ত্বনার নিমিত্ত দোয়ায় মনোযোগী হন। কেননা, রসূলের দোয়া অনিবার্যভাবে গৃহীত ও এ পর্যায়ে রসূল নিজেই বড় উপলক্ষ্য হবেন বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো। অতঃপর হযরত আবু বকর (রযি.) হযরত (স.)-এর হস্ত ধারণপূর্বক যখন বললেন, 'তখন রসূল দোয়া কবুল হয়ে গেছে ধারণায় আশ্বস্ত হন। ফলে তিনি দোয়া থেকে বিরত হলেন এবং এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এলেন ঃ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ অর্থাৎ, শীঘ্রই এ দল (কাফিররা) পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে। (৩) হযরত আবু বকর[২] (রযি.) রসূল (স.)-কে অত্যন্ত আকুতি-মিনতি করতে দেখে দোয়া কবুলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলেন। অতিরিক্ত দোয়া আল্লাহ্‌র আযাব ডেকে না নিয়ে আসে যার কথা আল্লাহ্ বলেছেন ঃ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ,, তোমরা ঐ বিপদ থেকে বাঁচ যা কেবল যালিমদের গ্রাস করে না। তাই দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে সকলে যাতে দোয়ার কারণে বিপদ কবলিত না হয় তার জন্য তিনি রসূল (স.)-এর হাত আঁকড়ে ধরেন।

(ফাতহুল বারী, কস্তলানী, বুখারীর পার্শ্বটীকা, আসাহ্হুস্-সিয়ার)

শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারী (রহ.) আলোচ্য শিরোনামের অধীনে দু'টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।(১) ইবনে মাসউদ (রযি.)-এর হাদীস, যার মধ্যে বদরের পূর্বেকার একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।(২) ইবনে আব্বাস[৩] (রযি.)-এর হাদীস, যার মধ্যে সাহায্য প্রার্থনা রয়েছে। আর এ উভয় হাদীসের সম্পর্ক উল্লিখিত আয়াতের সাথে রয়েছে। অতএব এইটুকুই মিলের জন্য যথেষ্ট। (আইনী)

بَابُ عِدَّةِ أَصْحَابِ بَدْرٍ

বদরী সাহাবীদের সংখ্যা

বদরী সাহাবীদের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন সংখ্যা এসেছে। যথা॥

(১) ইবনে ইসহাসের বর্ণনায়-তিনশ তের জন।

(২) উমর (রযি.) থেকে মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে-তিনশ উনিশ জন।

(৩) ইবনে সাদের বর্ণনায়-তিনশ পাঁচ জন।

(৪) আল-ইকলীলের বর্ণনায়-তিনশ পনের জন।

(৫) বাযযাজের বর্ণনায়-তিনশ সতের জন।

টীকা ঃ ১. ইবনুল আরাবী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৫৪২ হিঃ

২. হযরত আবু বকর (রযি.), মৃত্যু ঃ ১৩ হিঃ। ইনি নবী করীম (স.)-এর প্রধান সাহাবী ও প্রথম খলীফা।

৩. ইবনে আব্বাস (রযি.)-এর পূর্ণ নাম ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস। মৃত্যু ঃ ৬৮/৭০/৭৩ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

মতান্তরের সমাধান

হাফিয ইবনে হাজার (রহ.), আল্লামা আইনী (রহ.) এবং ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, প্রকৃত সংখ্যা তিনশ পাঁচজন। অবশিষ্ট আটজনকে রসূল (স.) যুদ্ধলব্ধাংশ (গনীমতের অংশ) এবং মুজাহিদের সমমর্যাদা প্রদান করায় তাদের নামও বদরী সাহাবীদের তালিকায় রাখা হয়েছে।

এ পরিসংখ্যান মতে বদরী সাহাবীদের সংখ্যা দাঁড়ায় তিনশ তের বা চৌদ্দ। এছাড়া বদর প্রান্তরে কয়েকটি বালকও (যেমন ঃ হযরত বারা (রযি.), ইবনে উমর (রযি.), আনাস (রযি.), জাবের (রযি.) এসেছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী (স.) তাঁদেরকে জিহাদের অনুমতি দেননি। (কতিপয় বর্ণনাকারী তাঁদেরও গণনায় এনেছেন)। এ দৃষ্টিকোণে সকল বর্ণনার মাঝে বিদ্যমান অমিলের একটি যুক্তিপূর্ণ ও চমৎকার সুরাহা হয়। –(ফাতহুল বারী, আইনীর সার-সংক্ষেপ)

উল্লিখিত আটজন ব্যক্তিত্ব

আটজন সাহাবী যাদেরকে নবী করীম (স.) গনিমত প্রদান করেছিলেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করা সত্ত্বেও, নিম্নে তাঁদের নাম দেয়া হলো।

(১) হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রযি.)। তাঁকে রসূল (স.) নিজের কন্যা ও তাঁর স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষার জন্য মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন। (২) হযরত ত্বলহা বিন উবাইদুল্লাহ (রযি.) (৩) হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রযি.)। নবীজী (স.) এ দু'জনকে গুপ্তচরবৃত্তি-এর দায়িত্ব দিয়ে মদীনার বাইরে পাঠিয়েছিলেন। (৪) হযরত আবু লুবাবা (রযি.)। রসূল (স.) তাঁকে মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন। (৫) হারিস বিন হাতিব (রযি.)। নবী করীম (স.) তাঁকে রওহা নামক স্থান হতে বনী আমর বিন আউফের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। (৬) হযরত আছিম বিন আদী (রযি.)। রসূলুল্লাহ (স.) তাঁকে মদীনার পল্লী এলাকায় নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছিলেন। (৭) হযরত হারিস বিন ছুম্মাহ (রযি.)। (৮) হযরত খাউয়াত বিন যুবাইর (রযি.)। এ দু'জনকে মহানবী (স.) রওহা নামক স্থান হতে মদীনায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কারণ, তারা পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিলেন।

(ফাতহুল বারী, আইনী, কস্তলানী)

তালূতের কাহিনী

হাফিয বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) বলেন, বনী ইসরাঈলদের মাঝে হযরত শাম্বীল (আ.) নামে হযরত হারুন (আ.)-এর পৌরুষানুক্রমে এক নবীর আবির্ভাব হয়। তাঁর উম্মত মিসর ও ফিলিস্তিনের মধ্যবর্তী রোম উপসাগরের উপকূলে বসবাস করতো। আমালেকা গোত্রের বাদশা 'চালূত' তাদের উপর ক্ষমতা চালাতেন। বনী ইসরাঈলরা হযরত শাম্বীল (আ.) সমীপে এ আবেদন রাখলো যে, তাদের একজনকে বাদশা নির্বাচিত করা হোক, যিনি জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিবেন। হযরত শাম্বীল (আ.) দোয়া করলে আল্লাহ্ মঞ্জুর করলেন। তালূতকে

www.e-ilm.weebly.com

বাদশা নিযুক্ত করেন। শাম্বীলের (আ.) কাছে একটি লাঠি ও তেল ভর্তি একটি শিং প্রেরিত হয়। সাথে ঐশী বাণী আসে যে, বনী ইসরাঈলের বাদশা সেই হবে, যে এ লাঠির উচ্চতাসম হবে। আর এ ব্যক্তি তখনই আপনার কাছে আসবে, যখন শিংয়ের তেল শুকিয়ে যাবে।

একদিনের ঘটনা। চামড়া ব্যবসায়ী ও রাখাল তালূত একদা তার হারানো গা ধা অনুসন্ধান করতে করতে হযরত শাম্বীল (আ.)-এর সমীপে উপনীত হলেন। পরিমাপ করা হলে তালূত লাঠির সমউচ্চ প্রমাণিত হলেন। ওদিকে শিংয়ের তেলও শুকিয়ে গেলো। এ দেখেই হযরত শাম্বীল (আ.) বললেন ঃ তুমি বনী ইসরাঈলের বাদশা।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, তালূত ৮০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে জালুতের সাথে যুদ্ধ করতে রওনা হলেন। জর্ডান নদীর নিকটে পৌঁছে তালুত শাম্বীল (আ.)-এর নির্দেশক্রমে সেনাবাহিনীকে জানিয়ে দিলেন যে, إِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ অর্থাৎ, আল্লাহ্ এক নদীর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা নিবেন। শেষ পর্যন্ত দামেস্কের পার্শ্ববর্তী নগর হুরানে তালুত আর চালুতের সৈন্যদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তালুতের সৈন্যদের মধ্য থেকে হযরত দাউদ (আ.) জালুতকে হত্যা করেন।

তালুতের শাসনামল ৪০ বছর ছিলো। তিনি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সহোদর বিন ইয়ামিনের অধঃস্তন বংশধর ছিলেন। তালুত অত্যন্ত ন্যায় বিচক্ষণ ও সৎ শাসক ছিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘদেহী হওয়ার কারণে তাঁর নাম হয়ে যায় 'ত্বালুত' (দীর্ঘকায়)। (আইনী)

قَوْلُهُ لَا وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ (আল্লাহ্‌র শপথ, তালুতের সাথে মুমিন ছাড়া কেউ নদী পার হতে পারেনি) ঃ "لَا وَاللّٰهِ" বাক্যটি একটি ঊহ্য প্রশ্নের প্রত্যুত্তর। প্রশ্ন ছিলো هَلْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُؤْمِنٍ অর্থাৎ, নহর অতিক্রমকারীদের মধ্যে কেউ মুমিন ছাড়া ছিলো কি? তারই জওয়াব দিয়েছেন ঃ لَا وَاللّٰهِ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কসম নয়। অথবা এখানে لَا শব্দটি অতিরিক্ত এসেছে। আর উক্ত খবরকে দৃঢ় করতে তিনি কসম খান। (কস্তলানী)

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُفَّارِ قُرَيْشٍ

কুরাইশ কাফিরদের প্রতি মহানবী (স.)-এর বদদোয়া

قَوْلُهُ فَدَعَا عَلَى نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ (তিনি কুরাইশদের কিছু লোকের প্রতি বদ দোয়া করেন) ঃ কারণ হলো, একদা রসূল (স.) কাবা ঘরের সামনে সিজদারত ছিলেন। এমতাবস্থায় কুরাইশ কাফিররা মহানবী (স.)-এর পৃষ্ঠদেশে উটের নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দেয়। এর দরুন নবীজী (স.) তাদের প্রতি এ বদদোয়া করেন।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعٰى (আমি তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখছি) ঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ[১] (রযি.) বলেন, তাদের চারজনের প্রত্যেককে আমি বদর রণাঙ্গনে ঠিক ঐ স্থানে পড়ে থাকতে দেখেছি, যুদ্ধের প্রারম্ভে রসূলে আকরাম (স.) যে স্থানের কথা বলেছিলেন। সেদিন শাইবাকে হযরত হামযা (রযি.), উতবাকে হযরত উবাইদুল্লাহ বিন হারিস (রযি.) কতল করেন। ইবনে হিশাম বলেন, উতবার হত্যায় হযরত উবায়দুল্লাহ, হযরত হামযা ও হযরত আলী (রযি.)[২] তিনজনই শরীক ছিলেন। ওয়ালীদ বিন উতবাকে হযরত আলী (রযি.) এবং আবু জাহেলকে হযরত মুয়ায বিন আমর বিন জামূহ ও মুয়ায বিন আফরা (রযি.) হত্যা করেন।

قَدْ غَيَّرَتْهُمُ الشَّمْسُ (সূর্য তাদের লাশ বিকৃত করে দিয়েছিলো) ঃ তাদের বর্ণ কালো ও শরীর ফুলে গিয়েছিল। (আইনী, কস্তলানী)

بَابُ قَتْلِ أَبِىْ جَهْلٍ

আবু জাহেলের হত্যা

কতক অনুলিপিতে এ শিরোনাম নেই। এ শিরোনাম না থাকাই শ্রেয়। কেননা, এতে আবু জাহেল ছাড়া অনেক অভিশপ্তের উল্লেখ রয়েছে। আবার কোন অনুলিপিতে আছে ঃ بَابُ قَتْلِ أَبِىْ جَهْلٍ وَغَيْرِهٖ এ সময় আলোচ্য অধ্যায় হওয়াটাই শ্রেয়তর হবে।

أَتٰى أَبَا جَهْلٍ وَبِهٖ رَمَقٌ ঃ অর্থাৎ, হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.) আবু জাহেলের কাছে ঐ সময় আসেন যখন তার ধড়ে প্রাণের স্পন্দন বাকী ছিলো এবং তার রূহ কণ্ঠনালীতে আনাগোনা করছিলো। ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর সাথে আরেকটু কথা যোগ করেছেন ঃ فَعَرَفَهٗ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَوَضَعَ رِجْلَهٗ عَلٰى عُنُقِهٖ ثُمَّ قَالَ لَهٗ لَقَدْ اَخْزَاكَ اللّٰهُ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ (রযি.) তাকে চিনতে পেরে নিজের পা তার কাঁধে স্থাপনপূর্বক বললেন, আল্লাহ্র দুশমন, তোকে তিনি লাঞ্ছিত করেছেন।

هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ (তোমাদের হত্যাকৃত ব্যক্তির থেকে অধিক মর্যাদার কেউ আছে কি?) ঃ হাফিয ইবনে হাজার বলেন, এখানে উহ্য ইবারত এভাবে হবে ঃ اِنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ أَتٰى أَبَا جَهْلٍ كَلَّمَهٗ بِكَلَامٍ تَشَفّٰى مِنْهُ فَأَجَابَهٗ بِقَوْلِهٖ هَلْ أَعْمَدُ..... অর্থাৎ, ইবনে মাসউদ (রযি.) আবু জাহেলের কাছে এসে এমন কথা বলেন, যাতে সে চটে যায় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়। এরপর আবু জাহেল প্রত্যুত্তরে উপরোক্ত উক্তি করে।

টীকা ঃ ১. ইবনে মাসউদ (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩২/৩ হিঃ।
২. হযরত আলী (রযি.), মৃত্যু ঃ ৪০ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهٗ اَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوْهُ

বাক্যের অর্থসমূহ

(১) ঐ ব্যক্তির থেকে অতি মর্যাদার অধিকারী কে, যাকে তোমরা হত্যা করেছো?

(২) ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে এতো আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে, যাকে তোমরা হত্যা করেছো!

(৩) তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, এতে এতোই বা ক্ষতির কি আছে?

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, আবু জাহেল তার উপর আগত বিপদকে হাল্কা করে প্রকাশের জন্য এ কথা বলে। আবু জাহেলের কথার সারসংক্ষেপ এই যে, আমাকে তোমাদের হত্যা করাটা এর থেকে অতিরিক্ত কিছু নয় যে, গোত্রের লোকেরা তাদেরই এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। এতে না আছে তোমাদের জন্য গর্বের কিছু, না আছে আমার জন্য লজ্জার কোন বিষয়। (আইনী কস্তলানী, কিরমানী)

হাদীস (৪৭)

قَوْلُهٗ ضَرَبَهٗ اِبْنَا عَفْرَاءَ (আফরা তনয় তাকে হত্যা করেছে) ঃ 'আফরা' এক আনসারী মহিলা সাহাবীর নাম। যিনি উবাইদ বিন ছা'লাবা নাজ্জারিয়ার কন্যা ছিলেন। আফরা প্রথমে হারিস বিন রিফাআর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এ ঘরে তাঁর (১) মুয়াজ (২) মুআওআজ ও (৩) আউফ নামে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। হারিছের এ পুত্ররা মা'র দিকে সম্বন্ধিত হওয়ায় তাদেরকে 'ইবনে আফরা' বলা হতো। হারিসের পর আফরা বুকাইরুল্ লাইছীর বিবাহ বন্ধনে আসেন। এ ঘরে (১) ইয়াস (২) আকিল (৩) খালিদ ও (৪) আমির নামে ৪টি সন্তানের জন্ম হয়। আফরার এ সাত পুত্রই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মুয়াজ ও মুআওআজ আবু জাহেল হত্যায় সক্রিয়ভাবে শরীক ছিলেন।

(বজলুল মাজহুদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৬)

আবু জাহেলের হত্যাকারী কে?

আবু জাহেলের ঘাতক সনাক্তকারী বর্ণনাগুলি বিপরীতমুখী। যথা ঃ (১) হযরত আনাস (রযি.) সহ অন্যান্যের বর্ণনায় ঘাতক হলেন, আফরার দুই পুত্র অর্থাৎ, মুয়াজ ও মুআওআজ (রযি.)।

(২) মুসলিম [১] এবং বুখারীর بَابُ مَنْ لَايُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ এর বর্ণনায় ঃ (১) মুয়াজ বিন আমর বিন আল জামুহ ও (২) মুয়াওআজ বিন আফরা (রযি.)।

(৩) কোন কোন বর্ণনায় হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.)-এর হিস্‌সা নেয়ার কথাও জানা যায়।

টীকা ঃ ১. মুসলিম শরীফ ঃ ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। তিনি ২৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

বহুমুখী বর্ণনার সুরাহা

ইবনে আব্দিল বার (রহ.) তারজীহ প্রদানের পন্থা অবলম্বন করে বলেন, الأَصَحُّ أَنَّهُ قَدْ ضَرَبَهُ اِبْنَا عَفْرَاءَ। অর্থাৎ, বিশুদ্ধতম কথা হচ্ছে, আফরার দুই পুত্রই তাকে হত্যা করেছেন। অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন, আবু জাহেলের ঘাতক হলেন—(১) মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহ এবং (২) মুআওআজ ইবনে আফরা।

এ মতের উপর প্রশ্ন হয় যে, মুয়াজ বিন আমর বিন জামূহ এর মা'র নাম তো আফরা নয়, তাহলে কিভাবে اِبْنَا عَفْرَاءَ বলা ঠিক হবে ? এ প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

(১) কোন কোন রাবী মুয়াজ বিন আমর বিন জামূহ ও মুয়াজ বিন আফরার মধ্যে পার্থক্য করতে না পেরে اِبْنَا عَفْرَاءَ বলে দিয়েছেন।

(২) কারো কারো মতে এটা تَغْلِيْبًا (প্রাধান্যহেতু) বলা হয়েছে।

(৩) কারো মতে মুয়াজ বিন আমর বিন জামুহের মা'র নামও আফরা।

(৪) ইবনুত্ ত্বীন বলেন, হতে পারে তাদের মধ্যে দুধ সম্পর্ক ছিলো

(৫) তবে সর্বোত্তম সমাধান দিয়েছেন ফাতহুল বারী প্রণেতা ইবনে হাজার (রহ.)। তিনি বলেন, সর্বপ্রথমে মুআওআজ এসে আঘাত হানেন। অতঃপর রূহ কণ্ঠনালীতে আনাগোনা করা অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি.) এসে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে দেন।

এ সমাধান অবলম্বন করলে সকল বহুমুখী বর্ণনার চমৎকার সুরাহা হয়।

(ফতহুল বারী, আইনী, বুখারীর পার্শ্বটীকা)

قَوْلُهُ حَتَّى بَرَدَ (সে নিস্তেজ হয়ে গেলো) ঃ অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার এর অর্থ مَاتَ অর্থাৎ, 'মারা গেলো' করেছেন। কিন্তু কাজী ইয়াজ[২] (রহ.) বলেন, ইবনে মাসউদ (রযি.) আবু জাহেলের সাথে আলাপ করেছেন। যদি সে মারা গিয়ে থাকে, তাহলে তিনি কিভাবে আলাপ করলেন? তাই তিনি দাবী করেন, মুসলিম শরীফে সমরকন্দীর বর্ণনায় بَرَدَ-এর স্থলে যে بَرَكَ (অর্থাৎ, سَقَطَ ঃ পড়ে গেলো) শব্দ এসেছে, আর এখানে এটাই অধিক উপযুক্ত।

কোন কোন ব্যাখ্যাতা بَرَدَ-এর অর্থ بِاعْتِبَارِ مَا سَيَؤُلُ তথা আগাম বার্তা হিসেবে এই করেছেন, اِنَّهُ صَارَ فِىْ حَالَةِ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَبْقَ فِيْهِ سِوَى حَرَكَةِ الْمَذْبُوْحِ অর্থাৎ, সে মৃৎবত হয়ে গেলো। তার মধ্যে জবেহিত প্রাণীর

---

২. আল্লামা কাজী ইয়াজ (রহ.) মৃত্যু ঃ ৫৪৪ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

ন্যায় সামান্যই স্পন্দন ছিলো। হযরত গাঙ্গুহী (রহ.)[১] سَكَنَ اِضْطِرَابُهُ অর্থ بَرد করেছেন। অর্থাৎ, সে নিস্তেজ হয়ে গেল। (ফাতহুল বারী, আইনী, কস্তলানী, লামিউদ্ দারারী)

قَالَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ فَأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ (তিনি বললেন, তুমিই আবু জাহেল? এরপর তার দাড়ি ধরলেন) ঃ আল্লামা কস্তলানী বলেন ঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রযি.) আবু জাহেলকে কথা ও কাজের দ্বারা উত্তেজিত ও প্রভাবিত করতে তার সাথে উপরোক্ত উক্তি করেন। কেননা আবু জাহেল ইবনে মাসউদকে মক্কায় সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। (কস্তলানী)

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ أَنْتَ أَبُوْ جَهْلٍ ঃ (আহমাদ বিন ইউনুস বলেন॥ আহমাদ বিন ইউসুফ॥ইনি বুখারী (রহ.)-এর শায়েখ। আল্লামা আইনী বলেন, এটাই মুস্তামলীর আসল বর্ণনা। আর অধিকাংশের বর্ণনায় এসেছে॥ أَنْتَ أَبَاجَهْلٍ অর্থাৎ,, "بَا" বর্ণে যবরের সাথে। যবর হবার কারণ-(১) সে সমস্ত লোকদের ভাষা অনুপাতে, যারা সর্বাবস্থায় أَسْمَائِ سِتَّه مُكَبَّرَه-এর أَلِف-কে বাকী রাখে (২) উহ্য نِدَاء-এর ভিত্তিতে অর্থাৎ, أَبُوْ এর পূর্বে حَرَفِ نِدَا উহ্য থাকায়। তখন ইবারত হবে— أَنْتَ مَصْرُوْعٌ يَا أَبَاجَهْلٍ অর্থাৎ, আবু জাহেল! তুমি ভূপাতিত? (২) অথবা উহ্য ইবারত হবে॥ أَنْتَ تَكُوْنُ أَبَا جَهْلٍ অর্থাৎ, তুমিই আবু জাহেল হবে। (আইনী, ফাতহুল বারী, কস্তলানী)'

জ্ঞাতব্য ঃ ইমাম শাফেয়ী[২] ও ইমাম আহমাদ[৩] (রহ.)-এর মতে নিহতের سَلَبْ তথা রণাঙ্গনের পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারীকে দেওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা[৪] ও ইমাম মালেক[৫] (রহ.) বলেন, নিহতের পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারীকে দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং এ সম্পদ হত্যাকারী ঐ সময় প্রাপ্ত হয়, যখন আমীর বা সেনাপতি তাকে তা নফল বা অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করে। বজলুল মাযহুদ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭ এবং লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠায় এমনটি বিবৃত হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, যদি কেউ (উদাহরণস্বরূপ সেনাপতি, সেক্টর কমান্ডার প্রভৃতি) হত্যাকারীকে নিহতের সম্পদ প্রদান করে তবে আমীরের রায়ের দ্বারা তা কার্যকরী হবে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও ইমাম মালেক (রহ.)-এর দলিল হলো, রসূল (স.) আবু জাহেলের তরবারী মুয়াজ বিন আমর বিন

টীকা ঃ ১. হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), জন্ম ১২৪৪ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১৩২৩ হিঃ।
২. ইমাম শাফেয়ী (রহ.), জন্ম ঃ ১৫০ হিজরী, মৃত্যু ঃ ২০৪ হিঃ
৩. ইমাম আহমাদ (রহ.),জন্ম ঃ ১৬৪ হিঃ মৃত্যু ঃ ২৪১ হিঃ
৪. ইমাম আবু হানীফা (রহ.), জন্ম ঃ ৮০ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১৫০ হিঃ
৫. ইমাম মালেক (রহ.), জন্ম ঃ ৯৩ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১৭৯ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

জামূহ (রযি.)-কে প্রদান করেন। কেননা যদি হত্যাকারীকে পরিত্যক্ত সম্পদ দেয়া ওয়াজিবই হত (যেমনটি, ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.) বলেছেন, তবে উক্ত তরবারীর হক ছিল দু'জনের। কেননা তারা উভয়ে (মুয়াজ বিন আমর ও মুয়াজ বিন আফরা) আবু জাহেলের হত্যায় শরীক ছিলেন। তথাপি রসূল (স.) যখন তাঁদের একজনকে তরবারী দেন, তখন এটাই প্রমাণ করে যে, কেবল হত্যা করলেই সম্পদের হকদার হবে না; বরং আমীরের অনুমোদন ও বরাদ্দের বদৌলতে হকদার হবে। মালেকীগণ বলেন যে, রসূল (স.) মুয়াজ বিন আমরকে ঐ তরবারী দেন তাদের নিজ নিজ দাবীর পক্ষে নমনীয় না হওয়ার কারণে। কেননা পরিত্যক্ত সম্পদে আমীরের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে যে, তিনি তা যা ইচ্ছা করতে পারেন। শাফেয়ী ও অন্যান্য মতাবলম্বীগণ এর জবাবে বলেন যে, বাক্যের পূর্বাপর থেকে একথা বুঝে আসে যে, পরিত্যক্ত সম্পদের হকদার সেই হবে, হত্যায় যে প্রধান ভূমিকা রাখে। যদিও আঘাত ও তীর নিক্ষেপে তার সাথে অন্য কেউ শরীক হয়। বুখারী প্রথম খণ্ডের ৪৪৪ পৃষ্ঠার পার্শ্বটিকায় উদ্ধৃত হয়েছে, যদি এর উপর প্রশ্ন আসে যে, আবু জাহেলের হত্যাকাণ্ডে উভয় শরীক থাকা সত্ত্বেও ইবনে জামূহকে শুধু কেন দেয়া হল ? প্রত্যুত্তরে বলব, পরিত্যক্ত সম্পদের অধিকার সাব্যস্তকারী শরয়ী হত্যা হলো৷হত্যায় অগ্রণী ও প্রধান ভূমিকা রাখা। আর তা পাওয়া যায় মুয়াজ বিন আমর (রাঃ) থেকে।

قَوْلُهُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অর্থাৎ,, হযরত আলী (রযি.) বলেন, কেয়ামতের দিন কাফেরদের বিরুদ্ধে মুজাহিদদের মধ্য থেকে আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র দরবারে মামলা দায়ের করব। কারণ, কাফেররা সেদিন কেয়ামতের আদালতে এ ভুয়া কেস দায়ের করবে যে, এ সকল লোক (হযরত আলী, হযরত হামযা প্রমুখ) আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিনা উস্কানী ও নিরাপরাধে হত্যা করেছে। তখন তিনি শরয়ী আইনের বিভিন্ন ধারার রেফারেন্স টেনে প্রমাণ করে দেখাবেন যে, আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের সাথে যুদ্ধ করেছি। যেহেতু বদর যুদ্ধ ছিল হক-বাতিলের সর্বপ্রথম যুদ্ধ, আর এ ব্যাপারে কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মার্ডার কেসের মামলা দায়ের করবে৷ সে জন্যই হযরত আলী (রযি.) বলেছেন– **أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ**

(আইনী, কস্তলানী, লামিউদ্ দারারী)

هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ঃ এই দু'দল তারা তাদের প্রভুর প্রশ্নে বিবাদমুখর। দু'দল দ্বারা উদ্দেশ্য 'হক' ও 'বাতিল'। এক. মু'মিন গ্রুপ যারা আল্লাহ্‌র সকল কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও মান্য করে। তাঁর আদেশ-নিষেধের সামনে আনুগত্যের মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। দুই. কাফের গ্রুপ-যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলে না। তাঁর আদেশ-নিষেধের ধার ধারে না। এ দু'গ্রুপ দাবী, তর্ক-বিতর্ক

www.e-ilm.weebly.com

এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ সর্বক্ষেত্রে একে অন্যের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। যেমনভাবে বদর যুদ্ধে দু'দল একে অপরের বিপক্ষ হয়েছিল, তদ্রূপ কেয়ামতের দিনেও তারা একে অপরের বিপক্ষ দল হবে।

(ফাওয়ায়িদুল কুরআন ঃ আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী[১] সংকলিত)

আবু হায়ান বলেন ঃ

اَلظَّاهِرُ ـ أَنَّ الْإِخْتِصَامَ هُوَ فِى الْاٰخِرَةِ بِدَلِيْلِ التَّقْسِيْمِ بِالْفَاءِ الدَّالَّةِ عَلَى التَّعْقِيْبِ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

অর্থাৎ, একথা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট যে, এখানে যে বিবাদের কথা বলা হয়েছে, তা আখেরাতে সংঘটিত হবে। দলীল হলো فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا-এর মধ্যকার فَاءْ টি, যা পরবর্তীতে হওয়া বুঝায়। মূলত এ কারণেই হযরত আলী (রযি.) বলেছেন ঃ

أَنَا أَوَّلُ مَن يَحْثُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُوْمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

যদি প্রশ্ন হয়, মুসলমান আর কাফেরদের সংঘর্ষ তো দুনিয়াতে সংঘটিত হয়েছে; কেয়ামতের দিন নয়? উত্তর হবে, যখন এ বিষয়টি বদরের দিন প্রকাশ পেয়ে গেছে, তখন কেয়ামতের দিনকে সংঘর্ষের সময় বলা যায়; এতে কোন অসুবিধা নেই।

এ আয়াতের পটভূমিকা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। (১) হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত, এটা মুসলমান এবং আহলে কিতাবদের বাদানুবাদ সম্পর্কে অবতারিত। (২) জুমাল প্রণেতা বলেন, যে সকল মুসলমান ও কাফের একে অপরের বিপক্ষে বদর প্রাঙ্গণে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে অবতারিত। (৩) মুজাহিদের বর্ণনায় এ আয়াত সে সকল কাফের ও মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বর্ণনায় অবতারিত, যারা পুনরুত্থান প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক করে। আল্লামা কস্তলানী বলেন, উপরোক্ত সকল উক্তিকে কেন্দ্র করে এ আয়াত অবতারিত। বদর যুদ্ধ প্রভৃতির কথা এতে এসে গেছে। কেননা, ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিজয় কামনা করেন আর কাফেররা ঈমানের আলো নিভিয়ে দিতে চায়। কামনা করে হকের পরাজয় আর বাতিলের বিজয়। (আইনী, কস্তলানী)

فِىْ سِتَّةٍ مِنْ قُرَيْشٍ (ছ'জন কুরাইশ সম্বন্ধে) ঃ এদের মধ্যে (১) হযরত আলী (২) হযরত হামজা ও (৩) হযরত উবায়দা বিন হারেস ছিলেন মুসলমান। আর (১) শায়বা বিন রবীয়া (২) উতবা বিন রবীয়া ও (৩) ওলীদ বিন উতবা ছিল কাফের। হযরত আলী (রযি.) ওলীদ বিন উতবা এবং হযরত হামযা (রযি.) শায়বার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। মূল যুদ্ধের প্রারম্ভে (মল্লযুদ্ধে) হযরত আলী ও হামযা নিজ নিজ

টীকা ঃ ১. আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৩৬৯ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন। হযরত উবায়দা (রযি.) উতবা বিন রবীয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। কিন্তু কেউ কাউকে পুরোপুরি পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়। ইত্যবসরে হযরত আলী ও হামজা এসে উতবার উপর চড়াও হন এবং তাকে ধরাশায়ী করেন। হযরত উবায়দা (রযি.) উরুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

قَوْلُهٗ كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ (আমি উমাইয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিলাম) ঃ আলোচ্য অংশটুকু লেখক কর্তৃক "كِتَابُ الْوَكَالَةِ" তে উদ্ধৃত হাদীসের অংশবিশেষ। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রযি.) বলেন, আমি এবং উমাইয়া এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম যে, সে মক্কায় আমার সম্পদ সংরক্ষণ করবে আর আমি মদীনায় তার মাল তদারকি করব। লামিউদ্দারারী [১] গ্রন্থে এসেছে, মদীনায় উমাইয়ার কোন সম্পদ কিংবা পরিবার-পরিজন ছিল না। এ সময়ে চুক্তির মর্মার্থ হবে, মদীনায় উমাইয়ার প্রয়োজনীয় বস্তু আব্দুর রহমান সরবরাহ করবেন।

উমাইয়া হত্যার বিবরণ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রযি.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিন মুসলিম ফৌজ নিদ্রা গেলে আমি উমাইয়াকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে পাহাড় অভিমুখে রওনা করলাম। কিন্তু হযরত বেলাল (রযি.) তাকে দেখে 'উমাইয়া' 'উমাইয়া' বলে আনসারদের ডেকে বলেন, لَانَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ অর্থাৎ, আজ উমাইয়া বেঁচে গেলে আমার রক্ষা নেই। তার আওয়াজে একদল আনসার আমাদের পিছু নিল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের ধরে ফেলবে, তখন আমি উমাইয়াকে প্রাণে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে তার পুত্রকে কিছুটা পশ্চাতে রেখে আসি। যাতে আনসারগণ তার হত্যার দিকে মনোনিবেশ করে আর সেই ফাঁকে আমি উমাইয়াকে নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু অতি অল্প সময়ে তারা উমাইয়ার পুত্রের জীবন সংহার করে আমাদের একেবারে নিকটে চলে এলেন। এ অবস্থা দেখে আমি উমাইয়াকে উটের মত বসে যেতে বললাম। সে বসে গেল। উমাইয়ার প্রাণ রক্ষার্থে আমি তার শরীরের উপর নিজের শরীর ঢালরূপে বিছিয়ে দিলাম। কিন্তু আনসারগণ আমার শরীরের নিচ দিয়ে তলোয়ার ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলে। (বুখারী ঃ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮)

উমাইয়ার হত্যাকারী কে?

এ প্রসঙ্গে বহুমুখী বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) ওয়াকেদী বলেন, হত্যাকারী হলেন, খুবাইব বিন আসাফ (রযি.)। (২) ইবনে ইসহাক বলেন, বনী মাযিনের এক আনসারী সাহাবী (রযি.)। (৩) ইবনে হিশাম বলেন, হত্যাকারী তিনজন-(১) মুয়াজ বিন আফরা (২) খারিজাহ বিন যায়েদ ও (৩) খুবাইব বিন আসাফ (রযি.)।

টীকা ঃ ১. লামিউদ্দারারী বুখারী শরীফের একটি উঁচুমানের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থ। গ্রন্থটি মূলত হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.)-এর আলোচনা ও তাকরীর থেকে সংকলিত। সংকলন করেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া কান্দলভী (রহ.)। পরে এ গ্রন্থের হাশিয়া লিখেছেন হযরত যাকারিয়া (রহ.)

www.e-ilm.weebly.com

(৪) আল্লামা কিরমানীর মতে হযরত বেলাল (রযি.) তাকে হত্যা করেন। কবিতায় উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

هَنِيْئًا زَادَكَ الرَّحْمٰنُ فَضْلًا * فَقَدْ اَدْرَكْتَ ثَارَكَ يَا بِلَالُ

ঢের মর্যাদা লভিছ খোদার হর্ষ তোমার জন্য,
আশা তোমার হয়েছে পূর্ণ ধন্য বেলাল ধন্য।

আল্লামা আইনী বলেন, "كِتَابُ الْوَكَالَةِ"-এর হাদীস থেকে অনুমিত হয় না যে, হযরত বেলাল[১] (রযি.) একাই উমাইয়াকে হত্যা করেছেন। তবে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, আব্দুর রহমান বিন আউফের (রযি.) নিচ থেকে যারা তলোয়ার ঢুকিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হযরত বেলালও ছিলেন। হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, উমাইয়া তনয়ের প্রাণ সংহার করেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসির (রযি.)। (ফতহুল বারী, আইনী, কস্তলানী, লামিউদ্ দারারী)

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন ঃ বদর প্রান্তরে মুসলমানগণ কাফেরদের নাস্তানাবুদ করতে গিয়েছিলেন। তাহলে আব্দুর রহমান বিন আউফ (রযি.) উমাইয়াকে কিভাবে নিরাপত্তা দিলেন? এবং কিভাবে তার প্রাণ রক্ষার্থে সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন?

জবাব ঃ কাফেরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি উচ্চাশা ও দম্ভ চূর্ণ করতে আব্দুর রহমানের গৃহীত কৌশলই ছিল অধিক কার্যকর। কেননা কাফেররা যখন দেখে তাদের নেতা ভাগতে সচেষ্ট তখন তাদের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং পুরো দলের মধ্যে আতংক সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য, এ পদ্ধতি ছিল তাকে সরাসরি হত্যার তুলনায় অধিক ফলপ্রসূ। তাই হযরত আব্দুর রহমান (রযি.) এ কৌশল অবলম্বন করেন। (লামিউদ্ দারারী)

আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন॥(১) সংশ্লিষ্ট ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, বদরের দিন কাফেরদের নিরাপত্তা ছিল না। আর সে কারণেই আনসারগণ আব্দুর রহমানের প্রদেয় নিরাপত্তার তোয়াক্কা করেননি। (২) উমাইয়ার সাথে সম্পাদিত প্রতিশ্রুতি আব্দুর রহমান যে ষোলকলায় পূরণ করেন, হাদীসটিতে তারও প্রমাণ রয়েছে। (৩) পরবর্তীতে আলোচ্য হাদীসটি রসূল (স.)-এর অত্র হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর তা হলো– قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَدْنَاهُمْ অর্থাৎ, ন্যূনতম সংখ্যক বা নিম্নস্তরেরও কোন মুসলমান যদি কাউকে নিরাপত্তা দেয়, তবে তা সকলের পক্ষ থেকে কার্যকর হবে। —আইনী।

وَوَاحِدَةٌ يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ (একটি ছিল ইয়ারমুক যুদ্ধের) ঃ সিরিয়া, দামেস্ক ও ইজরায়াতের মধ্যবর্তী একটি স্থানের নাম ইয়ারমুক। এখানে হযরত উমর (রযি.)-এর শাসনামলে (১৩/১৫ হিজরী) রোম সম্রাট হিরাক্লার সেনাবাহিনী আর মুসলিম সৈন্যদের মাঝে এক তুমুল লড়াই সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর

www.e-ilm.weebly.com

সেনাপতি (চীফ কমান্ডার) ছিলেন হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ[১] (রযি.)। আর হিরাকলার বাহিনীর চীফ কমান্ডার ছিলেন বামান আর্মেনী। রণাঙ্গনে অবিচল থাকতে ৭০ হাজার রোমীয় পায়ে শিকলাবদ্ধ হয়। পরে এদের অধিকাংশই নিহত হয়। এ যুদ্ধে একশত বদরী সাহাবী অংশ নেন। যুদ্ধে চার হাজার (৪০০০) মুসলমান শহীদ হন। আর রোমীয়দের এক লাখ পাঁচ হাজারের মত সৈন্য নিহত হয়। চল্লিশ হাজার হয় বন্দী। (ফাতহুল বারী, আইনী, কস্তলানী)

فَضَرَبُوْهُ ضَرْبَتَيْنِ عَلٰى عَاتِقِهٖ بَيْنَهُمَا ضَرْبَةٌ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْرٍ (তারা তাঁর ঘাড়ে দু'টি আঘাত করে। এ দুটি আঘাতের মাঝখানে বদর যুদ্ধের আঘাত ছিল) ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্ণিত বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে। ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ যার মর্মার্থ হলো, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.) বদর যুদ্ধে দু'টি এবং ইয়ারমুক যুদ্ধে একটি আঘাতপ্রাপ্ত হন। অথচ আলোচ্য বাক্যের ভাষ্য তার বিপরীত। ব্যাখ্যাকারগণ এ দু'বর্ণনার সমাধান নিম্নোক্তভাবে প্রদান করেছেন—

(১) যদি বিরোধটা হয় হিশাম রাবীর উপস্থিতির কারণে, তবে ইবনে মুবারকের বর্ণনাটা বেশি গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, حَدِيْثُ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ এ সূত্রটি বিতর্কিত। নতুবা (অর্থাৎ, বিরোধ যদি সূত্রগত না হয়) সমাধান হবে, আব্দুল্লাহর ঘাড়ে ছাড়া অন্যত্র দু'টি আঘাত ছিল।

(২) আল্লামা কিরমানী বলেন, দু'বর্ণনার মাঝে কোনই বিরোধ নেই। কেননা মোটেই অসম্ভব নয় যে, ইয়ারমুকের আঘাত দুটি ছিল তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্রের। পক্ষান্তরে বদরের আঘাতদ্বয় ছিল তলোয়ারের।

(৩) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে, প্রকৃতপক্ষে বদর ও ইয়ারমুক উভয় যুদ্ধের দু'টি দু'টি করে মোট চারটি আঘাত ছিল। প্রথমটি বদরের, দ্বিতীয়টি ইয়ারমুকের, তৃতীয়টি বদরের ও চতুর্থটি ইয়ারমুকের। অথবা এর বিপরীত প্রথমটি ইয়ারমুকের, দ্বিতীয়টি বদরের, তৃতীয়টি ইয়ারমুকের এবং চতুর্থটি বদরের। রাবী যখন তাঁর বদরের শৌর্য-বীর্যের বিবরণ দিতে চান, তখন বদরের উভয়টি উল্লেখ করেন। আর ইয়ারমুকের করেন মাত্র একটি। পক্ষান্তরে যখন ইয়ারমুকের বীরত্বের বিবরণ দেন তখন ইয়ারমুকের উভয় আঘাত উল্লেখ করেন। অপরদিকে বদরের করেন মাত্র একটি।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ প্রথম বর্ণনায় এসেছে, ঘাড়ে একটি আঘাত ছিল। পক্ষান্তরে পরবর্তী বর্ণনায় উদ্ধৃত হয়েছে, তারা তার ঘাড়ে দু'টি আঘাত হানে! এ বিরোধ নিরসনার্থে আল্লামা কিরমানী বলেন, প্রথম বর্ণনায় ঘাড় দ্বারা উদ্দেশ্য ঘাড়ের ঠিক মধ্যখানে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় আগত ঘাড় দ্বারা উদ্দেশ্য ঘাড়ের দু'পার্শ্বে।

(ফাতহুল বারী, কিরমানী, লামিউদ্ দারারী)

টীকা ঃ হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রযি.), মৃত্যু ঃ ১৮ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ حِيْنَ قُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ (যখন আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর শহীদ হলেন) ঃ খলীফা আব্দুল মালিকের শাসনামলে আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.) মক্কায় খেলাফতের দাবী করলে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ তাঁকে শহীদ করে দেয় এবং তাঁর সহায়-সম্পত্তি ক্রোক করে খলীফা আব্দুল মালিক সমীপে প্রেরণ করে। তন্মধ্যে হযরত যুবাইরের (রযি.) তরবারিও ছিল।

قَوْلُهُ يَاعُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّبَيْرِ (যুবাইরের তলোয়ার চেন উরওয়া?) ঃ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক মক্কায় আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের অবরোধকালে হযরত উরওয়া তাঁর ভাইয়ের সাথে ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রযি.)-এর ইন্তেকালের পর উরওয়া খলীফা আব্দুল মালিকের নিকটে যান। উরওয়াকে[১] তলোয়ার ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে আব্দুল মালিক এ সময় তাঁকে তরবারী সংশ্লিষ্ট উপরোক্ত প্রশ্ন করেন। কারণ, হযরত যুবাইরের অন্যান্য সন্তানদের সাথে খলীফা আব্দুল মালিকের[২] কোন বিরোধ ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহর[৩] সাথে যে বিরোধ তাও মূলত খেলাফতের দাবীর ইস্যুতেই ছিল।

لَاعَيْبَ فِيْهِمْ ঃ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এ ছাড়া আর কোন দোষ নেই যে, অহরহ যুদ্ধ ও শত্রু বাহিনীর মোকাবেলা করতে করতে তাদের তলোয়ারে দাঁত সৃষ্টি হয়ে গেছে। (বীরের জন্য এটা কোন দোষ নয়; বরং নৈপুণ্য)।

قَوْلُهُ فَقُذِفُوا فِىْ طَوِىٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (বদরের একটি কূপে তাদের নিক্ষেপ করা হয়) ঃ সামনে আছে قَامَ عَلٰى شِفَّةِ الرَّكِيِّ অর্থাৎ, রসূল (স.) কূপের কিনারায় দাঁড়ালেন। প্রস্তরনির্মিত কূপকে طَوِيٌّ বলে। এর বিপরীতে মাটির কূপকে বলে اَلرَّكِيُّ । উভয়ের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট। তবে সমাধান হলো, কূপটি প্রথমে طَوِيٌّ তথা প্রস্তরনির্মিত ছিল পরে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে اَلرَّكِيُّ তথা মাটির কূপে পরিণত হয়েছিল।

আল্লামা আইনী বলেন, বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের নিহত হয়। তন্মধ্য হতে উমাইয়া বিন খলফ বাদে বাকী নেতাদের এ কূপে ফেলা হয়। কারণ, উমাইয়া মোটা হওয়ায় ফুলে গিয়েছিল। তাই মাটি ও পাথর দ্বারা তার লাশ ঢেকে দেয়া হয়। আর অপর নিহতদের অন্যান্য স্থানে নিক্ষেপ করা হয়। —আইনী

قَوْلُهُ فَجَعَلَ يُنَادِيْهِمْ (রসূল তাদের নাম ধরে ডাক দেন) ঃ আল্লামা কস্তলানী বলেন, রসূল (স.)-এর এ ডাক হেয় প্রতিপন্ন স্বরূপ ছিল। কূপে উমাইয়া ছিল না। কারণ, মোটাহেতু ফুলে যাওয়ায় তাকে পাথর ও মাটি চাপা দেয় হয়। সুস্পষ্ট এটাই যে, পাথর চাপা দেয়ার সে স্থানটি কূপের নিকটেই ছিল। এজন্য রসূল (স.) তাকে তার লেডারগ্রুপ সহ সম্বোধন করেন।

টীকা ঃ ১. হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর (রযি.)। মৃত্যু ঃ ৯৪ হিজরী

২. খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম (রহ.), মৃত্যু ঃ ৮৬ হিঃ। তিনি তাবেয়ী ছিলেন।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.), মৃত্যু ৭৩ হিজরী। তিনি শহীদী মৃত্যুবরণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ (রসূল ময়দানে তিন দিন অবস্থান করতেন) ঃ (১) হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, মাহলাব বলেছেন ঃ যুদ্ধের পর মুজাহিদ বাহিনী ও তাদের বাহনের বিশ্রামার্থে রসূল (স.) বিজিত এলাকায় তিনদিন অবস্থান করতেন। (২) ইবনুল জাওযী বলেন, আইন কার্যকর ও শত্রুদের ব্যাপারে নিরুদ্বেগতা প্রকাশের জন্য রসূল (স.) ময়দানে তিনদিন অবস্থান করতেন। এটা শত্রুদের প্রতি রসূল (স.)-এর এক ধরনের চ্যালেঞ্জ ছিল যে, আমরা এখানেই আছি। সাহস হয় তো পুনর্বার আসতে পার। (৩) যে সমস্ত স্থানে আল্লাহ্র অবাধ্যতা ও নাফরমানী হতো সে সকল স্থানে আল্লাহ্র আনুগত্য ও ইসলামের নিদর্শনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে রসূল (স.) সেখানে অবস্থান করতেন। যেহেতু এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক ধরনের আতিথেয়তা, তাই তিন দিন অবস্থানই যুক্তিসঙ্গত। (বজলুল মাযহুদ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪-২৫)

أَيَسُرُّكُمْ (তোমাদের জন্য খুশীর বিষয় হতো না?) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্র শাস্তি প্রাপ্ত হয়ে এখন তোমরা ইসলাম আনয়নের ইচ্ছা করছ কি?

قَوْلُهُ قَالَ قَتَادَةُ أَحْيَاهُمُ اللّٰهُ (কাতাদা বলেন, আল্লাহ্ তাদের জীবিত করে দিয়েছিলেন) ঃ হযরত কাতাদার এ উক্তি সম্পর্কে ইবনে হাজার (রহ.) মন্তব্য করেন যে, কাতাদা (রযি.) এ উক্তির মাধ্যমে 'মৃত শ্রবণ' অস্বীকারকারীদের বক্তব্য খণ্ডন করেছেন। লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে, হাফেজ ইবনে হাজারের এ উক্তি থেকে অনুমিত হয় যে, যেহেতু হযরত আয়েশা (রযি.) মৃত এর না শ্রবণেরই প্রবক্তা, তাই হযরত কাতাদা হযরত আয়েশার বিরোধী। অথচ বাস্তব ব্যাপার হল, আলোচ্য বিষয়ে হযরত কাতাদা (রযি.) হযরত আয়েশার সাথে সম্পূর্ণ একমত। কেননা প্রকৃতই যদি তিনি 'মৃত শ্রবণের' প্রবক্তা হতেন তবে কখনই উপরোক্ত উক্তি করতেন না। অতএব বলতেই হবে, যেরূপভাবে এ বিষয়ে হযরত আয়েশা ব্যাখ্যা করেছেন, অনুরূপভাবে হযরত কাতাদাও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে প্রভেদ এই যে, উভয়ের ব্যাখ্যা এক নয়। (লামিউদ্‌দারারী)

মৃতের শ্রবণ প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে সাহাবা ও তৎপরবর্তীদের থেকে দু'ধরনের অভিমত পাওয়া যায়। (১) হযরত উমর[১] (রযি.) ইবনে উমর[২] (রযি.) ও তাঁদের অনুসারীগণ মৃতের শ্রবণে বিশ্বাসী। পক্ষান্তরে (২) হযরত আয়েশা (রযি.) এবং তাঁর অনুসারীরা মৃতের শ্রবণের বিরোধী। মৃতের শ্রবণের অস্বীকারকারীগণ নিম্নোক্ত প্রমাণাদি তুলে ধরেন—

টীকা ঃ ১. হযরত উমর (রযি.), মৃত্যু ঃ ২৩ হিজরী

২. হযরত ইবনে উমর (রযি.)। পূর্ণ নাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রযি.), মৃত্যু ঃ ৭৩/৭৪ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) আল্লাহ্‌র উক্তি ঃ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى অর্থাৎ, নবী, আপনি মৃতকে শোনাতে পারবেন না!

(২) আল্লাহ্‌র অপর উক্তি ঃ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ অর্থাৎ, নবী, কবরবাসীকে আপনি শোনাতে পারবেন না।

(৩) হযরত আয়েশা[৩] (রযি.)-এর হাদীসের উপর ভিত্তি করে এ পক্ষ (মৃতের শ্রবণের বিরোধী পক্ষ) হযরত ইবনে উমরের হাদীসের * এ জবাব দেন যে, (১) যেহেতু হযরত আয়েশা শ্রবণের অর্থ 'অবগত' করে হাদীসের ব্যাখ্যা করেছেন, তাই অর্থগত দিক দিয়ে এ বর্ণনাটি সঠিক নয়। (২) রসূল (স.) 'মৃতের শ্রবণকে' জীবিতদের উপদেশ স্বরূপ আখ্যা দিয়েছেন (৩) অস্বাভাবিকতা হেতু (নীতি বিরুদ্ধ হওয়ায়) তা কেবল তাদের (বদরে নিহতদের) ক্ষেত্রে সীমিত। (৪) মুজেযাহেতু তা রসূল (স.)-এর সাথে খাস।

মৃতের শ্রবণে বিশ্বাসীদের প্রমাণপঞ্জী ঃ (১) হযরত উমর ও ইবনে উমরের ঐ হাদীসে যা টীকাংশে উদ্ধৃত। (২) মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে ঃ إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ অর্থাৎ, মৃত তাদের জুতার আওয়াজ শোনে। (২) অপর বর্ণনায় এসেছে ঃ إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَعْلَمُ مَنْ يُكَفِّنُهُ وَمَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَمَنْ يَحْمِلُهُ وَمَنْ يَدْفِنُهُ অর্থাৎ, কে কাফন পরাচ্ছে, জানাযা নামায পড়ছে, বহন করছে, সমাহিত করছে॥সবই মৃত অনুধাবন করে। এ হাদীসগুলি মৃতের অনুভূতি শক্তি থাকার উপর জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ, অনুভূতি ব্যতীত অনুমান করা বা বুঝা সম্ভব নয়। সেজন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেম মৃতের শ্রবণের পক্ষে। তারা মূলত হযরত উমর ও ইবনে উমরের হাদীস দ্বারা বিষয়টিকে প্রমাণিত করেন।

কুরআনিক আয়াতের জবাব

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা (জমহুর) দাবী করেন যে, কুরআনের আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বস্তুত কোন বিরোধ— বা দ্বন্দ্ব নেই। কেননা—(১) মুফাসসিরগণ আয়াতোক্ত اَلْمَوْتَى (মৃত) দ্বারা কাফেরদের উদ্দেশ্য নেন।

---

৩. হযরত আয়েশা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৫৭ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

কারণ বাহ্যিকভাবে তারা জীবিত হলেও অন্তঃকরণ তাদের মৃত। আল্লামা সুয়ূতীর[১] কণ্ঠোচ্চারণ—

سِمَاعُ الْمَوْتٰى كَلَامَ الْخَلْقِ قَاطِبَةً * جَاءَتْ عِنْدَنَا الْاٰثَارُ فِى الْكُتُبِ

মানুষের কথা মৃতরা শোনে বসে কবর আমাদের কাছে কিতাবে এসেছে এ খবর

وَاٰيَةُ النَّفْىِ مَعْنَاهَا سِمَاعُ هُدًى * لَا يَقْبَلُوْنَ وَلَا يَصْغُوْنَ لِلْاَدَبِ

আয়াতের মর্ম ঃ নাকচ করা হেদায়েত শ্রবণ কবুল করে না তারা যারা, ভক্তিতে নোয়ায়না দেল-মন

(২) مَوْتٰى-এর প্রকৃত অর্থ 'মৃত' করলেও ক্ষতি নেই। কেননা কুরআনে শ্রবণ করানোকে নফী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে হাদীসে সাবেত করা হয়েছে শ্রবণ করাকে। আর এ দু'মর্মের মধ্যে কোনই দ্বন্দ্ব নেই।

(আল্লামা উসমানী প্রণীত ফতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৮)

দ্বীন বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিষয়টিকে আরও খুলে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ

(১) ইবনুত্ত্বীন বলেন, আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মৃতরা আপনা-আপনি শোনে না। তবে আল্লাহ্ শোনানোর ইচ্ছা করলে তাদের শোনাটা অসম্ভব কিংবা নিষিদ্ধ নয়। যেমন ঃ

* উক্ত হাদীস হলো— اِنَّ رَسُوْلَ ﷺ قَامَ عَلَى الْقَلِيْبِ وَفِيْهِ قَتْلٰى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ اِنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ অর্থাৎ, বদরে নিহত মুশরিকদের নিক্ষিপ্ত কূপের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্য করে রসূল (স.) বলেন, অবশ্যই তারা আমার কথা শুনছে। (বুখারী-২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭)

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا অর্থাৎ, আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালার কাছে আমানত পেশ করেছিলাম, তারা বহন করতে অস্বীকার করল। অপর আয়াতে আছে ঃ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ ائْتِيَا অর্থাৎ, তিনি আসমান ও জমিনকে আসার নির্দেশ দিলেন।

(২) ইসমাঈলী বলেন, আল্লাহ্র উক্তি॥ قَوْلُهٗ تَعَالٰى اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى রসূল (স.)-এর উক্তি-قَوْلُهٗ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّهُمْ يَسْمَعُوْنَ এর বিরোধী নয়। কারণ, এখানে নবী তাদের শোনাননি; বরং নবীর আওয়াজ তাদের পর্যন্ত পৌঁছার পর আল্লাহ্ই তাদের শুনিয়েছেন।

টীকা ঃ ১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.), জন্ম ঃ ৮৪৯ হিঃ, মৃত্যু ঃ ৯১১ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

(৩) আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলূসী (রহ.)* স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ 'রূহুল মা'আনী' তে বলেন, মৃতরা শোনে। তবে তার পদ্ধতি দু'টি। (১) আল্লাহ্ পাক মৃতের কতক অঙ্গের মধ্যে এমন শক্তি দান করেন, যার ফলে সে শুনতে পারে। মাটির নীচে মৃতের অবস্থান এই শ্রবণের অন্তরায় নয়। (২) মৃতের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শ্রবণ শক্তি দেয়া ছাড়াই আত্মা শুনতে পায়।

(৪) দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা হযরত কাসেম নানুতবী[১] (রহ.) বলেন, বান্দার কাজটা স্বাভাবিক পর্যায়ের হলে তার সম্বন্ধ বান্দার প্রতি করা হয়। আর কাজটা অস্বাভাবিক পর্যায়ের হলে তার সম্বন্ধ দেয়া হয় আল্লাহ্র দিকে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ কাউকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করলে বলা হয় সে অমুককে হত্যা করেছে। কেননা এ হত্যাকাণ্ডটা ঘটেছে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়। পক্ষান্তরে কারো প্রতি যদি কঙ্কর নিক্ষেপ করা হয় আর তাতে সে মারা যায়, তবে বলা হয় না যে, সে অমুককে হত্যা করেছে; বরং এটা আল্লাহ্র থেকে হয়েছে বলা হয়। কেননা এ অঘটন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ঘটেনি। যেমন আল্লাহ্ বলেন, وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের হত্যা করেছেন। অপর আয়াত ঃ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى অর্থাৎ, 'মাটি আপনি নিক্ষেপ করলেও প্রকৃতপক্ষে আপনি তা নিক্ষেপ করেননি; বরং আল্লাহ্ স্বয়ং তা নিক্ষেপ করেছেন।' মৃতের শ্রবণ ব্যাপারটি ঠিক এমনই যে, সাধারণত জীবিত ব্যক্তিরা মৃতদেরকে তাদের কথা শুনাতে সক্ষম নয়; অস্বাভাবিক পন্থায় আল্লাহ্ পাক মৃতদেরকে জীবিতদের কথা শুনিয়ে দেন।

হযরত আয়েশা (রযি.) কর্তৃক বর্ণনার জবাব

(১) হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামা হযরত ইবনে উমরের (রযি.) বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। হযরত আয়েশার বর্ণনা নয়। কারণ, ইবনে উমরের বর্ণনার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ইবনে উমরের ন্যায় হযরত উমর, হযরত আবু তালহা[২] ও হযরত ইবনে মাসউদও (রযি.) রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে আয়েশার (রযি.) বর্ণনাটি কেবল তার থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(২) আল্লামা সুহায়লী (রহ.) বলেন, বদর প্রাঙ্গণে রসূল (স.)-এর কথা বলার মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রযি.) উপস্থিত ছিলেন না। অতএব কথা বলার মুহূর্তে যারা উপস্থিত ছিলেন সঙ্গত কারণে তাঁদের উক্তিই গ্রহণযোগ্য হবে।

টীকা ঃ ১. হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১২৯৭ হিজরী।
২. হযরত তালহা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩৬ হিঃ
* আল্লামা আলুসী (রহ.) মৃত্যু ঃ ১২৭০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(৩) আল্লামা সুহায়লী আরও বলেন, হযরত আয়েশা (রযি.) শ্রবণে বিশ্বাসী না হলেও বদরে মৃতদের ক্ষেত্রে অবগতি (عِلْم) লাভে তো বিশ্বাসী। যদি তারা অবহিত (عالِم) হতে পারে, তবে শ্রবণে (سَامِعْ) বাধা কোথায়?

(৪) 'মাগাযী ইবনে ইসহাক' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য সূত্রে ইউনুস বিন বুকাইর থেকে আবু তালহার অনুরূপ হযরত আয়েশা থেকেও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে। مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ অর্থাৎ, আমার কথা তোমরা তাদের থেকে বেশি শুনছ না। ইমাম আহমাদ (রহ.)-ও হাদীসটি উৎকৃষ্ট সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অতএব যদি এ বর্ণনাটি বাস্তবিকই বিশুদ্ধ হয় তবে ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, সম্ভবত হযরত আয়েশা (রযি.) উল্লিখিত সাহাবীদের বর্ণনা শুনে পূর্ব অবস্থান থেকে সরে এসেছেন।

(ফাতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮৭, ৪৭৯ ও লামিউদ্‌দারারী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪-৩৫)

مَسْئَلَةُ تَعْذِيْبِ الْمَيِّتِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ

পরিবারের ক্রন্দনে মৃতকে শাস্তিদান প্রসঙ্গ

قَوْلُهُ إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ (পরিবার কাঁদলে মৃত ব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়) ঃ উলামা মহলের সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, মৃতব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ স্বরূপ যে ক্রন্দনের বিবরণ বিভিন্ন হাদীসে এসেছে তার দ্বারা প্রত্যেক ক্রন্দন উদ্দেশ্য নয়; বরং ঐ ক্রন্দনই উদ্দেশ্য, যা সজোরে ও মাতমাকারে হয়। এ থেকে অনুমিত যে, নীরবে অশ্রু বিসর্জনে কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না।

জীবিতদের রুনাজারী ও মাতমের কারণে মৃতকে শাস্তি দান প্রশ্নে হযরত আয়েশা (রযি.) ও হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) বিরোধিতা করেন। শাফেয়ী মতাবলম্বীদের এক গ্রুপ তাদের সমর্থন করেন। হযরত আয়েশা (রযি.) আলোচ্য হাদীসকে কুরআনের আয়াত وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى অর্থাৎ, কেউ অপরের বোঝা (শাস্তি) বহন করবে না—এর বিরোধ মনে করে হাদীসের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আল্লামা কুরতুবী বলেন, হযরত আয়েশা কর্তৃক 'মৃতকে শাস্তিদান' অস্বীকার করা এবং হাদীসের রাবীর প্রতি ভুল, অসতর্কতা এবং একাংশ শ্রবণ ও অপরাংশ অশ্রবণের অপবাদ দেয়া সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী। কারণ, এ হাদীসের বর্ণনাকারী অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম। তাঁরা প্রত্যেকেই হাদীসের মূলভাবকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাই হাদীসকে তার সঠিক ক্ষেত্রে ফিট (مَحْمُوْل) করার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাকে প্রত্যাখ্যান করার কোন যুক্তি নেই। সেজন্য বিশ্লেষক উলামায়ে কেরাম হাদীসের একাধিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো—

(১) (যা উক্ত আয়াত থেকে অনুমিত)। তবে সে পাপের উপলক্ষ মৃত ব্যক্তি হলে অবস্থা ভিন্ন। তাই মাতম করা যদি মৃত ব্যক্তির প্রথাগত অভ্যাস থেকে থাকে,

www.e-ilm.weebly.com

আর সেই প্রথা পালনের নিমিত্ত তার পরিবার-পরিজন ক্রন্দন-বিলাপ করে, তবে মৃতব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্তহবে। কেননা আল্লাহ্র নির্দেশ ছিল- قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا অর্থাৎ, অগ্নি কবলিত হওয়া থেকে নিজে বাঁচ, পরিবারকে বাঁচাও। (সূরা তাহরীম-৬০)

(২) অথবা মৃতব্যক্তি শাস্তিপ্রাপ্ত হবে তখন, যখন সে পরিবারবর্গকে মাতমের জন্য ওসিয়ত করে যবে। জাহেলী যুগে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন তরফা বিন আবদ তার স্ত্রীকে ওসিয়ত করেছিল—

إِذَا مِتُّ فَانْعِينِي بِمَا أَنَا أَهْلُهُ * وَشُقِّي عَلَى الْجَيْبِ يَا ابْنَةَ مَعْبَدٍ

যখন আমি মারা যাব কাঁদবে খুব পড়ে টুটি,
মোর শোকে ফাড়বে জামা শোন হে মা'বাদের বেটি!

ইমাম নববী[১] (রহ.) এ ব্যাখ্যাকে জমহুরের উক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) ঐ মৃতের শাস্তি হবে, যে জানত মাতম করা শরীয়ত নিষিদ্ধ এবং তার পরিবারবর্গ তার উপর মাতম করবে—তথাপি পরিবারবর্গকে নিষেধ করেনি।

মৃতের শাস্তি তখন হবে, যখন পরিবারবর্গ তার বীরত্ব ও কৃতিত্ব উল্লেখ করে করে মাতম করবে। উদাহরণস্বরূপ, মৃতের ঐ পদের নাম উল্লেখ করে, যে পদ ও অবস্থানে থেকে সে অন্যায়-অবিচার করত। অথবা তার ঐ শৌর্য-বীর্যের কথা উল্লেখ করে, যা সে অবাধ্যতায় ব্যয় করত।

(৫) মৃতকে শাস্তি দেয়ার মানে হল যখন তার পরিবার-পরিজন চেচিয়ে চেঁচিয়ে হা-হুতাশ ও অবদানের কথা উল্লেখপূর্বক বিলাপ করতে থাকে, তখন ফেরেশতাগণ তাকে ধমক দেয় ও হেয় করে এবং বলে, তুই নাকি এমন ছিলি!

(৬) শাস্তিদানের অর্থ, পরিবারের মাতমের কারণে মৃতের কষ্ট পৌছা। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ[২], তাবারী এবং কাজী ইয়াজ (রহ.) এ ব্যাখ্য অবলম্বন করেছেন।

(৭) আল্লামা ইরাকী এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাচ্চাদের ক্রন্দনের আওয়াজে যেমনিভাবে আমাদের কষ্ট অনুভূত হয়, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের এভাবে ক্রন্দনের কারণে কষ্ট অনুভব করে।

(৮) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে, যেরূপভাবে অন্যের কাজের কারণে মানুষকে দুনিয়ায় শাস্তি দেয়া বৈধ, যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ, ঐ ফেতনা থেকে নিরাপদ থাক, জালেমরাই কেবল যার কবলে পড়বে না (বরং অপরাধী-নিরপরাধী সবাইকে সমভাবে গ্রাস করবে)-তদ্রূপ অন্যের কাজের কারণে শাস্তি প্রদান এর বরযখী জগতেও বৈধ। বাকী থাকল আল্লাহ্র উক্তি- وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ অর্থাৎ, কেউ অপরের বোঝা (পাপের শাস্তি) বহন করবে না। এর সমাধান হলো, এটা কার্যকর হবে কেয়ামতের দিন।

টীকা : ১. ইমাম নববী (রহ.), জন্ম : ৬৩১ হিঃ, মৃত্যু : ৬৭৬ হিঃ
২. ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.), জন্ম : ৬৬১ হিঃ, মৃত্যু : ৭২৮ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

(৯) আল্লামা কিরমানী বলেন, কাউকে বিনা কারণে শাস্তি দান অথবা অন্যের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান সব কিছুর পূর্ণ অধিকার সংরক্ষণ করেন আল্লাহ্ পাক। কারণ তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। (ফাতহুল মুলহিম ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪, লামিউদ্ দারারী)

قَوْلُهُ يَقُولُ حِينَ تَبَوَّؤُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ (তিনি বলেন ঃ যখন তারা জাহান্নামে নিজেদের সীট রিজার্ভ করে নিয়েছে) ঃ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এ উক্তিকারক হযরত উরওয়া। তিনি এ উক্তির মাধ্যমে হযরত আয়েশার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمَوْتَى আয়াতাংশে যে শ্রবণকে নাকচ করা হয়েছে–তা কাফেরদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার অবস্থায় কেবল প্রযোজ্য। অর্থাৎ, তাদের অশ্রবণটা শুধু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের সীট জাহান্নামে বুক হয়ে গেছে। এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে হযরত আয়েশা (রযি.)-এর মৃতের শ্রবণ না মানা আর হযরত ইবনে উমরের (রযি.) মানার মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকবে না। তবে আগত বর্ণনা প্রমাণ করে যে, হযরত আয়েশা (রযি.) সর্বাবস্থায় মৃতের শ্রবণকে অস্বীকার করেন। কেননা তিনি বলেন, 'হাদীসের শব্দ মূলতঃ إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ (তারা নিশ্চিত জানে)। আর أَنَّهُمْ لَيَسْمَعُوْنَ (তারা শোনে) বলা–এটা ইবনে উমরের ভুল মাত্র'।

লামিউদ্ দারীরী গ্রন্থকার বলেন, আলোচ্য উক্তিটি أَنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ এরই ব্যাখ্যা। يَقُوْلُ-এর فَاعِل হলেন রসূল (স.)। আর تَبَوَّؤُا الْمَقَاعِدَ مِنَ النَّارِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যখন কাফেররা বদরের কূপে বরযখী আজাবে গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। অর্থাৎ, বদর কূপে যখন তাদের বরযখী শাস্তি হচ্ছে, তখন তারা এমনিই বিশ্বাস করবে যে, আমি দুনিয়াতে যা তাদের বলতাম, সেটাই সঠিক ছিল।

بَابُ فَضْلِ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا

বদর রণাঙ্গনে শাহাদাত বরণকারীর মর্যাদা

قَوْلُهُ أُصِيبَ حَارِثَةُ (হারেছা (রযি.) শহীদ হলেন) ঃ মূল নাম হারেছা বিন সুরাকা আল আনসারী (রযি.)। বদর যুদ্ধে আনসারদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই শহীদ হন। তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। যুদ্ধের দৃশ্য দেখার জন্য বদরে যান, জিহাদের জন্য নয়। তিনি কূপ থেকে পানি পান করছিলেন ইত্যবসরে হাব্বানুল আরাফা তার লক্ষ্যে তীর ছুঁড়লে তিনি শহীদ হন।

قَوْلُهُ فَجَاءَتْ أُمُّهُ (তাঁর মাতা এলেন) ঃ তার মায়ের নাম রবী' 'বিনতে নছর (রযি.)। তিনি (রবী') হযরত আনাসের (রযি.) ফুফু ছিলেন।

قَوْلُهُ أَوَهَبِلْتِ (তোমার বিবেক লোপ পেয়েছে কি?) ঃ শব্দটি মা'রূফ (هَبِلْتِ) ও মাজহুল (هُبِلْتِ) উভয় হতে পারে। অর্থ হলো, কি তুমি বিবেক হারিয়ে ফেলেছ, যার দরুন জান্নাতে না অন্যত্র হওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করছ! উচিত তো ছিল এ বিশ্বাস রাখা যে, নিশ্চিত সে জান্নাতে। একান্ত জিজ্ঞাসার থাকলে এটাই ছিল যে, "সে কোন্ জান্নাতে?"

www.e-ilm.weebly.com

قِصَّةُ حَاطِبِ بْنِ أَبِى بَلْتَعَةَ

হাতেব বিন আবী বালতাআর ঘটনা

হযরত হাতেব (রযি.) ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন। পরে মক্কায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তিনি মুসলমান হয়ে মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু পরিবার-পরিজন মক্কাতেই রেখে যান। যে সময়ে কুরাইশ কাফেররা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে এবং রসূল (স.) মক্কা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন, সে সময়ে (ঘটনাক্রমে) সারা নাম্নী এক নর্তকী মদীনায় আসে। রসূল (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি হিজরত করে এসেছ? জবাবে সে বলল,'না'। আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মুসলমান হয়ে এসেছ? সে বলল, 'না'। রসূল (স.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কোন উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বলল, মক্কার নামী-দামী বংশের লোকদের মাধ্যমে আমার দিন চলত। বদর যুদ্ধে মক্কার প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ নিহত হয়েছে। আপনারা এখানে চলে এসেছেন, ফলে বর্তমানে আমার দিন চালানো মুশকিল হয়ে পড়েছে। আমি বড় সমস্যার সম্মুখীন ও বিপদে পড়ে আপনার থেকে সাহায্যের আশায় এখানে এসেছি। রসূল (স.) বললেন, তুমি তো মক্কার পেশাদার নর্তকী। মক্কার সে যুবকরা আজ কোথায়, যারা তোমার উপর টাকা-পয়সার বৃষ্টি বর্ষণ করত? সে বলল, বদর ঘটনার পর তাদের সঙ্গীতানুষ্ঠান ও আনন্দ-জৌলুস খতম হয়ে গেছে। সেই থেকে আমি বেকার। কেউ আমাকে আর আহ্বান করে না। রসূল (স.) বনী আব্দুল মুত্তালিবকে উৎসাহিত করলেন তাকে সহায়তা করতে। তাঁরা তাকে টাকা-পয়সা ও পোশাক দিয়ে বিদায় দিল। এ সারার মাধ্যমেই হযরত হাতেব (রযি.) মক্কার নেতৃবৃন্দের নামে পত্র প্রেরণ করেন।

(মা'আরিফুল কুরআন[১])

بَعَثَنِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَامَرْثَدٍ وَالزُّبَيْرَ

(নবীজী যুবাইর, আবু মারছাদ ও আমাকে প্রেরণ করেন) ঃ জিহাদ পর্বের সি,আই, ডি, অধ্যায়ে এসেছে যে, রসূল (স.) হযরত আলী, হযরত মেকদাদ ও যুবাইরকে (রযি.) প্রেরণ করেছিলেন। তথাপি দু'বর্ণনার মাঝে কোনো বিরোধ নেই। কারণ-(১) হতে পারে রসূল (স.) এ চারজনকে প্রেরণ করেন। রাবীগণ কারো নাম উল্লেখ করেছেন, কারো নাম উল্লেখ করেননি। (২) অথবা রসূল (স.) তাঁদেরকে দু'দফায় প্রেরণ করেছিলেন। প্রথমে মেকদাদ ও যুবাইর (রযি.)-কে পাঠান। তাঁরা গিয়ে মহিলার মাথার খোঁপায় রাখা পত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। যেহেতু তার কাছে আরও একটি পত্র থেকে যায়, তাই রসূল (স.) দ্বিতীয়বার হযরত যুবাইর, হযরত আবু মারছাদ ও হযরত আলী (রযি.)-কে প্রেরণ করেন। তাঁরা মহিলার কোমরে লুকায়িত পত্র উদ্ধার করে নিয়ে আসেন । এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত যুবাইর (রযি.) দুইবার প্রেরীত হন এবং উভয় পত্র উদ্ধারে তিনি শরীক ছিলেন।

টীকা ঃ ১. মাআরিফুল কুরআন ঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রণীত। জন্ম ঃ ১৩১৩ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১৩৯৬ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

فَاخْرَجَتْهُ (সে পত্র বের করে দিল) ঃ এ বাক্য প্রমাণ করে যে, মহিলাটি পত্র তার কোমর থেকে বের করে। পক্ষান্তরে জিহাদ পর্বের বর্ণনা হতে জানা যায়, মাথার খোঁপা থেকে সে বের করে। এ জটিলতার সমাধান হলো—(১) حجزة দ্বারা উদ্দেশ্য জোড়া বা গিরা। চাই তা কোমর হোক বা কোমর ছাড়া অন্য কোন জোড়া। (২) হতে পারে সে পত্রটি প্রথমে কোমর থেকে (অলক্ষ্যে) বের করে খোঁপায় লুকিয়ে রাখে। পরে যখন নিরুপায় হয়ে পড়ে তখন খোঁপা থেকে বের করে দেয়। (৩) এবং এটাও হতে পারে যে, একই বিষয় সম্বলিত দু'টি পত্র তার কাছে ছিল। আর তা রেখেছিল দু'স্থানে। দু'টি পত্র প্রেরণের কারণ হলো, কোন কারণবশতঃ যদি একটি পত্র হারিয়ে যায় তবে দ্বিতীয়টি বাকী থাকবে এবং তা দ্বারাই কার্য উদ্ধার হবে।

قَدْ خَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ (সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আমানত রক্ষা করেনি) ঃ রসূল (স.) হযরত হাতেবের (রযি.) যুক্তি সমর্থন করেছেন এবং তার ব্যাপারে ভাল মন্তব্য করতে নির্দেশ দিয়েছেন–তথাপি قَدْخَانَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ বলা হযরত উমরের পক্ষে কিভাবে শোভা পেল? উত্তর হলো—(১) হযরত উমর (রযি.) তাঁর স্বভাবগত দ্বীনি টান এবং মুনাফিকদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতাভাব পোষণের প্রেক্ষিতে এ কথা বলেন। তিনি হাতিবের এ কাজকে কতলযোগ্য ধারণা করেন। তবে নিশ্চিত ছিলেন না। তাই রসূল (স.)-এর কাছে কতলের অনুমতি চান। আর তাকে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেয়ার কারণ হলো, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত ছিল।

রসূল (স.) হাতেবকে দায়েরকৃত মামলা থেকে বেকসুর খালাস দেন। কারণ তিনি যা করেন, তাতে ইসলামের ক্ষতি হবে না ভেবেই তিনি কাজটি করেন। আর তার দ্বিমুখিতা স্রেফ কার্যগত ছিল, বিশ্বাসের সাথে যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। (কস্তলানী)

(২) আল্লামা সিন্ধী[১] (রহ.) বলেন, সম্ভবত তখন হযরত উমরের উপর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, রসূল (স.)-এর কথা তিনি শুনতে পাননি বা ভালভাবে খেয়াল করেননি। কেননা ভাবাবেগে থাকাবস্থায় অনেক সময় মানুষ নিকটের কথা যেমন শুনতে পারে না, তেমনি তা সে নিজেও জানে না। (৩) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হযরত উমর (রযি.) রসূল (স.)-এর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এটা বুঝেন যে, রসূল (স.) কেবল হযরত হাতেবের মনোরঞ্জনের জন্য একথা বলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে হযরত উমরের অভিমত ছিল, মনোরঞ্জনের পরিবর্তে তিনি (হযরত হাতিব) শিক্ষা পাবারই বেশি উপযুক্ত। তাই তিনি যা বলার তা বলেছেন। (লামিউদ্ দারারী)

قَوْلُهُ وَلَاتَقُوْلُوا اِلَّاخَيْرًا (তোমরা পারলে উত্তম মন্তব্য করো) ঃ অর্থাৎ, তাকে কাফের বা মুনাফিক বলো না। আর হয়ত উমর (রযি.) তাঁকে যে মুনাফিক বলেছিলেন, সেটা তার মুনাফিকসুলভ কাজের কারণে মাত্র।

টীকা ঃ ১. আল্লামা সিন্ধী (রহ.)। পূর্ণনাম ঃ আবুল হাসান আল কাবীর ইবনু আবেদ সিন্ধী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১৩৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

اِعْمَلُوامَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার; আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি) ঃ বাহ্যিক ভাষ্যমতে প্রকাশ, বদরী সাহাবীদের জন্য সকল কাজ বৈধ। যদিও তা হারাম ও গুনাহের কাজ হোক। অথচ এটা সম্পূর্ণ ইসলামী নীতির খেলাফ। এ প্রশ্নের সমাধান নিম্নরূপ—

(১) আয়াতোক্ত নির্দেশটা (اَمْر) জরুরী কিংবা অনুমতি পর্যায়ের নয়। মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশক মাত্র। মর্মার্থ হলো, বদরোত্তর এ সকল সাহাবা হতে যদি কোনো অনুচিত কাজ প্রকাশ পায়, তবে তা মার্জনীয় হবে। অতীতের মত ভবিষ্যৎ অপরাধের বিচার হবে না। এ বিপুল সম্মান ও মর্যাদা তাদের বদরী হওয়ার লাভ বা পুরস্কার স্বরূপ।

(২) কেউ কেউ এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, যদি তাঁদের থেকে কোনো ক্রটি হয়ে যায় তবে তাঁদের তওবার সুযোগ হবে (অর্থাৎ, তারা তওবা করবেই)। (লামআত[১])

(৩) প্রশ্ন হয় যে, হযরত কুদামা বিন মাজউন (রযি.) [হযরত উমরের শ্যালক ও ইবনে উমরের মামা] বদরী সাহাবী ছিলেন। হযরত উমরের শাসনামলে শরাব পানের অভিযোগে তিনি শাস্তির সম্মুখীন হন। যার দরুন তিনি মদীনা ছেড়ে চলে যান। ঘটনাক্রমে একবার হযরত উমর (রযি.) ও হযরত কুদামা (রযি.) উভয়ে হজব্রত পালনে যান। তথায় উমর (রযি.) স্বপ্নে দেখেন যে, কেউ তাঁকে বলছে। কুদামার সাথে বিরোধ মিটিয়ে ফেল। এ প্রশ্নের জওয়াব হলো, বদরী সাহাবাদের উল্লিখিত পুরস্কার দুনিয়াতে প্রযোজ্য নয়; বরং তা আখেরাতে কার্যকর হবে। অতএব শরয়ী বিধানের প্রয়োগটা উক্ত পুরস্কার প্রাপ্তির বিরোধ নয়।

(৪) কেউ কেউ বলেছেন, এটা অতীতের ব্যাপারে প্রযোজ্য। অর্থাৎ, অতীতের যে সমস্ত অন্যায় কাজ তাঁদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে তা সবই মার্জনীয়। কারণ যদি ভবিষ্যৎ কার্যাবলী উদ্দেশ্য হতো, তবে অতীতকালীন বাচক (فِعْلِ مَاضِي) শব্দ ব্যবহৃত হতো না। (فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ)-এর স্থলে سَاغْفِرُ لَكُمْ বলা হতো। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ এটা যদি অতীতের জন্য হয়, তবে হাতিবের ঘটনায় এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ হাতিবের ব্যাপারে হযরত উমর (রযি.) যে মন্তব্য করেন, রসূল (স.) এ উক্তি দ্বারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আর হযরত হাতেবের এ ঘটনা বদর যুদ্ধের ছয় বছর পর সংঘটিত হয়। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, اِعْمَلُوا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ এর দ্বারা ভবিষ্যৎই উদ্দেশ্য। আর অতীতকালীন শব্দ (قَدْ غَفَرْتُ) ব্যবহারের রহস্য হলো, ক্ষমার নিশ্চয়তা বর্ণনা করা।

টীকা ঃ ১. লামআতুত তানকীহ ঃ শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) প্রণীত। তিনি ৯৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং ১০৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এ হাদীস এখানে উল্লেখ করার দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো। فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ এবং فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ الْجَنَّةُ لَقَدْ اِطَّلَعَ اللّٰهُ عَلٰى أَهْلِ بَدْرٍ অর্থাৎ, জান্নাত তোমাদের অনিবার্য। বদরীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত-এ তথ্য জানানো তথা বদরী সাহাবীদের মর্যাদা-মর্তবা প্রমাণ করা। কেননা এ ধরনের বিরাট সুসংবাদ বদরী সাহাবীগণ ছাড়া আর কেউ লাভ করে নি। (ফাতহুল বারী, কস্তলানী, লামিউদ্ দারারী, বুখারীর পার্শ্বটিকা)

فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ (উমরের চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্রবাহিত করল) ঃ হযরত উমরের (রযি.) চক্ষু থেকে অশ্রু নির্গমন হয়ত হযরত উমরসহ সকল বদরী সাহাবীর বিরাট সুসংবাদ লাভের আনন্দের কারণে ছিল। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তিনি হযরত হাতিবের প্রতি নিফাকের (কপটতা) যে অপবাদ দেন তার জন্য দুঃখিত হওয়ায় এ অশ্রু বের হয়। কেননা রসূল (স.)-এর ইরশাদ শুনে তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি হযরত হাতিবের প্রতি যে অপবাদ আরোপ করেছেন হাতিবের মর্যাদা তার থেকে বহুগুণ উর্ধ্বে। (লামিউদ দারারী)

قَوْلُهُ إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ ঃ অর্থাৎ, দুশমন কাছে এলে তীর মার, আর সংরক্ষিত স্থানে থাকলে তীর মেরো না; বরং তীর রেখে দাও, যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগানো যায়। রসূল (স.)-এর এ নির্দেশের তাৎপর্য হলো, তীর নিক্ষেপের উদ্দেশ্য শত্রু ঘায়েল করা। আর তা অর্জিত হয় নিকট থেকে তীর বর্ষণের দ্বারা। রক্ষিত স্থান এর বিপরীত। কেননা, তখন অধিকাংশ তীর লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে না বা পৌঁছলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

إِذَا الْخَيْرُ مَاجَاءَ اللّٰهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ (আর কল্যাণ দ্বারা উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ্ উহুদ যুদ্ধের পর ঘটান) ঃ টীকাকার বলেন, এ হাদীস "بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ" (নবুওয়াতের নিদর্শন অধ্যায়)-এ বর্ণিত একটি হাদীসের শেষাংশ বিশেষ। পূর্ণ হাদীসটি হলো—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاى فِى الْمَنَامِ بَقَرًا تُنْحَرُ وَخَيْرًا فَعَبَّرَ نَحرَالْبَقَرِ بِاِصَابَةِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُوْن يَوم أُحُدٍ يَعْنِى حَيْثُ أُصِيْبُوْا فِيْهِ ـ وَالْخَيْرَ بِأَنَّهُ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِى جَاءَ اللّٰهُ بِه بَعْدَ ذٰلِكَ ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) স্বপ্নে একটি বকরী কুরবানী করতে (কল্যাণ) দেখেন। তিনি বকরী কুরবানীর ব্যাখ্যা করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপদ কবলিত হবে। রাবী বলেন, সত্যই উহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিপদের সম্মুখীন হয়। আর কল্যাণের ব্যাখ্যায় রসূল (স.) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য তৎপরবর্তী বিজয়সমূহ ও বহুবিধ উন্নতি-অগ্রগতি।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে ঃ اَىْ بَعْدَ يَوْمِ بَدْرٍ অর্থাৎ, دال বর্ণে যবর যোগে। আর বদর দ্বারা উদ্দেশ্য 'বদরে কুবরা'। এ বিশ্লেষণানুযায়ী خَيْرًا তথা

www.e-ilm.weebly.com

কল্যাণ বলতে উদ্দেশ্য হবে ঐ পুরস্কার ও নেয়ামত (গনিমত), যা আল্লাহ্ বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের দান করেছিলেন। এ ব্যাখ্যামতে হাদীস আর শিরোনামের মধ্যকার সমতা সুস্পষ্ট। কেননা বদর যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিপুল কল্যাণ ও গনিমত অর্জিত হয়।

بَعْدُ শব্দটি পেশ বিশিষ্টও হতে পারে। তখন তা مُضَاف (সম্বন্ধ) হবে না। بَعْد মানে بَعْدَ هٰذِهِ الْقِصَّةِ এ সময় বদর দ্বারা বদরে সুগরা (হামরাউল আসাদ) উদ্দেশ্য হবে, যা উহুদ যুদ্ধের পর সংঘটিত হয়। এ ব্যাখ্যানুপাতে শিরোনামের সাথে হাদীসের কোনই সম্পর্ক হবে না।

কেউ কেউ বলেন, (উহুদ যুদ্ধে) শহীদদেরকে আল্লাহ্ যে নেয়ামত (শাহাদাত) দানে ধন্য করেছেন, সেটাই خَيْر তথা কল্যাণ।

কিতাবে এটাও এসেছে যে, বদরে সানী অর্থাৎ, হামরাউল আসাদের পর আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের যেভাবে দৃঢ় ও অবিচল রাখেন, ঐ মুহূর্তে সেটাই ছিল বড় কল্যাণ। কেননা কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ এবং তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করলে তা মুসলমানদের ঈমান বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

لَمْ اٰمَنْ بِمَكَانِهِمَا (তাদের দিক থেকে আমি নিরাপদ হলাম না) ঃ আল্লামা কস্তলানী (রহ.) বলেন, أَيْ بِجِهَةِ مَكَانِهِمَا অর্থাৎ, তাদের স্থানের দিক দিয়ে। এর দ্বারা তিনি তাদের দু'জনের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ, তাদের দু'জনের উপস্থিতির কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ বোধ করলাম না। আর তা এ কারণে যে, হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রযি.) এ দু'যুবককে চিনতেন না। যেহেতু তারা শত্রুও হতে পারে, তাই তিনি তাদের প্রতি আস্থা রাখতে পারেন নি। ফতহুল বারী গ্রন্থে এসেছে যে, মাগাযী ইবনে আয়েদের বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে– فَاشْفَقْتُ أَنْ يُؤْتِيَ النَّاسُ مِنْ نَاحِيَتِي لِكَوْنِي بَيْنَ غُلَامَيْنِ حَدِيثَيْنِ অর্থাৎ, আমি দু' অল্প বয়স্ক বালকের মধ্যখানে থাকায় আমার দু'পার্শ্ব হতে শত্রু এসে পড়ার আশঙ্কা করছিলাম। এ থেকে অনুমিত হয় যে, হযরত আব্দুর রহমান তাদের পার্শ্ব হতে শত্রু কবলিত হওয়ার তীব্র আশঙ্কা করছিলেন। কারণ তারা অল্প বয়স্ক ছিল। তবে প্রথম অভিমতটিই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য।

فَمَا سَرَّنِيْ أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا (তাদের পরিবর্তে অন্য দু'ব্যক্তির মাঝে অবস্থান আমাকে সন্তুষ্ট করত না) ঃ এখানে "مَا" শব্দটি নেতিবাচকের জন্য।

بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَيْنًا (নবীজী দশজন গোয়েন্দা প্রেরণ করেন) ঃ এখানে عَيْنًا শব্দটি عَشَرَةً-এর বদল হওয়ায় জবর বিশিষ্ট হয়েছে। অর্থ সি. আই. ডি তথা গোয়েন্দা।

فَاعْطُوا أَيْدِيَكُمْ ঃ অর্থাৎ, তোমরা অনুগত হয়ে যাও এবং নিজেদেরকে আমাদের হাওলা করে দাও তথা আত্মসমর্পণ কর।

www.e-ilm.weebly.com

فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ : অর্থাৎ, কাফেররা মুসলমানদের প্রতি তীর বর্ষণ করল।

فَقَتَلُوا عَاصِمًا (তারা হযরত আছেমকে শহীদ করল) : কাফেররা দশ নিরপরাধ ব্যক্তির মধ্যে যে ৭ জনকে শহীদ করে হযরত আছেম (রযি.) ছিলেন তাদের একজন। (কস্তলানী)

اَطْلَقُوا الْاَوْتَارَ : তারা কামানের তার খুলল।

فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ : অর্থাৎ, তারা আব্দুল্লাহ বিন তারেককে চরমভাবে টানা-হেঁচড়া করতে লাগল এবং নির্দয়ভাবে প্রহার করল, যাতে সে তাদের সাথে মক্কায় যায়।

فَابْتَاعَ بَنُو الْحَارِثِ (হারেসের সন্তানেরা ক্রয় করল) : হারেসের সন্তানের, যারা হযরত খুবাইবকে (রযি.) ক্রয় করেছিল তাদের নাম : (১) উকবা (২) আবু সারুয়া (৩) ও তার বৈপিত্রীয় ভাই হুযাইর বিন আবী উহায়ের। (কস্তলানী)

সফওয়ান বিন উমাইয়া কেবল তার পিতার হত্যার বদলায় হত্যা করতে ৫০ উট দ্বারা হযরত যায়েদ বিন দাছিনা (রযি.)-কে ক্রয় করে। (কস্তলানী)

قَوْلُهُ وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ (খুবাইব বদর যুদ্ধে হারিছ বিন আমেরকে কতল করে) : হাফেজ দিময়াতী বলেন, ইনি হলেন খুবাইব বিন আদী। যিনি বদরেও শরীক ছিলেন না। আবার হারেস বিন আমেরকেও হত্যা করেন নি। হারেসকে যিনি হত্যা করেন তার নাম খুবাইব বিন আসাফ।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, ইবনে আব্দুল বার (রহ.) ইস্তেআব আর ইবনুল আছীর[১] উসদুল গাবাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, খুবাইব বিন আদী (রযি.) বদরে উপস্থিত ছিলেন। ইস্তেআব গ্রন্থে এ বিবরণও এসেছে যে, উকবা বিন হারেস খুবাইব বিন আদীকে ক্রয় করে। আর তিনি (খুবাইব) উকবার পিতাকে হত্যা করেন। খুবাইব বিন আসাফও বদরে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই উমাইয়া বিন খলফকে হত্যা করেন।

قَوْلُهُ فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا (খুবাইব তাদের কাছে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করেন) : কারণ তারা হত্যা নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিতের অপেক্ষায় ছিল।

يَسْتَحِدُّ بِهَا : অর্থাৎ, তিনি ক্ষুর দ্বারা নাভীর নিম্নকেশ পরিষ্কার করবেন। যেন নিহতের পর তা প্রকাশ না পায়। (কস্তলানী)

قَوْلُهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ : অর্থাৎ, হারিসের কন্যা তার সন্তানকে খুবাইবের রানের উপর বসা দেখতে পেল।

فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ : (বর্তমান) মসজিদে তানয়ীমের স্থানে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করেন। (কস্তলানী)

টীকা : ১. ইবনুল আছীর (রহ.), জন্ম : ৫৫৫ হিঃ, মৃত্যু : ৬৩০ হিঃ।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ (তিনি তাদের এক বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করেন) ঃ বদর যুদ্ধে হযরত আছেম (রযি.) মুশরিকদের যে বিশিষ্ট নেতাকে হত্যা করেছিলেন, তার নাম উকবা ইবনে আবী মুয়ীত। রসূল (স.)-এর নির্দেশক্রমে তাকে বন্দী অবস্থায় তীর বর্ষণে হত্যা করা হয়।

قَوْلُهُ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ (মৌমাছি তাকে তাদের দলের হাত থেকে রক্ষা করে) ঃ হযরত আছেম (রযি.) শপথ করেছিলেন যে, তিনি কোন মুশরিক স্পর্শ করবেন না এবং কোন মুশরিকও তাকে স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ পন্থায় তার এ শপথ পূরণের ব্যবস্থা হয়।

জ্ঞাতব্য-১ ঃ এ হাদীস প্রকৃতপক্ষে 'জাতুর রিকা' যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট। ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীসটিকে এখানে কেবল قَوْلُهُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيمًا مِنْ عُظَمَائِهِمْ এর কারণে উল্লেখ করেছেন। কেননা এটা বদরে সংঘটিত হয়েছিল। অন্য বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

জ্ঞাতব্য-২ ঃ আল্লামা আইনী বলেন, বায়হাকী (রহ.) তাঁর 'দালায়েল' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, হযরত খুবাইব (রযি.) যখন আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ করছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি আপনার রাসূলের (স.) কাছে সালাম প্রেরণ করতে চাই, কিন্তু আমার কোন দূত নেই তা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছানোর। তখন হযরত জিব্রাইল (আ.) রসূল (স.)-এর কাছে আসেন এবং খুবাইবের (রযি.) সালাম পৌঁছে দেন।

জ্ঞাতব্য-৩ ঃ হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) তার 'লাতায়েফে' উল্লেখ করেন যে, রসূল (স.) ঘোষণা দিয়েছিলেন, খুবাইবের লাশ শূল থেকে যে নামাতে পারবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। হযরত যুবাইর (রযি.) এ কথা শুনে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি আর মেকদাদ প্রস্তুত। হযরত যুবাইর বলেন, যখন আমরা হযরত খুবাইবকে শূল থেকে নামাতে গেলাম, তখন সেখানে তার চারপাশে চল্লিশজন সশস্ত্র প্রহরী ছিল। যখন তার বডি নামালাম, তা সদ্য মৃতের ন্যায় মনে হচ্ছিল। চল্লিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ছিল না। শরীর থেকে রক্তের ধারা বেয়ে যায়; যা থেকে মেশকের ন্যায় সুগন্ধি ছড়ায়। হযরত যুবাইর (রযি.) তাকে ঘোড়ায় উঠিয়ে নেন। ইত্যবসরে কাফেররা টের পেয়ে পিছু নিলে তিনি মৃতদেহ জমিনে নামান। অতঃপর জমিন তাকে আপন বক্ষে নিয়ে নেয়। বস্তুত এ কারণেই তাঁকে "بَلِيعُ الْأَرْضِ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

قَوْلُهُ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ذَكَرُوا الخ (কা'ব বিন মালেক বলেন, তারা উল্লেখ করেছে) ঃ এটা ইমাম বুখারী কর্তৃক তাবুক যুদ্ধ অধ্যায়ে উল্লিখিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। এর পূর্বের বর্ণনার সাথে খুবাইবের কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু হাফেজ দিময়াতী প্রমুখ হযরত মুরারা বিন রবী ও হেলাল বিন উমাইয়্যাকে বদরী সাহাবী স্বীকার করেন না, তাই ইমাম বুখারী কাব বিন মালেকের এ উক্তি উল্লেখপূর্বক দিময়াতী প্রমুখের পূর্বোক্ত উক্তি খণ্ডন করেছেন। সাথে সাথে 'বদরে

www.e-ilm.weebly.com

শহীদদের মর্যাদা' অধ্যায়ে এ উক্তিটি উল্লেখের ফলে হযরত কাবের (রযি.) ভাষ্যের দ্বারা তাঁদের এ মর্যাদারও বহিঃপ্রকাশ হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে সৎ এবং বদরী সাহাবী ছিলেন। (ফাতহুল বারী, আইনী, লামিউদ্ দারারী)

قَوْلُهُ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ঃ হযরত সাঈদ বিন যায়েদ এক প্রবীণ মুসলমান এবং মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবী ছিলেন। জান্নাতের দশ সুসংবাদ প্রাপ্তদের মধ্যে তিনিও একজন। হযরত উমরের ভগ্নিপতি ও চাচাত ভাই ছিলেন। তাঁর স্ত্রী (উমরের বোন) হযরত ফাতিমাই হযরত উমরকে ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেন। সাঈদ (রযি.) বদর ব্যতীত সকল যুদ্ধে শরীক হন। যাদের দোয়া অনিবার্য মনে করা হতো, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম। মানুষেরা তাঁর বদ দোয়াকে ভয় করত। তার পিতা যায়েদ বিন আমর বিন নুফাইল নবুওয়াতের পূর্বেও সঠিক দ্বীনে ইব্রাহীমের উপর অটল-অবিচল ছিলেন। প্রতিমা পূজাসহ সকল প্রকার শিরক হতে দূরে থাকতেন। মানুষ তাকে 'নবী' ধারণা করত।

قَوْلُهُ وَكَانَ بَدْرِيًّا (তিনি বদরী ছিলেন) ঃ প্রকৃতপক্ষে হযরত সাঈদ (রযি.) বদর রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন না। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রসূল (স.) তাঁকে সি.আই.ডি তথা গুপ্তচরবৃত্তির জন্য মদীনার বাইরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তথাপি রসূল (স.) তাকে বদরী সাহাবীদের মধ্যে গণ্য এবং তার জন্য গনিমতের অংশেরও ঘোষণা দেন।

قَوْلُهُ اِقْتَرَبَتِ الْجُمُعَةُ (জুমআর সময় নিকটবর্তী ছিল) ঃ জুমআর দিন সফর করা প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের রায় বিভিন্ন। কতকের মতে, সূর্যোদয়ের পরে সফর করা জায়েয নেই। তবে জুমহুরের মতে পূর্ণ দুপুর হওয়ার পরে নাজায়েয। এর পূর্বে জায়েয। লামিউদদারারী গ্রন্থে আছে ঃ যদিও জমআর সময় নিকটবর্তী ছিল, কিন্তু মূল সময় হতে তখনও কিছুটা দেরী ছিল। এ সময় সফর শুরু করা জায়েয। অবশ্য না করাটাই অধিক ভাল। আর সময় হয়ে যাবার পর কোন প্রকারেই সফর করা জায়েয নেই। এটাই আমাদের মাজহাব।

হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) 'কাওকাব' গ্রন্থে বলেন, বিশুদ্ধ মতের আলোকে ঠিক দুপুরের পূর্বে সফর করা জায়েয। কিন্তু যখন সূর্য ঢলে যাবে তখন জায়েয নেই। কেননা জুমুআ ওয়াজিব হয় ওয়াক্তের কারণে, আর ওয়াক্ত হয় সূর্য ঢলে যাবার পর থেকে।

মুন্য়া[১] গ্রন্থে আছে, দুপুর হওয়ার পর জুমুআর নামাযের পূর্বে সফর করা মাকরূহ। দুপুরের পূর্বে মাকরূহ নয়। ইবনে আবিদীন[২] (শামী প্রণেতা) বলেন, যদি কেউ নামায আদায়ের ফলে সঙ্গীচ্যুত হবার আশংকা করে এবং পরবর্তীতে একাকী সফর করতে সক্ষম না হয়, তবে এমন ব্যক্তিকে এ আইনের বাইরে রাখা বাঞ্ছনীয়।

টীকা ঃ মুনয়াতুল মুসাল্লী ঃ আল্লামা সাদীদুদ্দীন কাশগরী (রহ.) প্রণীত। তিনি ৭০৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

২. ইবনে আবিদীন। পূর্ণ নাম ঃ মুহাম্মাদ আমীন আশ্শামী (রহ.)। মৃত্যু ঃ ১২৫২ হিঃ। রদ্দুল মুহতার বা ফতোয়ায়ে শামী নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি তাঁরই অনবদ্য রচনা।

www.e-ilm.weebly.com

মুওয়াফফাক বলেন, مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ لَا يَجُوْزُ لَهُ السَّفَرُ بَعْدَ دُخُوْلِ وَقْتِهَا অর্থাৎ, জুমআ ওয়াজিব–এমন ব্যক্তির পক্ষে সময় হয়ে যাবার পর সফর করা জায়েয নেই। ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাকের (রহ.) অভিমত এটাই। ইমাম মালেক (রহ.) এর মাজহাব সম্পর্কে তাফরী' প্রণেতা বলেন, لَايُسَافِرُ بَعْدَ الزَّوَالِ وَلَا بَأْس أَنْ يُسَافِر قَبْلَه অর্থাৎ, দুপুরের পরে সফর করবে না, তবে তৎপূর্বে সফর করায় কোন ক্ষতি নেই।

দুপুরের (زوال) পূর্বে অর্থাৎ, জুমুআর সময় হওয়ার পূর্বে সফর করার বিষয়ে উলামাদের থেকে তিন ধরনের উক্তি রয়েছে। ইবনে কাইউম প্রণীত যাদুল মা'আদ গ্রন্থের ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ

(১) সফর নিষিদ্ধ। এর প্রমাণ ইবনে উমরের হাদীস ঃ

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ سَفر مِنْ دَارِاقَامَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ لَا يَصْحَبُ فِىْ سَفرِه وَلَا يُعَانُ عَلٰى حَاجَتِه ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) বলেন, কেউ আপন বাসস্থান হতে জুমুআর দিন সফর করলে ফেরেশতারা তার প্রতি বদদোয়া করেন। তার সফরে কেউ সাথী হয় না এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় না।

(২) জায়েয। এর দলীল হযরত উমরের উক্তি ঃ اَلْجُمُعَةُ لَا تَحْبِسُ عَنْ سَفرٍ অর্থাৎ, জুমুআ সফরের প্রতিবন্ধক হয় না। জুমুআ যেহেতু মুসাফিরের উপর ওয়াজিব নয়, তাই তা নিষিদ্ধ না হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত।

(৩) মুজাহিদ প্রমুখের জন্য মুবাহ তথা সফরের অনুমতি রয়েছে। এ মত পোষণকারীদের দলীল রসূল (স.)-এর এক উক্তি, যা তিনি আব্দুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, যখন তিনি মুতা প্রান্তরে পৌঁছতে বিলম্ব করেন ঃ

مَا خَلَّفَكَ ؟ قَالَ : اَلْجُمُعَةُ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّم : لَرَوْحَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَوْ قَالَ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا قَالَ فَرَاحَ مُنْطَلِقًا ـ

অর্থাৎ, তোমার বিলম্বের হেতু কি? তিনি বললেন॥জুমুআ অর্থাৎ, আপনার পিছে জুমুআর নামায পড়ার বাসনা। তখন নবী করীম (স.) বললেন, এক বিকাল অথবা এক সকাল আল্লাহ্‌র রাস্তায় অবস্থান করা দুনিয়া ও দুনিয়ার সমুদয় বস্তু হতে উত্তম। রাবী বলেন, অতঃপর বিকালে আব্দুল্লাহ্ রওনা হয়ে যান। তবে বিশুদ্ধতম মতামত হলো, জুমুআর দিন দুপুরের পূর্বে সফর করা সর্বাবস্থায় জায়েয।

(লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা)

www.e-ilm.weebly.com

وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ (তিনি জুমুআর নামায পড়তে পারলেন না) ঃ হযরত ইবনে উমর (রযি.) এক ওজরহেতু জুমআর নামায পড়তে পারেন না। আর সে ওজর ছিল, তাঁর ফুফু হযরত সাঈদ (রযি.) ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন।

حِيْنَ وَضَعْتُ حَمْلِى (যখন আমার বাচ্চা প্রসব হল) ঃ আল্লামা খাত্তাবী বলেন, অধিকাংশ সাহাবা ও আইন বিশেষজ্ঞ (ফোকাহা) দের মতে বাচ্চা প্রসবের পর বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত যে কোন মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। যদিও প্রসবজনিত রক্তক্ষরণ চলতে থাকে। কেননা এ রক্ত বিবাহ বন্ধনের অন্তরায় নয়। তবে শর্ত হলো রক্ত চলাকালীন সময়ে স্বামী সহবাসে প্রবৃত্ত হবে না। কারণ এ অবস্থায় সংগম হারাম তথা নিষিদ্ধ। তাদের দলীল কুরআনের আয়াত— قَوْلُهُ تَعَالَى وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ অর্থাৎ, গর্ভবতী মহিলাদের (অপেক্ষার) সর্বোচ্চ সময়সীমা সন্তান প্রসব পর্যন্ত। তাঁরা কুরআনের অপর আয়াতঃ قَوْلُهُ تَعَالَى يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا অর্থাৎ, বিধবা মহিলা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কমপক্ষে চার মাস দশ (১৩০) দিন অপেক্ষা করবে–কে গর্ভবতী ছাড়া অন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করেন।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত আছে, এ ধরনের মহিলা অর্থাৎ, যে গর্ভবতী মহিলা তালাকপ্রাপ্তা অবস্থায় বিধবা হয় সে দু'ইদ্দতের মধ্যে যেটা বেশি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ সেটা পালন করবে। তবে হানাফী মতাবলম্বী ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত গর্ভপ্রসব। চাই সে মহিলা আযাদ হোক বা বাদী। তালাকের ইদ্দত পালনকারিনী হোক বা স্বামী মৃত্যুজনিত হোক। অথবা এ ছাড়া অন্য কোন ইদ্দতে হোক। মোটকথা সর্বাবস্থায় গর্ভবতী মহিলার ইদ্দত গর্ভপ্রসব। কেননা গর্ভপ্রসঙ্গ আয়াতটি পরবর্তীতে অবতারিত। আর তা রহিতও হয়নি।

بَابُ شُهُوْدِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

বদর রণাঙ্গনে ফেরেশতাদের উপস্থিতি

قَوْلُهُ مَا يَسُرُّنِىْ أَنِّىْ شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْعَقَبَةِ (আকাবার পরিবর্তে বদরে উপস্থিতি আমাকে খুশি করত না) ঃ এখানে "مَا" বর্ণটি নেতিবাচক এবং প্রশ্নবোধক উভয় হতে পারে। আর بِالْعَقَبَةِ-এর মধ্যে "بِ" বর্ণটি বদল বা পরিবর্তনের জন্য। অর্থাৎ, বাইয়াতে আকাবার পরিবর্তে যদি আমি বদর যুদ্ধে উপস্থিত হতাম, তবে তা আমাকে খুশি করত না। বদর যুদ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও হযরত রাফে (রযি.) উক্ত কথাটি সম্ভবত স্বীয় ইজতেহাদের ভিত্তিতে বলেছেন। কেননা বাইয়াতে আকাবার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের সাহায্য করা। আর তা রসূল (স.)-এর হিজরতেরও পটভূমিকা ছিল, যার দ্বারা ইসলামে গতি সঞ্চারিত হয়। যুদ্ধের শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হয়। হতে পারে এ সকল কারণে হযরত রাফে (রযি.) বাইয়াতে আকাবাকে বদর যুদ্ধ থেকে উত্তম মনে করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

عَنْ مُعَاذِبْنِ رِفَاعَةَ ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, লেখক মুয়াজ বিন রেফায়া থেকে এ হাদীস তিন সূত্রে নিয়ে এসেছেন। (১) জারীর বিন ইয়াহইয়া (২) হাম্মাদ আন ইয়াহইয়াহ (حَمَّادُعَنْ يَحْيٰ) ও (৩) যায়িদ বিন হারুন বিন ইয়াহইয়া। তবে প্রথম সূত্রটি ধারাবাহিক (مُتَّصِل) আর শেষোক্ত দু'টি বিচ্ছিন্ন (مُرسَل)।

قَوْلُهُ وَكَانَ رَافِعُ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ (রাফে' বাইয়াতকারীদের অন্তর্গত ছিলেন) ঃ হযরত রাফে' (রযি.) তিনিও বাইয়াতে শরীক ছিলেন। প্রথম বাইয়াতে ছয় জনের একজন, দ্বিতীয় বাইয়াতে ১২ জনের একজন এবং তৃতীয় বাইয়াতে ৭০ জনের একজন ছিলেন।

قَوْلُهُ وَعَنْ يَحْيٰ أَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ ঃ সারকথা হলো, ইয়াযিদ ইয়াহইয়াকে এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যেদিন মুয়াজ (রযি.) এ হাদীস বর্ণনা করেন, সেদিন আমি আপনার সাথে ছিলাম। ইয়াযিদ এটাও জানাল যে, হযরত মুয়াজ (রযি.) প্রশ্নকারীর নামটাও সেদিন উল্লেখ করেন। আর সম্ভবত প্রশ্নের ভাষ্য ছিল লেখকের বর্ণনারূপ ঃ مَاتَعُدُّوْنَ أَهْلَ بَدْرٍ فِيْكُمْ অর্থাৎ, আপনারা বদরীদেরকে কেমন অর্থাৎ, কোন স্তরের ছিল বলে বিবেচনা করেন?

قَوْلُهُ هٰذَا جِبْرِيْلُ اٰخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ (ইনি জিবরাঈল; নিজের ঘোড়ার মস্তক ধারণ করে আছেন) ঃ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন। জাগ্রত হয়ে ইরশাদ করলেন ঃ "সুসংবাদ শোন আবু বকর! জিবরাঈল এসে গেছে ! সে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে।" প্রশ্ন হতে পারে জিবরাঈল (আ.) তাঁর ডানার আঘাতেই কাফিরদের পর্যুস্ত, করতে সক্ষম, তথাপি নবীর (স.) সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল? উত্তর হলো, এ প্রক্রিয়ার রহস্য ছিল গোটা যুদ্ধ কর্মকাণ্ডটা রসূল (স.) ও সাহাবাদের কাজ হিসেবে প্রকাশ করা। যাতে তাঁরা সওয়াবের অধিকারী হন এবং তাঁদের উচ্চ মর্তবা অর্জিত হয়। সেখানে ফেরেশতারা কেবল সাধারণ সৈন্য হিসেবে সাহায্যকারী বিবেচিত হবেন।

জ্ঞাতব্য-১ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ বদর যুদ্ধে সাদা পাগড়ী, উহুদ যুদ্ধে লাল পাগড়ী আর হুনাইন যুদ্ধে সবুজ পাগড়ী পরিহিত ঠছিলেন। এটা ছিল তাদের বিশেষ নিদর্শন। (লামিউদ্দারারী)

জ্ঞাতব্য-২ ঃ বদর, উহুদ, হুনাইন ও আহযাব (খন্দক) যুদ্ধে ফেরেশতাদের অবতারণা ও আগমন হয়েছিল।

জ্ঞাতব্য-৩ ঃ ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত, বদর ছাড়া অপর কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যুদ্ধ করেননি। তবে কতিপয়ের মতে, বদর ছাড়া হুনাইন যুদ্ধেও তাঁরা যুদ্ধ করেছেন। আর বুখারীর বর্ণনায় সুপ্রমাণিত যে, উহুদ যুদ্ধেও ফেরেশতারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধ করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابٌ অধ্যায় (শিরোনামবিহীন)

قَوْلُهُ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ঃ قتادة শব্দের "ة" বর্ণে যবর, যের, পেশ তিনও اِعْرَاب হতে পারে। (১) পেশ ঃ উহ্য মুবতাদার খবর হিসেবে। (২) যবর ঃ اَعْنِى উহ্য فِعْل এর মাফউল (কর্মবাচ্য) হিসেবে। (৩) যের ঃ أَخِيْهِ শব্দ হতে বদল হিসেবে।

হযরত কাতাদা বিন নু'মান (রযি.) উচ্চ পর্যায়ের আকবী (আকাবার বাইয়াত লাভকারী) এবং বদরী সাহাবী। সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদর বা খন্দক বা উহুদ (এটাই বিশুদ্ধমত) যুদ্ধে তিনি আহত হন। তার চোখের মণি বেরিয়ে যায়। লোকেরা তা বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইল। কিন্তু তিনি তা হাতে করে রসূল (স.)-এর দরবারে আসেন। রসূল (স.) জিজ্ঞাসা করলেন, কাতাদা একি হল? জওয়াবে তিনি বললেন, যেমন আপনি দেখছেন! রসূল (স.) বললেন, সম্ভব হলে ধৈর্য ধর; বিনিময়ে জান্নাত পাবে। আর তুমি বললে তা স্বস্থানে স্থাপন করে দেব এবং আল্লাহ্র কাছে সুস্থতার জন্য দো'আ করব। যেন ভবিষ্যতে তুমি চোখের জ্যোতির হ্রাসভাব অনুভব না কর। হযরত কাদাতাহ বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল! জান্নাত বড় নেয়ামত এবং আল্লাহ্র বিরাট দান। তবে কথা হলো, আমি এক মেয়েকে গভীরভাবে ভালবাসি। আমার আশঙ্কা হয় যে, সে আমাকে কানা বলবে এবং ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করবে। তাই আমার অনুরোধ, আপনি আমার চক্ষুও ঠিক করে দেবেন, আবার আমার জন্য জান্নাতেরও দোআ করবেন। রসূল (স.) মণিটা নিজের হাতে নিয়ে তা নির্দিষ্ট স্থানে সফলভাবে বসিয়ে দেন। হযরত কাতাদা বলেন, এরপর থেকে আমার চোখে আর কোন রোগ হয়নি। ভাল চোখের মতই তা কাজ দেয়। আর রসূল (স.) আমার জন্য জান্নাতেরও দোআ করেন।

قَوْلُهُ لَمَّا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ (যা করতে নিষেধ করা হতো) ঃ কতিপয় আলেম তিনদিনের পর কুরবানীর গোশত খাওয়াকে হারাম বলেন। তারা প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন হযরত আলী (রযি.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীস ঃ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثٍ অর্থাৎ, রসূল (স.) আমাদের কুরবানীর গোশত তিনদিনের পর খেতে নিষেধ করেন। তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে, তিন দিনের পরেও খাওয়া জায়েয। তারা প্রমাণস্বরূপ পেশ করেন রসূল (স.)-এর হাদীস ঃ قَوْلُهُ كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَزَوَّدُوْا অর্থাৎ, খাও, জমা করে রাখ এবং পাথেয় বানাও। তারা নিষেধমূলক হাদীসকে মানসুখ (রহিত) হিসেবে অভিহিত করেন।

وَهُوَ مُدَجَّجٌ ঃ অর্থাৎ, সে বর্মে এমনভাবে আচ্ছাদিত ছিল যে, শরীরের কোন অংশ দেখা যাচ্ছিল না।

ذَاتُ الْكَرِشِ ঃ (১) স্থূলকায় পেটধারী অর্থাৎ, ভুঁড়িওয়ালা ঃ পরিবার-পরিজনের অভিভাবক (গৃহকর্তা)। (লামিউদ্‌দারারী)

www.e-ilm.weebly.com

وَقَدْ اِنْثَنٰى طَرَفَاهَا : সহজে বের করতে তার দু'পার্শ্ব মৃদু নাড়ানো হলো। কেননা সোজা বস্তু কোথাও আটকে গেলে টেনে বের করা সহজ হয় না (মৃদু নাড়ানো ব্যতিরেকে)। পেরেক, তারকাটা ইত্যাদিতে বিষয়টি চাক্ষুষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। (লামিউদ্‌দারারী)

اِنَّ اَبَا حُذَيْفَةَ : হযরত আবু হুজাইফার নাম, হিশাম বিন উতবা বিন রবীয়া। তিনি উভয় কেবলার দিকে নামায পড়েন। হাবশা, মদীনা সর্বত্র হিজরত করেন।

تَبَنّٰى سَالِمًا : ইনি সালেম বিন মা'কল বিন উবাইদ। তিনি হযরত হুজাইফার স্ত্রী সাবীনা বিনতে ইয়ার আল-আনসারিয়ার গোলাম ছিলেন। আজাদ করার পর হযরত আবু হুজাইফা (রযি.) তাকে পালকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

فَجَاءَتْ سَهْلَةُ (অতঃপর সাহলা এলেন) : ইনিও হযরত হুজাইফার স্ত্রী ছিলেন। তবে প্রভেদ হলো প্রথমজন ছিলেন আনসারী, আর ইনি ছিলেন কুরাইশী।

فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ : হাদীসটি বুখারীর 'বিবাহ্ পর্বে' উল্লিখিত আছে। অর্থ হলো, হযরত সাহলা নবীর (স.) কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! সালেম এখন বড় হয়েছে। পূর্বের ন্যায় সে এখনও আমার সামনে আসে। আমার আশঙ্কা হয় এতে আবু হুজাইফার অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। রসূল (স.) বললেন, তাকে দুধ খাইয়ে দাও। তাহলে তুমি তার মাহরাম হয়ে যাবে এবং আবু হুজাইফারও সন্দেহ থাকবে না। অতঃপর সাহলা তাকে দুধ খাইয়ে দিলে আবু হুজাইফার সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এখানে উল্লেখ্য যে, সালেম বড় এবং শুশ্রুধারী ছিলেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে, দুগ্ধ পানের বয়স অতিক্রান্তের পর দুধ খেলে তার দ্বারা দুগ্ধসম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অতএব এ হাদীসটি হযরত সালেমের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আর কারো জন্য তা জায়েয ও প্রযোজ্য হবে না। আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, সম্ভবত স্তন থেকে প্রথমে দুধ বের করা হয়, অতঃপর তাঁকে খাওয়ানো হয়। ফলে সরাসরি স্তন থেকে দুধ চোষার আবশ্যকতার প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না।

فَجَلَسَ عَلٰى فِرَاشِىْ (তিনি আমার বিছানায় বসেন) : যদি প্রশ্ন হয়, এক অনাত্মীয় (গায়রে মাহরাম) মহিলার বিছানায় রসূল (স.) কিভাবে বসলেন? ব্যাখ্যাকারগণ তার বিভিন্ন জবাব দিয়েছেন—

(১) কিরমানী বলেন, রসূল (স.) পর্দার পাশে বসেন। অর্থাৎ, পাশে বসলেও তাদের মাঝখানে পর্দা ছিল।

(২) ঘটনাটি ছিল পর্দার বিধানের পূর্বেকার।

(৩) প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মহিলার প্রতি দৃষ্টিপাত জায়েয। এ ঘটনাটি তারই অন্তর্গত।

(৪) ফেতনার আশঙ্কা না থাকলে এমনটি জায়েয।

(৫) আল্লামা আইনী বলেন, বিশুদ্ধ জবাব হলো, গায়রে মাহরাম মহিলার পাশে বসা এবং তার প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধতা রসূল (স.)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্যাপারটি

www.e-ilm.weebly.com

ঠিক এই ধরনের, যা এক বর্ণনায় এসেছে যে, রসূল (স.) উম্মে হারাম বিনতে মিলহাজার নিকটে যান এবং শুয়ে পড়েন। অথচ উম্মে হারাম আর রসূল (স.)-এর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও ছিল না এবং তিনি রসূল (স.)-এর জন্য মাহরামও ছিলেন না। (আইনী)

يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ (তারা দুফ বাজাচ্ছিল) ঃ دُف দাল অক্ষরে পেশ যোগে। এটা এক ধরনের ঢোলের নাম (যার এক পাশ চামড়া দ্বারা বাঁধানো আর অপর পাশ খোলা থাকে)।

يَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أبَائِهِنَّ ঃ অর্থাৎ, বালিকারা তাদের পিতা ও পিতৃপুরুষদের গুণাবলী ও গৌরবগাঁথা উল্লেখ করত স্মৃতিচারণ করছিল, যা শ্রবণে হৃদয় আবেগ আলোড়িত আর চক্ষু হয়ে উঠে অশ্রুসজল। বদর যুদ্ধে রবীর পিতা মুআওয়াজ এবং চাচা আউফ শহীদ হয়েছিলেন। অভিশপ্ত আবু জাহেলের পুত্র ইকরামা এ দু'জনকে শহীদ করে। এখানে تغليبا চাচাকে পিতা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, পিতা ও চাচার মধ্যে পিতাকে প্রাধান্য দিয়ে উভয়কে পিতা (أباء) বলা হয়েছে।

لاتقولي هكذا (তুমি এরূপ বলো না) ঃ এ থেকে জানা গেল, সৃষ্টিজীবের প্রতি অদৃশ্য জ্ঞানের (عِلْم غَيْب) সম্বন্ধদান শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় ও নাজায়েয।

জ্ঞাতব্য-১ ঃ বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য করার উদ্দেশ্যে ঢোল বিশেষ বাজানো ও মুবাহ গানের মাধ্যমে বিবাহের প্রকাশ জায়েয। নিম্নবর্ণিত হাদীসগুলি এর স্বপক্ষে দলীল—

(১) রসূল (স.) ইরশাদ করেন— فَصْل مَابَيْنَ الحَلاَلِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ অর্থাৎ, হালাল (বিবাহ) ও হারামের (ব্যভিচার) মধ্যে পার্থক্য হলো ঢোল বাজানো ও অনুষ্ঠান করা। (অর্থাৎ, বিবাহের মধ্যে এগুলো করা হয় আর ব্যভিচারের মধ্যে করা হয় না)। (তিরমিযী)

(২) হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত ঃ أَعْلِنُوا هٰذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْاعَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ অর্থাৎ, তোমরা সবাইকে জানিয়ে বিবাহ কর এবং তাতে ঢোল বাজাও। (তিরমিযী)

(৩) হযরত কুরজা বিন কা'ব ও আবু মাসঊদ (রযি.) থেকে বর্ণিত ঃ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ(النَّسَائِي) অর্থাৎ, বিবাহ অনুষ্ঠানে আনন্দ-ফূর্তি করার অনুমতি আমাদের দেয়া হয়েছে। (নাসায়ী)

(৪) সায়িব বিন ইয়াজিদের বর্ণনায় এসেছে ঃ لَقِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَوَارِيَ يُغَنِّيْنَ وَيَقُلْنَ حَيُّوْنَا بِخَيْرِكُمْ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا حَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ يَارَسُوْلَ اللّٰه تُرَخِّصُ لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا قَالَ نَعَمْ اِنَّهٗ نِكَاحٌ لَا سِفَاحٌ ـ (الطبراني)

www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ, কতিপয় বালিকার সাথে রসূল (স.)-এর সাক্ষাৎ হল। তারা গাইছিল আর বলছিল ঃ "আপনাদের আশীর্বাদে আমরা বেঁচে থাকি।" রসূল (স.) বললেন, এরূপ বলো না; বরং বল ঃ "আমরা বেঁচে থাকি, আপনারাও বেঁচে থাকুন।" এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি মানুষদেরকে এভাবে গান গাওয়ার (শের পড়ার) অনুমতি দিচ্ছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ। এটা বিবাহ, ব্যভিচার নয়। (তবরানী)

(৫) হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, তাঁর এক আনসারী আত্মীয়ার বিবাহ হলে রসূল (স.) বলেন ঃ

اَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّىْ قَالَتْ قُلْتُ لَا فَقَالَ اِنَّ الْاَنْصَارَ قَوْمٌ فِيْهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ لَبِثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُوْلُ اَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ ـ (عَيْنِى)

অর্থাৎ, তোমরা বালিকা সাথে দিয়েছ? লোকেরা উত্তরে বলল, হ্যাঁ। রসূল (স.) বললেন, তার সাথে গায়িকা পাঠিয়েছ? হযরত আয়েশা বলেন, আমি উত্তর দিলাম 'না', তখন রসূল বললেন, আনসারদের মধ্যে গানের রেওয়াজ রয়েছে। যদি তোমরা তার (কনের) সাথে গায়িকা পাঠাতে, যে গাইবে; আমরা তোমাদের কাছে এসেছি। আমরা বেঁচে থাকি, তোমরাও বেঁচে থাকো (সকলের জীবন সুন্দর, সুখময় হোক)। (আইনী)

জ্ঞাতব্য-২ ঃ বুখারী শরীফের 'ঈদ পর্বে' একটি হাদীস এসেছে وَعِنْدِىْ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءٍ بُعَاثٍ وَدَخَلَ اَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِىْ الخ অর্থাৎ, হযরত আয়েশা বলেন, আমার বাসায় দু'টি বালিকা বুয়াছ কাহিনী অবলম্বনে গান গাইতে থাকে। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর আসেন এবং আমাকে চরমভাবে ভর্ৎসনা করেন।

এই দু'বালিকার নাম ছিল (১) হুমামা (২) যয়নব। মদীনার থেকে দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত আউস গোত্রের একটি কেল্লার নাম 'বুয়াছ'। يَوْمُ الْبُعَاثِ ঐ দিনকে বলে, যেদিন আনসারদের দু'গোত্র আউস ও খাযরাজদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আর তাতে আউস গোত্র বিজয়ী হয়। যদি প্রশ্ন করা হয়, যে গান রসূল (স.) সমর্থন করেছেন, তাতে কিভাবে হযরত আবু বকর (রযি.) ভেটো দিলেন? জবাব হলো—

(১) হযরত আবু বকর ধারণা করেন যে, এ দু'বালিকা রসূল (স.)-এর অজ্ঞাতেই এরূপ করেছে। কেননা যে সময় আবু বকর এ ধারণা করেন, হয়ত রসূল (স.) শুয়ে ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় কন্যার দৃষ্টি আকর্ষণ করত তাকে গাল-মন্দ দেয়া শুরু করেন। কারণ তার জানা ছিল যে, গান ও ক্রীড়া-কৌতুক শরীয়তে নিষিদ্ধ। রসূল (স.) এ পরিস্থিতিতে সুকৌশলে শরীয়তের হুকুম জানিয়ে দেন যে, ঈদের দিনটি শরীয়তেই খুশির দিন হিসেবে বিবেচিত। অতএব ঈদে এতটুকু গান নিষিদ্ধ নয়; যেমন তা বিবাহ অনুষ্ঠানে নিষিদ্ধ নয়। ফলে কোন প্রশ্ন থাকে না।

www.e-ilm.weebly.com

(২) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবু বকর (রযি.) ধারণা করেন যে, রসূল (স.) ঘুমিয়ে আছেন। অতএব তাদের এই আওয়াজ-শোরগোলে রসূলের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে আর তিনি জাগ্রত হয়ে হযরত আয়েশার প্রতি রেগে যাবেন। মূলত এ ধারণার ভিত্তিতেই তিনি আয়েশার প্রতি রুষ্ট হন ও তাকে ভর্ৎসনা করেন।

(৩) হতে পারে হযরত আবু বকরও এ ধরনের গান হারাম মনে করতেন না। তথাপি এটা যেহেতু নিম্ন পর্যায়ের মুবাহ্ কাজ তাই তিনি মনে করেন যে, এ ধরনের মুবাহ্ কাজ থেকে জাতীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের দূরে থাকা উচিত। আর তিনি রসূলের নীরবতা অবলম্বনকে তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যতা ছিল বলে মন্তব্য করেন। (ফতহুল মুলহিম)

জ্ঞাতব্য-৩ ঃ আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস থেকে আমাদের এ তথ্য লাভ হয় যে,

إِقْبَالُ الْإِمَامِ وَالْعَالِمِ إِلَى الْعُرْسِ وَإِنْ كَانَ لَهْوًا وَلَعْبًا مُبَاحٌ فَإِنَّهُ يُوْرِثُ الْأُلْفَةَ وَالْإِنْشِرَاحَ -

অর্থাৎ, ক্রীড়া-কৌতুকের আনন্দানুষ্ঠান হলেও সেখানে ইমাম ও আলেমের যাওয়া মুবাহ্। কেননা এতে ভালবাসা ও পারস্পরিক আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। তবে মনে রাখতে হবে, এ বৈধতা কেবল তখন প্রযোজ্য হবে যখন অনুষ্ঠান অনৈতিক ও দ্বীন বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে এবং তা আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কারণ হবে না। অন্যথা সে অনুষ্ঠান বয়কট করা ওয়াজিব। (লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭)

حُكْمُ السَّمَاعِ وَالْغِنَاءِ

গান ও তা শ্রবণের বিধান

গান ও তা শ্রবণ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামদের অভিমত নিম্নরূপ ঃ

আল্লামা আইনী বলেন, কুরতুবী বলেছেন ঃ গান সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ তা অবাঞ্ছিত ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্গত। যদি তাতে নিষিদ্ধ বিষয় না থাকে তবে বিবাহ, ঈদ ও এ জাতীয় অনুষ্ঠানে হাল্কা গানের অনুমতি রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে তাও হারাম। ইরাকীদের মতও অনুরূপ। ইমাম শাফেয়ীর মতে এ ধরনের গানও মাকরূহ। আর এটাই ইমাম মালেক (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত। আদদুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে, প্রত্যেক ক্রীড়া-কৌতুক মাকরূহ। কেননা রসূল (স.) বলেছেন ঃ মুসলমানের তিন ক্রীড়া-কৌতুক ব্যতিরেকে বাকী সব হারাম। (১) স্ত্রীর সাথে ক্রীড়া (২) অশ্বছুট (৩) তীরন্দাজী করা।

হাদীসটি গান পরিবেশন, শ্রবণ এবং বাদ্য ও মিউজিক শ্রবণ ইত্যাদি সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। এগুলো সবই হারাম। হঠাৎ গান বা মিউজিকের আওয়াজ কানে এসে গেলে তা অপারগতা হিসেবে বিবেচ্য হবে। তবে না শোনার দৃঢ় সংকল্প রাখতে হবে।

ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়ার বক্তব্য ফতহুল মুলহিমে উদ্ধৃত হয়েছে যে, যদি কণ্ঠটা কুরআন ও ওয়াজের কণ্ঠ হয় তবে জায়েয, আর যদি গানের কণ্ঠ হয় তবে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে হারাম।

শামী প্রণেতা ইবনে আবিদীন বলেন, বর্তমানে সূফীরা গজল ও গানের নামে যা করছে, তা হারাম। তাদের গান পরিবেশন স্থলে যাওয়া ও তাতে শরীক হওয়া জায়েয নেই। পূর্ববর্তী সূফীগণ এরূপ কখনও করেননি।

www.e-ilm.weebly.com

ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়াতে আরও আছে, সূফীগণ ছয়টি শর্তসাপেক্ষে পরহেযগার ও মুত্তাকীদের গানের অনুমতি দিয়েছে। যথা ঃ (১) শ্রোতা প্রবৃত্তিপূজারী না হতে হবে (২) মাহফিল বা আসরে কোন মহিলা কিংবা শ্মশ্রুবিহীন সুন্দর বালক উপস্থিত না থাকা (৩) আমোদ-প্রমোদ উদ্দেশ্য না হওয়া বরং আল্লাহ্‌র জিকিরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হওয়া (তবে তাকে কোনভাবেই আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের মাধ্যম মনে করা যাবে না। কারণ তা কুফুরী) (৪) পাঠক/গায়ক কোন মহিলা বা সুশ্রী বালক না হওয়া, বরং শ্রবণকারীদের অনুরূপ হওয়া। (৫) বিষয়বস্তু অশ্লীল ও অনৈতিক না হওয়া এবং তাতে বাদ্যযন্ত্র না থাকা (৬) মানুষ দেখানোর জন্য বিশেষ অবস্থা বা মেকি মহব্বত প্রকাশ না করা।*

নিবরাযিয়া গ্রন্থে আছে, বাদ্যের আওয়াজ যেমন, ঢোলের বাড়ি ইত্যাদি শ্রবণ হারাম। কেননা নবী (স.) বলেছেন, اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِىْ مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوْسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ অর্থাৎ, বাদ্য-মিউজিক শ্রবণ পাপ, সে অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া বড় অন্যায়, আর তাতে রোমাঞ্চিত হওয়া কাফেরের কাজ। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন, صَوْتُ اللَّهْوِ وَالْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ النَّبَاتَ অর্থাৎ, পানি যেমন উদ্ভিদ উৎপন্ন করে তেমনি সঙ্গীত ও মিউজিকের আওয়াজ কপটতা উৎপন্ন করে।

হযরত জাবের (রযি.) থেকে বর্ণিত—

اِحْذَرُوا الْغِنَاءَ فَاِنَّهُ مِنْ قِبَلِ اِبْلِيْس

অর্থাৎ, তোমরা গান বর্জন কর, কেননা তা ইবলিসের মন্ত্র।

গান-বাজনা ও বিভিন্ন বাদ্য-যন্ত্র এবং যেসকল কাজ দ্বারা কামনা-বাসনা বৃদ্ধি পায়, যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম হয়—সবই ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এগুলো হারাম হওয়ার বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, তা যরূরিয়াতে দ্বীন তথা সর্বজনবিদিত দ্বীনি বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। .....ভেবে দেখার বিষয় যে, হারামকে হালাল মনে করাই যেখানে কুফরী, সেখানে হারামকে আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম জ্ঞান করা অথবা তাকে ইবাদত মনে করা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ হবে ? আর এ কাজে জড়িত ব্যক্তিদের কি দশা হবে? (মাওলানা আব্দুল মালিক) (দা. বা.) রচিত "তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা" (পৃষ্ঠা ঃ ২৩২-২৩৪) থেকে এ আলোচনা সংকলিত ও সংগৃহীত। —অনুবাদক

টীকা ঃ

* উল্লিখিত শর্তসমূহের প্রতি খেয়াল রেখে যদি গানের অনুষ্ঠান হয় (যা বর্তমানে অনুপস্থিত), তবুও তার গুরুত্ব প্রদান করা বিজ্ঞ সূফীদের নিকট অপছন্দনীয় (তাদের মাঝে হযরত বড়পীড় সাহেবও রয়েছেন)। কেননা, খাইরুল কুরূনে (সাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈর যুগে)-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই যদি কেউ একে সুন্নাত ধারণা করে, আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে, তাহলে এটা সর্বসম্মতিক্রমে বিদআত বলে বিবেচিত হবে। ......আজ পর্যন্ত কোন মুসলমানই একে জায়েয বলেনি। যে ব্যক্তি এর বৈধতার সম্বন্ধ কোন হক্কানী বুযুর্গের দিকে করে, সে মূলত পূতঃপবিত্র জামাআতের উপর অপবাদ ও মিথ্যারোপ করে। এ ব্যাপারে শতশত উক্তি উদ্ধৃতি হতে এখানে মাত্র একটি উক্তি উল্লেখ করছি ঃ

'তাফসীরে আহমাদিয়া' কিতাবে আছে ঃ "আমাদের যুগে লোকেরা সামা' (গান)-এর ব্যাপারে খুব তৎপর। তারা সুরার (পানপাত্র) পেয়ালায় মাতাল হয়ে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়, অবৈধ কাজ করে। খারাপ চরিত্রের পুরুষ, শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী বালকদেরকে একত্রিত করে, গান-বাজনা শ্রবণ করে ইত্যাদি। এরূপ করা যে কবীরা গোনাহ তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এগুলোকে হালাল মনে করা সুস্পষ্ট কুফরী।"(তাফসীরে আহমাদিয়া ঃ পৃ. ৬০৪-৬০৫)

www.e-ilm.weebly.com

** হাদীসটি মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লিখিত হলেও হাদীসের কিতাবাদিতে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ।

—অনুবাদক

উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, বর্তমানে গান শ্রবণ জায়েয নেই। বর্ণিত আছে, সূফী সম্রাট হযরত জুনায়েদ বাগদাদী [১] (রহ.) প্রথম দিকে মারেফতী গানের অনুমতি দিলেও শেষ জীবনে এসে তা থেকেও তওবা করেন।

যারা বুয়াছের গানের ভিত্তিতে গানকে জায়েয প্রমাণ করতে চান, তাদের যুক্তি ঠিক নয়। কারণ—

(১) উক্ত বালিকাদ্বয় পেশাদার নর্তকী ছিল না। এমনকি তারা সঙ্গীত পরিবেশনের ন্যায় গাইছিল না যে, তার দ্বারা মানুষের মধ্যে কামনার উদ্রেক হবে, সেক্স জাগ্রত হবে এবং তারা ফেতনা কবলিত হবে। হযরত আয়েশার উক্তি "وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَانِ" এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, বুয়াছের গানের হাদীস দ্বারা কতিপয় সূফী বাদ্যসহ ও বাদ্য ব্যতীত সকল প্রকার গানকে জায়েয বলেন। তাদের উক্তি খণ্ডনের জন্য হযরত আয়েশার وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَانِ এ উক্তিই যথেষ্ট। কেননা এখানে হযরত আয়েশা, সুফীরা শব্দগতভাবে যা প্রমাণ করতে চেষ্টা করে তা অর্থগত পন্থায় খণ্ডন করেছেন।

(২) বালিকাদ্বয়ের গান পারিভাষিক গান ছিল না; বরং তা যুদ্ধ ও শৌর্য-বীর্যের বিবরণ সম্বলিত ছিল মাত্র। অতএব তাদের গান যুদ্ধ ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতার সমাহার হওয়ায় তা অনিষ্ট ও ফেতনামুক্ত ছিল। ফলে এ হাদীস প্রমাণস্বরূপ পেশ করা ঠিক নয়।

খাত্তাবী (রহ.) [২] বলেন, যুদ্ধ, বীরত্ব ও রণাঙ্গনে ঘটিত বিষয়বস্তু সম্বলিত যে গান তারা গেয়েছিল, তার লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে কাফেরদের সাথে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ, তখন তা দ্বীনেরই সহায়ক ছিল বিধায় রসূল (স.) তার অনুমতি দিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সঙ্গীত হলো অশ্লীলতা প্রকাশ ও কথার মাধ্যমে অনুচিত-নিষিদ্ধ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

(৩) 'গান' শব্দের ব্যবহার যেমন চরিত্রবিধ্বংসী ও যৌন সুড়সুড়িমূলক কবিতার উপর হয়, তেমনি উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ছন্দবদ্ধ বাক্য এবং উট-গীত পর্বেরও উপর হয়। এখানে গান বলতে পরিভাষায় গান বলতে যা বুঝায় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং সমুচ্চ ধ্বনি উদ্দেশ্য মাত্র।

টীকা : ১. হযরত জুনাইদ বাদগাদী (রহ.), মৃত্যু : ২৯৭ হিজরী
২. আল্লামা খাত্তাবী (রহ.), মৃত্যু : ৩৮৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, উচ্চ আওয়াজ, ছন্দবদ্ধ বাক্য এবং উট-গীত পাঠের উপরে গান শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যে তা পড়ে বা গায় তাকে বলা হয় গায়ক বা শিল্পী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গায়ক হল ঐ ব্যক্তি যে তা বানোয়াট, অতিরঞ্জন, প্ররোচক ও আবেগপ্রবণ করে রচনা করে, কেননা তাতে সুস্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন অশ্লীলতা থাকে।

(৪) তারা নাবালিকা ছিল। অতএব তাদের কার্য হতে শরীয়তের হুকুম গ্রহণ ঠিক হবে না। ইবনে হাজার বলেন, তারা দু'জন শরীয়ত আদিষ্টা (বালেগা) ছিল না। কারণ তারা ছিল ছোট। আর সে কারণেই রসূল (স.) তাদের অনুমতি দেন।

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থে আছে, আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, তাদের গান ছিল যুদ্ধ ও বীরত্বগাথা কবিতা মাত্র। আর তা বালিকাদের দুষ্টামী ও বিতর্কিত গান রচনায় অনুপ্রাণিত করে না; বরং গান ছিল সমস্বরে কবিতা পাঠ। আর সে কারণেই হযরত আয়েশা (রযি.) বলেন, وَلَيْسَتَا مُغَنِّيَانِ অর্থাৎ, তারা এমন পেশাদার কণ্ঠশিল্পী ও নর্তকী ছিল না যাদের পেশাই হল মানুষদেরকে (পুরুষদেরকে) উত্তেজিত, সম্মোহিত ও কামাতুর করা। নারীদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং যৌনাচারে প্ররোচিতা করার মত নির্লজ্জ ও চরিত্র বিধ্বংসী কাজে অনুপ্রেরণা যোগানোই হলো তাদের আসল কাজ।

কথিত আছে اَلْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا অর্থাৎ, গান ব্যভিচারের মন্ত্র। বানোয়াট, অতিরঞ্জন এবং চিত্তাকর্ষক চরিত্রবিধ্বংসী গানে তারা দু'জন পরিচিত-প্রসিদ্ধ ছিল না। আর তারা পেশাদার শিল্পীও ছিল না।

(প্রেমাস্পদের) সৌন্দর্য-গুণাগুণ, মদ, সাকী, সুরাপাত্র ইত্যাদির উল্লেখ সম্বলিত কবিতার সাহায্যে আল্লাহ্ প্রেম, মনের অবস্থা ইত্যাদির প্রতি প্রচ্ছন্ন ও ইঙ্গিতপূর্ণভাবে গান পরিবেশন করা ইবনে কাইউমের মত আমার মতেও তা মাকরূহমুক্ত নয়। কারণ তার উপস্থাপনা আপত্তিকর এবং শিরোনাম মন্দ। আর আসল কথা হলো এ সমস্ত ইঙ্গিত-ইশারাপূর্ণ বিষয় এবং নামকরণই ক্রমে গানের দ্বার খুলে দিয়েছে। (ফতহুল মুলহিম, লামিউদ্ দারারী)

لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا (ফেরেশতা গৃহে প্রবেশ করে না) ঃ এখানে ফেরেশতা বলতে হযরত আজরাঈল ও হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ব্যতীত ঐ সকল ফেরেশতা উদ্দেশ্য, যারা কল্যাণ ও রহমত নিয়ে বান্দাদের কাছে আগমন করেন।

فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ (যে গৃহে কুকুর ও ছবি থাকে) ঃ অপর এক বর্ণনায় জুনুবী তথা বীর্যপাতজনিত অপবিত্র ব্যক্তির কথাও এসেছে। কুকুর, ছবি ও অপবিত্র ব্যক্তি থাকা অবস্থায় গৃহে ফেরেশতা প্রবেশ না করার কারণ এগুলোর অশূচিতা (অর্থাৎ, অপবিত্র হওয়া)। কুকুর ও জুনুবীর অপবিত্রতা সুস্পষ্ট। আর ছবি যেহেতু শরীয়তে নিষিদ্ধ তাই তাতেও হুকমী তথা বিধানগত অপবিত্রতা রয়েছে। জনৈক

www.e-ilm.weebly.com

কবি বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—

بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں * اسلئے تصویرجاناں ہم نے کھینچوائی نیس

মূর্তি পূজার ঘটেনি অনুপ্রবেশ ইসলাম ধর্মে কখন,
প্রেমিকার ছবি তাই মোরা করতে পারিনি অঙ্কন ॥

يُرِيْدُ صُوْرَةَ التَّمَاثِيْلِ فِيْهَا الْأَرْوَاحُ (তিনি রূহধারী প্রাণীর ছবি উদ্দেশ্য নিয়েছেন) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) ব্যাপক অর্থবহ হাদীসকে সীমিত অর্থে প্রযোজ্য করতে এ ব্যাখ্যা করেন। ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হাদীস শর্তহীন হওয়ায় তা প্রত্যেক ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াটাই বেশি সুস্পষ্ট।

(১) قَوْلُهُ الْأَقْتَابُ ঃ এটা قَتَبٌ-এর বহুবচন। বোঝাই বস্তা উটের পিঠে রাখার গদিবিশেষ।

(২) الْغَرَائِرُ ঃ এটা غَرَارَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ চটের থলে। ঘাস ইত্যাদি রাখার পাত্রবিশেষ।

(৩) قَوْلُهُ أَعْطَانِىْ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ مِنَ الْخُمُسِ (তিনি আমাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত মালে ফায়ের এক পঞ্চমাংশ দেন) ঃ এখানে أَعْطَانِىْ-এর দ্বিতীয় مفعول "شَارِفًا أُخْرَى" (অন্য দু'উটনী) উহ্য রয়েছে। (কিরমানী)

(৪) আল্লামা কস্তলানী বলেন, এ পঞ্চমাংশ মাল (خُمُس) আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশের সারিয়াহ থেকে অর্জিত হয়, সে সারিয়াহ বদরের পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

وَهَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لِأَبِىْ (তোমরা তো আমার পিতার গোলাম বৈ নও) ঃ হযরত হামযার (আ.) পিতা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন রসূল (স.) ও হযরত আলী (রযি.)-এর দাদা। দাদাকে মনিব আর মনিবের অধীনস্তদের গোলাম বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত হামযা উপরোক্ত উক্তি করেন। তার এ উক্তির লক্ষ্য, গর্ব করা মাত্র।

হযরত গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, এ ধরনের বাক্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন, কেননা এটা বিবেকহীনের প্রলাপ মাত্র।

أَنْفَذَهُ لَنَا (ইবনে উয়াইনা বলেন, ইবনে ইস্পাহানীর পক্ষ হতে আমাদের কাছে হাদীস পৌঁছেছে) ঃ সুফিয়ানের হাদীস প্রাপ্তিটা পত্রানুমতির অন্তর্গত। তবে কেউ এ উদ্দেশ্য নেন যে, ইবনুল ইস্পাহানী (রহ.) এ বর্ণনাটিকে ধারাবাহিকতার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। (আইনী)

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِنَّ عَلِيًّا كَبَّرَعَلٰى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ (হযরত আলী সাহল বিন হুনায়ফের জানাযায় তাকবীর দিয়েছেন) ঃ হযরত সাহল (রযি.) আটত্রিশ হিজরীতে কুফায় ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রযি.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান। হযরত ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে তাকবীরের সংখ্যা উল্লেখ করেননি। তবে আবু নুয়াঈম বুখারীর সূত্রে এ হাদীসকে সনদের সাথে মুস্তাখরাজ উল্লেখ করেছেন সেখানে 'পাঁচ তাকবীর', আর বগভী, ইসমাঈলী ও হাকিমের বর্ণনায় 'ছয় তাকবীর' এসেছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফতহুল বারীতে বলেন, হযরত আলীর উক্তি إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا (তিনি বদরে উপস্থিত ছিলেন) প্রত্যেক বিষয়ে অন্য লোকদের উপর বদরী সাহাবীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। জানাযার তাকবীরের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম প্রযোজ্য। তদুপরি হাদীসে মারফূ বিদ্যমান রয়েছে যে॥

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَخَمْسًا وَسِتًّا وَسَبْعًا وَثَمَانِيًا حَتّٰى مَاتَ النَّجَاشِىْ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا وَثَبَتَ عَلٰى ذٰلِكَ حَتّٰى مَاتَ .

অর্থাৎ,, রসূল (স.) জানাযায় প্রথম প্রথম ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ তাকবীর পর্যন্ত দিতেন। নাজ্জাশী মারা গেলে তার জানাযায় চার তাকবীর দেন। পরবর্তীতে ইন্তেকাল পর্যন্ত চার তাকবীরের উপরেই তিনি বহাল থাকেন।

قَوْلُهُ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِى ঃ হযরত খুনাইস (রযি.) আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমীর ভ্রাতা ও প্রাথমিক মুহাজির ছিলেন। হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বদরে এবং উহুদে শরীক হন। (আইনী)

قَوْلُهُ تُوُفِّىَ بِالْمَدِيْنَةِ ঃ তিনি উহুদ যুদ্ধে আহত হন। এ আহত হওয়ার কারণে মদীনায় গিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর সম্পর্কে এটাও জানা যায় যে, বদর যুদ্ধের পরপরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ফতহুল বারীতে আছে, "সম্ভবত এ মতটিই অগ্রগণ্য"। কারণ উলামায়ে কেরামের ভাষ্য মতে, হিজরতের পঁচিশ মাস পরে রসূল (স.) হযরত হাফছাকে বিবাহ করেন। কোন বর্ণনায় ত্রিশ, কোন বর্ণনায় বিশ মাস পরে হয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তাই এ হিসেবে মৃত্যুর ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পরে হওয়াটাই অধিক বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত। কেননা উহুদ যুদ্ধ হিজরতের ত্রিশ মাসের অনেক পর গিয়ে সংঘটিত হয়েছে। (কস্তলানী)

قَوْلُهُ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّى عَلٰى عُثْمَانَ ঃ অর্থাৎ, আমি হযরত উসমানের তুলনায় আবু বকরের প্রতি বেশি নারাজ হলাম। কারণ প্রথমতঃ হযরত উসমান প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তার অপারগতা প্রকাশ করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর (রযি.) তাঁর কথার জবাব পর্যন্ত দেননি। (কস্তলানী)

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِى (আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযিদ আবু মাসউদ বদরীকে বলতে শুনেছেন) ঃ তাঁর নাম উকবা বিন উমর বিন ছা'আলাবা বিন মাসউদুল আনসারী আল খাযরাজী। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বদর এলাকায় বসবাস করার কারণে তাকে আবু মাসউদ বদরী বলা হয়। এ জন্য নয় যে, তিনি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত। একদলের মতে বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন বিধায় তাকে বদরী বলা হয়। ইমাম বুখারীরও অভিমত এটা।

قَوْلُهُ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِىْ إِمَارَتِهِ ঃ অর্থাৎ, ইমাম যুহরী বলেন, আমি শুনেছি, একদা হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) তাঁর শাসনামলে আসরের নামায পড়তে বিলম্ব করলে হযরত উরওয়া তাঁর কাছে যান এবং এ হাদীস বর্ণনা করেন যে— أَخَّرَ الْمُغِيْرَةُ الخ

قَوْلُهُ أَخَّرَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ ঃ অর্থাৎ, হযরত মুগিরা (রযি.) যখন হযরত মুয়াবিয়ার[১] (রযি.) পক্ষ থেকে কুফার আমীর (শাসক) ছিলেন, তখন একদা তিনি আসরের নামায পড়তে বিলম্ব করেন।

شَهِدَ بَدْرًا (তিনি বদরে উপস্থিত ছিলেন) ঃ এটা হযরত উরওয়ার উক্তি। হযরত উরওয়ার এ উক্তিটি হযরত আবু মাসউদের বদর যুদ্ধে শরীক হওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে। কেননা, উরওয়া আবু মাসউদের সাক্ষাৎ লাভ করেন। আর তিনি আপন চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেন। এ কারণেই ইমাম বুখারীর মত হলো আবু মাসউদ বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন বলেই তাকে বদরী বলা হয়।

(ফতহুল বারী, কস্তলানী)

نَزَلَ جِبْرِيْلُ (জিবরাঈল অবতরণ করেন) ঃ জিবরাঈলের (আ.) এ অবতরণ মে'রাজের রাত্রের পরবর্তী দিন প্রভাতে হয়।

قَوْلُهُ قَالَ هٰكَذَا أُمِرْتَ (তিনি বললেন, এভাবেই আপনি আদিষ্ট) ঃ এটা وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ مَجْهُوْل এর সীগা। অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, মে'রাজের রাতে সংক্ষিপ্তভাবে যে নামাযে আদিষ্ট হন তার বিস্তারিত বিবরণ ও বাস্তব নক্সা-চিত্র এটাই। হযরত আবু যর[২] (রযি.)-এর প্রতিলিপিতে أُمِرْتُ (مُتَكَلِّمْ হিসেবে) এসেছে। অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ.) বলেন, আমার প্রতি আদেশ হয়েছে আপনাকে এভাবে নামায শিক্ষা দেয়ার। (কস্তলান)

টীকা ঃ ১. হযরত মুয়াবিয়া (রযি.), মৃত্যু ঃ ৬০ হিজরী।

২. হযরত আবু যর গিফারী (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩১ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

كَذَالِكَ كَانَ بَشِيْرُ بْنُ أَبِى مَسْعُوْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيْهِ (এরূপভাবেই বশির বিন আবু মাসউদ তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতেন) ঃ এটা হযরত উরওয়ার উক্তি। যেহেতু ইমাম বুখারী 'নামাযের সময় পর্বে'ও এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আর সেখানে আছে ঃ فَقَالَ عُمَرُ لِعُرْوَةَ اِعْلَمْ مَاتُحَدِّثُ بِهِ অর্থাৎ, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয বলেন, ভেবে দেখুন আপনি কি বর্ণনা করছেন! তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উরওয়ার কথা প্রত্যাখ্যান করা। হযরত কুরতুবী (রহ.) বলেন, 'প্রত্যাখ্যানই' এ হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্য। আর তার দু'টি কারণ ঃ (১) জিবরাইলের (আ.) ইমামতি সংক্রান্ত হাদীস সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। (২) অথবা তিনি জানতেন, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, উমর বিন আব্দুল আযীয[১] কর্তৃক উরওয়ার কথা প্রত্যাখ্যানের কারণ হলো, তিনি বিশ্বনবীর উপর জিবরাইলের ইমামতি করাকে অসম্ভব মনে করেছিলেন। সেজন্য হযরত উরওয়া এ উক্তি পেশ করে নিজের বর্ণনাটি দৃঢ় করেন যে, আমি আপনার সম্মুখে যে হাদীসে জিবরাইল বর্ণনা করেছি তা কেবল আমিই বর্ণনা করি না; বরং আমার মত আবু মাসউদ আনসারীর পুত্র বশির বিন মাসউদও তার পিতা হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেন। অতএব এ বর্ণনায় সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই।

أَنَّ عُمَرَ اِسْتَعْمَلَ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُوْنٍ عَلَى الْبَحْرَيْنِ (উমর কুদামা বিন মাজউনকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন) ঃ কুদামা বিন মাজউন তিনি হযরত উসমান বিন মাজউনের ভ্রাতা এবং হযরত ইবনে উমর ও হযরত হাফসার (রযি.) মামা ছিলেন। শরাব পান হেতু হযরত উমর (রযি.) তার প্রতি চরম রুষ্ট হয়ে তাকে বরখাস্ত করেন এবং তার স্থলে উসমান বিন আবুল আসকে গভর্নর নিযুক্ত করেন। ঘটনাক্রমে হযরত উমর ও কুদামা উভয়ে একবার হজ্বে মিলিত হন। হযরত উমর (রযি.) স্বপ্নে দেখেন যে, কেউ তাঁকে বলছে, কুদামার সাথে দ্রুত বিরোধ মিটিয়ে ফেল। কেননা সে তোমার ভাই। হযরত উমর (রযি.) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হন এবং নিজেদের মধ্যে আপস করে নেন।

نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ (রসূল বর্গাচাষ থেকে নিষেধ করেছেন) ঃ পরিভাষায় مُزَارَعَة-এর সংজ্ঞা হলো هِىَ الْمُعَامَلَةُ الْأَرَاضِى بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا অর্থাৎ, উৎপাদিত ফসলের অংশ বিশেষের বিনিময়ে চাষীকে বর্গাচাষ করতে জমি প্রদান করা।

টীকা ঃ * এটা সাহেরাঈন তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদেরও (রহ.) অভিমত। (হেদায়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২৪)

১. হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.), মৃত্যু ঃ ১০১ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে ঃ وَلَا تَصِحُّ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ هُمَا تَصِحُّ وَبِهِ يُفْتَى لِلْحَاجَةِ وَقِيَاسًا عَلَى - الْمُضَارَبَةِ بِشُرُوطٍ ثَمَانِيَةٍ - অর্থাৎ, আবু হানীফার মতে বর্গাচাষ বৈধ নয়। তবে ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মতে ৮টি শর্তের সাথে এটা জায়েয তথা বৈধ। মানুষের প্রয়োজন ও শেয়ার ব্যবসার সাথে মিল থাকায় বর্তমানে জায়েযের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ইবনে বাত্তাল বলেন, ফসল অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি পদ্ধতিতে জমি বর্গা দেয়া প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মতামত বিভিন্ন। যথাঃ

(১) হযরত আলী, ইবনে মাসউদসহ একদল সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, এ বর্গা প্রদান জায়েয।

(২) ইমাম আওযায়ী, ইবনে উমর, ইকরামা, ইব্রাহীম নখয়ীর মতে এ বর্গা প্রদান জায়েয নেই। ইমাম মালেক, আবু হানীফা, শাফেয়ী প্রমুখের (রহ.) অভিমতও এটা।

দ্বিতীয় পক্ষের দলীল হলো, তাঁরা বলেন ঃ এটা একটি অজ্ঞাত বিনিময়। কেননা, অনেক সময় ফসল উৎপাদিত হয় না। ফলে এ বর্গা জায়েয হবে না। এ বর্গার বৈধতা 'উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমি বর্গা'র প্রতি নিষেধাজ্ঞার দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। রসূল (স.) খয়বারবাসীদের সাথে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে যে চুক্তি করেছিলেন, তার জওয়াবে এ পক্ষ বলেন, রসূল (স.)-এর এ চুক্তি বর্গা পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল না। এটা জিযিয়া (ট্যাক্স) ছিল। কেননা, রসূল (স.) তার মালিক হয়েছিলেন গনিমত-প্রাপ্তি হিসেবে। আর তিনি তাদেরকে কোন সময়সীমা বেঁধে দেন না। যদি এটা বর্গাচাষ হতো, অবশ্যই তিনি সময় বেঁধে দিতেন। কেননা বর্গাচাষের বৈধতা দানকারীগণও সময় নির্ধারণ ব্যতিরেকে তা বৈধ বলেন না।

হযরত আবু বকর রাযী[১] (রহ.) বলেন, খায়বারবাসীদের প্রতি রসূল (স.)-এর অর্ধ ফল ও ফসলের শর্তারোপই প্রমাণ করে যে, এটা ট্যাক্স ছিল। তারা কোন হাদীস দেখাতে পারবে না যে, রসূল (স.) তাঁর ইন্তেকাল, হযরত আবু বকর (রযি.) তাঁর ইন্তেকাল এবং হযরত উমর (রযি.) কর্তৃক তাদের দেশান্তর করা পর্যন্ত তাদের থেকে ট্যাক্স উসুল করেছেন। যদি তা ট্যাক্স না হত, তবে ট্যাক্সের আয়াত অবতরণের পর অবশ্যই তিনি তাদের থেকে তা আদায় করতেন।

বর্গাচাষ বৈধ দাবীদারদের দলীল হলোঃ

(١) اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ -

(১) অর্থাৎ, রসূল (স.) উৎপাদিত ফসলের অর্ধেকের শর্তে খায়বারবাসীদের সাথে বর্গাচুক্তি করেছেন।

টীকা ঃ ১. ইমাম আবু বকর রাযী আল জাস্সাস (রহ.), মৃত্যু ঃ ৩৭০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(২) এটা মাল ও কাজের অংশভিত্তিক একটি চুক্তি। অতএব তা মুযারাবার (মুযারাবা চুক্তির[১]) ন্যায় জায়েয।

হেদায়া প্রণেতা বলেন, মানুষের প্রয়োজন ও এ কাজে ব্যাপকভাবে মানুষ নিয়োজিত হওয়ার প্রেক্ষিতে আজকের ফতওয়া সাহেবাইনের উক্তি অনুযায়ী। কিয়াস সর্ববাদী কাজের تَعَامُلُ نَاسْ দ্বারা পরিত্যাজ্য হয়। মুযারাবা ও বর্গাচাষ উভয় মানুষের প্রয়োজন মেটায়। কেননা অর্থপতি (ধনী) অনেক সময় কাজ করতে সক্ষম হয় না। অপর দিকে কাজ করতে সক্ষম হয় এমন অনেকে আছে যাদের অর্থকড়ি নেই। ফলে তারা পরস্পরে এহেন চুক্তি স্থাপনের মুখাপেক্ষী হয়। তবে অর্ধ লভ্যাংশের বিনিময়ে ছাগল ও মুরগী বর্গা প্রদান সংশ্লিষ্ট চুক্তি এর বিপরীত। কেননা সেখানে লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে কাজের কোন দখল নেই। কারণ হলো, ওখানে লভ্যাংশটা প্রকৃতপক্ষে মূল হতেই সৃষ্ট। তাতে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যাকারীর শ্রমের বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না। পক্ষান্তরে বর্গাচাষ চুক্তিতে ফসল উৎপাদনে চাষীর বিরাট শ্রম ও অবদান থাকে।

قَوْلُهُ قُلْتُ لِسَالِمٍ فَتُكْرِيهَا أَنْتَ ঃ অর্থাৎ, আমি সালেমকে বললাম, আপনিও তো জমি বর্গাচাষ হিসেবে দেন। এটা মূলত ইমাম যুহরীর উক্তি।

قَوْلُهُ إِنَّ رَافِعًا اَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ ঃ (রাফে নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছে) ঃ এটা হযরত সালেমের উক্তি। তিনি এর দ্বারা রাফে'র উক্তি প্রত্যাখ্যান করেছেন। সারকথা হলো, হযরত রাফে জমি বর্গাদান নিষিদ্ধ সম্বলিত হাদীসটিকে সাধারণভাবে

টীকা ঃ ১. মুযারাবা (দ্বিস্তর বিশিষ্ট বিনিয়োগ) হলো বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি মৌলিক বিনিয়োগ পদ্ধতির নাম। মুযারাবা বিনিয়োগে ব্যাংক সমস্ত মূলধন যোগান দেয়। অন্যদিকে বিনিয়োগকারী গ্রাহক তার শ্রম উদ্যোগ ও শ্রমসেবা প্রদান করে। কারবারে মুনাফা অর্জিত হলে পূর্ব নির্ধারিত হারে মুনাফা ভাগ হয়। যদি ইচ্ছাকৃত, গাফলতি ও ত্রুটির কারণ ব্যতীত কারবারে লোকসান হয়, তবে ব্যাংক সমস্ত ক্ষতি বহন করে। এর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে মহানবী (স.) ও হযরত খাদিজা (রযি.)-এর মধ্যেকার ব্যবসার সাথে। রসূল (স.)-এর কোন মূলধন ছিল না। কিন্তু হযরত খাদিজা (রযি.)-এর মূলধন ছিল। উভয়ের মধ্যে ব্যবসার চুক্তি হয়, চুক্তি অনুযায়ী মুনাফা হলে উভয়ের মধ্যে অর্ধেক অর্ধেক বা যে কোন অনুপাতে অর্থ বণ্টন হতো, আর ক্ষতি হলে হযরত খাদিজা (রযি.)-এর অর্থ বিনষ্ট এবং রসূল (স.)-এর শ্রম ব্যর্থ হত। ব্যবসায় লাভ ও ক্ষতি না হলে উভয়েই কিছু পেত না। ইসলামী ব্যাংকের মৌলিক নীতিমালায় এ নীতি লিপিবদ্ধ। এখন যদি বাস্তব কার্যক্রমেও তারা এ নীতির পূর্ণ অনুসরণ করে কারবার করে থাকে, তবে তাতে সুদের কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। মুযারাবা ছাড়াও মুশারাকা, বাই-য়ে মুয়াজ্জাল, বাই-য়ে মুরাবাহা, বাই-য়ে সালাম, হায়ার পারচেজ আন্ডার (শিরকাতুল মিলক), লীজ ইত্যাদি বিনিয়োগ করে থাকে। শরীয়তের নির্দিষ্ট শর্ত অনুসরণ করে এ সমস্ত বিনিয়োগ করায় কোন দোষ নেই। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

সর্বত্র প্রযোজ্য করেন। অথচ তা সর্বত্র প্রযোজ্য নয়; বরং এক বিশেষ ক্ষেত্রে সীমিত। আর তা হলো, কতক লোক জমি বর্গাদানের ক্ষেত্রে অনুচিত শর্ত যোগ করত। উদাহরণস্বরূপ জমির মালিকরা বলত, সেচের আশেপাশে যে ফসল উৎপন্ন হবে তা আমাকে দিতে হবে আর বাকীটা তোমার। অথবা বলত, অমুক শস্য আমাকে দিতে হবে আর বাদবাকী তোমার। এহেন চুক্তির ক্ষতি অনেক। প্রথমতঃ এতে শর্ত অজ্ঞাত থাকে। কেননা শস্যের পরিমাণ জানা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ কখনও জমির মালিকের অংশ আবার কখনও চাষীর অংশ ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং ফসল মোটেই উৎপন্ন হয় না। ফলে চাষী বা জমির মালিক সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়। তাই রসূল (স.) এ ধরনের চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ-এর মর্মার্থ এটাই। আধা ফসল, তিন ভাগের এক ভাগ, চারভাগের এক ভাগ উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে জমিবর্গা প্রদান এ নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন নয়। যেহেতু হযরত রাফে এহেন বর্গাচাষকেও নিষেধাজ্ঞার অন্তর্গত করেন তাই হযরত সালেম বলেন— إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ, হযরত রাফে নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন।

قَوْلُهٗ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ (কতিপয় আনসারী রসূল (স.)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলেন) ঃ রসূল (স.)-এর পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রযি.) বদর যুদ্ধে আবুল ইয়াসার কা'ব বিন আমর আল-আনসারী কর্তৃক বন্দী হয়ে মদীনায় উপনীত হলেন। শক্তভাবে বাঁধার ফলে তিনি ব্যথায় আর্তনাদ করছিলেন। এ কাতর ধ্বনি শ্রবণে রসূল (স.) সারা রাত ঘুমাতে পারেননি। আনসার সাহাবীগণ রসূল (স.)-এর এ অবস্থা অবগত হয়ে আব্বাসের বন্ধন খুলে দেন। অতঃপর রসূল (স.)-এর পূর্ণ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্য ফিদিয়া (মুক্তিপণ) গ্রহণ ব্যতিরেকে তাকে মুক্ত করে দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রসূল (স.) তাতে সাড়া দেননি।

فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَائَهٗ (আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের ফিদিয়া ফেরত দিব) ঃ এখানে আনসারগণ أُخْت (বোন) বলতে আব্বাসের দাদীকে বুঝিয়েছেন; তার মা নয়। কারণ তার মা'র নাম ফাতিলা বিনতে খাব্বাব। যিনি আনসারী নন। তার দাদী ও আব্দুল মুত্তালিবের মা সালমা বিনতে আমর ছিলেন আনসারী মহিলা। মূলত দাদীর প্রতি লক্ষ্য করেই তাঁরা তাকে ভাগ্নে বলে অভিহিত করেন।

لَاتَذَرُوْنَ مِنْهُ دِرْهَمًا (তোমরা এক দেরহামও কম করবে না) ঃ রসূল (স.) অর্থ গ্রহণ ব্যতিরেকে আব্বাসকে ছেড়ে দেয়ার আনসারী প্রস্তাবকে নাকচ করে দেন। কারণ কি? কেউ বলেন, আব্বাস মুশরিক ছিলেন বিধায় রসূল (স.) তার পয়সা গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারো মতে, রসূল (স.) তাঁর চাচাকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দিয়েছেন—এ ধরনের কোন খটকা যাতে কারো অন্তরে না আসে তার জন্য তিনি এমনটি করেন। আবার কেউ বলেন, আনসারগণ কর্তৃক মুক্তিপণ

www.e-ilm.weebly.com

না নেয়ার প্রস্তাব রসূল (স.)-এর সম্মান ও আত্মীয়তার প্রেক্ষিতে ছিল। যাতে তাঁদের অবদান আব্বাসের প্রতি না থাকে তার জন্য রসূল (স.) তাঁদের প্রস্তাব না-মঞ্জুর করেন। তদুপরি হযরত আব্বাস (রযি.) বিত্তশালী ছিলেন বিধায় রসূল (স.) নিজেই আব্বাসের মাল থেকে তার ফিদিয়া আদায় করে দেন।

জ্ঞাতব্য ঃ অর্থের বিনিময়ে বন্দীমুক্তি থেকে যে অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয় তা মুজাহিদদের বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় করা হয়।

لَاتَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ اَنْ تَقْتُلَهُ (তুমি তাকে হত্যা করো না, করলে সে ঐ স্থানে চলে আসবে, যে স্থানে ইতঃপূর্বে তুমি ছিলে) ঃ কেননা কালেমা পড়ার কারণে সে তোমার ন্যায় নিরাপদ মুসলমান হয়ে গেছে। কারণ, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা সকল অপরাধ মাফ হয়ে যায়।

وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ كَلِمَتَهُ الَّتِىْ قَالَ ঃ অর্থাৎ, যেমনভাবে সে কালেমা পড়ার পূর্বে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কতলের উপযুক্ত ছিল, তেমনি এখন তুমি (তাকে হত্যা করলে) কিসাসের আইনের অধীন কতলের উপযুক্ত হবে। এ ব্যাখ্যানুপাতে সাদৃশ্যে কারণ 'হত্যার উপযুক্ত' হওয়া। যদিও কারণ ভিন্ন ভিন্ন।

কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, হত্যা করলে তুমিও গুনাহগার হবে। যেমন সে কাফের থাকাবস্থায় গুনাহগার ছিল। এ ব্যাখ্যানুপাতে 'গুনাহ' হবে সাদৃশ্যে কারণ। যদিও সে গুনাহের উৎস ভিন্ন ভিন্ন। (কস্তলানী)

أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ ঃ আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, أَبَا جَهْل বাক্যটি مُنَادِىْ তথা 'আহ্বানকৃত'। অর্থাৎ, হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.) ভর্ৎসনার সুরে বলেন, أَنْتَ الْمَقْتُوْلُ الذَّلِيْلُ يَا أَبَا جَهْلٍ অর্থাৎ, আবু জাহেল! নরাধম তুই মরেছিস!

দাউদী বলেন, আবু জাহেলকে লজ্জা দিতে ও উত্তেজিত করতে ইবনে মাসউদ (রযি.) এ বাক্য উচ্চারণ করেন। (কস্তলানী)

فَلَوْ غَيْرَ اَكَّارٍ قَتَلَنِىْ (হায় চাষী না হয়ে অন্য কেউ যদি আমাকে হত্যা করতো) ঃ আল্লামা কস্তলানী বলেন, এখানে "لَوْ" শব্দটি شَرْط ও تَمَنِّى (আকাঙ্ক্ষা) উভয়ের জন্য হতে পারে। শর্তের জন্য হলে তখন শর্তের জবাব উহ্য মানতে হবে ঃ لَتَسَلَّيْتُ (তবে আমি সান্ত্বনা পেতাম)। আর تَمَنِّى হলে জবাবের কোন প্রয়োজন নেই। হত্যাকারীকে তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করতে আবু জাহেল এ শব্দ উচ্চারণ করে। কেননা আফরার যে পুত্রদ্বয় তাকে হত্যা করে তারা কৃষিজীবী আনসারী ছিলেন। তাঁদের হাতে নিহত হওয়ায় তার আত্মাভিমানে আঘাত লাগে। তাই সে তাদের প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শন করত এ বাক্য উচ্চারণ করে।

আর অন্য বর্ণনায় আবু জাহেলের যে উক্তি ঃ "وَهَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ قَوْمُهُ" ধ্বনিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য নিজেকে এভাবে সান্ত্বনা প্রদান ছিল যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তার জাতি নিহত করলে তা তার জন্য কোন লজ্জাষ্কর ব্যাপার নয়।

www.e-ilm.weebly.com

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এখানে আবু জাহেল তার সম্পর্ক নিজ গোত্র কুরাইশের দিকে করেছে। অথচ আবু জাহেলকে তার গোত্রের কেউ হত্যা করেনি! এ অপ্রাসঙ্গিক সম্বন্ধের জবাব হলো, আবু জাহেল তার গোত্রের দিকে হত্যার এ সম্পর্ক রূপকভাবে (مَجَازًا) করেছে। কারণ, যদিও তার গোত্র বাস্তবে তাকে হত্যা করেনি, কিন্তু তারা উপলক্ষ ছিল বটে। (কস্তলানী)

كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّيْنَ (বদরী সাহাবীদের বরাদ্দকৃত ভাতা ছিল) ঃ হযরত উমরের শাসনামলে বদরী সাহাবাগণ বাৎসরিক পাঁচ হাজার করে ওজিফা (ভাতা) পেতেন। হযরত উমর (রযি.) থেকে হযরত মালেক বিন আউস (রযি.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রযি.) মুহাজিরদের পাঁচ হাজার, আনসারদের চার হাজার আর রসূল (স.)-এর স্ত্রীদের প্রত্যেককে বার হাজার করে ওজিফা (ভাতা) দিতেন। (ফাতহুল বারী)

قَوْلُهُ أَوَّلُ مَا وَقَّرَ الْإِيْمَانُ فِىْ قَلْبِىْ (এ ঘটনাই সর্বপ্রথম আমার অন্তরে ঈমানের ব্যাপারে গভীর রেখাপাত করে) ঃ বদরে বন্দীদের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে মদীনায় এসে হযরত যুবাইর বিন মুতইম (রযি.) রসূল (স.)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তুর পড়তে শোনেন। মক্কা বিজয়কালীন সময়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামী অনুশাসন পূর্ণরূপে পরিগ্রহণ করেন। অবশ্য ইসলামের মহত্ত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ তার অন্তরে তখনই প্রবিষ্ট হয় যখন তিনি রসূল (স.)-কে সূরা তূর পড়তে শোনেন।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, যুবাইর বিন মুতইম বদরে বন্দীদের মুক্তিপণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করতে মদীনায় এসেছিলেন বিধায় ইমাম বুখারী এ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا (যদি মুতইম বিন আদী জীবিত থাকতেন) ঃ মুতইম বিন আদী বংশের দিক দিয়ে দাদার সূত্রে রসূল (স.)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। বংশ পরিক্রমা হলো, মুতইম বিন আদী বিন নওফল বিন আবদে মানাফ। বদর যুদ্ধের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ঃ অর্থাৎ, মুতইম জীবিত থাকলে তার খাতিরে আমি বন্দীদের বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দিতাম এবং হত্যা করতাম না। রসূল (স.)-এর এ উক্তির কারণ সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বলেন॥

(১) বনু হাশেম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশরা কাবা গৃহে যে অঙ্গীকারনামা লটকিয়ে রেখেছিল, যার কারণে মুসলমানরা শুআবে আবী তালেবে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল তা বাতিল করতে মুতইম প্রাণান্তকর চেষ্টা করেন। তারই নির্দেশে তাঁর চার পুত্র সশস্ত্র অবস্থায় রুকনে কা'বার নিকট অবস্থান নেয়। যা দেখে কুরাইশরা ঘাবড়ে যায় এবং পরিশেষে তারা তা বাতিল করতে বাধ্য হয়।

www.e-ilm.weebly.com

(২) রসূল (স.) তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন করলে মুতইমই তাঁকে আশ্রয় দেন এবং মুশরিকদের প্রতিহত করেন। মুতইম বলেছিলেন, তোমরা মুহাম্মদের প্রতি সবচে বেশি অত্যাচার করেছ। অতএব অন্যায়ের তুলনায় তোমরাই সবচে বেশি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত হও।

(৩) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, রসূল (স.) মুতইম-তনয় যুবাইরের মনোরঞ্জনার্থে একথা বলেন।

قَوْلُهُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْأُوْلٰى (প্রথম অঘটন শুরু হল) ঃ অর্থাৎ, হযরত উসমানের (রযি.) শাহাদাত ভবন ৪৯ দিন বা ১ মাস ২০ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর হিজরী ৩৫ সনের ৮ই জিলহজ্জে হযরত উসমান (রযি.) নির্মমভাবে শহীদ হন।

قَوْلُهُ فَلَمْ يُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ أَحَدًا (ফেতনা বদরী সাহাবীদের একজনকেও জীবিত রাখেনি) ঃ এ উক্তির উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যখন উসমানের (রযি.) শাহাদাতের পরও হযরত আলী, হযরত যুবাইর, হযরত তালহা, হযরত সা'দ, হযরত সাঈদ প্রমুখ অগণিত সাহাবী জীবিত ছিলেন, তখন কিভাবে বলা শুদ্ধ হলো যে, 'উসমান হত্যাকাণ্ড' ফেতনা কোন বদরী সাহাবীকে জীবিত রাখেনি।

উত্তর হলো, হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় পর্যন্ত সকল বদরী সাহাবী ইন্তেকাল করেন—একথা বলা উপরোক্ত বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, হযরত উসমানের শাহাদাতের সময় থেকে দ্বিতীয় অঘটন 'হাররাহ ঘটনা' সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সময়ে সকল বদরী সাহাবীর ইন্তেকাল হয়ে যায়। হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রযি.)[1] সর্বশেষ বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনিও হাররা ঘটনার কয়েক বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়ার (রযি.) মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে বহু সংখ্যক বদরী সাহাবী শাহাদাত লাভ করায় প্রথম ফেতনাটিই ছিল বিপুল সংখ্যক সাহাবীর প্রাণহানির উপলক্ষ।

قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِى الْحَرَّةَ فَلَمْ تُبْقِ مِنْ أَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَةِ أَحَدًا (এরপর দ্বিতীয় বিপর্যয় অর্থাৎ, হাররাহ ঘটনা সংঘটিত হয়। এ বিপর্যয়ে হুদায়বিয়া-সাহাবীদের সকলেই ইন্তেকাল করেন) ঃ মদীনার বাইরে একটি স্থানের নাম হাররা। তেষট্টি হিজরীতে এখানে মুসলমান ও ইয়াযিদ বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় ইয়াযিদ সৈন্যরা মদীনার উপর বিভীষিকাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, হাররা ঘটনার নেপথ্য হলো, মদীনাবাসীগণ কর্তৃক ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন এবং ইয়াযিদ কর্তৃক নিযুক্ত মদীনার শাসক তার চাচাত ভাই উসমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবু সুফিয়ানকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করা। ইয়াযিদের সেনাবাহিনীতে ২৭ হাজার অশ্বারোহী এবং ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। এ যুদ্ধে ৭০০ মুহাজির ও আনসার শাহাদাত বরণ করেন। (আইনী, কস্তলানী)

টীকা ঃ ১. হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রযি.), মৃত্যু ঃ ৫৫ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ (অতঃপর তৃতীয় বিপর্যয় ঘটে) ঃ এ বিপর্যয় সম্বন্ধে বিভিন্নমুখী মন্তব্য রয়েছে। যথা—

(১) কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইরাকের বিখ্যাত ইয়ারাকার ফেতনা। ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তা সংঘটিত হয় এবং দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকে। তবে এ মন্তব্য সঠিক নয়। কারণ, হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া বিন সাঈদ এখানে ফেতনা দ্বারা মদীনায় সংঘটিত কোন ফেতনা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

(২) এ মতামতও পাওয়া যায় যে, এ ফেতনা বলতে ১৩০ হিজরীতে মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান বিন হাকামের শাসনামলে মদীনায় সংঘটিত আবু হামযাতুল খারিজীর ফেতনা উদ্দেশ্য।

(৩) কারো মতে, একাত্তর হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ[২] কর্তৃক হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরকে হত্যা ও কাবাগৃহ ভাংচুরের ঘটনা উদ্দেশ্য। (কস্তলানী)

قَوْلُهُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاخٌ ঃ লামিউদ্ দারীরী গ্রন্থে আছে, খলীল বলেন, طَبَاخٌ বলা হয় ঘি ও শক্তিকে। তা বিবেক ও কল্যাণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। মর্মার্থ হলো, এ ফেতনা এমনিই বন্ধ হয় না; বরং মানুষের অনেক মেধা, শ্রম ও প্রচেষ্টার পর বন্ধ হয়। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২২)

قَوْلُهُ فَجَمِيعُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ قُرَيْشٍ (বদরে উপস্থিত কুরাইশদের সর্বমোট সংখ্যা) ঃ ফতহুল বারীতে আছে, এটা মূসা বিন উকবার বক্তব্যের বাকী অংশ। কিরমানীরও মন্তব্য এটা। তবে অন্যান্যদের উক্তি থেকে অনুমিত হয় যে, এটা ইমাম বুখারীর বক্তব্য।

مِنْ قُرَيْشٍ فَمَنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمٍ احَدٌ وَّ ثَمَانُوْنَ (যে সমস্ত কুরাইশ সাহাবী বদরে অংশগ্রহণ করেন এবং গনিমতের অংশ পান তাদের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে ৮১ জন) ঃ বারা বিন আযেবের বর্ণনায় মুহাজিরদের সংখ্যা ৬০ বা তার থেকে সামান্য বেশি বর্ণিত হয়েছে। এ দু'বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধান এভাবে হতে পারে যে, বারার হাদীসে সশরীরে উপস্থিতদের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। আর এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসে সশরীর ও রূপকভাবে উপস্থিত সকলের সংখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অথবা বলা হবে যে, হযরত বারার হাদীসে শুধুমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিদের বর্ণনা এসেছে আর এ হাদীসে স্বাধীনদের সাথে তাদের গোলাম বা অধীনস্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَا جِرِيْنَ بِمِأَةِ سَهْمٍ (বদর যুদ্ধে মুহাজিরদের জন্য শত হিস্যা বরাদ্দ করা হয়) ঃ এ বর্ণনাটি পূর্বের বর্ণনার বিরোধী নয়। কারণ উক্ত ৮১ জনের মধ্যে কতকের কাছে ঘোড়া ছিল। যার কারণে তাদের অংশ একাধিক হয়েছে। তদুপরি বদর যুদ্ধে শরীক ছিলেন না, বরং রসূল (স.) গুরুত্বপূর্ণ কাজে অন্যত্র প্রেরণ করেছিলেন–এমন কতিপয় সাহাবীর জন্যও রসূল (স.) অংশ নির্ধারণ করেন। সুতরাং এ সমস্ত দিক দিয়ে মুহাজির সংখ্যা ৮১ হলেও গনিমতের অংশ হয় একশ।

টীকা ঃ ২. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মৃত্যু ঃ ৯৫ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ تَسْمِيَةِ مَنْ سُمِّىَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ فِى الْجَامِعِ (বদরী সাহাবী হিসেবে বুখারীতে উল্লিখিত সাহাবাদের নাম) ঃ অর্থাৎ, এ সংকলনের (বুখারী) পূর্বোক্ত অধ্যায় ও সাবেক বর্ণনাসমূহে যে সকল সাহাবীর ব্যাপারে ইমাম বুখারী 'তিনি বদরী' 'তিনি বদরে শরীক ছিলেন' ইত্যাদি ভাষা ব্যক্ত করে যাদের সুস্পষ্টভাবে বদরী সাহাবী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন–এ অধ্যায়ে কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ হবে। এর অর্থ এটা নয় যে, এ গ্রন্থে মোট যত বদরী সাহাবীর নাম রয়েছে, তাদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা হবে। অনুরূপভাবে এ অর্থও নয় যে, এ অধ্যায়ে সমস্ত বদরী সাহাবীদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রযি.) সর্বসম্মতিক্রমে বদরী সাহাবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাম এ অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়নি। (লামিউদ্ দারারী)

كَانَ فِى النَّظَارَةِ (তিনি সি.আই.ডির দায়িত্বে ছিলেন) ঃ হযরত হারেছের (রযি.) ব্যাপারে দু'ধরনের অভিমত রয়েছে। (১) তিনি অল্প বয়স্ক ছিলেন। যুদ্ধের জন্য বদরে যাননি। যুদ্ধের দৃশ্য অবলোকনের নিমিত্ত তথায় যান। আকস্মিকভাবে একটি তীর এসে বিদ্ধ হলে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। (কস্তলানী)

(২) তিনি উঁচু স্থানে থেকে শত্রুদের গতিবিধির উপর নজর রাখতেন। সম্ভবত বিশেষ কোন অন্তরায় হেতু তিনি রণাঙ্গনে যুদ্ধের জন্য যাননি। হতে পারে তিনি মুসলমানদের সি.আই.ডি তথা গুপ্তচর নিযুক্ত হয়েছিলেন। (মেরকাত, লামিউদ্ দারারী)

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লামা দাওয়ানী বলেন, আমরা মাশায়েখে হাদীস থেকে শুনেছি যে, বুখারীতে আগত এ সকল সাহাবীর আলোচনা শেষে দোয়া করলে তা কবুল হয়। বিষয়টি একাধিকবার পরীক্ষিত।

بَابُ حَدِيثِ بَنِى نَضِيرٍ

বনূ-নযীর ঘটনার বিবরণ

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, মদীনায় হিজতোত্তর রসূল (স.)-এর সাথে সম্পর্কের দিক থেকে কাফেররা ছিল তিন প্রকার। (১) যাদের সাথে রসূল (স.)-এর চুক্তি হয় যে, তারা তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুদের মদদ যোগাবে না। ইহুদী তিন সম্প্রদায় (বনূ নযীর, বনূ কুরাইযাহ ও বনূ কায়নুকা) এ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল। (২) যারা রসূল (স.)-এর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ও শত্রুতা পোষণ করত। যেমন কুরাইশ। (৩) যারা রসূল (স.) থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে এবং পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় তা দেখার অপেক্ষায় ছিল। যেমন— আরবের অন্যান্য গোত্র।

এ গোত্রসূহের কেউ কেউ রসূল (স.)-এর বিজয় কামনা করত। যেমন— বনূ খোজাআ, আর কোন গোত্র পরাজয় কামনা করত। যেমন, বনূ বকর। আর কিছু ছিল যারা বাহ্যত রসূল (স.)-এর আর গোপনে দুশমনদের পক্ষাবলম্বন করত। যেমন, মুনাফিকরা।

ইহুদীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ওয়াদা ভঙ্গ করে বনূ কায়নুকা। সে জন্য বদর যুদ্ধের এক মাস পরেই দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে রসূল (স.) তাদের প্রতি আক্রমণ

www.e-ilm.weebly.com

করেন। তিনি তাদেরকে হত্যার পরিকল্পনা নেন, কিন্তু আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইয়ের সাথে তাদের মিত্রতা থাকায় তার একান্ত সুপারিশে রসূল (স.) তাদের ক্ষমা করে দেন। তবে মদীনা থেকে ইজরায়াতে বহিষ্কার করেন। এরপর বনূ নযীর চুক্তি ভঙ্গ করে। তাদের বস্তি মদীনার সন্নিকটে থাকায় রসূল (স.) গোটা বস্তি অবরোধ করেন। ফলে তারা বাধ্য হয়ে দেশান্তরে রাজি হয়। তারা খায়বার ও সিরিয়ায় পাড়ি জমায়। বনূ নযীরের পরে বনূ কুরাইযাহ রসূল (স.)-এর সাথে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে। রসূল (স.) তাদের প্রতিও আক্রমণ করেন। (ফতহুল বারী, আসাহহুস সিয়ার)

বনূ নযীর অভিমুখে কোচ করার কারণ

হিজরতের পর রসূল (স.) মদীনা ও তার আশপাশের গোত্রের সাথে নিছক মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে এক মিত্রচুক্তি করেন। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না। কারণ, একদিকে মুসলমানদের সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না। পক্ষান্তরে সারা আরব ছিল এ ক্ষুদ্র দলের শত্রু। যাদের সাথে রসূল (স.) চুক্তিবদ্ধ হন তাদের মধ্যে বনূ নযীরও ছিল। মদীনার দু'মাইল দূরত্বে তাদের বাগ-বাগিচা ও কেল্লা ছিল। তারা রসূল (স.)-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করলে রসূল (স.) তাদের প্রতি হামলা করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ—

وَاقِعَةُ بَنِى نَضِيْرٍ

বনূ নযীর ট্রাজেডী

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'বি'রে মাউনা'-এর করুণ ট্রাজেডী সংঘটিত হয়। 'কারী' বলে প্রসিদ্ধ সতেরজন সাহাবা এ ট্রাজেডীর শিকার হয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শহীদ হন। তাদের মধ্যে আমর বিন উমাইয়া জমরীও (রযি.) ছিলেন। তিনি এ মুষ্টিমেয় সৈন্যদলের প্রধান দায়িত্বশীল ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান, তবে গ্রেপ্তার হন। 'বীরে মাউনা' ঘটনার মূল নায়ক আমের বিন তুফাইল তার মায়ের পক্ষ থেকে তাকে আযাদ করে দেয়। তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন পথিমধ্যে 'করকরাহ্' নামক স্থানে মদীনা হতে আগত বনূ কিলাব (বনূ আমের) এর দু'ব্যক্তির দেখা পান। আমর বিন উমাইয়া কারী সাহাবীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ঘুমন্তাবস্থায় তাদের দু'জনের ভবলীলা সাঙ্গ করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তারা ছিল রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ। আমর বিন উমাইয়ার তা জানা ছিল না। আমর বিন উমাইয়া মদীনায় এসে রসূল (স.)-কে সকল ঘটনা খুলে বললে রসূল (স.) বললেন, বনূ কিলাবের রক্তপণ (দিয়াত) আদায় করে দিতে হবে। যেহেতু বনূ নযীর বনূ কিলাবের মিত্র ছিল তাই রসূল (স.) নিহত দু'জনের রক্তপণের ব্যাপারে আলোচনা করতে বনূ নযীরের কাছে যান। তারা বাহ্যত অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করে এবং রসূল (স.)-কে একটি দেয়ালের পাশে বসতে দেয়। এ দিকে তারা রসূল (স.)-এর প্রাণনাশ করতে দেয়ালের উপর থেকে তার মস্তকোপরি পাথর নিক্ষেপের গভীর ষড়যন্ত্র করে। হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বিষয়টি রসূল (স.)-এর গোচরীভূত করলে তিনি এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। (কস্তলানী)

www.e-ilm.weebly.com

কার্যত বনূ নযীর এভাবে চুক্তি ভঙ্গ করলে রসূল (স.) এ মর্মে সংবাদ পাঠান যে, তোমাদেরকে দশ দিনের সুযোগ দেয়া হল। এখান থেকে চলে যাও। অন্যথা এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেই হত্যা করা হবে। তারা দেশান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের ঠেকিয়ে রাখে এবং এ আশ্বাস প্রদান করে যে, তোমরা স্থান ত্যাগ করো না, আমরা দু'হাজার লোক তোমাদের সাহায্যে প্রস্তুত। রসূল (স.) যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন। দীর্ঘ ছয়দিন তাদের অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই কিংবা বনূ গাতফান কেউ এ দুর্দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় না। (আসাহহুস সিয়ার)

كَانَتْ عَلٰى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ قَبْلَ أُحُدٍ (ঘটনাটি উহুদের পূর্বে ও বদর যুদ্ধের ছয় মাসের মাথায় সংঘটিত হয়) ঃ এটা ইমাম বুখারীর অভিমত বিধায় তিনি বনূ নযীর ঘটনাকে উহুদ ও বীরে মাউনার পূর্বে উল্লেখ করেছেন এবং উরওয়ার বর্ণনার সাহায্যে তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সকল ঐতিহাসিকের মতে এ ঘটনা বীরে মাউনার পরেই সংঘটিত হয়। কেননা, যে দু'ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের নিমিত্তে রসূল (স.) বনূ নযীরে যান, তা হাদীস বিশারদ (মুহাদ্দিস) ও ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মতিক্রমে বীরে মাউনার পরে চতুর্থ হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসের ঘটনা। রক্তপণের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর বনূ নযীরে যাওয়ার কথা খোদ ইমাম বুখারীও বর্ণনা করেছেন। বনূ নযূর ট্রাজেডী প্রসঙ্গে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) আবু দাউদ ও বায়হাকীর উদ্ধৃতি দিয়ে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন–

ইহুদীরা রসূল (স.)-এর সমীপে এ মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি ত্রিশজন সাহাবী নিয়ে আসুন। আমাদেরও ত্রিশজন আসছে। রসূল (স.) ত্রিশজন সাহাবা নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে এলে ইহুদীরা একে অপরকে বলল, কিভাবে তোমরা তাঁর (রসূলের) প্রাণনাশের আশা করছ? অথচ তাঁর সাথে ত্রিশজন সাহাবা রয়েছে, যাদের প্রত্যেকে তাঁর (রসূলের) পূর্বে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। তার চেয়ে এ মর্মে সংবাদ পাঠাও যে, আমাদের ষাটজনের সাথে আপনি কিভাবে সাক্ষাৎ করবেন! বরং আপনি তিনজন সাহাবী নিয়ে আসুন। আমাদেরও তিনজন আলেম আপনার কাছে যাবে! রসূল (স.) তিনজন সাহাবী নিয়ে রওনা হন। অপরদিকে তিন ইহুদীও রওনা হয়। তবে তাদের প্রত্যেকের কাছে খঞ্জর লুকানো ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল রসূল (স.)-এর প্রাণনাশ।

এ বর্ণনা বিশুদ্ধ হলে বদরের পরে বনূ নযীর যুদ্ধ উল্লেখের একটা অর্থ হতে পারে। তবে তখনও এ প্রশ্ন রয়ে যায় যে, তাহলে ইমাম বুখারী রক্তপণের ঘটনা কেন বর্ণনা করলেন? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, হতে পারে লেখক বনূ নযীর ঘটনার দ্বিতীয় কারণের প্রতি ইঙ্গিত করতে ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

(লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৪)

www.e-ilm.weebly.com

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ (প্রথম নির্বাসন) ঃ বনূ নযীরের প্রথম নির্বাসন মদীনা থেকে খায়বার আর দ্বিতীয় নির্বাসন খায়বার ও আরব উপদ্বীপ থেকে সিরিয়া রাষ্টে ছিল। যা হযরত উমর (রযি.)-এর শাসনামলে সংঘটিত হয়। (লামিউদ্ দারারী)

বনূ নযীর যুদ্ধের ফলাফল

এ যুদ্ধের ফলে বনূ নযীরের উপর কেয়ামত সৃষ্টি হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের সূরা হাশরে তার বিবরণ রয়েছে। তারা আপন বাসস্থান ও কেল্লা ছেড়ে খায়বার চলে যায়। তাদের পুরো এলাকা মুসলমানদের কব্জায় চলে আসে।

حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ (কুরাইজাও সন্ধি ভঙ্গ করত যুদ্ধে লিপ্ত হল) ঃ বনু নযীরের ন্যায় বনূ কুরাইজাও চুক্তি ভঙ্গ করল। ইহুদীদের বড় বড় নেতা সাল্লাম বিন মুশকিম, সালাম বিন আবুল হুকাইক (আবু রাফে'), কেনানা ইবনে রবী প্রমুখ আরবের গোত্রে গোত্রে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে একযোগে মদীনা আক্রমণ করতে অনুপ্রাণিত করে। তাদের উস্কানীতে বিভিন্ন গোত্রের দশ হাজার আরব মুসলমানদের উপর আক্রমণে উদ্যত হয়। যা থেকে পরিত্রাণ পেতে মুসলমানদের খন্দক (পরিখা) খননের প্রয়োজন পড়ে। কারণ এ ছাড়া মদীনা রক্ষা সম্ভবপর ছিল না। তাই মুসলমানরা স্ত্রী-সন্তান মদীনায় রেখে সালা' পর্বতের কোণ ঘেঁষে পরিখা খনন করত তথায় অবরুদ্ধভাবে অবস্থান করেন। বিভিন্ন গোত্রের সম্মিলিত শত্রুবাহিনী এসে তাদের ঘিরে রাখল। মুসলমানরা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে গেলেন। সেখান থেকে বের হয়ে মদীনায় গিয়ে পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এদিকে সংবাদ রাষ্ট্র হল যে, বনূ কুরাইজা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। রসূল (স.) ঘটনার সঠিক তদন্ত করতে হযরত সাদ বিন মুয়াজ ও খাওয়াত বিন যুবাইরকে (রযি.) প্রেরণ করেন। খবরের সত্যতা প্রমাণিত হল। মূলত এ কারণেই আহযাব (খন্দক) যুদ্ধ হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পরপরই হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বনূ কুরাইজার প্রতি আক্রমণ করতে বলেন। এ যুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ অংশ নেন। তারা দীর্ঘ পঁচিশ দিন বনু কুরাইজাকে অবরোধ করে রাখেন। এ যুদ্ধ ৫ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে সংঘটিত হয়।

ফলাফল ঃ কোন শর্ত ছাড়াই বনূ কুরাইজা আনুগত্য স্বীকারে সম্মত হল। তাদের সকল পুরুষকে হত্যা ও সন্তান-সন্ততি গ্রেফতার করা হয়। বণ্টন করে দেয়া হয় মুসলমানদের মধ্যে তাদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ।

وَأَجْلَا يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ بَنِى قَيْنُقَاعِ (রসূল মদীনার বনূ কায়নুকার সকল ইহুদীকে সমূলে উচ্ছেদ করে দেন) ঃ ইহুদীদের এ সম্প্রদায় মদীনার নিকটেই থাকত। বদর যুদ্ধের পর সর্বপ্রথম তারাই চুক্তি লংঘন করে এবং যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনা ছিল—

এক আরব মহিলা তাদের বাজারে গেলে এক দোকানদার অসদাচরণ ও তাকে বিবস্ত্র করে দেয়। অন্যান্যরা হাসতে থাকে। মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠলে এক আরব

www.e-ilm.weebly.com

এসে দোকানদারকে হত্যা করে ফেলে। এতে ইহুদীরা চতুর্দিক থেকে সমবেত হল। ফলে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এ সংবাদ শ্রবণে রসূল (স.) দ্রুত অকুস্থলে আসেন এবং খুবই ভর্ৎসনা করেন। এতে বনূ কায়নুকা অসন্তোষ প্রকাশ করে হুমকি প্রদান করে যে, বদরে বিজয় লাভ করায় আত্মপ্রসাদে মগ্ন হয়ো না। তারা তোমাদের যুদ্ধানাড়ী সম্প্রদায় ছিল। আমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধলে তখন বুঝবে যুদ্ধ কাকে বলে। এর দ্বারা কার্যত তারা চুক্তি লঙ্ঘন করে। ফলে রসূল (স.) তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে শনিবার দিন তাদের উপর আক্রমণ করেন। দীর্ঘ পনের দিন অবরোধ বলবৎ থাকে। (আসাহুস্ সিয়ার)

ফলাফল ঃ বনূ কায়নুকা ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। তারা বিনা শর্তে রসূল (স.)-এর আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং মদীনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। মদীনার অভ্যন্তর ইহুদীমুক্ত হলো।

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ (যে খর্জুর বৃক্ষ তোমরা কেটেছ) ঃ কতক সাহাবা ইহুদীদের রাগান্বিত করতে তাদের গাছ কেটে দেন। কেউ কেউ জ্বালিয়ে দেন। আবার কেউ কেউ জ্বালানো কিংবা কাঁটা হতে বিরত থাকেন এই ভেবে যে, পরিশেষে বিজয় তো আমাদেরই হবে। এ বিষয়ে সাহাবাদের মধ্যে পরস্পরে আলোচনা হলে, যারা গাছ কেটেছিলেন বা জ্বালিয়েছিলেন, তাদের চিন্তা হল হয়ত আমাদের অপরাধ হয়ে গেছে। এতদ্ব্যতীত খেজুর গাছ কর্তন ও প্রজ্বলন সম্পর্কে ইহুদীদের অপবাদ ছিল যে, এটা অনর্থকতা বৈ নয়। আর অনর্থকতা নিন্দনীয়। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

এ আয়াতে যারা গাছ কেটেছিলেন এবং জ্বালিয়েছিলেন, তাদের এ কাজকে বৈধ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর যারা বিরত থাকেন তাদেরকেও সমর্থন করা হয়েছে।

شِعْر : وَهَانَ عَلٰى سَرَاةِ بَنِىْ لُؤَىِ الخ ঃ এ শেরের (কবিতার) ব্যাখ্যা নিম্নরূপ— কুরাইশ ও বনূ নযীরের মধ্যে চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বনূ নযীরের চরম দুর্দিনে যখন কুরাইশরা তাদের সাহায্যের জন্য কোন পদক্ষেপ নিল না, তখন রসূল (স.)-এর কবি হযরত হাস্‌সান বিন সাবেত (রযি.) তাদেরকে লজ্জা প্রদানপূর্বক বলেন, বনূ নযীরদের খর্জুর বিথীকা, যা মুসলমানদের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে, তা রক্ষার্থে কুরাইশরা কোনই উদ্যোগ নেয়নি। যার দ্বারা বুঝা যায় যে, তাদের ঐ বাগিচা ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারটি বনূ লুয়াই তথা কুরাইশ সর্দাররা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেছে। অন্যথা তা রক্ষার্থে অবশ্যই তারা কৌশল ও উদ্যোগ গ্রহণ করত।

প্রত্যুত্তরে আবু সুফিয়ান (তিনি তখন পর্যন্ত মুসলমান হননি) বলেন, আল্লাহ্ এ কাজটি সর্বদা বহাল রাখুন এবং তার আশপাশকে (অর্থাৎ, পুরো মদীনাকে) ঐ আগুনে ভস্মীভূত করুন।

نَوَاحِيْه ঃ এর দ্বারা মদীনা ও তার চার পার্শ্বস্থ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা উদ্দেশ্য। (আবু সুফিয়ান বলেন) শীঘ্রই জানা যাবে যে, আমাদের (কাফের ও মুসলমান) মধ্য হতে কাদের এলাকা (মক্কা না মদীনা) সে অগ্নি কবলিত হয়।

www.e-ilm.weebly.com

وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِى الَّتِى اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ بَنِى النَّضِيْرِ (বনূ নযীর হতে আল্লাহ্ যে সম্পদ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন সে ব্যাপারে তারা দু'জন বাদানুবাদে লিপ্ত হয়) ঃ فَىْءٌ (ফাই)-এর আভিধানিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। শরীয়তের পরিভাষায় (ফাই) হলো, ঐ সম্পদ যা যুদ্ধ-জিহাদ ব্যতিরেকে কাফেরদের থেকে মুসলিম বাহিনী অর্জন করে। তবে বিভিন্ন বর্ণনা পর্যালোচনা থেকে জানা যায় যে, যে সকল মাল ও জমিন যে কোন প্রক্রিয়ায় রসূল (স.)-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাকে 'ফাই' বলে।

নবী করীম (স.)-এর পরিত্যাজ্য সহায়-সম্পত্তি

আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, রসূল (স.)-এর মালিকানায় চার ধরনের জমি ছিল।

(১) মানুষদের হেবাকৃত জমি। যেমন, বনূ নযীরে অবস্থিত ৭টি স্থান, যা মুখায়রিক নামক এক ইহুদী উহুদ যুদ্ধের দিন রসূল (স.)-কে দান করেন।

(২) বনূ নযীরদের ঐ জমি, যা রসূল (স.) 'মালে ফাই' হিসেবে পেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে ফাদাকের অর্ধ ভূমি।

(৩) কুরা উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ জমি।

(৪) খায়বারের দু'কেল্লা, যা রসূল (স.) তাদের সাথে সন্ধির ফলে লাভ করেন।

উল্লিখিত জমিগুলো রসূল (স.)-এর কব্জায় ছিল। এতে অন্যের অধিকার ছিল না। তবে রসূল (স.) তা কেবল নিজের কাজে ব্যয় করতেন না; বরং তা থেকে তাঁর পরিবার-পরিজনদের আহার্য ও খরচাও প্রদান করতেন। অবশিষ্ট যা থাকত, তা মুসলমানদের কল্যাণকর খাতে ব্যয় করতেন। আল্লামা নববী (রহ.) নিজ ভাষায় এ কথাটিই ব্যক্ত করেছেন।

রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর এ সকল জমি নিয়ে প্রখ্যাত সাহাবাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। হযরত আলী, ফাতেমা ও হযরত আব্বাস (রযি.) দাবী করেন যে, এ সকল সম্পত্তিতে রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল। ফলে যেরূপভাবে প্রত্যেক মুসলমানের মালিকানা তার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়, তেমনি এ সম্পত্তিও রসূল (স.)-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রযি.), হযরত উমর (রযি.)সহ অন্যান্য সাহাবা এ মত পোষণ করতেন যে, এগুলো রসূল (স.)-এর ব্যক্তিগত মালিকানাভুক্ত ছিল না। কেননা নবীদের মালিকানা (স্বত্বাধিকার) প্রতিষ্ঠা হয় না। অতএব এতে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপনের কোনই অবকাশ নেই।

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ خَصَّ رَسُوْلَهُ فِى هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক বনূ নযীরদের থেকে অর্জিত 'মালে ফাই' স্বতন্ত্রভাবে রসূল (স.)-কে প্রদান করেন। অন্য কেউ তা পাননি। কারণ, এ মাল সম্পূর্ণ বিনা যুদ্ধে অর্জিত হয়। অতএব এ সমস্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব একচেটিয়া রসূল (স.)-এর। তিনি

www.e-ilm.weebly.com

যথা ইচ্ছা ব্যয় করতে পারেন। বস্তুত এ কারণেই রসূল (স.) গনিমতের মাল (যুদ্ধলব্ধ)-এর ন্যায় মালে ফাইকে মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করেন না। কেবল মুহাজিরদেরকে তা প্রদান করেন। আনসারদেরকে কিছু দেননা। শুধু বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তিন আনসারকে তা প্রদান করেন। হযরত উমর (রযি.) নিজের এ উক্তিকে আল্লাহ্র ইরশাদ وَمَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا ....الخ-এর দ্বারা প্রমাণ করেছেন।

মালে ফাই ব্যয়ের খাত

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, গনিমতের এক পঞ্চমাংশ (খুমুস) ও মালে ফাই-উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই। উভয় জাতীয় কোষাগারে (বায়তুল মালে) জমা দিতে হবে। অতঃপর ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যেভাবে ভাল মনে করেন সেভাবে রসূল (স.)-এর আত্মীয়বর্গকে প্রদান করবেন।

পক্ষান্তরে সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম 'মালে ফাই' ও গনিমতের খুমুসের মধ্যে ব্যবধান আছে বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, গনিমতের খুমুসের ব্যয় খাত হল, যা কুরআনের সূরা আনফালের আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। তা ব্যতীত অন্য খাতে ব্যয় করা জায়েয নেই। আর মালে ফাইয়ের খাত ইমামের কৃপাদৃষ্টির উপর নির্ভর। তিনি যেখানে শ্রেয় মনে করেন সেখানে জনস্বার্থে ব্যয় করতে পারেন। তাঁরা হযরত উমরের (রযি.) উক্তি— فَكَانَتْ هٰذِهٖ خَالِصَةً لِّرَسُوْلِ اللّٰهِ অর্থাৎ, "এ মালে ফাইটা রসূল (স.)-এর একান্ত ব্যক্তিগত"-দ্বারা নিজেদের অভিমত প্রমাণিত করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের মতে, মালে ফাই-এর এক পঞ্চমাংশ জাতীয় কোষাগারে প্রদান করতে হবে না। শুধুমাত্র ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, মালে ফাই থেকেও এক পঞ্চমাংশ জাতীয় কোষাগারে প্রদান করতে হবে। (হাশিয়ায়ে সুনানে আবী দাউদ ঃ মুফতী আমীমুল ইহসান[১] প্রণীত)

لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ (নবীগণের পরিত্যাজ্য সম্পত্তি ছদকা, বিধায় তার উত্তরাধিকারী আমাদের পক্ষ হতে কেউ হয় না) ঃ এর কারণ হলো, নবীদের মালিকানায় সম্পদ সঞ্চিত হয় না। যার ফলে তাতে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। নবীদের মালিকানায় সম্পদ সঞ্চিত না হওয়ার অনেক তাৎপর্য রয়েছে।

(১) যদি তাঁরা সঞ্চয়মুখী হতেন, তবে তাদের গুরুদায়িত্ব তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসার কার্য বিঘ্নিত ও ব্যাহত হত।

(২) যদি তাঁদের মালিকানায় সম্পদ সঞ্চিত হত, তবে সম্ভাবনা ছিল যে, মানুষ সম্পদের লোভে তাদের দলে ভিড়ত এবং ঈমান আনয়ন করত। ফলে মানুষের ঈমান আনয়নটা পার্থিব স্বার্থে হতো; আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হতো না।

টীকা ঃ ১. মুফতী আমীমুল ইহসান (রহ.) বাইতুল মুকাররমের ভূতপূর্ব খতীব এবং বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। قواعد الفقه সহ তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন। ১৩৯০ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

(৩) যদি তারা সম্পদের প্রতি আকর্ষিত হতেন, তাহলে মানুষ ধারণা করত যে, তিনি নিজের উত্তরাধিকারের জন্য অর্থ-সম্পদ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ধর্মের ফাঁদ ও জাল পেতেছেন। ফলে তারা তাদের নিকট আগমন ও ঈমান আনয়ন থেকে বিরত থাকত।

এ সমস্ত কারণে পঙ্কিল দুনিয়ার সাথে না জড়িয়ে সকল সন্দেহ-সংশয় থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে কেবল সত্যের প্রচার-প্রসারের গুরুদায়িত্ব সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ পাক নবী-রসূলগণকে মানুষদের প্রতি প্রেরণ করেন। (বুখারী প্রভৃতির পার্শ্বটিকা)

فَلِذَالِكَ حَرَّمَ الْمِيْرَاثَ عَلٰى أَهْلِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَاتِ (মূলত এ কারণেই আল্লাহ্ পাক যেমনিভাবে নবী পরিবারের জন্য সদকা গ্রহণ হারাম করেছেন তেমনি মীরাস ছেড়ে যাওয়াও হারাম করেছেন)ঃ এতদসত্ত্বেও নবীগণের পরিত্যক্ত সম্পদ সদকায়ে পরিণত হওয়ার তাৎপর্য হলো ঃ

(১) হতে পারে নবীগণের উত্তরাধিকারদের মধ্যে কতেক লোক এমন হবে, যারা মীরাস (উত্তরাধিকার সম্পত্তি) পাবার লোভে নবীদের মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হবে। তখন তার ধ্বংস হবে অনিবার্য।

(২) নবীগণ নিজ নিজ উম্মতের জন্য পিতাস্বরূপ। ফলে সঙ্গত কারণে তাদের সঞ্চয়ে যাই থাকুক না কেন তা সকল সন্তান তথা গোটা উম্মত তা পাবার দাবী রাখে; অথচ বাস্তবে তা হতে পারে না। তাই এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত যে, তাঁদের পরিত্যাজ্য সম্পত্তি জনকল্যাণেই ব্যয়িত হবে।(ব্যক্তিগতভাবে কেউ তা পাবে না।)

مَا احْتَازَهَا دُوْنَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَهَا بِهَا عَلَيْكُمْ (তিনি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে সম্পদ সঞ্চিত করেননি এবং তোমাদের উপর নিজেকে প্রাধান্য দেননি) ঃ এ বাক্য থেকে জানা যায় যে, বনূ নযীর থেকে অর্জিত মালে রসূল (স.)-এর একক অধিকার থাকা সত্ত্বেও তিনি তা কেবল নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করতেন না; বরং প্রয়োজনানুপাতে নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং অন্যান্য অভাবগ্রস্তদের মাঝেও ব্যয় করতেন।

فَجِئْتَنِيْ يَعْنِيْ عَبَّاسًا (অতঃপর আব্বাস, আপনি আমার কাছে এসেছেন) ঃ এ অংশ পূর্বোক্ত ثُمَّ جِئْتُمَانِيْ অর্থাৎ, আপনারা দু'জন (আব্বাস ও আলী) আমার কাছে এসেছেন৷উক্তির বিরোধী নয়। কারণ, হতে পারে পূর্বে দু'জন এক সাথে আসেন অতঃপর হযরত আব্বাস একা আসেন।

فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا অর্থাৎ, অধিকার অনুপাতে আপনাদের দু'জনকে ঐ জমি থেকে উপকৃত হওয়ার কর্তৃত্ব প্রদান করেছি মাত্র; তার মালিক বানানো হয় নি।

فَكَانَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ مَنَعَهَا عَلٰى عَبَّاسٍ - (এটা আলীর নিয়ন্ত্রণাধীন ছদকার জমি যার দেখাশুনা করা হতে আলী (রযি.) হযরত আব্বাসকে বিরত রাখেন) ঃ হযরত উসমান (রযি.)-এর শাসনামলে হযরত আব্বাস (রযি.) ঐ জমির দাবী ছেড়ে দিলে হযরত আলী (রযি.) তাতে বাধা প্রদান করেন। হযরত

www.e-ilm.weebly.com

মা'মারের বর্ণনায় এটুকু অতিরিক্ত এসেছে যে, দীর্ঘদিন ঐ জমি (বংশানুক্রমে) হযরত আব্দুল্লাহ বিন হাসানের কর্তৃত্বে থাকে। অতঃপর বনূ আব্বাস তার অভিভাবক হয়ে তা নিজের অধিকারে নিয়ে নেয়।

এ ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত আলী (রযি.)-এর বংশধরদের পরে ঐ জমি হযরত আব্বাস (রযি.)-এর বংশধরদের অধীনে এসেছিল।

(লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬)

হাদীসের উপর উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জবাব

আলোচ্য হাদীসের উপর একাধিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। যথা॥

প্রথম প্রশ্ন ঃ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আলী (রযি.) ও আব্বাস (রযি.) রসূল (স.)-এর উক্তি لَانُوْرِثُ مَاتَرَكْنَا صَدَقَةٌ সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তাহলে উভয়ে এ হাদীস শুনে থাকলে কিভাবে হযরত আবু বকর (রযি.)-এর কাছে আবার উত্তরাধিকারত্ব দাবী করলেন? আর যদি হযরত আবু বকর (রযি.)-এর থেকে শুনে থাকেন তাহলে আবার হযরত উমর (রযি.)-এর কাছে কিভাবে দাবী করলেন?

প্রথম প্রশ্নের জওয়াব ঃ বজলুল মাজহুদ প্রণেতা [১] এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, হতে পারে হযরত আবু বকরের কাছে দাবী করার সময় হাদীসটি তাদের জানা ছিল না। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, পূর্ব হতেই জানতেন, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলেন। সুতরাং যখন তারা আবু বকর (রযি.)-এর থেকে হাদীসটি শুনলেন এবং আবু বকর (রযি.) তাদেরকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন তখন এরপরে গিয়ে তাঁরা হযরত উমরের (রযি.) কাছে উত্তরাধিকারত্বের দাবী করেননি; বরং এটা দাবী করেন যে, উক্ত সম্পদ তাদেরকে অভিভাবকত্বের ভিত্তিতে অর্পণ করা হোক। হযরত উমর (রযি.) এক বিশেষ অঙ্গীকার ও ওয়াদা নিয়ে তাদেরকে ঐ জমির কর্তৃত্ব হস্তান্তর করেন। এরপর তাদের পরস্পরের মধ্যে বাদানুবাদ হলে প্রত্যেকেই দাবী করেন যে, অর্ধেক অর্ধেক করে জমি তাদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হোক। কিন্তু হযরত উমর (রযি.) এ দাবী মঞ্জুর করলেন না। কেননা, যদি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হত, তবে পরবর্তীতে তাকে তাদের উত্তরাধিকারী সম্পত্তি হিসেবে মনে করা হতো।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, হযরত আলী ও ফাতেমা (রযি.) মিরাস দাবী করাকে নিজেদের হক বলে মনে করতেন। কারণ তাদের মতে হাদীসটি عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ। (অর্থাৎ, ব্যাপক অর্থবোধক হলেও তা ক্ষেত্র বিশেষে সীমিত।) অর্থাৎ, ভূমির ব্যাপারটা হাদীসলব্ধ হুকুমের অন্তর্গত নয়। তখন মিরাসের দাবী উত্থাপন হাদীসের বিরোধ হয় না। (লামিউদ্ দারারী)

টীকা ঃ ১. হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.), তিনি ১৩৪৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তবে এ গ্রন্থটি প্রণয়নে শায়খুল হাদীস হযরত জাকারিয়া (রহ.)-এর বিরাট অবদান রয়েছে। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ খলীফা হযরত উমর (রযি.) হযরত আলী ও হযরত আব্বাসকে (রযি.) অবশেষে যখন দিলেনই, তবে প্রথমে দিলেন না কেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রথমে দেননি মালিকানা হিসেবে, আর পরবর্তীতে যা দেন, তা ছিল চাষাবাদের জন্য মাত্র। অতএব এ প্রশ্ন ভিত্তিহীন।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রযি.) উভয়ে হযরত উমর (রযি.) কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী মেনে নিয়ে যখন উক্ত জমি গ্রহণ করেন তখন তাদের মধ্যে আবার বাদানুবাদ কেন হল?

তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব ঃ হযরত উমর (রযি.) জমিটি তাদেরকে শেয়ার পদ্ধতিতে চাষের জন্য প্রদান করেন। কিন্তু এতে তাদের আপসে অসুবিধা দেখা দেয়। তাই তাঁরা চান যে, জমি তাদের মধ্যে সমভাবে অর্ধাধি ভাগ করে দেয়া হোক। যাতে তারা নিজেদের ইচ্ছামত নিজ নিজ অংশে চাষাবাদ করতে পারে। কিন্তু হযরত উমর তাদের এ দাবী মঞ্জুর করেন নি। কারণ, ভাগ হয় মালিকানা সম্পত্তি; আর এতে তাদের মালিকানা ছিল না। দ্বিতীয়ত যদি তিনি ভাগ করে দিতেন তবে পরবর্তীতে উক্ত জমিতে তাদের স্বত্বাধিকারের ধারণা সৃষ্টি হত।

চতুর্থ প্রশ্ন ঃ শিয়া সম্প্রদায় এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করে যে, হযরত আবু বকর ও উমর (রযি.) হযরত আলী (রযি.)-এর অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তার প্রতি অবিচার করেছেন।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর ঃ শিয়া সম্প্রদায়ের এ অভিযোগ তখনই সঠিক বলে বিবেচিত হবে, যখন উক্ত জমিতে হযরত আলী (রযি.)-এর মালিকানা থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হবে। অথচ কোন দলীল দ্বারা তা প্রমাণিত নয়। কেননা, উক্ত সম্পদ যে অবস্থায় হযরত আবু বকর ও উমরের যুগে ছিল, হুবহু সে অবস্থায় হযরত আলীর শাসনামলেও ছিল। বিন্দুমাত্রও পরিবর্তন হয়নি। অতএব তাদের দাবী ভিত্তিহীন।

পঞ্চম প্রশ্ন ঃ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত আব্বাস (রযি.) হযরত আলী (রযি.)-এর প্রতি মিথ্যুক, প্রতারক, গাদ্দার, পাপী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়!

পঞ্চম প্রশ্নের জওয়াব ঃ এ সমস্ত শব্দ এখানে তার বাস্তব অর্থে ব্যবহৃত নয়; বরং হযরত আব্বাস (রযি.) এ শব্দাবলী মিষ্ট ধমক ও কৌতুকাচ্ছলে বলেছেন মাত্র। উদ্দেশ্য ছিল হযরত আলীকে মধুর ভাষায় ভর্ৎসনা করা। (কেননা তিনি আপন ভাতিজা হয়েও চাচাকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি।)

ষষ্ঠ প্রশ্ন ঃ কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, হযরত ফাতেমা হযরত আবু বকরের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। হযরত আবু বকরকে শেষ পর্যন্ত রসূল (স.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণ করতে হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্নের জওয়াব ঃ প্রথম জওয়াব হলো, হযরত আবু বকর (রযি.) হাদীস لَانُوَرِّثُ الخ-কে ব্যাপক অর্থবোধক মনে করেন। পক্ষান্তরে হযরত ফাতেমা প্রমুখ হাদীসটিকে عَامٌّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ বলে বিশ্বাস করেন এবং ভূমি-সম্পত্তি হাদীসের অন্তর্গত নয় বলে মনে করেন।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় জওয়াব হলো, বায়হাকী শা'বী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইন্তেকালের পূর্বে হযরত আবু বকর (রযি.) হযরত ফাতেমার সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে আর কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না। বিস্তারিত জওয়াব সামনে আসছে। وَاللّٰهِ لَقَرَابَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِىْ

(আল্লাহ্র কসম, আমার আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা রসূলের আত্মীয়-স্বজনকে তুষ্ট করা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়) ঃ এটা হযরত আবু বকরের পক্ষ হতে মীরাস না দিতে পারায় দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ। অর্থাৎ, যদিও আমি এ হাদীসের ভিত্তিতে মিরাস দিতে পারিনি, তবে ভিন্ন পন্থায় তার বদলা দিয়ে তুষ্ট করতে পারি। এতে হাদীসের খেলাপ হবে না।

بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

কা'ব বিন আশরাফ হত্যাকাণ্ড

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) ফাতহুল বারী গ্রন্থে ইবনে ইসহাকের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কা'ব বিন আশরাফ আরবী বংশোদ্ভূত ছিল। সে আরবের তাঈ গোত্রের এক উপশাখা বনূ মাবহানের লোক ছিল। জাহেলী (বর্বর) যুগে তার পিতা এক হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হলে ফেরার হয়ে মদীনায় উপনীত হয়। সেখানে বনূ নযীরকে মিত্ররূপে গ্রহণ ও আকীলা বিনতে আবুল হুকাইককে বিবাহ করে। এ গর্ভেই কাব জন্মলাভ করে। তবে আল্লামা আইনীসহ অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ বলেন যে, কা'ব ইহুদী কুরাজী ছিল; আরব নয়।

বদর যুদ্ধে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিহত হওয়ার পর রসূল (স.) ইহুদীদের বড় বড় নেতাদের ভবলীলা সাঙ্গ করতে মনোযোগী হন। এ পর্যায়ে কা'ব বিন আশরাফ এবং আবু রাফে'র হত্যাকাণ্ড ঘটে।

কা'ব বিন আশরাফ ইহুদী কবি ছিল। সে রসূল (স.) ও সাহাবাদের স্ত্রীদের নিন্দাবাদ করত। স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে নবী করীম (স.) ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে মক্কার মুশরিকদের উত্তেজিত করত।

وَمَعَهُ أَبُوْ نَائِلَةَ (তার সাথে আবু নায়েলা ছিল) ঃ আবু নায়েলার নাম সাদ। উপাধি সালকানুল আনসারী। মুহাম্মদ বিন মুসলিমের মত তিনিও কাব বিন আশরাফের দুধ ভাই ছিলেন। কাব বিন আশরাফ ঘাতকদের মধ্যে তিনিও ছিলেন।

قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدَّمُ (তার স্ত্রী বলল, আমি রক্ত নির্ঝর একটি আওয়াজ শুনছি) ঃ কাব বিন আশরাফের স্ত্রীর এ অনুভবের কারণ এটা হতে পারে যে, সে জ্যোতিষী ছিল। অথবা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে সে বিষয়টি বুঝতে পারে। (লামিউদ্ দারারী)

إِنَّ الْكَرِيْمَ لَوْ دُعِىَ إِلَى طَعْنَةٍ ঃ এটা কা'ব বিন আশরাফের পক্ষ হতে তার স্ত্রীর উক্তির জবাব। অর্থাৎ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গভীর রাতেও যদি যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি আহ্বান করা হয়, তবুও তাতে সাড়া দেয়া তার কর্তব্য। আর এখানে সে ধরনের আশঙ্কার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, তারা উভয়ে আমার ভাই। কেবল ঋণ

www.e-ilm.weebly.com

গ্রহণ করবে বলেই তারা আমাকে ডাকছে। অতএব আমি কিভাবে সাড়া দিব না? আর তাদের রাতে আসার কারণ শুধু এই ছিল যে, যাতে লেন-দেনের এ ব্যাপারটি গোপন থাকে। (লামিউদ্ দারারী)

وَقَالَ غَيْرُ عَمْرٍو الخ ঃ এ ব্যাখ্যানুপাতে ঘাতকের সংখ্যা ছিল মোট ছয় জন। তবে ঐতিহাসিকদের মতে ঘাতক ছিল পাঁচ ব্যক্তি। আর সে পাঁচই জন ছিল আউস গোত্রের। (কস্তলানী)

আল্লামা যুরকানী (রহ.) বলেন, যেরূপভাবে আউস গোত্র একাই কাব বিন আশরাফকে হত্যা করে, তেমনি সালাম বিন আবুল হুকাইক (আবু রাফে')-কে খাযাজ গোত্র একাই হত্যা করে।

কাব বিন আশরাফ হত্যার বৈধতা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার জওয়াব

কাবের হত্যার উপর অভিযোগ আনা হয় যে, এ ধরনের হত্যা তো প্রকারান্তরে ধোঁকা প্রদানের নামান্তর। আর ধোঁকা ইসলামে অবৈধ। মাজুরী এ প্রশ্নের জবাব দেন যে, কাবকে এভাবে হত্যা করা সম্পূর্ণ বৈধ হয়েছে। কেননা, সে রসূল (স.)-এর সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন করে। রসূল (স.)-কে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধাগতদের সাথী হয়ে আসে এবং তাদেরকে সার্বিক সহায়তা করে।

আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, প্রশ্ন কেবল ঐ সময় উত্থাপিত হতে পারে যদি মুহাম্মদ বিন মাসলামা চুক্তি ভঙ্গ করে তাকে হত্যা করতেন। অথচ মুহাম্মাদ বিন মাসলামার কথার মধ্যে কোথাও নিরাপত্তার উল্লেখ নেই; নেই চুক্তি ও অঙ্গীকারেরও উল্লেখ। অতএব আজ কারো এটা বলার অধিকার নেই যে, কা'বকে প্রতারণাচ্ছলে হত্যা করা হয়েছে। এ কারণেই তো হযরত আলীর দপ্তরে জনৈক ব্যক্তি এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে তৎক্ষণাৎ তাকে হত্যা করা হয়। তদুপরি কা'ব বিন আশরাফ নিজেই প্রথমে চুক্তি লঙ্ঘন করে।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসের উপর بَابُ الْفَتْكِ فِى الْحَرْبِ নামে যে শিরোনাম প্রদান করেছেন, তার দ্বারা প্রতারণা বা ধোঁকা উদ্দেশ্য নয়; বরং فَتْك এর অর্থ হলো অজ্ঞাতে হত্যা করা।

ইবনে হাজার বলেন, ইমাম বুখারীর শিরোনাম اَلْفَتْكُ بِاَهْلِ الْحَرْبِ এবং اَلْكِذْبُ فِى الْحَرْبِ থেকে জানা যায় যে, কাব বিন আশরাফ চুক্তিবদ্ধ ছিল না; বরং যুদ্ধোদ্যত ছিল। অতএব প্রশ্ন উত্থাপনের কোনই অবকাশ নেই।

আলোচ্য হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে–

(১) যদি ইসলামের দাওয়াতী বার্তা একবার পাঠানো হয়, তবে পরবর্তীতে দ্বিতীয় কোন বার্তা প্রেরণ ছাড়াই মুশরিককে হত্যা করা জায়েয।

(২) প্রয়োজনবশত যুদ্ধে বিপক্ষদলের সাথে বাস্তবতা বিবর্জিত কথা বলাও জায়েয।

www.e-ilm.weebly.com

এক বর্ণনায় এসেছে যে, কাবের হত্যার পরের দিন ইহুদীরা যখন রসূল (স.)-এর কাছে এসে অভিযোগ দায়ের করে যে, আমাদের নেতাকে প্রতারণামূলক অজ্ঞাতবশতঃ হত্যা করা হয়েছে তখন কা'ব বিন আশরাফ রসূল ও মুসলমানদের কেমন বিরোধিতা করছে, তাদের সাথে কোন ধরনের অশোভনীয় আচরণ এবং তাদেরকে কেমন কষ্ট দিত-তা রসূল (স.) সবিস্তারে সুস্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দেন। এতে তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এ থেকে প্রকাশ্য জালেম ও উৎপীড়ককে প্রতারণামূলক হত্যার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

আল্লামা নববী বলেন, কাফেরকে ধোঁকা প্রদান জায়েযের ব্যাপারে সবাই একমত। চাই তা যেভাবেই হোক না কেন। তবে যদি সে ধোঁকা তার সাথে কৃত চুক্তি লঙ্ঘন ও নিরাপত্তা ভঙ্গ করে তবে জায়েয হবে না।

(ফতহুল বারী ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬২০, বুখারীর পার্শ্বটীকা প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থ)

আল্লামা কস্তলানী বলেন, কাব বিন আশরাফ হত্যাকাণ্ড তৃতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকেরও অভিমত এটা। তবে কেউ কেউ দাবী করেন যে, এ ঘটনা তৃতীয় হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়।

بَابُ قَتْلِ أَبِىْ رَافِعٍ

আবু রাফে হত্যাকাণ্ড

ইমাম বুখারী (রহ.) লিখেন, আবু রাফে'র নাম আব্দুল্লাহ বিন আবুল হুকাইক বা সালাম বিন আবুল হুকাইক ছিল। যারা রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে বিভিন্ন আরব গোত্রকে খন্দকে এনেছিল, আবু রাফে' ছিল তাদেরই একজন। হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত, আবু রাফে 'মক্কাস্থ মুশরিকদের মধ্যে বনূ গাতফান প্রভৃতিকে অঢেল অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করত। হযরত আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক থেকে বর্ণিত, রসূল (স.)-এর কাজ করতে আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলত। আউস গোত্র রসূল (স.)-এর সন্তুষ্টি অর্জনে কোন কাজ করলে খাযরাজ গোত্রও তদ্রূপ কোন কাজ করতে চাইত। যাতে তারা তাদের চেয়ে বেশী মার্যাদা লাভ করতে না পারে। এ কারণে যখন আউস গোত্র কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করে, তখন খাযরাজরা এসে রসূল (স.)-এর কাছে আবু রাফে'কে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করে। রসূল (স.) তাদের অনুমতি দিলে পাঁচজন খাযরাজী ব্যক্তি আবু রাফে'র হিসেব চুকিয়ে দেয়।

এ হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে একাধিক উক্তি রয়েছে—

(১) ইবনে সাদ বলেন, এটা ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনা (২) ইবনে ইসহাক বলেন, বনূ কুরাইজা ঘটনার পর পঞ্চম হিজরীতে এটা ঘটে (৩) কারো মতে, এটা চতুর্থ হিজরীর ঘটনা (৪) কারো মতে, তৃতীয় হিজরীর রজব মাসের (৫) কারো মতে, তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরার (সানীর), (৬) ইমাম যুহরী বলেন, এ ঘটনা কাব বিন আশরাফের হত্যার পরবর্তী ঘটনা। এ অভিমতটি তৃতীয় হিজরীর জুমাদাল উখরার প্রবক্তাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৭)

www.e-ilm.weebly.com

فَغَلَقْتُهَا مِنْ ظَاهِرٍ (আমি বহিপার্শ্ব হতে দ্বার রুদ্ধ করলাম) ঃ এ হাদীস পূর্বের হাদীসের বিপরীত। কারণ সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে كُلَّمَا فُتِحَتْ بَابًا أَغْلَقْتُ عَلَيَّ مِنْ دَاخِلٍ অর্থাৎ, আমি কোন দরজা খুললেই ভিতর পাশ হতে তা বন্ধ করে দিতাম।

এ প্রশ্নের উত্তর লামিউদ্ দারারী প্রণেতা দেন যে, উভয় হাদীসোক্ত اَبْوَابْ-এর উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ, দরজা অভিন্ন ছিল না; বরং একই ছিল। বস্তুত দরজা বন্ধ করাটা ছিল ভিতর পাশ থেকে। বন্ধকারীর দিক বিবেচনায় যদিও তা ভিতর পাশ থেকে ছিল, কিন্তু বাইরের লোকদের বিবেচনায় তা ছিল বহিঃপার্শ্ব হতে।

লামিউদ্ দারারীর টিকাকার বরেণ্য মুহাদ্দিস হযরত মাওঃ মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রহ.) বলেন যে, উভয় হাদীসে বর্ণিত দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য এক নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন। কেননা, দ্বিতীয় হাদীসে বর্ণিত দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য কেল্লায় অবস্থানরত ভৃত্যদের ঘরের দরজা। এ সকল দরজায় বাইরে থেকে তালা মেরে দেয়া হয়, যাতে শাহী মহলের আওয়াজ শুনে তারা বাইরে বের হতে না পারে। পক্ষান্তরে প্রথম হাদীসে বর্ণিত দরজা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, শাহী মহলের দরজা। যা খুলে হত্যাকারী ভিতরে ঢুকে ভিতর পাশ হতে তা বন্ধ করে দেয়। যাতে বাইরে থেকে কেউ আবু রাফে'র নিকটে না আসতে পারে। (লামিউদ্ দারারী)

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়॥

(১) ইসলামের দাওয়াত পৌঁছার পরও যে কুফরীর উপর অটল-অবিচল থাকে, তাকে প্রতারণামূলক হত্যা করা বৈধ।

(২) কেউ জবান, মাল ও শক্তি দ্বারা রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে সাহায্য করলে তাকেও হত্যা করা বৈধ।

(৩) শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি করা জায়েয।

(৪) দ্বীনি স্বার্থে দ্ব্যর্থবোধক কথা বলা যায়। (ফাতহুল বারী ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬)

আবু রাফে' রসূল (স.)-এর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত। রসূল (স.)-এর প্রতি শত্রুতা সৃষ্টিতে লোকজন সমবেত করত। যেহেতু ওহী মারফত সুস্পষ্ট নমুনার আলোকে রসূল (স.) তার কুফরীর উপর অটল-অবিচল থাকা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তার ঈমান আনয়নের কোনই আশা ছিল না; বরং কাফের অবস্থায় মৃত্যু ছিল অবধারিত, তাই ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে হত্যা করা বৈধ হয়েছে। অতএব যার ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জানা যাবে যে, সে ঈমান আনবে না, বরং ইসলামের জন্য হুমকির কারণ হবে, তাকে ধোঁকা দিয়ে অজ্ঞাতবশতঃ হত্যা করা জায়েয। (বুখারীর পার্শ্বটিকা ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৪)

كَانَ بِخَيْبَرَ وَيُقَالُ فِيْ حِصْنٍ لَهُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ (সে খয়বারে থাকত, আবার এটাও বলা হয় যে, সে তার হিজাজস্থ দুর্গে থাকত) ঃ যেহেতু খায়বার

www.e-ilm.weebly.com

হিজাজের অন্তর্গত নয়, তাই সঙ্গত কারণেই এ দু'উক্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। ব্যাখ্যাকারকগণ এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিয়েছেন—

(১) হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হিজাজের সীমান্তবর্তী এলাকায় তার একটি কেল্লা ছিল। এ ব্যাখ্যা হিসেবে উভয় উক্তি সঠিক।

(২) কেউ কেউ বলেন, খায়বার হিজাজের একটি বস্তির নাম।

(৩) হতে পারে তার একটি বাড়ী খয়বারে আর আরেকটি বাড়ী ছিল হিজাজে।

(৪) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, বনূ নযীরের নির্বাসনের পূর্বে সে তাদের সাথে মদীনার নিকটে থাকত। নির্বাসনের পর খয়বারে চলে যায়। অতএব দু'উক্তির মাঝে কোনরূপ বিরোধ নেই।

بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

উহুদ যুদ্ধ

'উহুদ' মদীনার একটি পাহাড়ের নাম। মদীনা হতে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত এ পাহাড়টি অন্যান্য পাহাড় থেকে একাকী ও বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হওয়ায় তার নাম রাখা হয়েছে উহুদ।

উহুদ যুদ্ধের পটভূমি

বদর যুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ নিহত হওয়ায় তারা প্রচণ্ড আঘাত পায়। ইতঃপূর্বে তারা এমন আঘাত আর কখনও পায়নি। তাই বদরে নিহতদের জন্য মাত্র কয়েকদিন শোক পালন করে কুরাইশদের সর্বোচ্চ নেতা আবু সুফিয়ান বদরের দু'মাস পরেই মদীনা আক্রমণ করে। কিন্তু চরম ব্যর্থ হয়। সেজন্য বদরের প্রতিশোধ নিতে মদীনার উপর ব্যাপকভাবে হামলা করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ পর্যায়ে আব্দুল্লাহ বিন উবাই, রবীয়া, ইকরামা বিন আবু জাহেল, সফওয়ান বিন উমাইয়াসহ অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সম্পদ সঞ্চয় আর আবু সুফিয়ান কুরাইশ ও তাদের মিত্রদের সমন্বয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে মনোনিবেশ করল। প্রায় তিন হাজার সৈন্যের এক বিশাল বহর নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে আবু সুফিয়ান মদীনা রওনা হল। উহুদ পাহাড়ের নিকটবর্তী 'আইনাইন' নামক স্থানে এসে সেনাবাহিনী অবস্থান গ্রহণ করে। এদিকে রসূল (স.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতৃব্য হযরত আব্বাস[১] (রযি.) রসূল (স.)-এর কাছে কুরাইশদের এ খবর পৌঁছে দেন। রসূল (স.)-এর ইচ্ছা ছিল মদীনার বাইরে যাবেন না। শহরেই তাদের মোকাবেলা করবেন। কিন্তু বিশিষ্ট সাহাবাদের অনেকে এবং নব যুবকগণ জিহাদী প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলতে লাগলেন যে, আমরা মদীনার বাইরে গিয়ে মোকাবেলা করব। রসূল (স.) অধিকাংশ সাহাবার এ অদম্য স্পৃহা ও অটল মনোভাব দেখে গৃহে প্রবেশপূর্বক যুদ্ধসাজে সজ্জিত হন। মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা রসূল (স.)-এর মর্জির খেলাফ দেখে কতিপয় সাহাবা নিবেদন করেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল ! আপনার মর্জি মোতাবেক মদীনা থেকেই মোকাবেলা করা হোক।

টীকা ঃ ১. হযরত আব্বাস বিন আব্দিল মুত্তালিব (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩২ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

কিন্তু রসূল (স.) তাঁদের প্রস্তাব এ কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেন যে, আল্লাহ্র নবী একবার যুদ্ধের পোশাক পরিধান করলে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক তার এবং শত্রুর মাঝে ফায়সালা না করেন, ততক্ষণ তাঁর হাতিয়ার ত্যাগ করা জায়েয নেই।

অতঃপর এক হাজারের মত ইসলামী সৈন্য সাথে নিয়ে রসূল (স.) মদীনা ত্যাগ করেন। কিন্তু 'শওত' নামক স্থানে এসে কপটচারী (মুনাফিক) আব্দুল্লাহ বিন উবাই তার তিনশত (সমমনা) সাথী নিয়ে মুজাহিদ বাহিনী থেকে পৃথক হয়ে যায়। অবশিষ্ট ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে রাসূলে আকরাম (স.) উহুদে পৌঁছান। সর্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। (আসাহহুস সিয়ার, প্রভৃতি)

উহুদ যুদ্ধের ফলাফল

সাধারণত বলা হয় যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়। কিন্তু এ যুদ্ধের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দিকসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা কোন উল্লেখযোগ্য পরাজয় ছিল না। বাহ্যিক কারণ হল, যদিও কতক মুসলমানের কিছু ভুলের দরুন সত্তরজন মুসলমান শহীদ হন, কিন্তু তাদেরও তো বিশ বা বাইশ জন নিহত হয়। আর বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিতে এটা কোন পরাজয় ছিল না। তদুপরি এক বিজয়ী জাতি হিসেবে তাদের যা করণীয় ছিল তার কিছুই তারা করেনি। তারা উহুদ থেকে এমনিই চলে যায়। এভাবে চলে যাবার কারণে কিছু দূর গিয়ে আবু সুফিয়ান আফসোস করতে থাকে। পুনর্বার প্রত্যাবর্তনের অভিলাষও ব্যক্ত করে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে রসূল (স.) সাহাবাদের নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত যান। কিন্তু তাদের নাগাল পাওয়া যায়নি। তাদের মধ্যে এমন ভীতি সঞ্চারিত হয় যে, তারা দ্বিতীয়বার মুসলমানদের সামনে দাঁড়াবার সাহস হারিয়ে ফেলে। মুসলমানগণ অনন্তর মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

এ সকল অবস্থাকে সামনে রেখে যদি বলা হয় যে, উহুদ যুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায়ে বিজয় যেমন মুসলমানদের হয় তেমনি চূড়ান্ত ফলাফলেও মুসলমানরা সফলতা লাভ করেন, তবে তা মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

অভ্যন্তরীণ দিক দিয়েও মুসলমানদের পরাজয় ছিল না। কারণ, বদর যুদ্ধে বিজয় ও গনিমত লাভের পর আল্লাহ্ পাক উহুদ যুদ্ধেও মুসলমানদের অসংখ্য কল্যাণে ভরপুর করে দেন। তন্মধ্য হতে কতিপয় নিম্নরূপ॥

(১) খাঁটি ও ভেজাল (মুনাফিক) মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

(২) কর্তৃক সাহাবার শাহাদাতের উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়।

(৩) মুসলমানদের পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। তারা তাতে কৃতকার্য হয় এবং ধর্মীয় ও জাগতিক পুরস্কারে বিপুলভাবে পুরস্কৃত হয়।

(৪) নবী করীম (স.)-এর রায়কে অগ্রাধিকার প্রদান এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজে বাধ্য না করার শিক্ষা সাহাবায়ে কেরাম লাভ করেন।

(৫) উহুদ যুদ্ধ হতে মুসলমানগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র প্রতি আস্থা স্থাপন ও বিজয় অর্জন করে উল্লাসিত না হওয়ার সবক গ্রহণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৬) এ যুদ্ধ হতে মুসলমানগণ এ শিক্ষাও লাভ করেন যে, তারা পার্থিব অর্থ-সম্পদের লালসা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ هٰذَا جِبْرَئِيلُ (উহুদের দিন রসূল (স.) বলেন, ইনি জিবরাঈল [আ.]) ঃ এ হাদীস প্রসঙ্গে ফাতহুল বারীতে ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, হাদীসটি দু'কারণে ত্রুটিমুক্ত নয়।

(১) এ হাদীসটি পূর্বে 'বদরে ফেরেশতাদের উপস্থিতি' অধ্যায়ে সূত্র ও ভাষ্যসহ বর্ণিত হয়েছে। সে কারণেই হযরত আবু যর ও বুখারীর গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারীদের কেউ হাদীসটি এ স্থলে উল্লেখ করেননি। ইসমাঈল এবং আবু নুয়াইমও তা বর্ণনা করেন নি।

(১) এ হাদীসের ভাষ্যে (মতন) يَوْمَ بَدْرٍ হওয়াটাই প্রসিদ্ধ, يَوْمَ أُحُدٍ নয়। আল্লামা আইনী ও কস্তলানীর অভিমতও তাই। তবে আল্লামা সিন্ধী বলেন, উহুদ যুদ্ধে যখন 'ফেরেশতা কর্তৃক যুদ্ধ করা' প্রমাণিত আছে, তখন يَوْمَ أُحُدٍ-কে বর্ণনাকারীর ত্রুটি অথবা লিপিকারের ভুল বলার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসকে এ অধ্যায়ে শুধু يَوْمَ أُحُدٍ শব্দ থাকার কারণে উল্লেখ করেছেন। হতে পারে রসূল (স.) উভয় যুদ্ধের ব্যাপারে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য যুদ্ধে ফেরেশতাদের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। কতিপয়ের মতে বদর যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা যুদ্ধ করেননি। তবে বিশুদ্ধ মত হলো, ফেরেশতাদের যুদ্ধ বদরে সীমাবদ্ধ নয়। ইমাম নববীরও (রহ.) মত এটা। কেননা, মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে ঃ হযরত সাঈদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রযি.) বলেন, আমি উহুদ যুদ্ধে রসূল (স.)-কে এমন দুই ব্যক্তির সাথে দেখেছি, যারা তাঁর পক্ষ থেকে যুদ্ধরত ছিল। এ হাদীসের শেষাংশে ঐ দু'ব্যক্তির পরিচয় দান করা হয়েছে যে, তারা হলেন, জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.)। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৯)

শহীদদের জানাযা নামায প্রসঙ্গ

صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى قَتْلٰى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِيْ سِنِيْنَ (রসূল আট বছর পর উহুদ-শহীদদের জানাযা নামায পড়েন) ঃ শহীদদের জানাযা নামায পড়তে হবে কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

(১) আইম্মায়ে ছালাছা (ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমাদ) ও ইসহাকের মতে, শহীদদের জানাযা নামায পড়তে হবে না।

(২) ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে, শহীদদের জানাযা নামায পড়তে হবে।

www.e-ilm.weebly.com

জানাযা নামায প্রবক্তাদের প্রমাণাদি

(১) হযরত উকবা বিন আমেরের বর্ণনা ঃ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ অর্থাৎ, রসূল (স.) উহুদ-শহীদদের জানাযা নামায পড়েছেন। (বুখারী)

ইবনে আব্বাসের হাদীস ঃ فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ অর্থাৎ, রসূল (স.) দশ দশ জন করে শহীদদের জানাযা নামায পড়েছেন। (ইবনে মাজাহ, ত্বহাবী, হাকেম, বায়হাকী, বাযযার, ইবনে হিশাম)

(৩) মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত ইবনে মাসঊদের হাদীস।[১]

(৪) নাসায়ী শরীফে বর্ণিত শাদ্দাদ বিন হাদের হাদীস।[২]

(৫) আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) ফুতুহুশ্ শাম গ্রন্থে রবীয়ার গোলাম সাঈফের থেকে ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু বকর (রযি.) কর্তৃক ঈলা ও ফিলিস্তিন অভিমুখে হযরত আমর বিন আসের সাথে প্রেরিত সৈন্যদলে আমি ছিলাম। এ যুদ্ধে ১৩০ জন মুসলমান শহীদ হন। হযরত আমর বিন আস-সহ সকল মুসলমান তাদের জানাযা নামায পড়েন। আমরের (রযি.) সাথে নয় হাজার মুসলমান ছিলেন। (ফতহুল কদীর)

আল্লামা আইনী (রহ.) নিম্নোক্ত কারণে আহনাফের মতামতকে প্রাধান্য দেন।

(১) হযরত জাবেরের (রযি.) হাদীস নেতিবাচক আর হযরত উকবার (রযি.) হাদীস ইতিবাচক। আর নেতিবাচক ও ইতিবাচকের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে ইতিবাচকেরই জয় হয়।

(২) শাফেয়ী মতাবলম্বীদের প্রমাণসিদ্ধ বর্ণনা হতে আহনাফের বর্ণনা বেশি।

(৩) মৃতের জানাযা নামায পড়া দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় এবং ফরজে কেফায়া। অতএব কারো জানাযা পড়া ব্যতিরেকে এ ফরজ আদায় হবে না।

(৪) যদি শহীদদের জানাযা নামায পড়ার প্রচলন না থাকত, তবে নবী করীম (স.) অবশ্যই এ বিষয়ে বলে দিতেন। যেমন গোসলের ব্যাপারে তিনি বলে দেন যে, শহীদদের গোসল দিতে হবে না।

জানাযা বিরোধীদের দলীল ও তার জওয়াব

(১) হযরত জাবের (রযি.) এর বর্ণিত হাদীস– أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ, রসূল (স.) উহুদে শহীদদের জানাযা নামায পড়েননি। (বুখারী, তিরমিযী)

(২) হযরত আনাস (রযি.) কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসই (যা আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত)

টীকা ঃ ১. আর সে হাদীসে এসেছে, হযরত হামযা (রযি.) শহীদ হলে রসূল (স.) প্রথমে তাঁর জানাযা পড়েন। অতঃপর উহুদের ময়দানে শহীদ অন্যান্য সাহাবাকে এক এক করে এনে হযরত হামযার (রযি.) পাশে রাখেন এবং তার জানাযা পড়েন। এভাবে সেদিন হযরত হামযা (রযি.)-এর জানাযা ৭০ বার পড়া হয়। (মুসনাদে আহমাদ ২ ঃ ৫১ হাদীস নং-৪৪০০।) —অনুবাদক

২. উক্ত হাদীসের ভাবার্থ হলো, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রসূল (স.)-এর অনুমতিক্রমে যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হলে রসূল (স.) তার জানাযা পড়েন এবং তাঁর শাহাদাতের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন। (নাসায়ী শরীফ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৭। —অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

জওয়াব ঃ আহনাফের পক্ষ হতে এ দু'হাদীসের নিম্নরূপ জওয়াব প্রদান করা হয়।

(১) ইমাম ত্বহাবী বলেন, لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ-এর মর্মার্থ হলো, রসূল তাদের নামায পড়েননি; বরং রসূল ব্যতীত অন্যে পড়েছেন। (অর্থাৎ, এ হাদীসের উদ্দেশ্য শুধু এ খবরটুকু প্রদান যে, রসূল (স.) তাদের নামায পড়েননি, কিন্তু একেবারে যে তাদের নামায পড়া হয়নি, এটা বলা উদ্দেশ্য নয়)।

(২) হতে পারে রসূল (স.) সেদিন জানাযা পড়েননি; বরং পরে পড়েছেন। কারণ, তিনি নিজেই সেদিন আহত এবং হামযা প্রমুখের শাহাদাতের দরুন শোকাহত ছিলেন। ফলে জানাযা পড়ার অবকাশ হয়নি।

জাবের (রযি.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের স্বতন্ত্র জওয়াব

(ক) যখন শহীদদের জানাযা নামায পড়া হয় তখন তিনি তথায় ছিলেন না। কারণ তিনি স্বীয় পিতা ও মামুর মৃতদেহ মদীনায় নেয়া ও সেখান থেকে পুনরায় উহুদে ফিরিয়ে আনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। অতএব, যারা মূল ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাদের বক্তব্যই অগ্রাধিকার পাবে।

(খ) হযরত জাবের (রযি.)-এর হাদীস পরস্পর সাংঘর্ষিক। কেননা 'আল ইকলীল' গ্রন্থে আছে—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى حَمْزَةَ ثُمَّ جِيْئَ بِالشُّهَدَاءِ فَصَلَّى -

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) হামযার (রযি.) জানাযা নামায পড়েন। অতঃপর অন্যান্য শহীদদের আনা হলে তিনি তাদেরও জানাযা পড়েন। হাকেমও তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অতএব যখন দু'উক্তি সাংঘর্ষিক হলো তখন উভয়ই পরিত্যাজ্য।

জানাযা বিরোধীদের আরও তিন দলীল ও তার জওয়াব

(৩) তাদের তৃতীয় দলীল হলো, গোসল ব্যতিরেকে জানাযা পড়া বৈধ নয়। আর শহীদদের গোসল দেয়া হয় না। অতএব তাদের জানাযা পড়াও বৈধ হবে না।

জওয়াব ঃ ব্যাপারটি বাস্তবিকই এমন হলে তাদের দাফন (সমাহিত) করাও বৈধ হবে না। কারণ, বিনা গোসলে মৃতকে সমাহিত করা জায়েয নেই। অথচ তাদের দাফন করা হয়। আসল কথা হলো, শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা গোসলকৃত ব্যক্তির ন্যায়। ফলে তাদের জানাযা নামায পড়তে হবে।

(৪) জানাযা নামায মৃতদের জন্য; জীবিতদের জন্য নয়। শহীদগণ যেহেতু জীবিত, তাই তাদের নামাযও পড়া হবে না।

জওয়াব ঃ যদি বাস্তবিকই জীবিত হন তবে তো তাদের সম্পত্তিও বণ্টিত না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাদের স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহও নিষিদ্ধ হবে। আসল কথা হলো, তাদের জীবিত থাকাটা পার্থিব দিক দিয়ে নয়; বরং আখেরাতের দৃষ্টিকোণে মাত্র। আর নামাযের সম্পর্ক পার্থিব আহকামের সাথে, আখেরাতের আহকামের সাথে নয়।

www.e-ilm.weebly.com

(৫) জানাযা নামাযের মূল হল ক্ষমা প্রার্থনা। আর শহীদগণ ক্ষমা প্রার্থনার ঊর্ধ্বে। কেননা হাদীসে আছে॥ اَلسَّيْفُ مَحَّاءُ الذُّنُوبِ অর্থাৎ, তরবারী পাপ নাশক।

জওয়াব ঃ বান্দা কখনও দোয়ার ঊর্ধ্বে হতে পারে না। যদিও সে নৈকট্যের সর্বোচ্চ স্তরে হোক না কেন। কারণ, নৈকট্য স্তরের কোন শেষ নেই। সে জন্যই তো শহীদদের স্তর থেকে বহু ঊর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও সাহাবাগণ রসূল (স.)-এর জানাযা নামায পড়েন।

বিরোধীদের পক্ষ হতে হানাফী মাজহাবের প্রতি বিভিন্ন প্রশ্ন ও জওয়াবঃ

(১) আহনাফের মতে, তিন দিনের পর জানাযা নামায পড়া জায়েয নেই। অথচ উকবা বিন আমেরের বর্ণনায় আট বছর পর নামায পড়ার কথা এসেছে। তাহলে এটা জানাযা নামায কিভাবে হল?

জওয়াব ঃ 'তিনদিন পরে জানাযা পড়া যাবে না'॥এটা আহনাফের মাজহাব নয়। আহনাফ বলেন, যতক্ষণ লাশ ফেটে ও ফুলে যাবার আশঙ্কা না হয় ততক্ষণ তার উপর জানাযা পড়া যেতে পারে। যেহেতু শহীদদের দেহ পচে না, গলে না, তাই যখনই হোক তার নামায পড়া যেতে পারে। 'মুয়াত্তা মুহাম্মদ'[১] গ্রন্থে আছে যে, উহুদ রণাঙ্গনের দু'শহীদ হযরত আমর বিন জামুহ এবং আব্দুল্লাহ বিন আমর আনসারীর কবর স্রোতের চাপে উন্মুক্ত হয়ে পড়লে দেখা যায় যে, যেন গতকাল (সদ্য) তাদের ইন্তেকাল হয়েছে। অথচ এটা ছিল ৪৬ বছরের পূর্বের ঘটনা।

(২) শহীদদের জানাযা প্রসঙ্গে আগত বর্ণনার সবই সূত্রগতভাবে (سَنَدًا) দুর্বল। সুতরাং এ ধরনের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা কিভাবে ঠিক হবে?

জওয়াব ঃ এ সকল হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা ঠিক আছে। কেননা, সনদের দিক দিয়ে তা 'হাসান' স্তরের নীচে নয়।

ইমাম নববী (রহ.) صَلاة-এর অর্থ دُعَاء করেছেন। এটা ঠিক নয়। কেননা, বুখারী ও মুসলিমে উকবা বিন আমের থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে—

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلّٰى عَلَى الشُّهَدَاءِ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ

অর্থাৎ, রসূল (স.) সাধারণ মৃতের ন্যায় শহীদদের জানাযা নামায পড়েছেন। এরূপভাবে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে যুবাইর, ইকরামা[২], সাঈদ বিন মুসাইয়িব, হাসান বসরী[৩], মাকহুল[৪], ছাওরী[৫] আওযায়ী[৬] মুযানী[৭] প্রমুখ হতেও অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। সুতরাং صَلاة-এর শরয়ী অর্থ পরিহারপূর্বক তাকে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা কিভাবে শুদ্ধ হবে? (আইনী, বুখারীর পার্শ্বটিকা, লামিউদ্ দারারী, আসাহহুস সিয়ার প্রভৃতি)

টীকা ঃ ১. ইমাম মুহাম্মদ (রহ.), জন্ম ঃ ১৩৫ হিঃ, মৃত্যু ঃ ১৮৯ হিজরী।

২. হযরত ইকরামা (রহ.), মৃত্যু ঃ ১০৫ হিঃ ৩. হযরত হাসান বসরী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১০ হিঃ ৪. হযরত মাকহুল (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১৩ হিঃ ৫. হযরত সুফয়ান সাওরী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৬১ হিঃ ৬. ইমাম আওযায়ী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৫৭ হিঃ ৭. ইমাম মুযানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ২৬৪ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ঃ অর্থাৎ, জীবিত ও মৃতদের বিদায় দানের মতই রসূল (স.) উহুদে শহীদদের জন্য দোয়া করেন। কেননা, এটা ছিল রসূল (স.)-এর শেষ জীবনের ঘটনা। জীবিতদের বিদায় প্রদানের মর্মার্থ এটাই। আর মৃতদের বিদায় দান হতে সম্ভবত সাহাবার উদ্দেশ্য হল, রসূল (স.) সশরীরে তাদের জেয়ারত করা হতে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন-তা বর্ণনা করা। কেননা যদিও তিনি কবরে জীবিত, কিন্তু সেটা পারলৌকিক জীবন; পার্থিব জীবন নয় যে, তাদের জেয়ারত হতে পারে। এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, 'মৃতদের বিদায় দান' অর্থ আহলে বাকীদের জন্য রসূল (স.)-এর ইস্তেগফার করা। যেমন তা হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে। (ফতহুল বারী ৭ ঃ ২৬৯)

اَلصَّلَاةُ عَلَى الْغَائِبِ

গায়েবানা জানাযা

এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ ঃ

(১) ইমাম শাফেয়ী ও আহ্মাদের মতে, গায়েবানা জানাযা জায়েয। তারা বলেন, রসূল (স.) কর্তৃক নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়াই প্রমাণ করে যে, এটা জায়েয। অতএব, প্রত্যেক অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা পড়া সুন্নাত হবে।

(২) ইমাম আবু হানীফা ও মালেকের মতে, গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই। তারা বলেন, রসূল (স.) কর্তৃক নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযা পড়া, এটা কেবল রসূল (স.)-এর সাথে খাস (সীমাবদ্ধ)। অন্যদের জন্য এমনটি করা জায়েয নেই।

ইমাম মালেক (রহ.)-এর অনুসারীগণ ও ইমাম আবু হানীফা বলেন যে, নাজ্জাশীর মরদেহ যদিও অনেক দূরত্বে ছিল, সাহাবাগণ তা দেখেননি কিন্তু হতে পারে রসূল (স.)-এর সামনে তা উপনীত করা হয়েছিল; আর রসূল (স.) তা চাক্ষুষ দেখতে থাকেন। সাহাবারা যদিও তা দেখেননি, কিন্তু তারা রসূল (স.)-এর অনুসারী হয়ে নামায পড়েন।

তারা রসূল (স.)-এর বিশেষত্বের উপর এ দলীল প্রদান করেন যে, রসূল (স.) নাজ্জাশী ছাড়া অন্য কারো গায়েবানা জানাযা পড়েননি। রসূল (স.) ব্যতিরেকে অন্যের জন্য জায়েয না হওয়ার কারণ হলো, পথের দূরত্বহেতু লাশ দেখা অন্যদের জন্য নিশ্চিত নয়।

(৩) শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, যদি এমন স্থানে কারো ইন্তেকাল হয়, যেখানে জানাযা পড়া হয় না, তবে তার গায়েবানা জানাযা পড়া হবে। যেমন, নাজ্জাশীর জানাযা পড়া হয়। কেননা তিনি দারুল কুফরে মৃত্যুবরণ করেন, যেখানে মৃতের জানাযা পড়া হয় না। পক্ষান্তরে কেউ যদি জানাযা পড়ার প্রচলন রয়েছে এমন স্থানে ইন্তেকাল করে, তবে সেখানে গায়েবানা জানাযা পড়া হবে না। কেননা সেখানকার মুসলমানদের নামায পড়ার দ্বারা ফরজ আদায় হয়ে গেছে।

(লামিউদ্ দারারী ২ ঃ ১২১)

www.e-ilm.weebly.com

اَلصَّلَاةُ عَلَى الْقَبْرِ

কবরের উপর জানাযা

আল্লামা আইনী (রহ.) মাবসূতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন যে, ইমাম আবু হানীফার অভিমত হলো, যদি অভিভাবক ব্যতিরেকে অন্যে জানাযা নামায পড়ে আর অভিভাবক না পড়ে থাকে, তবে অভিভাবকের জন্য কবরের উপর জানাযা পড়ার অধিকার রয়েছে। অন্যের জন্য এ অধিকার নেই। ইমাম মালেকও (রহ.) কবরের উপর জানাযা পড়তে নিষেধ করেন।

আদ দুররুল মুখতার[১] গ্রন্থে আছে, জানাযা ছাড়াই যদি কাউকে দাফন করা হয় অথবা জানাযা অভিভাবক ব্যতীত পড়ে; অভিভাবক না পড়ে, তবে এমতাবস্থায় কবরের উপর ইস্তেহসানান (জনকল্যাণহেতু) জানাযা নামায পড়া যেতে পারে। তবে এ বৈধতা ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ লাশ পচে-গলে না যায়।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, দাউদ জাহেরী ও মালেকীদের মতে কেউ জানাযা নামায পড়তে না পারলে তার জন্য কবরের উপর জানাযা পড়া জায়েয। তবে শর্ত হলো লাশ সদ্য সমাহিত হতে হবে। যার সময়সীমা কারো মতে তিনদিন, কারো মতে দশদিন আবার কেউ একমাসের কথা বলেছেন। তবে বিশুদ্ধতর কথা হলো, এর জন্য নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা বেঁধে না দেয়া। কেননা গরম, ঠাণ্ডা, মোটা, পাতলা এবং স্থানের বিভিন্নতার কারণে সকল স্থান ও সকল যুগে এক রকম পরিবর্তন সাধিত হয় না। আর যে বর্ণনায় রসূল (স.) কর্তৃক একমাস পরে উম্মে সাদের জানাযা পড়ার কথা এসেছে, তার জওয়াব মোল্লা আলী কারী (রহ.) দিয়েছেন যে, এটা নবীর (স.) স্বতন্ত্র ব্যাপার। অতঃপর মোল্লা আলী কারী (রহ.) আল্লামা সুয়ূতীর উদ্ধৃতিতে বলেন যে, কতিপয় হানাফী আলেম বলেন, রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায় রসূল (স.)-এর জানাযা নামায পড়া ব্যতিরেকে মূল জানাযাই আদায় হতো না। এ থেকে বুঝা যায় যে, জানাযা নামায যদিও অন্যদের জন্য ফরজে কেফায়া, কিন্তু রসূল (স.)-এর জন্য তা ছিল ফরজে আইন। এ কারণেই রসূল (স.) এক মাস পরে উম্মে সাদের নামায পড়েন। কারণ তিনি ছিলেন সর্বাভিভাবক। আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেছেন ঃ اَلنَّبِىُّ أَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ অর্থাৎ, নবী মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের তুলনায় অধিক উত্তম অভিভাবক। অপর আয়াতে আল্লাহ্ বলেন— وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ অর্থাৎ,আপনি তাদের জানাযা পড়ুন। আপনার জানাযা তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক।

হানাফী আলেমগণ বলেন, কবরের উপর জানাযা নামায আদায় নাজায়েয হবার দলীল হলো, নবী করীম (স.) এর নৈকট্যার্জনের অদম্য স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম রসূল (স.)-এর কবরের উপর জানাযা নামায পড়েন না। অথচ রসূল (স.) কবরে জীবিতভাবেই অবস্থান করেছেন।

(আইনী, বুখারীর পার্শ্বটিকা, লামিউদ্ দারারী প্রভৃতি)

টীকা ঃ ১. আদ্-দুর্রুল মুখতার ঃ মুহাম্মাদ বিন আলাউদ্দীন আল-হাসকাফী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। তিনি ১০৮৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ (উমর নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র দুশমন, মিথ্যা বলেছিস) ঃ রসূল (স.) বারণ করা সত্ত্বেও উমর (রযি.) আবু সুফিয়ানকে কেন জওয়াব দেন? এ প্রশ্নের জওয়াব হলো—

(১) টিকাকার বলেন, এর দ্বারা হযরত উমরের (রযি.) উদ্দেশ্য রসূল (স.)-এর অবাধ্যতা করা ছিল ন;, বরং তিনি আবু সুফিয়ানের অসত্য উক্তি খণ্ডন করতে চেয়েছেন মাত্র।

(২) আল্লামা সিন্ধী বলেন, রসূল (স.) কর্তৃক নিষেধের উদ্দেশ্য হযরত উমর বুঝেন যে, জওয়াব না দেয়ার এ নির্দেশটা মূলত তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য ছিল। হযরত উমর তখন উপরোক্ত পন্থায় অবজ্ঞা করাকে অধিক ক্রিয়াশীল মনে করেন।

(৩) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, কথা বলার ধরন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা হতে হযরত উমর (রযি.) রসূল (স.)-এর নিষেধের কারণ এটা বুঝেন যে, যতক্ষণ আবু সুফিয়ান বলতে থাকে ততক্ষণ কিছু না বলা হোক। যাতে তার মনের খবর জানা যায়। রসূল (স.)-এর উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আবু সুফিয়ানের কথা শেষ হওয়ার পরও জওয়াব দেয়া হবে না।

(৪) আল্লামা যুরকানী বলেন ঃ আহমাদ, তবরানী ও হাকেম (রহ.) ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন উমর (রযি.) নীরবতা অবলম্বন করার ব্যাপারে নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলেন না, তখন তিনি রসূল (স.)-এর কাছে জওয়াব প্রদানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রসূল (স.) তাকে জওয়াব প্রদানের অনুমতি দেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

لَمْ اٰمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِىْ ঃ অর্থাৎ, আমি কাউকে অঙ্গহানী (مثله) করার নির্দেশ দিইনি। তবে তারা যে অঙ্গহানি করেছে, তাতে আমি অসন্তুষ্ট নই। কারণ, তোমরা আমার দুশমন। বদর যুদ্ধে তোমরা আমার পুত্রকে হত্যা করেছ।

وَقَدْ خَشِيْنَا أَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا (তীব্র আশঙ্কা হয় যে, আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান যা দুনিয়াতেই দেয়া হচ্ছে) ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হযরত আব্দুর রহমানের এ উক্তি এদিকে ইঙ্গিত করে যে, আলেম ও জাতির কর্ণধারদের জন্য কর্তব্য হলো, তারা বিশাল দুনিয়ার মোহ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে, যাতে পুণ্য সঞ্চয় ব্যাহত না হয়।

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ ঃ হযরত আনাসের চাচা আনাস বিন নযর বদর যুদ্ধের দিন মদীনায় না থাকার কারণে বদর যুদ্ধে শরীক হতে পারেন না।

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ (আল্লাহ্! তোমার দরবারে ওজর পেশ করছি) ঃ হযরত আনাস বিন নযর (রযি.) এ উক্তির মাধ্যমে মুসলমান ও মুশরিক উভয়ের

www.e-ilm.weebly.com

কার্যের প্রতি তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তবে إِنِّىْ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ الخ বলে মুসলমানদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ পেশ করেছেন। কারণ, মুসলমানরা উহুদ রণাঙ্গন থেকে পিছু হটে গিয়েছিল। আর اَبْرَ اِلَيْكَ الخ বলে মুশরিকদের ব্যাপারে নিজের নির্দোষের কথা ব্যক্ত করেছেন।

إِنِّىْ اَجِدُ رِيْحَ الْجَنَّةِ دُوْنَ أُحُدٍ (উহুদের পাদদেশ হতে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি) ঃ কেউ কেউ এ বাক্যের রূপকার্থ বর্ণনা করেন যে, আমি পূর্ণ বিশ্বাসী যে, এখান থেকেই আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। তবে লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে যে, উল্লিখিত বাক্যটি রূপকার্থে ব্যবহারের কোন প্রয়োজন নেই; বরং বাক্যটি তার বাস্তব ও প্রকৃত অর্থেই সুন্দরভাবে প্রযোজ্য। কেননা মুমিন বান্দা মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী হলে বেহেশত হতে খুশবু নিয়ে ফেরেশতা তার কাছে আগমন করে। আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয় বান্দা তার ঘ্রাণ লাভের বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেন। যেমন হযরত সালমান (রযি.) বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে ঃ اِنَّ أَوَّلَ مَا يُبَشَّرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ عِنْدَ الْوَفَاةِ بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ অর্থাৎ, মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুকালে সর্বপ্রথম খুশবুর সুসংবাদ লাভে ধন্য হন। অনুরূপভাবে হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে ঃ اِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِحَرِيْرَةٍ فِيْهَا مِسْكُ الخ অর্থাৎ, মৃত্যুকালে মুমিনের নিকট ফেরেশতা মিশক সম্বলিত রেশমী কাপড় নিয়ে উপস্থিত হয়। হযরত আবুল আলীয়া থেকেও এক হাদীসে এসেছে ঃ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا حَتّٰى يُؤْتٰى بَعْضٍ مِنْ رَيْحَانِ الْجَنَّةِ فَيَشُمُّهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কোন প্রিয় বান্দার দুনিয়া ত্যাগের সময় হলেই জান্নাতের খুশবু তার নাকে আসে আর সে তা প্রাণভরে গ্রহণ করে। হযরত আনাস বিন নযরও (রযি.) এ ধরনের নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন ছিলেন। (লামিউদ্ দারারী ৩ ঃ ১৩০)

حِيْنَ نَسَخْنَا الْمَصَحَفَ (হযরত উছমান বিন আফ্‌ফান (রযি.)-এর নির্দেশক্রমে যখন আমরা উসমানী অনুলিপি তৈরী করছিলাম।*

صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ (তারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত চুক্তি বাস্তবায়ন করেছে) ঃ এখানে চুক্তি বলতে উদ্দেশ্য হয়ত জিহাদ থেকে পিছু না হটার অঙ্গীকার। আল্লাহ্ পাক যার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন। لَايُوَلُّوْنَ الْأَدْبَارَ অর্থাৎ, তারা পশ্চাদপসারণ হয়নি। অথবা আকাবার রাতে কৃত অঙ্গীকার উদ্দেশ্য। আল্লামা কস্তলানী বলেন, কতক সাহাবা মান্নত করেছিলেন যে, যদি তারা রসূল (স.)-এর সাথে রণাঙ্গনে যান, তবে অটল-অবিচল থাকবেন। প্রয়োজনে শহীদও হয়ে যাবেন। হযরত উসমান বিন আফফান, হযরত তালহা, হযরত হামযা, হযরত মুসআব বিন উমাইর (রযি.) প্রমুখ সাহাবী ছিলেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

টীকা ঃ *হযরত উসমান (রযি.)-এর যুগে কুরআন শরীফ সংকলনের নাতিদীর্ঘ ইতিহাস বিস্তারিতভাবে এ গ্রন্থেরই তাফসীর পর্বে বর্ণিত আছে। অনুগ্রহপূর্বক সেখানে দেখুন। —(অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

فَمِنْهُمْ مَنْ قَضٰى نَحْبَهُ : কতক সাহাবা তাঁদের মান্নত পূরণ করেন। এটা মৃত্যুবরণের প্রতি ইঙ্গিতবহ।

فَأَلْحَقْنَا هَا فِى سُوْرَتِهَا فِى الْمُصْحَفِ (অতঃপর আমরা ঐ আয়াতকে কুরআনের সূরায় সংযোজন করে দিলাম) ঃ

এখানে প্রশ্ন হলো, কুরআন হওয়ার জন্য যখন তা 'মুতাওয়াতির' হওয়া শর্ত তখন কেবল এক ব্যক্তির সার্টিফিকেটে তা কি করে কুরআন হয়ে গেল?

উত্তর হলো, অনুলিপি প্রস্তুতকারীদের নিকট উক্ত আয়াত মুতাওয়াতিরই ছিল। কিন্তু হযরত খোযাইমা (রযি.) ব্যতিরেকে কারো কাছে তার পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি। অথবা ব্যাপার এমনও হতে পারে যে, তারা আয়াতটি বিস্মৃত হয়ে যান। যখন হযরত খোযাইমা (রযি.) থেকে শ্রবণ করেন, তখন স্মরণে এসে যায়। ফলে এভাবে মুতাওয়াতির হয়ে গেল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, আলোচ্য হাদীসে উহুদ যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই। তাহলে শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক কোথায়? উত্তর হলো হাদীসে যে আয়াত বিবৃত হয়েছে, তা হযরত আনাস বিন নযরসহ অন্যান্য উহুদ-শহীদদের প্রসঙ্গে অবতারিত। অতএব সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ (নবীর সাথে যাত্রাকারীদের একদল ফিরে এল) ঃ প্রত্যাবর্তনকারী দু'ধরনের লোক ছিল। প্রথম প্রকার ঃ মুনাফিকরা। অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার অনুসারীরা, যারা সওত নামক স্থান হতে পিছু টান দেয়। সংখ্যায় তারা ছিল ৩০০ জন। দ্বিতীয় প্রকার ঃ মুসলমান; যারা মূল যুদ্ধের পর পিছু হটে গিয়েছিল। তাদের পশ্চাদপসারণের পর রসূল (স.)-এর সাথে মাত্র ১৮ জন সাহাবী ছিলেন। এখানে نَاسٌ বলতে প্রথম প্রকার লোক অর্থাৎ, মুনাফিকরা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ فِرْقَتَيْنِ : অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সাথে প্রত্যাবর্তনকারী মুনাফিকদের ব্যাপারে মুসলমানগণ দু'শিবিরে বিভক্ত হন।

(১) فِرْقَةٌ تَقُوْلُ نُقَاتِلُهُمْ অর্থাৎ, একদল তাদের সাথে যুদ্ধের পক্ষপাতি ছিলেন। তাদের যুক্তি হলো, পিছু হটে প্রমাণ করেছে যে, তারা মুনাফিক।

(২) وَفِرْقَةٌ تَقُوْلُ لَا نُقَاتِلُهُمْ অর্থাৎ, আরেক দল যুদ্ধ না করার পক্ষপাতি ছিল। কারণ তারা যুক্তি দেখান যে, মুনাফিক হলেও তারা বাহ্যত মুসলমানই।

تَنْفِى الذُّنُوبَ : 'নফী' দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকাশ ও পৃথক। আর ذُنُوبٌ দ্বারা উদ্দেশ্য أَصْحَابُ الذُّنُوبِ অর্থাৎ. অপরাধীগণ। উদ্দেশ্য হলো, মদীনার এক বৈশিষ্ট্য হলো, সে অপরাধীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেয়। আসল ও নকলের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا (যখন তোমাদের দু'টি দল হীনবল হয়ে পড়েছিল) ঃ এখানে আল্লাহ্র সেই অনুগ্রহের কথা বিবৃত হচ্ছে যা আনসারদের দু'টি দল অর্থাৎ, খাযরাজ গোত্রভুক্ত বনূ সালিমাহ্ আর আউস গোত্রভুক্ত বনূ হারেসার প্রতি করা হয়। ঘটনাটি তখনকার, যখন মুনাফিক দলপতি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার তিনশত সমমনা সাথী নিয়ে সওত নামক স্থান হতে মদীনায় ফেরত এসেছিল; তখন উক্ত দু'দলও (বনূ সালিমাহ ও বনূ হারেসা) আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের সাথে ফিরে যেতে মনস্থ করে। কিন্তু তারা আল্লাহ্র সাক্ষাৎ রহমতপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তাদেরকে এহেন পদস্খলন থেকে রক্ষা করেন। তারা প্রত্যাবর্তন করেনি; বরং নবী করীম (স.)-এর সাথেই থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا أُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ ঃ হযরত জাবের [১] (রযি.) বলেন, এ আয়াত অবতীর্ণ না হোক তা আমি চাই না। কারণ, আয়াতের প্রাথমিক অংশে যদিও আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতার নিন্দা করা হয়েছে, কিন্তু আয়াতের শেষাংশে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের ঘোষণা রয়েছে। এ অংশে আল্লাহ্ নিজেকে তাদের অভিভাবক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। অতএব যাদের অভিভাবক আল্লাহ্ হন, তারা কিভাবে ভীরু ও কাপুরুষ হতে পারে? এ থেকে জানা যায় যে, তাদের প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা দৃঢ়তার পর্যায়ে পৌঁছেছিল না।

قَوْلُهُ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِيْ تِلْكَ السَّاعَةَ ঃ (কেমন যেন তারা সে সময় আমার উপর আক্রোশে ফেটে পড়ে এবং ঋণের জন্য লড়াই করতে উদ্যত হয়।

قَوْلُهُ فَسَلَّمَ اللّٰهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক খেজুরের স্তূপগুলির হ্রাস রক্ষা করেন। রসূল (স.)-এর হস্তস্পর্শের বদৌলতে এত বরকত হয় যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধের পরেও খেজুরের পরিমাণ পূর্বরূপই ছিল।

قَوْلُهُ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ (তার সাথে দু'ব্যক্তি ছিল, যারা তার পক্ষ হয়ে লড়ছিল) ঃ মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, এ দু'জন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আ.) ছিলেন। এর দ্বারা তাদের উক্তি খণ্ডন হয়, যারা বদর ব্যতিরেকে অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতাদের যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার দাবী করেন।

مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَجْمَعُ أَبَوَيْهِ لِأَحَدٍ غَيْرِ سَعْدٍ (সা'দ ব্যতীত অন্যের জন্য রসূল (স.) তার পিতা-মাতার উল্লেখ একত্রে করতে আমি শুনিনি) ঃ অন্য বর্ণনায় হযরত যুবাইর (রযি.)-এর জন্যও রসূল (স.) কর্তৃক এভাবে পিতা-মাতার উল্লেখের কথা প্রমাণিত আছে। জওয়াব দেয়া যেতে পারে, সম্ভবত বর্ণনাকারী তা শুনেন নি। অথবা শুনে থাকলেও তা সরাসরি শুনেননি; বরং অন্যের মাধ্যমে শুনেছেন। অথবা এটা কেবল উহুদ যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট।

টীকা ঃ ১. হযরত জাবের (রযি.), মৃত্যু ঃ ৭৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ غَيْرَ طَلْحَةَ وَسَعْدٍ عَنْ حَدِيْثِهِمَا ঃ অর্থাৎ, আবু উসমান নাহদীর (যার নাম আব্দুর রহমান) উক্তি 'সেদিন কিছুক্ষণ রসূল (স.)-এর সাথে হযরত সা'দ ও তালহা [১] ব্যতিরেকে অন্য কোন সাহাবা ছিলেন না'॥এটা তাদের থেকে শুনেই তিনি বলেন। কেননা, তাঁরা (সা'দ ও তালহা) আবু উসমান নাহদীকে এ কথা বর্ণনা করেন।

فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (আমি তাদের কাউকে হুযূরের উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে শুনিনি) ঃ কারণ, তাদের অন্তরে নবী করীম (স.)-এর ঘোষণা—

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ, আমার প্রতি জেনেশুনে কেউ মিথ্যাচার করলে জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়ে যাবে॥এর ভীতি সতত জাগ্রত ছিল। যাতে তা বর্ণনায় কোন উল্টা-পাল্টা বা এদিক-সেদিক হয়ে উক্ত হাদীসের আওতায় পড়ে না যান।

قَوْلُهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ اِنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (উহুদ যুদ্ধে যখন একদল মুসলমান নবীর থেকে বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে) ঃ হাফেজ ইবনে হাজার ফাতহুল বারীতে বলেন, উহুদের দিন সাহাবাগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েন।(১) কতক পরাজিত হয়েই মদীনায় চলে যায় এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করে না। এ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ أن الذين تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ অর্থাৎ, দু'দল পরস্পরমুখী হলে তোমাদের একটা দল পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে। (২) রসূল (স.)-এর ভুয়া মৃত্যু সংবাদ শুনে কতক সাহাবার পা টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরে তারা নিজেদের দুর্বলতাকে ঝেড়ে মুছে ফেলেছিল এবং শহীদ হওয়া নাগাদ লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্পবদ্ধ হয়েছিল। অধিকাংশ সাহাবী এ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। (৩) কতক সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায় রসূল (স.)-এর সাথে অটল-অবিচল থাকেন। অতঃপর দ্বিতীয় দল সাহাবা যখন জানতে পারেন যে, রসূল (স.) জীবিত, তখন এক এক করে সবাই রসূল (স.)-এর কাছে ফিরে আসতে শুরু করেন। বস্তুত এ কারণেই রসূল (স.)-এর নিকট অবস্থানরত সাহাবাদের সংখ্যার ব্যাপারে বর্ণনাসমূহ বিপরীতমুখী তথ্য প্রদান করে।

قَوْلُهُ أَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ (আবু তালহা রসূল (স.)-এর সামনে ছিলেন) ঃ হযরত আবু তালহার নাম যায়েদ বিন সাহল আনসারী (রযি.)। তিনি হযরত আনাসের (রযি.) মাতা উম্মে সুলাইমের স্বামী ছিলেন।

টীকা ঃ ১. হযরত তালহা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩৬ হিঃ

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ مَجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةٍ (তিনি রসূল (স.)-এর উপর ঢাল হয়েছিলেন) ঃ مُجَوِّب এটা 'ঢাল' অর্থ বিশিষ্ট جَوْبَة থেকে নির্গত। حَجَفَة অর্থ চামড়ার ঢাল, যাকে আরবীতে 'দারাকা'ও বলে।

شَدِيدُ النَّزْعِ (দক্ষ তীরন্দাজ) ঃ অর্থাৎ, তীর বর্ষণ ও নিক্ষেপে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ ঃ তূনীর (তীরদানী) নিয়ে।

وَأُمَّ سُلَيْمٍ ঃ ইনি হযরত আবু তালহার স্ত্রী। হযরত আনাসের মাতা। রসূল (স.)-এর দুধখালা। তাঁর নাম কেউ কেউ 'সাহলাহ' বলেছেন।

أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ ঃ মুসলমানদের প্রতি এ আহ্বান ছিল ইবলীসের। অর্থাৎ, মুসলমানগণ! পশ্চাৎ লোকদের থেকে আত্মরক্ষা কর অথবা তাদের সাথে লড়াই কর।" মুসলমানদের গোলক ধাঁধাঁয় ফেলতে সুকৌশলে ইবলীস এ আহ্বান করে। যাতে তাঁরা আপসে লড়াইয়ে লিপ্ত হয় এবং নিজেদের হাতে নিজেরা হতাহত হয়!

فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ (প্রথম দলটি ঘুরে দাঁড়াল এবং পশ্চাতে আগত দলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল) ঃ মুসলমানদের তীরন্দাজী দল নিজেদের নির্ধারিত স্থান পাহাড়ের গিরিপথ থেকে চলে এসে মুশরিকদের মাল-সম্পদ লুটার জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লে তারা মুশরিকদের সাথে মিশে যায়। অতঃপর যখন শয়তান উপরোক্ত আহ্বান জানায়, তখন ময়দানে পূর্ব হতে অবস্থানরত সাহাবা এদিকে মনোযোগ দেন। এ সময় তাঁরা মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। ফলে তখন কার্যত এক মুসলমান অপর মুসলমানের হাতে শহীদ হতে থাকেন।

مَا زَالَتْ فِيْ حُذَيْفَةَ بَقِيَّةُ خَيْرٍ ঃ অর্থাৎ, হুজাইফা[১] (রযি.) তাঁর পিতার হত্যাকারীর জন্য সর্বদা দোয়া-ইস্তেগফার করতে থাকেন। কেউ কেউ এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, হযরত হুজাইফার অন্তরে সর্বদা এ আফসোস ছিল যে, তার পিতাকে একজন মুসলমান হত্যা করেছেন। (কস্তলানী)

আল্লামা আইনী বলেন, হযরত হুজাইফার পিতা ইয়ামান ও সাবেত বিন কায়েস (রযি.) ছিলেন বৃদ্ধ। রসূল (স.) তাদেরকে মহিলা ও বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রেখে যান। মুসলমানগণ পরাজয়ের সম্মুখীন হলে তাঁরা তলোয়ার নিয়ে মুসলমানদের কাতারে ঢুকে পড়েন। মুসলিম বাহিনী তাদের চিনতে পারেন না। এমতাবস্থায় সাবেত বিন কায়েস (রযি.) মুশরিকদের হাতে নিহত হন আর হযরত ইয়ামান (রযি.) জনৈক সাহাবীর তলোয়ারে শহীদ হন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায়

টীকা ঃ ১. হযরত হুজাইফা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩৬ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আরও এসেছে যে, রসূল (স.) তাঁর রক্তপণ প্রদানের ইচ্ছা করলে হযরত হুজায়ফা (রযি.) তা মুসলমানদের প্রতি ছদকা করে দেন। এতে রসূল (স.)-এর কাছে হুজাইফার মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

أَنْشُدُكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْبَيْتِ (আমি তোমাকে এ গৃহের মর্যাদার শপথ দিচ্ছি) ঃ হাফেজ ইবনে হাচার ও লামিউদ্ দারারী প্রণেতার মতে, এর দ্বারা কা'বা শরীফই উদ্দেশ্য। তখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গায়রুল্লাহের নামে শপথ করলে তো শপথ কার্যকরী হয় না, তবে এখানে কিভাবে কার্যকরী হল?

উত্তর হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের নীরবতা অবলম্বন থেকে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। কেননা, তিনি বিষয়টি অস্বীকার করেন নি।

দ্বিতীয় উত্তর হলো, 'কাবা গৃহের শপথ' আর 'কাবা গৃহের মর্যাদার শপথ' এক নয়। কারণ, 'কাবা গৃহের মর্যাদা' আল্লাহ্র হুকুমেই হয়েছে। সুতরাং শপথটি হয়েছে আল্লাহ্র একটি গুণের (সীফাতের) উপর। (লামিউদ্ দারারী)

لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَبَعَثَهُ (যদি মক্কার লোকদের কাছে হযরত উসমান অপেক্ষা অন্য কেউ বেশি সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হতেন, তবে রসূল তাকেই প্রেরণ করতেন) ঃ বস্তুত এ কারণেই হযরত উমর (রযি.) এর মত ব্যক্তিত্ব এ অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হন যে, আল্লাহ্র রসূল! মক্কায় আমার বংশের কেউ নেই, যে আমাকে সাহায্য করবে এবং শত্রুর হাত থেকে হেফাজত করবে। তাই রসূল (স.) বাধ্য হয়ে হযরত উসমানকে (রযি.) প্রেরণ করেন। হযরত উসমান (রযি.) মক্কায় পদার্পণ করলে মক্কার জনগণ তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা এবং সাদর সম্ভাষণ জানায়।

فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ ঃ অর্থাৎ, দুঃখ প্রদানের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুঃখিত করেছেন। কেননা তোমরা আল্লাহ্র রসূলের কথা মান্য না করে তাঁকে দুঃখ দিয়েছ। তাই আল্লাহ্ ঐ দুঃখ প্রদানের বিনিময়ে তোমাদেরকেও দুঃখিত করেছেন। তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করেছ। তোমাদেরকে জীবন ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন যে, সাহাবায়ে কেরাম রসূল (স.)-এর কারণে দুঃখিত হন। কারণ তারা রসূল (স.)-এর চেহারা মুবারকে আঘাত দেখেন। দাঁত ভাঙ্গা পান। রসূল (স.)-এর আপন পিতৃব্য হযরত হামযা (রযি.) শাহাদাত বরণ করেন। অনুরূপভাবে রসূল (স.)ও সাহাবাদের আচার-ব্যবহারে ব্যথিত হন। কারণ তিনি সাহাবাদেরকে গনিমতের পিছে পড়ে স্বীয় প্রভুর অবাধ্যতায় লিপ্ত দেখতে পান। যার ফলে তারা গনিমত থেকেও বঞ্চিত হয় এবং আপন আত্মীয়-স্বজনদেরও প্রাণ দিতে হয়।

ইমাম ক্বফফাল (রহ.) বলেন, আমার মতে দুঃখ উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্ তোমাদেরকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়ে অর্থাৎ, বহু দুঃখে নিপতিত করে রসূলের কথা মান্য না করার প্রতিফল প্রদান করেছেন। আর তা নিম্নরূপ ঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) প্রাথমিক বিজয় ও সফলতা হস্তচ্যুত হয় (২) আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু (৩) অনেকে আহত হন। (৪) মুশরিকদের পুনঃ আক্রমণের শিকার এবং (৫) মুসলিম বাহিনী নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন প্রভৃতি। (কস্তলানী)

تُصْعِدُونَ تَذْهَبُونَ الخ ঃ এ বাক্য থেকে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য ثُلَاثِى ও رُبَاعِى-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। تُصْعِدُونَ যখন ثُلَاثِى হতে ব্যবহৃত হবে, তখন অর্থ হবে اِرْتَفَعَ অর্থাৎ, উঁচু হয়েছে। পক্ষান্তরে رُبَاعِى হতে ব্যবহৃত হলে, অর্থ হবে ذَهَبَ অর্থাৎ, প্রস্থান করেছে।

وَاَقْبَلُوا مُنْهَزِمِيْنَ (তারা পরাজিত হয়ে মদীনায় এলো) ঃ পঞ্চাশ তীরন্দাজের সিংহভাগ নিজেদের স্থান ত্যাগ করে গনিমতের মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ময়দানে লাফিয়ে পড়লে কুরাইশদের এক অশ্বারোহী বাহিনী উক্ত স্থান খালি পেয়ে সেখান থেকে মুসলমানদের পশ্চাতে এসে পৌঁছে এবং মুসলমানদেরকে চতুর্দিক হতে ঘিরে নেয়। যার করুণ ফলাফলে ৭০ জন সাহাবা শহীদ হন আর বাকীরা হন পরাজিত।

قَالَ لِىْ خَلِيْفَةُ (খলীফা আমাকে বলেন) ঃ যেহেতু বুখারীর (রহ.) শায়েখ (উস্তাদ) খলীফা (রহ.) তাঁকে বিষয়টি 'হাদীস বর্ণনার' পন্থায় বর্ণনা করেননি; বরং আলোচনার পদ্ধতিতে বলেছেন—তাই ইমাম বুখারী "قَالَ" শব্দ দ্বারা তা উল্লেখ করেছেন।

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ (আল্লাহ্ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন বা শাস্তি দিবেন॥এ ব্যাপারে আপনার করণীয় কিছুই নেই) ঃ এ আয়াতের অবতরণহেতু সম্বন্ধে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতান্তর রয়েছে। অধিকাংশের মতে এ আয়াত উহুদ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতারিত। আবার তাদের কতিপয়ের মতে রসূল (স.) আহত হয়ে যখন বলেন যে, নবীকে একা ফেলে চলে গেলে সে জাতি কি করে কামিয়াব হবে? ঠিক তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। কারো মতে, আয়াতের অবতরণ তখন হয়, যখন রসূল (স.) সফওয়ান বিন উমাইয়া, সুহাইল বিন আমর এবং হারেস বিন হিশামের প্রতি অভিসম্পাত করছিলেন। কারো মতে, যখন কাফেররা হযরত হামযার অঙ্গচ্ছেদন করলে রসূল বলেন॥ لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِيْنَ مِنْهُمْ অর্থাৎ, আমি অবশ্যই তাদের সত্তরজনের অঙ্গহানী করব। কারো মতে, যখন রসূল (স.) তাদের মূলোৎপাটনের জন্য বদদোয়া করার ইচ্ছা করেন। কারো মতে, যে সকল মুসলমান রসূল (স.) এর বিরুদ্ধাচরণ ও নিশ্চিত জয়কে পরাজয়ে পরিণত করে দেয়, তাদের প্রতি রসূল (স.) বদদোয়া করার ইচ্ছা করলেন। মোটকথা, এর যে কোন একটি অথচ সম্মিলিত সকল কারণের প্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

www.e-ilm.weebly.com

তবে কতিপয়ের মতে এ আয়াত বিরে মাউনার ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতারিত। যখন নবী করীম (স.) কর্তৃক প্রেরিত সাতজন কারী সাহাবাকে আমের বিন তুফাইল নৃশংশভাবে হত্যা করে এবং সে কারণে রসূল (স.) এ ঘটনার সাথে জড়িত গোত্রদের প্রতি অভিসম্পাত করেন, ঠিক তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।
(আইনী, কস্তলানী)

أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ الخ ঃ এ বাক্যের তারকীব তিন রকম হতে পারে। (১) এটা পূর্বোক্ত أَوْ يَكْبِتَ বাক্যের উপর আতফ হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহ্ পাকই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখেন; আপনি নন। অতএব হয়ত তিনি তাদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করবেন অথবা তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টি দিয়ে ক্ষমা করবেন। তারা মুসলমান হোক কিংবা কুফরীর উপর অটল থাকার কারণে তাদের শাস্তি দেয়া হোক-এ ব্যাপারে আপনার কোন কর্তৃত্ব নেই।

(২) أَنْ শব্দ উহ্য মেনে أمر বা شَيْء-এর উপর আতফ হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে তাদের ব্যাপারে বা তাদের তওবা কবুল করা বা তাদেরকে আজাব দেয়ার প্রশ্নে আপনার কিছুই বলার অধিকার নেই।

(৩) অথবা أَوْ টা إِلَّا أَنْ-এর অর্থে হবে। তখন উদ্দেশ্য হবে, তাদের ব্যাপারে আপনার কোন ইখতিয়ার নেই। তবে তারা ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন আর যদি তারা কুফরের উপরেই অটল-অবিচল থাকে, তবে তাদেরকে শাস্তি দিবেন। (বুখারীর পার্শ্বটীকা)

بَابُ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيْطٍ

উম্মে সালীত আলোচনা প্রসঙ্গ

أُمِّ سَلِيْط ঃ নাম অজ্ঞাত। পুত্রের নামানুসারে তাকে উম্মে সালীত বলা হয়। কস্তলানীর গ্রন্থে আছে, ইবনে সা'দ বলেন, তিনি উবাইদ বিন যিয়াদ মাযিনীর কন্যা উম্মে কায়েস।

بَابُ قَتْلِ حَمْزَةَ رض-হযরত হামযা (রযি.)-এর হত্যা প্রসঙ্গ

فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ (যখন আমরা হিমসে পদার্পণ করলাম) ঃ সিরিয়ার একটি নামকরা শহরের নাম হিমস। ৭০০ সাহাবা সেখানে বসবাস করতেন।

هَلْ لَكَ فِيْ وَحْشِيْ (আপনি ওয়াহাশীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী?) এ ওয়াহশী দ্বারা উদ্দেশ্য যুবাইর বিন মুতঈমের[১] গোলাম ওয়াহশী বিন হারব আল হাবশী (রযি.)।

كَأَنَّهُ حَمِيْتٌ ঃ যেন তা একটি বড় ডোল। স্থূলকায় ও কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় তাকে মশক বা ডোলের সাথে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে।

فَكَأَنِّيْ نَظَرْتُ إِلَى قَدَمَيْكَ (তাই মনে হচ্ছে আমি তোমার পদদ্বয় দেখেছিলাম)

টীকা ঃ ১. হযরত যুবাইর বিন মুতঈম (রযি.), মৃত্যু ঃ ৫৭/৫৮/৫৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

ওয়াহশী উবায়দুল্লাহর পদদ্বয়কে ঐ শিশুর পায়ের সাথে তুলনা করে, যাকে সে শিশুকালে তার (দুধ) মায়ের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। এটা ওয়াহশীর তুখোড় মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং বিশেষ মনোবিজ্ঞানী হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, তার পা দেখেই তিনি চিনতে পারেন যে, এ সেই বাচ্চা যাকে আমি শিশুকালে নিয়ে গিয়েছিলাম। অথচ দীর্ঘ ৫০ বছর পর তাদের এ পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটে।

إِنَّ حَمْزَةَ قَتَلَ طُعَيْمَةَ بْنَ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ (হামযা তুয়াঅমা বিন আদীকে হত্যা করেছেন) ঃ এ বাক্যটি ভুল। বিশুদ্ধ হলো, তুয়াঅমা বিন আদী বিন নওফল। অন্যথা এর পরবর্তী বাক্য إِنْ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّيْ অর্থাৎ, যদি তুমি আমার চাচা হত্যার বদলা স্বরূপ হামযাকে হত্যা করতে পার...বলা শুদ্ধ হবে না। কারণ তুআয়মা যদি আদী বিন যিয়াদের পুত্র হয়, তবে তুআয়মা যুবাইর বিন মুতঈমের ভাতিজা হবে; চাচা হবে না। সুতরাং, বংশধারা হবে-যুবাইর বিন মুতঈম বিন আদী বিন নওফল। তুআয়মা বিন আদী বিন নওফল। এ ব্যাখ্যা অবলম্বন করলে যুবাইর বিন মুতঈমের চাচা তুআয়মা হওয়ার উপর কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

يَا ابْنَ أُمِّ أَنْمَارٍ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ (হে খত্‌নাকারিণী উম্মে আনমারের পুত্র!)ঃ উম্মে আনমার হলো উম্মে সিবা[১]। "بَظْر" মেয়েদের লজ্জাস্থানের ঐ চামড়াকে বলে, যা খত্‌নার সময় কেটে ফেলা হয়। সিবা'র মাতা মক্কায় মেয়েদের খতনা করত। আরববাসী এ শব্দটি লজ্জা প্রদান ও নিন্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন।

إِنَّهُ لَا يُهِيْجُ الرُّسُلَ ঃ নবী করীম (স.) দূতদের প্রতি উত্তেজিত হন না এবং তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করেন না।

فَهَلْ تَسْتَطِيْعُ أَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ (তুমি নিজেকে [আমার থেকে] দূরে রাখতে পারবে?) ঃ রসূল (স.)-এর এ উক্তির কারণ হল, যাতে তাকে দেখে চাচার কথা মনে হওয়ায় তাকে শাস্তি দেয়ার মানসিকতা সৃষ্টি না হয়। এটা অতি বাস্তব যে, রসূল (স.)-এর আন্তরিক কষ্টের দরুন কারো ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। কেননা, সাধারণ বুযুর্গদের আন্তরিক কষ্টেরও নিশ্চিতভাবে একটি অশুভ প্রতিক্রিয়া পড়ে। বদদোয়া (মুখে) করার প্রয়োজন পড়ে না। মূলত এ জাতীয় অনিষ্ট হতে বাঁচানোর জন্য রসূল (স.) ওয়াহশীকে উপরোক্ত কথা বলেন। (লামিউদ্ দারারী)

فَخَرَجَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ (অতঃপর মিথ্যুক মুসায়লামার আবির্ভাব হলো) ঃ এ মুসায়লামা হচ্ছে প্রসিদ্ধ ভণ্ড নবীর দাবীদার মুসায়লামা বিন হাবীব কাজ্জাব। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর সে তার সমর্থক বনূ হানীফা প্রমুখদের নিয়ে সাহাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পাঁয়তারা করলে হযরত আবু বকর (রযি.) তার বিরুদ্ধে হযরত খালিদ বিন ওলীদের নেতৃত্বে তথায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। মুসায়লামা তার দলবল সহ পরাজিত হয় এবং হযরহ ওয়াহশীর (রযি.) হাতে মুসায়লামা নির্মমভাবে নিহত হয়। ওয়াহশী (রযি.) বলতেন ঃ قَتَلْتُ

www.e-ilm.weebly.com

فِى كُفْرِى خَيْرَ النَّاسِ وَفِى الْإِسْلَامِ شَرَّ النَّاسِ অর্থাৎ, কাফের থাকাকালে সর্বোৎকৃষ্ট আর মুসলমান হয়ে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকে আমি হত্যা করেছি।

وَوَثَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (এক আনসারী ব্যক্তি তার উপর লাফিয়ে পড়েন) ঃ প্রসিদ্ধ আছে, এ বীরের নাম আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসেম মাযিনী (রযি.)। মুসায়লামা ওয়াহশীর (রযি.) বল্লমের আঘাতে প্রাচীর থেকে ঘরের বাইরে গিয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ঐ আনসারী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তলোয়ারের আঘাতে ভবলীলা সাঙ্গ করেন। (লামিউদ্ দারারী)

بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ

নবী করীম (স.) এর আঘাতপ্রাপ্তি

যে সময় উহুদ রণাঙ্গনে মুসলমানরা পরাজিত এবং ৭০ জন সাহাবা শাহাদাত বরণ করেন, তখন নবী (স.)-ও কাফেরদের বেষ্টনীতে আটকা পড়েন। কাফেররা রসূল ও তাদের মধ্যবর্তী অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানো মুসলমানদের হটিয়ে দিয়ে রসূল (স.)-কে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু জানবাজ মুসলমানরা তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিল। তাঁরা মাঝখানে প্রাচীরবৎ হয়ে রইলেন। সেখানেই দশজন সাহাবা শহীদ হন। হযরত মুসআব বিন উমায়ির (রযি.) রসূল (স.)-এর সামনেই লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। আমর বিন কমিয়্যাহ্ তাঁকে শহীদ করে মনে করে যে, রসূল (স.) শহীদ হয়ে গেছেন। ফলে সে কাফেরদের মধ্যে গিয়ে রাসূলের মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করে।

মুসলমানরা অবরুদ্ধ থাকাকালে কাফেররা রসূল (স.)-এর প্রতি পাথর বর্ষণ করে। এতে রসূল (স.)-এর চেহারা মুবারক আহত হয়। বাহুতে আঘাত লাগে। দাঁতের নিচের পাটির ডান পার্শ্বের সূচাল দাঁতটি ভেঙ্গে যায়। শিরস্ত্রাণের কড়া মস্তকে গেঁথে যায়; যা বের করতে আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রযি.) নিজ দাঁত দ্বারা কামড়ে সজোরে টান দিলে তাঁরও দু'টি দাঁত ভেঙ্গে যায়। (আসাহহুস সিয়ার[১])

اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ (আল্লাহ্ চরমভাবে ক্ষুব্ধ হন) ঃ এখানে غَضَبْ-এর আসল অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং বাক্যের উদ্দেশ্য হল ঃ যে এ কাজ করেছে, সে আল্লাহ্র নিকট মারাত্মক গুনাহগারে পরিণত হয়েছে। তাকে এ পাপের সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে। (আইনী)

আল্লামা আইনী বলেন, রসূল (স.) যখন আহত হলেন, ওষ্ঠ মোবারক জখমী হল, দাঁত ভেঙ্গে গেল, তখন উবাই বিন খালফ সামনে এসে বলে যে, আল্লাহ্র কসম! আমি মুহাম্মদকে হত্যা করব। (নাউযুবিল্লাহ্) জওয়াবে রসূল (স.) বলেন, বরং আমিই তোকে হত্যা করব। রে মুশরিক! কোথায় ভাগছিস? এই বলে রসূল (স.) তার প্রতি বল্লম ছুঁড়ে মারলে সে পড়ে যায়। লোকজন তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায় এবং এর কয়েক ঘণ্টা পরেই সে জাহান্নামে পৌঁছে যায়।

টীকা ঃ১. আসাহহুস সিয়ার ঃ হযরত মাওলানা আব্দুর রউফ সিখারভী কর্তৃক প্রণীত। এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের একটি নির্ভরযোগ্য ইতিহাস (সীরাত) গ্রন্থ। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আছে যে, মুসলমানদের টলটলায়মান অবস্থায় হযরত কা'ব বিন মালেক (রযি.) রসূল (স.)-কে জীবিত থাকার সুসংবাদ প্রদান করলে চতুর্দিক হতে সাহাবাগণ এসে জড়ো হলেন। রসূল (স.) একটি উপত্যকায় গেলেন এবং সাহাবাদের সাথে বসে নামায পড়ালেন। সাহাবাগণও হুযূরের পিছনে বসে নামায পড়েন। এ সময় উবাই বিন খালফ তার ঘোড়ায় চড়ে রসূল (স.)-কে হত্যার নিয়তে সেখানে আসে। রসূল (স.) হারেস বিন ছুম্মাহ (রযি.) থেকে একটি বল্লম নিয়ে তার ঘাড়ে আঘাত করলে সে ভেগে যায় এবং সারফ নামক স্থানে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

دَمُّوا وَجْهَ نَبِيِّ اللّٰهِ (যারা রক্তাক্ত করে আল্লাহ্র নবীর নূরানী চেহারা) ঃ হতভাগ্য আব্দুল্লাহ বিন কমিয়্যাহ নবী (স.)-এর চেহারা রক্তে রঞ্জিত করে। শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া মস্তকে ঢুকে যায়। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রযি.) দাঁত দিয়ে কামড়ে তা বের করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রযি.)-এর পিতা মালেক বিন সিনান (রযি.) রসূল (স.)-এর রক্ত চুষে নেন। রসূল (স.) বলেন, যার রক্তের সাথে আমার রক্ত মিশে গেছে তাকে দোজখের আগুন স্পর্শ করবে না।

ফতহুল বারীতে আছে, যখন রসূল (স.) আহত হন এবং তাঁর চেহারা রক্তে রঞ্জিত হয়, তখন রসূল (স.) সে রক্ত মুছতে থাকেন এবং বলেন ঃ যদি রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ে তাহলে তাদের প্রতি আজাব আসা অনিবার্য। এ সময় রসূল (স.) এ ফরিয়াদও জানান যে, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমার অবুঝ গুনাহগার কওমকে আপনি ক্ষমা করে দিন!

صدمہ :رنداں کوتو نےجن سے کہ پہنچا کی ان کے لئے تو نے بھلائی کی دعاہے

তোমাকে দিয়েছে যারা সীমাহীন বেদনা করেছ তুমি তাদের জন্য কল্যাণ কামনা

كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ (তাঁর দাঁত ভেঙ্গে যায়) ঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের ভাই উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস তীর মারলে তার আঘাতে রসূল (স.)-এর নীচের দাঁত পাটির ডান পাশের সূচাল দাঁতটি ভেঙ্গে যায়। তবে দাঁতের গোড়া অক্ষয় থাকে।

একটি সূক্ষ্ম তথ্য

(দারুল উলূম দেওবন্দে) আমাদের বুখারীর সবক চলাকালে জনৈক সহপাঠী হযরত শায়খুল আরব ওয়াল আজম হযরত মাওলানা সায়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী[১] (রহ.)-এর কাছে এ মর্মে প্রশ্ন করেন যে, মজনুর প্রতি লায়লার যতটুকু ভালবাসা ছিল, রসূল (স.)-এর প্রতি আল্লাহ্র ততটুকু মহব্বত ছিল না? শায়খ জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন সে ভালবাসা? প্রত্যুত্তরে প্রশ্নকারী নিম্নোক্ত শের (পঙক্তি) পড়েন ঃ

لیلی نے اپنے شہر مي یہ منادی کرئ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو

ঘোষণা করে দিল লায়লা সারা শহরময়,
মারে না যেন পাথর কেউ আমার পাগলের গায়।

টীকা ঃ ১. হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৩৭৭ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

প্রশ্নের উদ্দেশ্য একথা বলা ছিল যে, যেমনভাবে লায়লার পক্ষ থেকে মজনুর হেফাজতের ব্যবস্থা হয় তদ্রূপ অলক্ষ্য হতে রসূল (স.)-এর হেফাজতের ব্যবস্থা কেন হল না? হযরত মাদানী (রহ.) তৎক্ষণাৎ আরেকটি শেরের দ্বারা তার প্রত্যুত্তর দেন ঃ

خون دل پینے کو لخت جگر کھانےکو یہ غذا ملتی ہے مولی تیرے دیوانے کو

আহার করতে কলিজার টুকরা পান করতে হৃদয়-রক্ত,
রুজি হিসেবে এই পায় প্রভু তোমার এ ভক্ত।

মোটকথা হযরত মাদানী (রহ.) এটা বলতে চান যে, আল্লাহ্ ওয়ালাদের প্রতি যে দুর্যোগ, বিপদ, মুসিবত, কঠোরতা আসে, তা তাদের জন্য দুঃখ ও কষ্টের কারণ হয় না; বরং তা তাদের আনন্দের উপকরণে পরিণত হয়। ফলে তারা এতে এক ধরনের মজা পায় এবং অন্তরের অন্তস্তল থেকে কামনা করে ঃ

نشود نصیب دشمن که شود هلاك تیغت سر دوستاں سلامت که تو خنجر آزمائی

দুশমনের ভাগ্য না হোক এমন অসিতে তোমার হবে বধ,
তোমার খঞ্জর পরীক্ষা হতে বন্ধু-মস্তক না হোক নিরাপদ।

بَابُ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ

আল্লাহ্ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দানকারীগণ প্রসঙ্গ

বর্ণনায় এসেছে, উহুদ যুদ্ধ হতে ফিরতি পথে আবু সুফিয়ান ও তার অন্যান্য সাথীরা রওহা নামক স্থানে পৌঁছে এ বিষয়ে আফসোস করতে থাকে যে, আমরা মুসলমানদের স্বাভাবিকভাবে ছেড়ে এসেছি। তাদেরকে বন্দীও করিনি আবার কষ্টও দিইনি। অথচ আমরা তা অনায়াসে করতে পারতাম। তাই তারা পুনরায় ময়দানে আসার মনস্থ করে। রসূল (স.) তাদের এ মতিগতি অবহিত হয়ে সাহাবীদের নিয়ে মদীনা হতে আট মাইল দূরে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত যান। কিন্তু আল্লাহ্ পাক মুশরিকদের অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত করেন। তারা (মক্কায়) ফেরত চলে যায়। এ বিষয়কে সামনে রেখে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (ফতহুল বারী, কস্তলানী)

بَابُ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَ اُحُدٍ

উহুদ যুদ্ধের শহীদ যারা

قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُحُدٍ سَبْعُوْنَ (উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন শহীদ হন) ঃ উহুদ শহীদদের সংখ্যায় মতান্তর রয়েছে। হযরত আনাসের (রযি.) এ বর্ণনা হতে জানা যায় যে, শহীদ ৭০ জনের সবাই আনসার ছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত উবাই বিন কাবের (রযি.) বর্ণনায় আছে, ৬ জন মুহাজির ও ৬৪ জন আনসার ছিলেন।
(ফতহুল বারী)

আল্লামা কস্তলানী হাফেজ আবুল ফাতাহ্ হতে উল্লেখ করেন যে, মোট ৯৬ জন শহীদ হন। ১১ জন মুহাজির, আর ৮৫ জন আনসার।

www.e-ilm.weebly.com

كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ (রসূল উহুদের শহীদদের দু'জন দু'জনকে একজনের বস্ত্রে কাফন দান করেন) ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন, পুরো হাদীস থেকে বুঝে আসে যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনের মুহূর্তে দু'বা ততোধিক লোকের মধ্যে একটি কাফনের কাপড় ভাগ করে দেয়া যেতে পারে। অতএব প্রত্যেককে অংশবিশেষ কাপড় দ্বারা কাফন পরানো হয়; যদিও তা দ্বারা পূর্ণ দেহ আবৃত হয় না। হাদীসের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কয়েকজনকে একই কাফন পরানো হয়। (বরং প্রত্যেকের কাফন ভিন্ন ছিল। কিন্তু একজনের কাফনের কাপড় ভাগ করে তাতে দু'জনকে কাফন দেয়া হয় বলে হাদীসে فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ বলা হয়েছে।)

আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায়—

(১) প্রয়োজন দেখা দিলে এক বস্ত্রকে কয়েকজনের মধ্যে ভাগ করে দেয়া জায়েয। যদিও এতে প্রত্যেকের পূর্ণ শরীর আবৃত না হয়।

(২) এক কবরে দু'বা ততোধিক ব্যক্তিকে দাফন করা জায়েয। 'বাদায়ে' গ্রন্থে আছে যে, সর্বোত্তম হলো এমতাবস্থায় দু'লাশের মধ্যখানে মাটির হাল্কা প্রাচীর দ্বারা আড়াল করে দেয়া, যাতে তা দু'কবরের হুকুমে হয়ে যায়। ইমাম মালিক, আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমাদ, ইসহাক (রহ.) প্রমুখের অভিমত এটাই।

لَا تَبْكِيهِ (তুমি তার জন্য কেঁদো না)ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ নিষেধাজ্ঞাটা জাবেরের ফুফু ফাতেমার জন্য। যেমন তা জানাযার পর্বে বিধৃত হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আইনী ও কিরমানী বলেন যে, জানাযা পর্বে নিষেধাজ্ঞাটা জাবেরের ফুফুর জন্য আর এখানকার নিষেধাজ্ঞাটা খোদ জাবেরের জন্য। মর্মার্থ হলো তুমি তার প্রতি ক্রন্দন কর বা না কর, উভয় বরাবর। কেননা ফেরেশতা ডানা নাড়িয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে? ফলে তার প্রতি খুশি হওয়া উচিত, ক্রন্দন করা ঠিক নয়।

بَابٌ أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ

উহুদ ও আমাদের পারস্পরিক ভালবাসা প্রসঙ্গ

أُحُد ঃ মদীনার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের নাম أحد (উহুদ)। সুহাইলী বলেন, অন্যান্য পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের কারণে তাকে উহুদ বলা হয়।

أُحُدٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ঃ কেউ কেউ বাক্যটিকে রূপকার্থে প্রয়োগ করেছেন এবং তৎপূর্বে أَهْل শব্দ উহ্য মেনে বলেছেন হতে যে, এর দ্বারা 'আনসার' উদ্দেশ্য। তবে কতিপয়ের মতে, রসূল (স.) সফর প্রত্যাবর্তনকালীন সময়ে যখন উহুদ পাহাড় দেখতেন, তখন এ বাক্য উচ্চারণ করতেন। উদ্দেশ্য ছিল, পরিবার-পরিজনের নিকটবর্তী হওয়া এবং দ্রুত তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা। কিন্তু বিশ্লেষকদের মতে, এ বাক্য তার আসল অর্থেই ব্যবহৃত।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, 'উহুদ' শব্দটি উহ্দিয়াত (একত্ববাদ) থেকে নির্গত হওয়ায় নবীর (স.) আগমনের লক্ষ্য অর্থাৎ, একত্ববাদ প্রচারের সাথে তা

www.e-ilm.weebly.com

সম্পূর্ণভাবে মিল রাখে বিধায় উহুদ পাহাড়টির সাথে নবীজীর (স.) গভীর মহব্বত সৃষ্টি হয়। বস্তুত এ মহব্বতের সূত্রেই উহুদ বেহেশতে রসূল (স.)-এর সাথে থাকবে। ফলে তাকে আসল অর্থে ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। কারণ, পাহাড়ের মধ্যে যেমন দাউদের (আ.) সাথে তাসবীহ পড়ার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে এবং পাথরের মধ্যে আল্লাহ্ভীতি সঞ্চারিত করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ অর্থাৎ, কতক পাথর আছে যা আল্লাহ্র ভয়ে অবনত হয়। তদ্রূপ যদি উহুদের মধ্যে রসূল (স.)-এর প্রতি মহব্বত প্রদান করা হয়, তবে তাতে দোষ বা আশ্চর্যের কি আছে!

حَرَّمْتُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْهَا (আমি সম্পূর্ণ মদীনাঞ্চলকে সম্মানিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছি) ঃ কৃষ্ণ প্রস্তরময় ভূমিকে لابة বলে। অপর নাম হাররাহ। 'মদীনা' দু'প্রস্তরময় ভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত। ইমামত্রয়ের মতে মদীনাও হারাম। তাই মক্কার ন্যায় মদীনার বৃক্ষ কর্তন ও প্রাণী নিধন অবৈধ।

আল্লামা আইনী বলেন, আহনাফের মতে মক্কার ন্যায় মদীনা হারাম নয়। অতএব মদীনার বৃক্ষ কর্তন ও প্রাণী নিধন বৈধ। আর আগত এ বাক্যে হারাম দ্বারা বৃক্ষ কর্তন ও প্রাণী নিধন হারাম উদ্দেশ্য নয়; বরং মদীনার সৌন্দর্য ও নৈসর্গে স্থায়িত্ব উদ্দেশ্য। যাতে মদীনার জনগণ প্রফুল্লচিত্ত ও সচ্ছলতার সাথে সেখানে জীবন যাপন করতে পারে।

بَابُ غَزْوَةِ الرَّجِيْعِ

রজী' যুদ্ধ

اَلرَّجِيْع ঃ হুজাইল গোত্র অধ্যুষিত একটি স্থানের নাম اَلرَّجِيْع (রজী)। এ স্থানের সন্নিকটে এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ায় তাকে রজী' যুদ্ধ বলা হয়।

رِعْل وَذَكْوَان ঃ বনূ সুলাইম গোত্রের দু'টি উপশাখার নাম এটা।

بِئْرِمَعُوْنَة ঃ মক্কা ও উসফানের মাঝে অবস্থিত হুজাইল গোত্র অধ্যুষিত একটি স্থানের নাম 'বীরে মাউনা'।

عَضَل وَ قَارَه ঃ এটা বনূ উলহুনের দু'ইহুদীর নাম (অর্থাৎ, দু'ইহুদীর নামানুসারে সৃষ্ট দু'গোত্রের নাম)। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, লেখকের শিরোনামের শেষাংশ হতে অনুমিত হয় যে, রজী যুদ্ধ ও বীরে মাউনার ঘটনা এক ও অভিন্ন। অথচ ঘটনা অভিন্ন নয়। কারণ, রজী যুদ্ধ আদাল ও কারাহ গোত্রের সাথে তৃতীয় হিজরীর শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়। যে ঘটনায় সাহাবাদের মধ্য হতে দশজন আছেম, খুবাইব প্রমুখ শরীক ছিলেন। পক্ষান্তরে বীরে মাউনার ঘটনা ঘটে চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে রি'ল, জাকওয়ান ও আসিয়্যাহ গোত্রের সাথে। এ ঘটনায় ৭০ জন কারী সাহাবী শরীক ছিলেন।

যেহেতু ওয়াকেদীর বর্ণনানুযায়ী এ দু'ঘটনা প্রায় একই সময় সংঘটিত হয় এবং উভয় ঘটনার সংবাদ রসূল (স.)-এর নিকট একই রাতে পৌঁছে, তাই লেখক দু'ঘটনাকে একই শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

রজী' যুদ্ধের পটভূমি

বর্ণিত আছে, একদা আদাল ও কারাহ্ গোত্রের কিছু লোক রসূল (স.)-এর খেদমতে এসে নিবেদন করল যে, আমাদের এলাকায় জনগণ ইসলাম কবুল করেছে। তাই ইসলামী বিধানাবলী শিক্ষা দিতে সেখানে কিছু সাহাবী পাঠালে ভাল হয়। রসূল (স.) মারছাদ, আছেম, খুবাইব (রযি.) প্রমুখ দশজন সাহাবীকে প্রেরণ করেন। তাঁরা রজী' নামক স্থানে পৌঁছলে তাঁদের সাথে গাদ্দারী করা হয়। অতঃপর হুজাইল গোত্রে নিয়ে গিয়ে এ সাহাবাদের শহীদ করে দেয়া হয়। কতককে বন্দী করে তারা মক্কা নিয়ে বিক্রি করে দেয়। বদরে নিহত আত্মীয়-স্বজনের প্রতিশোধ নিতে মক্কার মুশরিকরা তাঁদের ক্রয় করে।

বীরে মাউনা ঘটনার বিবরণ

বাকপটু হিসেবে পরিচিত আবু বারা আমের বিন মালেক রসূল (স.)-এর নিকটে এলে রসূল (স.) তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণও করে না আবার অস্বীকারও করে না। সে বলে, আমি আপনার কথা ভাল বলে জানি। আপনি যদি আমার গোত্র নজদবাসীদের উদ্দেশ্যে কিছু সাহাবী প্রেরণ করেন, তবে আমি আশাবাদী যে, তারা ইসলাম আনয়ন করবে। রসূল (স.) বললেন, আমি নজদবাসীদের ভয় করি। আবু বারা বলল, কোন ভয় নেই। আমি তাদের জিম্মাদার। তারা আমার নিরাপত্তায় থাকবে। নবী (স.) কারী হিসেবে প্রসিদ্ধ ৭০ জন সাহাবাকে তার সাথে প্রেরণ করেন। তারা বীরে মাউনা পৌঁছলে সাহাবায়ে কেরাম আবু বারার ভাতিজা আল্লাহর শত্রু আমের বিন তুফাইল বিন মালেকের নিকট হারাম বিন মালহানকে প্রেরণ করেন। ঐ হতভাগ্য রসূল (স.)-এর পত্র দেখেও না; বরং তাকে আক্রমণ করে তৎক্ষণাৎ শহীদ করে দেয়। ঐ হতভাগ্য নিজ গোত্র বনূ আমেরকে আহ্বান করে কিন্তু তারা তাতে সাড়া দেয় না। অতঃপর সে বনূ সুলাইমের উপগোত্র আসিয়্যাহ, রি'ল ও জাকওয়ানকে আহ্বান করলে এ হতভাগারা এসে সকল সাহাবাকে শহীদ করে দেয়।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, রসূল (স.)-এর কাছে যারা গিয়েছিল, তারা সাহাবাদের শহীদ করেনি; বরং অন্যরা শহীদ করে। কোন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, রসূল (স.) শরীয়তের আহকাম শিক্ষা দিতে সাহাবাদের প্রেরণ করেছিলেন। আর কোন বর্ণনা হতে জানা যায়, জিহাদ করার জন্য তাঁদের প্রেরণ করেছিলেন। তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। কারণ, প্রকৃতপক্ষে রসূল (স.) শরয়ী আহকাম শিক্ষা দিতেই তাঁদের প্রেরণ করেন। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বলে দেন যে, প্রয়োজন দেখা দিলে তাদের সাথে জিহাদও করবে।

وَهُوَ جَدُّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (তিনি হলেন আসেমের নানা) ঃ তবে অধিকাংশের মতে, আছেম বিন সাবেত (রযি.) সম্পর্কে আছেম বিন উমর বিন খাত্তাব (রযি.)-এর মামা ছিলেন নানা নন।

www.e-ilm.weebly.com

فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً (আমিএ অবস্থা দেখে অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলাম) ঃ এ মহিলার নাম ছিল মরিয়ম। ইবনে ইসহাক বলেন, সে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়।

قَامَ إِلَيْهِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ (উকবা তার প্রতি দণ্ডায়মান হলেন) ঃ তাঁর কুনিয়াত আবু সারুয়া। তিনি মক্কা বিজয়ের পর মুসলমান হন।

فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ (মৌমাছি তাকে কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধির হাত থেকে রক্ষা করে) ঃ আর তা এভাবে হয় যে, মৌমাছি তাদের মুখের কাছে উড়ত আর কামড়াত। ফলে তাঁরা নিরুপায় হয়ে তাকে রেখে চলে যায়। হায়াতুল হায়াওয়ান গ্রন্থে আছে, মুশরিকরা আছেম (রযি.)-কে অঙ্গহানী করতে চাইলে আল্লাহ্ মৌমাছির মাধ্যমে তার দেহ হেফাজত করেন এবং মুসলমানরা তাকে নিয়ে দাফন করে দেন। কোনো বর্ণনায় আছে, একটি স্রোত এসে তাঁকে ভাসিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। পক্ষান্তরে ৫০ জন মুশরিককে জাহান্নামে পৌঁছায়।

ইবনে ইসহাক গ্রন্থে আছে, হযরত আছেম (রযি.) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, "কোন মুশরিক যেন আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। আর আমিও কোন মুশরিক স্পর্শ করব না"। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁর এ মুমিন বান্দাকে মুশরিকদের স্পর্শ থেকে মৃত্যুর পরও হেফাজত করেন, যেমন জীবিতাবস্থায় হেফাজত করেন। এ কারণেই তাঁতে 'মৌমাছি সুরক্ষিত' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

وَكَانَ خُبَيْبٌ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ (খুবাইব বদর যুদ্ধে হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেন) ঃ দিময়াতী বলেন, যুদ্ধ বর্ণনাকারীদের কেউ একথা বলেন নি যে, খুবাইব বিন আদী বদর যুদ্ধে শরীক হন। আবার এ কথাও বর্ণনা করেননি যে, তিনি হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেন। তাঁরা বলেন, হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেন হযরত খুবাইব আসাফ (রযি.)। ইনি খাযরাজী ছিলেন। আর খুবাইব বিন আদী ছিলেন আউস গোত্রের।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, দিময়াতীর বক্তব্য সঠিক মেনে নিলে এ বিশুদ্ধ হাদীস অগ্রাহ্য করা আবশ্যক হয়। যদি খুবাইব বিন আদী হারেস বিন আমেরকে কতল না করে থাকেন তবে তার সন্তানগণ কর্তৃক খুবাইব (রযি.)-কে বন্দী করে কতল করার কোন অর্থ হয় না। অথচ হাদীসে সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, হারেসের সন্তানেরা হযরত খুবাইবকে হত্যা করে।

আল্লামা আইনী বলেন, আবু আমের (রহ.) 'ইস্তেআব' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, খুবাইব বিন আদী বদরে উপস্থিত এবং রজী যুদ্ধে গ্রেপ্তার হন। কিরমানী ও খয়রে যারী গ্রন্থদ্বয়ে আছে, বুখারীতে এ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে সেটাই সঠিক।

(ফাতহুল বারী, আইনী প্রভৃতি)

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ سَبْعِينَ رَجُلاً (রসূল ৭০ জনকে প্রেরণ করেন) ঃ ইবনে ইসহাক ও মুসা বিন উকবার বর্ণনায় ৪০ জনের কথা এসেছে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হতে পারে ৪০ জন নেতা পর্যায়ের আর অবশিষ্ট তাদের অনুগত ও অনুসারী ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ (তাঁদের কারী বলা হত) ঃ পবিত্র কুরআনের বেশি বেশি তেলাওয়াত এবং শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের কারণে তারা কারী নামে প্রসিদ্ধ হন।

وَذٰلِكَ بَدْءُ الْقُنُوْتِ ঃ অর্থাৎ, এটাই কুনূতের সূচনা।

مَسْئَلَةُ الْقُنُوْتِ

কুনূত প্রসঙ্গ

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—

প্রথম বিষয় ঃ কুনূতের অর্থ নির্ণয় ঃ দু'ভাবে কুনূতের অর্থ করা যেতে পারে। (১) আভিধানিক ও (২) পারিভাষিক।

কুনূতের আভিধানিক অর্থ ঃ অভিধানে দশ বা ততোর্ধ অর্থে কুনূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়। জনৈক কবি তা কবিতাকারে নিম্নের দু'পঙক্তিতে বর্ণনা করেছেন—

دُعَاءُ خُشُوْعٌ وَالْعِبَادَةُ طَاعَةٌ * إِقَامَتُهَا إِقْرَارُهُ بِالْعُبُوْدِيَّةِ

দোয়া একাগ্রতা ইবাদাত ও আনুগত্য বান্দা হবার স্বীকারোক্তিতে হয় পালিত

سُكُوْتٌ صَلَاةٌ وَالْقِيَامُ وَطُوْلُه * كَذَالِكَ دَوَامُ الطَّاعَةِ الْقَنِيْتِ

নীরবতা নামায কিয়াম ও তার দীর্ঘতা স্থায়ী আনুগত্য তেমন আরও তুষ্টতা

কুনূতের পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় নির্দিষ্ট নামাযের নির্ধারিত স্থানে বিশেষ দোয়া করাকে কুনূত বলে।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ বেতেরের কুনূত প্রসঙ্গে বিভিন্ন মাজহাব ঃ আল্লামা ইবনে রুশদ বলেন—

(১) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তার শাগরিদদের মতে সারা বছর বেতেরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে হবে।

(২) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এক মতে, রমযানের শেষার্ধে বেতেরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে হবে।

(৩) কারো মতে, রমযানের প্রথমার্ধে বেতেরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে হবে।

(৪) কারো মতে, পূর্ণ রমযানে বেতেরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তে হবে।

(৫) ইমাম মালেক (রহ.)-এর মতামত বিভিন্ন। যথা ঃ

ক. মিসরীদের বর্ণনায় আছে, বেতের নামাযে দোয়া কুনূত পড়বে না। চাই তা রমযানের বেতেরে হোক বা অন্য সময়ে।

খ. মদীনাবাসীদের বর্ণনায় আছে, রমযানের শেষার্ধে বেতেরের নামাযে পড়বে।

গ. নাফে'র বর্ণনায় আছে, বেতেরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়া আর না পড়া উভয় ইখতিয়ার রয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

তৃতীয় বিষয় ঃ বেতের ব্যতীত কুনূত ঃ এ প্রসঙ্গে মতভেদ রয়েছে। যথা ঃ

(১) ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর মতে, সারা বছর ফজরের নামাযে কুনূত পড়বে।

(২) হানাফী ও হানাবেলাগণ বলেন, বিপদ এলে বা দুর্ঘটনা সংঘটিত হলে তবেই ফজরের নামাযে কুনূত পড়বে। বিপদ-মুসিবত ছাড়া পড়বে না।

(৩) আবুল খাত্তার বলেন, বিপদ দেখা দিলে ফজর এবং মাগরিব উভয় নামাযে কুনূত পড়বে।

(৪) কারো মতে, বিপদকালে উচ্চ-অনুচ্চ সকল কেরাতবিশিষ্ট নামাযে কুনূত পড়বে।

(৫) কারো মতে, বিপর্যয় কবলিত হলে সকল নামাযে কুনূত পড়বে।

ফজরে সর্বদা কুনূতের ব্যাপারে শাফেয়ী ও মালেকীদের দলীল ঃ আর তা নিম্নরূপ ঃ

(১) আবু জাফর আনাস (রযি.) হতে বর্ণনা করেন ঃ

مَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْنُتُ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتّٰى فَارَقَ الدُّنْيَا ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা ফজরের নামাযে কুনূত পড়েন।

(২) হযরত ফুদাইক (রহ.) আব্দুল্লাহ বিন সাদ মাকবুরী হতে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) হতে বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَيَدْعُوا الخ ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) ফজরের দ্বিতীয় রাকাতের রুকূ হতে মাথা উঠিয়ে দু'হাত উঁচু করে দোয়া করতেন।

(৩) হাযেমী 'কিতাবুন্ নাসেখ ওয়াল মানসুখ' গ্রন্থে খলীফা চতুষ্টয় হতে ফজরের নামাযে কুনূত পড়ার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

ফজরে অস্থায়ী কুনূতের উপর আহনাফের দলীল ঃ আর তা নিম্নরূপ ঃ

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি.) বলেন ঃ

لَمْ يَقْنُتْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الصُّبْحِ إِلَّا شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) মাত্র এক মাস ফজরের নামাযে কুনূত পড়ে অতঃপর তা বর্জন করেন।

এ বর্ণনা সম্বন্ধে শাফেয়ীগণ যদি বলেন যে, এতে আবু হামজা নামী একজন রাবী আছে, তিনি বেশি ভ্রান্তি কবলিতহেতু জঈফ, তবে প্রত্যুত্তরে বলা হবে, এরূপ অনেকে আবু জাফরকেও দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। অতএব উভয় হাদীস বরাবর হয়ে গেল। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, আহনাফের বর্ণনাটি অন্যান্য বর্ণনা হতে সুদৃঢ় ও সমর্থিত, যা তাকে মজবুত করেছে।

www.e-ilm.weebly.com

(২) আছেম সুলাইমান বলেন যে, আমি হযরত আনাস বিন মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম যে, কিছু মানুষের ধারণা, রসূল (স.) সর্বদা ফজরের নামাযে দোয়া কুনূত পড়তেন। প্রত্যুত্তরে হযরত আনাস বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে; বরং আসল ব্যাপার হল—

إِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَهْرًا وَاحِدًا ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) মাত্র একমাস কুনূত পড়েছেন।

(৩) আবু হানীফা, হাম্মাদ[১], ইব্রাহীম[২], আলকমা[৩] সবাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি.) হতে বর্ণনা করেন,।

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَقْنُتْ فِى الْفَجْرِ إِلاَّ شَهْرًا وَاحِدًا ـ

অর্থাৎ,, রসূল (স.) মাত্র একমাস ফজরের নামাযে কুনূত পড়েছেন।

(৪) তবরানী গালেব বিন ফারকদুত্‌তহ্‌হান থেকে বর্ণনা করেন ঃ كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ شَهْرَيْنِ فَلَمْ يَقْنُتْ فِى صَلَاةِ الْغَدَاةِ অর্থাৎ, আমি হযরত আনাসের খেদমতে দু'মাস ছিলাম। তিনি ফজরের নামাযে কুনূত পড়েননি।

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহের আলোকে যখন ফজরে কুনূত পড়া রহিত হওয়া প্রমাণিত হল, তখন আবু জাফর কর্তৃক হযরত আনাস (রযি.)-এর বর্ণনাটি ভুল হিসেবে ধরা হবে অথবা কুনূত দ্বারা দীর্ঘ দণ্ডায়মান হওয়া উদ্দেশ্য নেয়া হবে। যেমন আল্লামা ইবনে কাইউম বলেন, মূলত প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণ হলো, কুনূত শব্দটি বিনয়, নীরবতা, দোয়া, দীর্ঘ দণ্ডায়মান ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। আর ফকীহগণের ভাষায় কুনূত একটি বিশেষ দোয়া হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাই যদি বর্ণনাসমূহের মধ্যে আগত কুনূত শব্দের অর্থ করা হয় দীর্ঘ দণ্ডায়মান হওয়া, তবে কোন প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে না এবং এই অর্থে একথা বলা শুদ্ধ হয় যে, রসূল (স.) মৃত্যু নাগাদ ফজরের নামাযে কুনূত পড়েছেন। অনুরূপ একথা বলাও শুদ্ধ হবে যে, নবী (স.) এবং সাহাবীগণ প্রত্যহ ফজরে লাগাতার এমনটি করেছেন। কারণ, সকালের নামায অর্থাৎ, ফজর অন্যান্য ওয়াক্তের তুলনায় দীর্ঘ হওয়ার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই।

আর হাযেমের বর্ণনার জওয়াব হলো, এ বর্ণনাটি আবু মালেক সাদ বিন তারেক আশবায়ী তার পিতা হতে বর্ণিত একটি বর্ণনা ঃ "আমি নবী (স.) ও খলীফা চতুষ্টয়ের পিছে নামায পড়েছি। কিন্তু কেউ কুনূত পড়েনি। বৎস! অতএব এটা বেদআত।"—এর বিরোধী। সে জন্য ইবনে হুমাম বলেন, এ বিপরীত বর্ণনা থাকা অবস্থায় কিভাবে ফজরে কুনূত পড়া সুন্নাতে রাতেবা হতে পারে? তদুপরি

টীকা ঃ ১. হযরত হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান (রহ.), মৃত্যু ঃ ১২০ হিজরী

২. হযরত ইব্রাহীম নাখায়ী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৯৫/৯৬ হিঃ

৩. হযরত আলকমা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৬১ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

হাফেজ ইবনে হাজারের উক্তি وَأَنَّ الْجُمْهُوْرَعَلَى عَدَمِهِ অর্থাৎ, সকল উলামা ফজরে কুনূতের বিপক্ষে-এর দ্বারাও বিষয়টি খণ্ডন হয়ে যায়। আর ইবনে আবী ফুদাইকের হাদীস শাফেয়ীদের স্বপক্ষে দলীল হতে পারে না। কারণ, এটা হাদীসে মুনকার। ফলে এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করা ঠিক হবে না।

চতুর্থ বিষয় ঃ কুনূতের স্থান প্রসঙ্গ ঃ এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত মতান্তর রয়েছে॥

(১) শাফেয়ী ও হানাবেলাদের নিকট সকল কুনূতের স্থান রুকুর পর।

(২) মালেকীদের মতে, রুকুর পূর্বে।

(৩) আহনাফের মতে, বেতেরের কুনূত রুকুর পূর্বে আর ফজরের কুনূত রুকূর পরে।

এ অধ্যায়ে হযরত আনাস (রযি.)-এর বর্ণনায় আগত قُنُوْتٌ فِى الصُّبْحِ بَعْدَ الرُّكُوْعِ। শব্দ হানাফীদের অবলম্বিত মাজহাবের সম্পূর্ণ অনুকূলে। কেননা, তাঁর কাছে ফজরে কুনূত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি তার স্থান রুকুর পরে বলেন। অতঃপর আরেকবার সাধারণ প্রশ্ন রাখা হলে তিনি সারা বছর পঠিত কুনূত অর্থাৎ, বেতেরের কুনূত মনে করে জওয়াব দেন যে, তার স্থান রুকুর পূর্বে। প্রশ্নকারী প্রথম উত্তরের ভিত্তিতে যখন আপত্তি তুলেন যে, আপনিতো পূর্বে 'রুকুর পরে' বলেছেন। তখন প্রত্যুত্তরে আনাস (রযি.) বলেন, সে আমার কথাকে আমার উদ্দেশ্যের বিপরীতে প্রযোজ্য করেছে।

হযরত আনাস (রযি.)-এর এ সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, ফজরে রুকুর পরে পঠিত কুনূতটি অস্থায়ী ভিত্তিতে ছিল। পক্ষান্তরে বেতেরে রুকুর পূর্বে পঠিত কুনূতটি ছিল স্থায়ীভাবে। এ বর্ণনার আলোকে আহনাফের মতামতের বিশুদ্ধতা পরিষ্কার হয়ে গেল।

পঞ্চম বিষয় ঃ কুনূতের শব্দ প্রসঙ্গ ঃ আহনাফের মতে বেতেরের কুনূতটা 'সূরা হাফদ' ও সূরা খলা'। এটা উবাইয়ের প্রতিলিপিতে আজও কুরআনের দু'টি সূরা হিসেবে রক্ষিত। তাই কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য থাকায় আহনাফ তাদের গৃহীত কুনূতকে সর্বোত্তম অভিহিত করেন। আর তা হলো॥

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ الخ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মাগরিব ও অন্যান্য নামাযে কুনূত পড়ার বিধান রহিত হয়ে গেছে। কারণ, তা নিয়মিত পঠিত কোন আমল ছিল না।

(লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২)

بَعَثَ خَالَهُ (তিনি তার মামাকে পাঠালেন) ঃ خَالَه-এর ضَمِيْر হযরত আনাস (রযি.)-এর দিকে ফিরেছে। কেননা, সে আনাসের মামা ছিল। অথবা রসূল (স.)-এর দিকে ফিরেছে। কেননা, সে রসূল (স.)-এর দুধ বা দূর সম্পর্কীয় মামা ছিল। তার নাম ছিল হারাম বিন মালহান।

www.e-ilm.weebly.com

خَيَّرَ بَيْنَ ثَلَاثِ خِصَالٍ (সে তিনটি বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়েছিল) ঃ অর্থাৎ, হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি অবলম্বনের ইখতিয়ার দিয়ে অভিশপ্ত আমের বিন তুফাইল নবীর (স.) প্রতি একটি পত্র লেখে। পত্রটি তার সীমাহীন পাষণ্ডতা ও আত্মঅহমিকার উপর প্রমাণ বহণ করে। সে নিজেকে এরই যোগ্য বলে মনে করত।

فَطُعِنَ عَامِر ঃ অর্থাৎ, আমের প্লেগ কবলিত হয়। তার কানে মারাত্মক বিষাক্ত ফোঁড়া উদগত হয়। এটা তার মৃত্যুবার্তা ছিল। যদিও তার মৃত্যুর ঘটনার সাথে সারিয়ায়ে কুররার কোন সম্পর্ক নেই, তথাপি যেহেতু সে এ সারিয়ার সাথে চরম গাদ্দারী করে, তাই অপ্রাসঙ্গিকভাবে তার মৃত্যুর আলোচনা করা হয়েছে।

فَانْطَلَقَ حَرَام (হারাম সম্মুখপানে অগ্রসর হলেন) ঃ বাক্যটি بَعَثَ خَالَهُ-এর উপর আতফ হয়েছে। এ দু'বাক্যের মধ্যবর্তী বাক্যটা অপ্রাসঙ্গিক তথা جُمْلَةَ مُعْتَرِضَة মাত্র।

وَهُوَ رَجُلٌ أَعْرَجُ (আরেক ল্যাংড়া ব্যক্তি) ঃ এখানে هُوَ যমীর হারামের দিকে ফেরেনি। কারণ, উম্মে সুলাইমের (হযরত আনাসের মাতা) ভাই হারাম বিন মালহান ল্যাংড়া ছিলেন না। এ ضَمِير টি مُبْهَم তথা অস্পষ্ট। আর رَجُلٌ أَعْرَجُ হল তার ব্যাখ্যা মাত্র। অথবা বলা হবে যে, এখানে هُوَ টা وَاو-এর আগে হবে। ইবারত হবে তখন— هُوَ وَ رَجُلٌ أَعْرَجُ অর্থাৎ, 'সে ও অপর এক ল্যাংড়া ব্যক্তি। অন্য নুসখায় ঠিক এমনই আছে। সম্ভবত লিপিকার (লেখক) ভুলে هُوَ-কে وَاو-এর পরে এনে দিয়েছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ ল্যাংড়া ব্যক্তির নাম কা'ব বিন যায়েদ আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম মুনজির বিন মুহাম্মাদ ছিল। নিহত ব্যক্তির নাম ছিল হারাম বিন মালহান। ল্যাংড়া ব্যক্তি শহীদ হন নি; বরং তিনি পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন।

فَلَحِقَ الرَّجُل ঃ এ বাক্যটি কতিপয় সম্ভাবনামুখী ঃ (১) لَحِقَ শব্দটি فِعْل مَعْرُوف হবে। তখন اَلرَّجُل দ্বারা হয়ত হারামের সাথী উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ, হারাম বিন মালহানের সাথী মুসলমানদের সাথে গিয়ে মিলল। অথবা হারামের হত্যাকারী উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হারামের হত্যাকারী তার স্ব-মুশরিক গোত্রের সাথে গিয়ে মিলল।

টীকা ঃ পূর্ণাঙ্গ দুয়া কুনূত হলো ঃ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ ـ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ ـ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ـ

www.e-ilm.weebly.com

অতঃপর সকলে একযোগে সাহাবাদের শহীদ করে দিল। (২) لَحِقَ শব্দটি فِعْل مَجْهُوْل হবে। তখন اَلرَّجُل দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত হারাম হবে। মর্মার্থ হবে হারামের সাথে তার মৃত্যুকে যোগ করে দেয়া হল। অথবা اَلرَّجُل দ্বারা হারামের সাথী উদ্দেশ্য হবে। মর্মার্থ হবে, হারামের সঙ্গীর সাথে মুশরিকরা মিলিত হল। আর তারা হারামের সাথীকে মুসলমানদের দিকে ফিরতে দিল না। বরং ঐ পাপিষ্ঠরা তাকে ও তার সাথীদের হত্যা করে দিল। (৩) এটাও হতে পারে যে, اَلرَّجْل-এর ج টা সাকীনবিশিষ্ট হয়ে বহুবচন শব্দ হবে। মর্মার্থ হল, মুশরিকরা মুসলমানদের কাছে গেল এবং তাদেরকে হত্যা করে দিল। (৪) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, اَلرَّجْل এর "ج" টা সাকীন ও "ل"টা যবর বিশিষ্ট হবে। কিন্তু رَاجِل-এর বহুবচন হবে। মর্মার্থ হল, প্লেগগ্রস্ত আমের বিন তুফাইল স্বগোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকে সাহাবাদের আগমনের সংবাদ দিল। অতঃপর একজোটে সবাই কারী সাহাবাদের শহীদ করে দিল। (বুখারীর পার্শ্বটীকা)

بِالدَّمِ هٰكَذَا (হাতে এভাবে রক্ত নিলেন) ঃ অর্থাৎ, হযরত হারাম (রযি.) রক্ত নিজের মুখ ও মস্তকে মাখান। এটা ছিল তার পূর্ণ বীরত্ব আর সানন্দে আপন মাওলার দরবারে যাওয়ার প্রমাণ। শহীদদের রক্ত পবিত্র হওয়ায় তা ধোয়া হয় না।

وَهِيَ الْجَدْعَاءُ ঃ নাক-কান কর্তিত উটনীকে প্রকৃতার্থে 'জাদআ' বলা হয়। রসূল (স.) যে উটনীতে আরোহণপূর্বক হিজরত করেন তা মূলত নাক-কান কর্তিত ছিল না। আল্লামা কস্তলানী বলেন, এটা ঐ উটনীর নাম ছিল।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, জাদআ, আযবা ও কসওয়া সব একই উটনীর বিভিন্ন নাম। অবশ্য কেউ কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, তিনটি একই উটনীর নাম নয়; বরং ভিন্ন ভিন্ন তিন উটনীর নাম। রসূল (স.) চারশ দেরহাম দিয়ে হযরত আবু বকর (রযি.) থেকে একটি উটনী খরিদ করেন। আবু বকর (রযি.) হিজরতের পূর্বে বনূ কুরাইশ থেকে ৮০০ দেরহাম দিয়ে দু'উটনী ক্রয় করেছিলেন। তন্মধ্য হতে রসূল (স.) একটি ক্রয় করে নেন।

فَكَانَ عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ غُلَامًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الطُّفَيْلِ (আমের আব্দুল্লাহ বিন তুফাইলের গোলাম ছিলেন) ঃ দিময়াতী বলেন, আব্দুল্লাহ বিন তুফাইল শুদ্ধ নয়; বরং বিশুদ্ধ হল-তুফাইল বিন আব্দুল্লাহ। আমের বিন ফুহাইরা তুফাইল বিন আব্দুল্লাহ্র গোলাম ছিল। আবু বকর (রযি.) তাকে ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। রসূল (স.) দারুল আরকামে প্রবেশের পূর্বে তিনি মুসলমান হন।

أَخُوْ عَائِشَةَ لِأُمِّهَا (আয়েশার বৈপিত্রেয় ভাই) ঃ ওয়াকেদী বলেন, হযরত আয়েশার মাতা উম্মে রোমান প্রথমে আব্দুল্লাহ বিন হারেস আযদীর স্ত্রী ছিলেন। সে উম্মে রোমানকে নিয়ে মক্কায় আসে এবং ইসলামের পূর্বে হযরত আবু বকরের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। এরপর তার মৃত্যু হয়ে যায়। এ ঘরে তুফাইল জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর আবু বকর (রযি.) উম্মে রোমানকে বিবাহ করেন। এ ঘরে হযরত আয়েশা ও আব্দুর রহমান (রযি.) ভূমিষ্ট হন। ফলে তুফাইল (রযি.) তাঁদের বৈপিত্রেয় ভাই হয়।

www.e-ilm.weebly.com

فَرَكِبَا فَانْطَلَقَا (তাঁরা সওয়ার হয়ে চললেন) ঃ রসূল (স.) ও আবু বকর (রযি.) মক্কা থেকে সাওর গুহা পর্যন্ত পদব্রজে না বাহনে যান, তা নিয়ে ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য বর্ণনা হতে বাহনে যান বলে জানা যায়। ইবনে হিব্বানের বর্ণনা হতেও এটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বর্ণনায় আছে ঃ فَرَكِبَا حَتَّى أَتَيَا الْغَارَ وَهُوَ ثَوْرٌ فَتَوَارَيَا فِيْهِ অর্থাৎ, তারা বাহনে চড়ে সাওর গুহায় এসে তাতে আত্মগোপন করেন।

যে বর্ণনায় রসূল (স.) চলতে চলতে ক্লান্ত ও আবু বকর (রযি.) কর্তৃক তাঁকে কাঁধে নেয়ার কথা এসেছে, তার জওয়াব হলো, এটা কতিপয় রাস্তা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে ঘটে। অনুরূপভাবে এ বর্ণনার বিরোধ ঐ বর্ণনাও নয়, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) বনূ দায়েল গোত্রের এক ব্যক্তিকে তাদের দু'বাহন অর্পণরূপপূর্বক তা তিনদিন পর সওর গুহায় পৌঁছে দিতে বলেন। কেননা তখন জওয়াবে বলা হবে যে, হতে পারে রসূল (স.) ও আবু বকর (রযি.) অন্য বাহনে আরোহণ করেন অথবা পূর্ব বাহনেই আরোহণ করেন। অতঃপর আমের বিন ফুহাইরকে বাহন দু'টি দিয়ে তা দলীল দায়লীকে অর্পণ করতে বলেন। আর সে তিন দিন পর সওর গুহায় পৌঁছে দেয়।

তবে কতিপয় বিশ্লেষকের মতে, রসূল (স.) ও আবু বকর (রযি.) সওর গুহা পর্যন্ত পদব্রজে যান। কেননা সে সময়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি মক্কা থেকে সওর গুহা পর্যন্ত সওয়ার হয়ে যাওয়ার অনুকূল ছিল না। কেননা ইসলামের শত্রুরা রাস্তায় রাস্তায় প্রহরী বসিয়েছিল। সে জন্য প্রকাশ্যভাবে সওয়ার হয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং পায়ে হেঁটে চলার উক্তিটিই সঠিক। মূলত এ কারণে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) فَرَكِبَا فَانْطَلَقَا বাক্যের এভাবে ব্যাখ্যা দেন যে, اِنْطَلَقَا-এর মধ্যে মক্কা থেকে সওর গুহা পর্যন্ত যাওয়ার বর্ণনা আর فَرَكِبَا-এর মধ্যে সওর গুহা হতে মদীনা পর্যন্ত যাওয়ার বর্ণনা এসেছে। বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা হযরত গাঙ্গুহী প্রদত্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। তিনদিন পরে বাহন সওর গুহায় পৌঁছে দিতে দলীল দায়লীর কাছে অর্পণ করার বর্ণনা এবং হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা ঃ আবু বকর (রযি.) এক রাত্রে রসূল (স.)-এর সাথে গুহা অভিমুখে রওনা দেন। তিনি কখনও হুযূরের সম্মুখে আবার কখনও পশ্চাতে চলতে থাকেন। হযরত গাঙ্গুহীর (রহ.) ব্যাখ্যার পূর্ণ সমর্থক। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮)

خَرَجَ مَعَهُمَا يَعْقُبَانِهِ (আমের তাদের সাথে রওনা হলেন পালাক্রমে তাদের বাহনে) ঃ "আরোহী নীচে নামবে আর পদাতিক আরোহী হবে। অতঃপর সে নীচে নামবে আর পদাতিক আরোহী হবে— কতিপয়ের কৃত أَعْقَابٌ-এর এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, তখন আবশ্যক হয় যে, রসূল (স.) পায়ে হেঁটে চলতেন আর আমের সওয়ার হয়ে। অথচ এটা এমনই ব্যাপার যা করতে আমের, আবু

www.e-ilm.weebly.com

বকর (রযি.) কেউ রাজি হতে পারেন না। তদুপরি এটা শিষ্টাচার (আদব) সম্মতও নয়। সেজন্য উক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হবে, পালাক্রমে আমেরকে কখনও রসূল (স.) তাঁর পিছনে বসাতেন আবার কখনও আবু বকর (রযি.) বসাতেন। আর তার কারণ এই ছিল যে, তিনি (আমের) বেশ মোটা মানুষ ছিলেন। তিনি সর্বক্ষণ রসূল (স.)-এর সাথে সওয়ার হলে বেশী ভার হয়ে যেত। তাই রসূল (স.) ভার লাঘব করতে এভাবে পালাবদল পন্থা অবলম্বন করেন। (আইনী, লামিউদ্ দারারী)

হিজরতের ঘটনা

সাহাবায়ে কেরাম তাদের ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন নিয়ে মক্কা থেকে মদীনায় গেলে আউস ও খাযরাজ গোত্র তাদের আশ্রয় দেয়। এতে কাফেররা রসূল (স.)-এর দিক থেকে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা করল। সে জন্য তারা আরবের গোত্রসমূহের বিচক্ষণদের সমবেত করে পরিষদ ভবনে (সভাগৃহে) মিটিং করল। দীর্ঘ আলোচনা শেষে সভাপতি আবু জাহেল এ মর্মে রায় পেশ করল যে, সকল গোত্র হতে এক একজন যুবক নিয়ে তাদের হাতে তরবারী তুলে দেয়া হোক। তারা সম্মিলিতভাবে রসূলে আকরাম (স.)-এর প্রাণনাশ করবে।

হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে কাফেরদের হত্যা মিটিং সম্পর্কে রসূল (স.) কে অবহিত করেন। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ হতে হিজরতের নির্দেশ জানিয়ে দেন এবং বলেন যে, আজ রাতে আপন শয্যায় শায়িত হবে না। রসূল (স.) দুপুরে হযরত আবু বকরকে হিজরতের সংকেত দিলেন। রাতে কাফেররা রসূল (স.)-এর বাসভবনের বাইরে সমবেত হয়ে পুরো বাসভবন ঘেরাও করে রাখল।

রসূলে পাক (স.) হযরত আলী (রযি.)-কে তার শয্যায় শায়িত করে দরজার নিকটে এলেন এবং আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ -

অর্থাৎ, আমি তাদের অগ্র-পশ্চাতে অন্তরায় সৃষ্টি করেছি, ফলে তারা দেখবে না। এরপর এক মুষ্টি মাটি নিয়ে তা কাফেরদের প্রতি ছুঁড়ে মারেন। এক কাফেরও রসূল (স.)-কে দেখতে পায় না। তিনি জানালা পথে বের হয়ে হযরত আবু বকরের গৃহে আসেন এবং তাঁকে নিয়ে সওর গুহা অভিমুখে রওনা হন। মাকড়সা গুহাদ্বারে জাল তৈরী করে দিলে পাখী তাতে ডিম পাড়ে। কাফেররা অনুসন্ধান করতে করতে সওর গুহা পর্যন্ত আসে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে তাদের অনিষ্ট হতে রক্ষা করেন। পরিশেষে আমের বিন ফুহাইরা ও আব্দুল্লাহ বিন উরাইকিত লায়সীকে সাথে নিয়ে রাসূলে পাক (স.) ও আবু বকর (রযি.) মোট চারজন সওর গুহা হতে মদীনা রওনা হলেন। একশ উট পুরস্কার পাবার লোভে পথিমধ্যে সুরাকা বিন মালেক রসূল (স.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু রসূল (স.)-এর দোয়ার বরকতে সে মুসলমান হয়ে যায়। অবশেষে রসূল (স.) অতি নিরাপদেই মদীনা পৌছেন।

www.e-ilm.weebly.com

لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ مَا قُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ ... ثُمَّ وُضِعَ (শাহাদাতের পর আমি তার লাশ আকাশে উঠাতে অতঃপর... নামতে দেখেছি) ঃ অপর এক বর্ণনায় এসেছে, আমের (রযি.)-কে প্রথমবার বল্লম মারা হলে তার দেহ হতে এক জ্যোতি নির্গত হয়। অন্য এক বর্ণনায় উরওয়া বিন যুবাইর বলেন, দুর্ঘটনার দিন আমেরকে নিহতদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। এক বর্ণনায় এসেছে, ফেরেশতারা তাঁকে দাফন করে দিয়েছেন অথবা উঠিয়ে নিয়ে গেছেন।

কাফেরদেরকে শংকিত, ভীত-সন্ত্রস্ত এবং আমেরের অতীব মর্যাদা ও মর্তবা প্রকাশের লক্ষ্যে তাঁকে প্রথমে আসমানে উত্তোলন অতঃপর জমিনে রাখা হয়। (আইনী)

فَسُمِّيَ عُرْوَةُ بِهِ (তার নাম অনুসারে উরওয়া নাম রাখা হয়) ঃ অর্থাৎ, জুবাইর বিন আওয়ামের এক পুত্র ভূমিষ্ট হলে তিনি বরকতস্বরূপ উরওয়া বিন আসমার নামে তার নাম রাখেন, 'উরওয়া'। এরপর দ্বিতীয় পুত্র হলে মুনজির বিন আমরের নামে 'মুনজির' নাম রাখেন। বর্ণিত আছে, উরওয়া বিন আসমার হত্যা ও উরওয়া বিন যুবাইরের জন্মের মধ্যে দশ বছরেরও অধিক ব্যবধান ছিল।

وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَهْدٌ قِبَلَهُمْ (মুশরিক সম্প্রদায় ও রসূলের মধ্যে তাদের পক্ষ হতে নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল) ঃ অর্থাৎ, রসূল (স.) ও বনূ আমেরের মধ্যে চুক্তি অর্থাৎ, নিরাপত্তা বলবৎ থাকা অবস্থায় রসূল (স.) ৭০ জন সুফফাবাসীকে বনূ আমেরের মুশরিকদের প্রতি প্রেরণ করেন। কারী সাহাবাগণ বীরে মাউনা পর্যন্ত পৌছলে আবু বারা আমের বিন মালেকের ভাতিজা আমের বিন তুফাইল তাদের সাথে গাদ্দারীর ইচ্ছা করে বনূ আমেরকে আহ্বান করে তাদের হত্যা করতে বলে। এতে তারা অস্বীকার করলে পরে সে বনূ সুলাইমের রি'ল, জাকওয়ান ও আসিয়্যাহ গোত্রকে আহ্বান করলে তারা তাতে সাড়া দেয়।

فَظَهَرَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ঃ বনূ সুলাইম-যাদের সাথে রসূল (স.)-এর চুক্তি ছিল, তারা প্রাধান্য বিস্তার (অর্থাৎ, গাদ্দারী) করল এবং কারী সাহাবাদের শহীদ করে দিল। (কস্তলানী)

এ থেকে জানা যায় যে, বনূ সুলাইম গোত্রের সাথেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যে মুশরিকদের প্রতি রসূল (স.) কারী সাহাবাদের প্রেরণ করেছিলেন, তারা তাদেরকে হত্যা করেনি; বরং যাদের লক্ষ্যে তারা প্রেরিত হয়েছিলেন তাদের কাছে পৌছানোর পথে অন্য গোত্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাঁরা শহীদ হন।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, কারী সাহাবায়ে কেরামকে বনূ আমেরের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। তারা তাদেরকে হত্যা করেনি। রি'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি বনূ সুলাইম গোত্রের লোক তাদের হত্যা করে। হাদীসে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেমনিভাবে আবু বারা আমের বিন মালেক তার কওমের জন্য তাদের দুশমনের বিরুদ্ধে রসূল (স.)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তেমনি রি'ল, জাকওয়ান প্রভৃতি বনূ সুলাইম গোত্রের লোকেরাও রসূল (স.)-এর সাহায্য চেয়েছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় গোত্র হতে গাদ্দারী প্রকাশ পেয়েছে। আর প্রথম গোত্র হতে তা প্রকাশ পায়নি। বস্তুত এ ব্যাখ্যানুপাতে বর্ণনাসমূহের মাঝে চমৎকার সমতা প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। (লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪)

بَابُ غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ

খন্দক যুদ্ধ

নামকরণ ঃ রসূল (স.)-এর নির্দেশক্রমে মদীনার পূর্ব প্রান্তে শিলা পর্বতের একটু সামনে খন্দক বা পরিখা খননের কারণে এ যুদ্ধের নাম রাখা হয় খন্দক যুদ্ধ। রসূল (স.)-এর সাথে যুদ্ধ করতে আরবের সকল গোত্র এবং ইহুদীরা জোটবদ্ধ হওয়ায় এ যুদ্ধকে আহযাব বা বহুজাতিক যুদ্ধও বলা হয়। হযরত সালমান ফার্সী (রযি.)-এর পরামর্শক্রমে এ খন্দক খনন করা হয়। কারণ, খন্দক খনন প্রথা আরবে ছিল না; এটা পারস্যদের প্রথা ছিল।

যুদ্ধের কারণ ঃ রসূল (স.) বনূ নযীরকে উচ্ছেদ করলে তারা খয়বারে চলে যায়। অতঃপর উহুদ যুদ্ধে কুরাইশরা প্রাধান্য বিস্তার করলে বনূ নযীরের কতক দলপতি মক্কায় গিয়ে রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে কুরাইশদের উত্তেজিত করে। তারা গাতফান গোত্রকেও আহ্বান করে। অবশেষে আরবের সকল গোত্র ও ইহুদীরা দশ হাজারের এক বহুজাতিক বাহিনী নিয়ে মদীনায় পৌঁছে। ফলে নিরুপায় হয়ে রসূল (স.) তিন হাজার সাহাবা নিয়ে মদীনার পূর্ব প্রান্তে সমবেত হন।

যুদ্ধের ফলাফল ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কেননা, উহুদ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে আবু সুফিয়ান বলেছিল, সে আগামী বছর অর্থাৎ, ৪র্থ হিজরীতে বদরে পুনরায় লড়বে। কিন্তু দুর্ভিক্ষহেতু সে আসতে পারেনি। এ থেকে জানা যায় যে, খন্দক যুদ্ধ ৫ম হিজরীতে সংঘটিত হয়।

মূসা বিন উকবা বলেন, খন্দক যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, ইবনে উমর উহুদ যুদ্ধে শরীক হতে চাইলে বয়স ১৪ বছর হওয়ায় রসূল (স.) তাকে অনুমতি দেন না। অতঃপর ১৫ বছর বয়সে খন্দক যুদ্ধে যেতে চাইলে রসূল (স.) তাকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। এ ঘটনাও প্রমাণ করে যে, খন্দক যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীতেই হয়েছে।

ইবনে হাকেম বলেন, বুখারী (রহ.) যে অভিমত উল্লেখ করেছেন, সেটাই সঠিক।

খন্দক খননকাল ঃ আসাহহুস্ সিয়ার গ্রন্থে আছে, খন্দক ২০ দিনে প্রস্তুত হয়। ওয়াকেদী ২৪ দিন আর ইমাম নববী (রহ.) ১৫ দিন বলেছেন। কোন বর্ণনায় একমাসের কথা এসেছে।

অবরোধ কাল ঃ আল্লামা আইনী বলেন, ২৭ দিন কাফেরদের অবরোধ বলবৎ থাকে। ওয়াকেদী ২৪ দিন আর মুসা বিন উকবা ২০ দিনের কথা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, এক মাসের কিছু কম সময় কাফেরদের অবরোধ বলবৎ থাকে।

www.e-ilm.weebly.com

ফলাফল ঃ এ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য কোন সংঘর্ষ হয়নি। শুধুমাত্র কিছু সময়ের জন্য তীর চালাচালি চলে। এ সময়ে হযরত সাদের (রযি.) শাহ্রগে একটি তীর বিদ্ধ হয়।

আসাহ্হুস সিয়ারে আছে, নাঈম বিন মাসঊদ (রযি.) খন্দক যুদ্ধে আগত আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। যার ফলে তারা একে অপরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এক দিকে এটা ঘটতে থাকে আর অপর দিকে আল্লাহ্ পাক এক প্রবলতর তুফান সৃষ্টি করে দেন। যার প্রচণ্ডতায় তাদের ক্যাম্প ও হাতিয়ার-সামগ্রী কোথা হতে কোথায় চলে যায় তার ইয়ত্তা থাকে না। এ সমস্ত কারণে অবশেষে কাফেররা ব্যর্থ ও হতোদ্যম হয়ে মক্কায় ফিরে আসে।

يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ (তাঁরা মদীনার পার্শ্বে পরিখা খনন করেন) ঃ কিতাবুল খামীস গ্রন্থে আছে, মদীনার কেবল এক পার্শ্ব উন্মুক্ত ছিল। বাকী দিকসমূহ বৃক্ষরাজি, বাগ-বাগিচা এবং ঘর-বাড়ী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এ সমস্ত দিক থেকে শত্রু মদীনার অভ্যন্তরে ঢুকতে পারত না। সেজন্য শিলা পর্বত (যা মদীনার পূর্ব দিকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত) এর সামনে খন্দক খনন করা হয়। যাতে মুসলমানরা শিলা পর্বত ও খন্দকের মাঝে অবস্থান করতে পারে। এ থেকে জানা যায় যে, মদীনার নিকটে খন্দক খনন করা হয়নি; বরং তার নিকটবর্তী এক এলাকায় খনন করা হয়। এ নিকটবর্তী স্থানে খননের কারণে حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ বা মদীনার পার্শ্বে বলা হয়েছে।

فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ঃ অর্থাৎ, দুর্গন্ধযুক্ত চর্বি দ্বারা তাদের জন্য রুটি তৈরী করা হতো।

بَشِعَةٌ فِى الْحَلْقِ ঃ বিস্বাদিত হওয়ায় তা কণ্ঠনালীতে আটকে যেত।

فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيْدَةٌ (একটি কঠিন প্রস্তর শিলাখণ্ড বের হয়ে এলো) ঃ كُدْيَة শব্দটির كَاف বর্ণে পেশ এবং دَال বর্ণে সাকিন হবে। অর্থ শক্ত প্রস্তর শিলা, আর তা এতই শক্ত যে কোদাল, লাঙ্গল ইত্যাদি দিয়েও তা উত্তোলন বা অপসারণ করা সম্ভব হয় না।

وَبَطْنُهُ مَعْصُوْبٌ بِحَجَرٍ ঃ অর্থাৎ, উপর্যুপরি অভুক্ত থাকার দরুন পিঠ যেন বেঁকে না যায় সেজন্য রসূল (স.) পেটে পাথর বাঁধেন। আল্লামা কিরমানী বলেন, পেটে পাথর বাঁধার ফায়দা হচ্ছে, পাথরের শীতলতায় ক্ষুধার তাপ দূরীভূত হয়।

فَعَادَ كَثِيْبًا اَهْيَلَ ঃ অর্থাৎ, সে প্রস্তর খণ্ডটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুর স্তূপে পরিণত হলো।

وَالْعَجِيْنُ قَدِ انْكَسَرَ ঃ অর্থাৎ, আটার খামীর প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। অনায়াসে যার দ্বারা রুটি বানানো যায়।

www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ طُعَيْمٌ لِي ঃ অর্থাৎ, জাবের (রযি.) রসূল (স.)-কে বললেন, আমার ঘরে সামান্য খানার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ (যখন তিনি তার স্ত্রীর কাছে এলেন) ঃ তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সাহ্‌লা বিনতে মাসউদ।

يَنْزِعُ ঃ অর্থাৎ, ডেগচি (খানার বড় পাত্র) থেকে গোশত রুটি বের করে রসূল (স.) সাহাবাদের দিচ্ছিলেন।

فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ঃ অর্থাৎ, চুলা (উনূন) থেকে রুটি নিয়ে তা ছিঁড়ে গোশতের ঝোলে মিশ্রিত করেন।

بِكَ وَبِكَ ঃ এটা উহ্য فِعْل-এর সাথে مُتَعَلِّق (সংযুক্ত)। অর্থাৎ, فَعَلَ اللّٰهُ كَذَا وَكَذَا অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে এমন এমন করুন। জাবেরের স্ত্রী জাবেরকে মায়া-মধুর ভর্ৎসনাস্বরূপ একথা বলেন। কেননা লোক বেশি পক্ষান্তরে খানা কম; যা রীতিমত লজ্জার ব্যাপার ছিল বটে!

إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ (যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চাঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল পশ্চাত হতে) ঃ এরা বনূ গাতফান ছিল। তারা পূর্ব দিক হতে উপত্যকার উপর দিয়ে আসে।

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ (এবং তোমাদের নিম্নাঞ্চল হতে) ঃ এরা কুরাইশ ছিল, যারা পশ্চিম দিক হতে উপত্যকার নিম্নদিক থেকে এসেছিল।

نُصِرْتُ بِالصَّبَا (পূবের হাওয়া দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে) ঃ পূবের বায়ু অর্থাৎ, পূর্ব দিক হতে আগত বাতাসকে صَبَا এবং পশ্চিমী হাওয়াকে دَبُوْرٌ বলে।

বহুজাতিক বাহিনী মদীনা অবরোধ করলে আল্লাহ্‌র নির্দেশে পূবের হাওয়া এমন গতিতে প্রবাহিত হয়, যা মুশরিকদের ক্যাম্প উপড়ে নিয়ে যায় এবং তাদের ডেগ ইত্যাদি আসবাব-পত্র তছনছ করে একস্থান হতে অন্যত্র উড়িয়ে নিয়ে যায়। যার দরুন অবশেষে মুশরিকরা ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করে।

قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا تَرَيْنَ (উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনা আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন) ঃ লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, أَمْرُ النَّاسِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রযি.)-এর মাঝে যে সিফফীন যুদ্ধ বিস্তার লাভ করেছিল, তাতে সমঝোতার চেষ্টা করা। আর তা এভাবে যে, হযরত আলী (রযি.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ আর হযরত মুয়াবিয়াকে তাঁর ভারপ্রাপ্ত নিয়োগ করা হোক।

প্রকাশ থাকে যে, তদানীন্তন সময়ে মক্কা-মদীনা প্রভৃতি স্থানে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম উভয়ের প্রতি পত্র প্রেরণ করেন এবং সমঝোতার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার অঙ্গীকার নেন। এহেন পরিস্থিতিতে হযরত ইবনে উমর (রযি.) তাঁর বোন

www.e-ilm.weebly.com

উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রযি.) নিকটে আসেন এবং সাহাবাদের পরামর্শ বৈঠকে অংশগ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মতামত চান। হযরত হাফসা (রযি.) শরীক হওয়ার পরামর্শ দেন, যাতে তাঁর অনুপস্থিতিতে এমন মতান্তরের সৃষ্টি না হয়, যা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের কারণ হয় এবং চলতি বিপর্যয়কে দীর্ঘমেয়াদী করে।

فَلَمْ يَجْعَلْ لِى مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ ঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমার জন্য কিছুই নির্দিষ্ট করা হয়নি অর্থাৎ, আমি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও পাইনি এবং তাতে আমার কোন ভূমিকাও রাখা হয়নি। আর কেউ বলেন, এ বাক্যের অর্থ হলো, আমাকে তাদের পরামর্শে শরীক করা হয়নি। (লামিউদ্ দারারী)

وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِى احْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فِرْقَةٌ ঃ অর্থাৎ, গুরুত্বপূর্ণ এ বৈঠকে তুমি অনুপস্থিত থাকলে আমি মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা করছি। কেননা, তখন মানুষ এ ধারণা করবে যে, হয়ত তুমি তাদের মধ্যে সমঝোতা ও হযরত আলী (রযি.)-এর হাতে বাইয়াত করার ব্যাপারে রাজি নও; বরং উল্টো তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কর।

حَتَّى ذَهَبَ ঃ অর্থাৎ, অনন্তর তিনি সেখানে গেলেন, যেখানে উভয় পক্ষের বিচারক উপস্থিত ছিলেন।

فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ (যখন জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল) ঃ এটা তখনকার ঘটনা যখন উভয় বিচারক (আবু মূসা আশআরী ও আমর বিন আস) রায়ের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে থাকেন।

হাফেজ ইবনে হাজারের বক্তব্য ঃ "বিচারকদ্বয়ের মতান্তরের পর" অনুরূপভাবে আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় আগত "অতঃপর যখন দু'বিচারক মতভেদ করলেন" এর দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা সিফফীন যুদ্ধের সাথে সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ বৈঠক ত্যাগ করা, যা হযরত মুয়াবিয়া (রযি.) ও হযরত হাসান বিন আলীর (রযি.) মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তবে আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনাটি এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইবনুল যাওজী বলেন, ইবনে উমরের উক্তি فَلَمْ يَجْعَلْ لِىَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হযরত উমর (রযি.) কর্তৃক ছ'জন সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ কমিটিতে আমাকে রাখা হয়নি। আর فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ দ্বারা উদ্দেশ্য, যখন হযরত মুয়াবিয়া (রযি.) স্বীয় পুত্র ইয়াযিদকে তার উত্তরসূরী বানানোর অভিমত ব্যক্ত করেন, তখন উপস্থিত জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু ইবনুল জাওযী তার এ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেননি। সেজন্য আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় আগত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য হবে (লামিউদ্ দারারী)

www.e-ilm.weebly.com

প্রকাশ থাকে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামনে রেখে আহূত সাহাবাদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হযরত আলী (রযি.)-এর পক্ষ হতে হযরত আবু মূসা আশয়ারী আর হযরত মুয়াবিয়ার পক্ষ হতে হযরত আমর বিন আস (রযি.)-কে বিচারক নিযুক্ত করা হবে। তারা এ বিষয়ে সলা-পরামর্শ করলেন।

পরামর্শ শেষে হযরত আমর বিন আস (রযি.) আবু মূসা আশয়ারীকে (রযি.) বললেন, যান, আমরা যে বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছি, তা জনতাকে অবহিত করুন। হযরত আবু মূসা (রযি.) জনতাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ উপস্থিত জনতা, সরকার গঠন প্রশ্নে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তা সমাধানকল্পে আমরা এ থেকে উত্তম কোন পন্থা বুঝছি না যে, হযরত আলী (রযি.) ও হযরত মুয়াবিয়া (রযি.) উভয়কে বরখাস্ত করা হোক এবং সরকার গঠনের বিষয়টি পরামর্শ সভার হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। পরামর্শ সভা যাকে ভাল মনে করবে, তাকেই খলীফা নিযুক্ত করবে। অতঃপর তিনি বলেন, সুতরাং আমি হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা) উভয়কে বরখাস্ত করছি। এই বলে তিনি মঞ্চ ত্যাগ করলে হযরত আমর বিন আস (রযি.) জনতার সামনে আসেন এবং হামদ ও ছানার পর বলেন ঃ হযরত আবু মূসার (রযি.) বক্তব্য ইতিমধ্যে আপনারা শুনেছেন এবং এটাও শুনেছেন যে, হযরত আবু মূসা (রযি.) হযরত আলী (রযি.)-কে বরখাস্ত করেছেন। তার ন্যায় আমিও তাঁকে বরখাস্ত করছি। আর তার স্থানে হযরত মুয়াবিয়াকে আমীর নিযুক্ত করছি। কেননা, তিনি উসমান হত্যা প্রতিশোধের দাবীদার এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনিই সর্বাধিক উপযুক্ত।

خَطَبَ مُعَاوِيَةُ (মুয়াবিয়া ভাষণ দিলেন) ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রযি.) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রযি.) ও তাঁর পিতা হযরত উমরের (রযি.) প্রতি ইঙ্গিত করে এ ভাষণ দেন।

فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ (আমরাই তাঁর ও তাঁর পিতা হতে এ ব্যাপারে অধিক হকদার)ঃ খেলাফতের হকদার সম্পর্কে সম্ভবত হযরত মুয়াবিয়ার (রযি.) রায় এটা ছিলযে, এ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামীর তুলনায় বিদ্যা-বুদ্ধিতে পারদর্শী ব্যক্তি বেশি অগ্রাধিকারী। পক্ষান্তরে ইবনে উমরের রায় ছিল এর বিপরীত। হয়ত তিনি ইসলামে অগ্রগামী এবং দ্বীনি জ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তির উপর নিছক বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রাধান্য দেননি। তবে বিপর্যয় দেখা দেয়ার আশঙ্কায় নিজের রায়ের বিপরীত কাজ করেন। তিনি হযরত মুয়াবিয়া ও তার পরে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করেন। অতঃপর আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের হাতেও বাইয়াত করেন এবং নিজ সন্তানদেরও অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে নিষেধ করেন।

শিরোনামের সাথে হাদীসের যোগসূত্র ঃ আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস এখানে উল্লেখের কোন অর্থ নেই। তবে এটা বলা যেতে পারে যে, পূর্ববর্তী বিষয়ের একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সম্পর্ক যে মোটেও নেই এমনটি নয়। কারণ, শিরোনামেও ইবনে উমরের উল্লেখ রয়েছে আবার হাদীসেও রয়েছে তার কথা। আর সম্পর্কের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

www.e-ilm.weebly.com

তবে আল্লামা কস্তলানী বলেন, مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلَامِ এ অংশটি শিরোনামের সাথে সম্পর্ক রাখার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ইবনে উমর (রযি.) এবং তার শ্রদ্ধেয় পিতা উমর (রযি.) হযরত মুয়াবিয়া ও তার পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে উহুদ এবং খন্দকে যুদ্ধ করেছেন। আর উভয় যুদ্ধে মুয়াবিয়া (রযি.)-এর পিতা মুশরিকদের হাতে বন্দী হন। ফলে এদিক দিয়ে এ হাদীস খন্দক যুদ্ধের অধ্যায়ে উল্লেখের যোগসূত্র সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا (আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব, তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না) ঃ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, খন্দকে আগত বাহিনী ফিরে গেলে রসূল (স.) ইরশাদ করেন ঃ এ বছরের পর কুরাইশরা আর তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না, তবে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এ উক্তিতে রসূল (স.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মোজেজা প্রকাশ পায়। কেননা, তিনি যেমনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ঠিক বাস্তবে তেমনটিই হয়। এ বছরের পর কুরাইশরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আর লড়তে আসেনি। পক্ষান্তরে মক্কা বিজয় পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের সাথে লড়াই অব্যাহত রাখে।

مَلَأَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের ইহলৌকিক জীবনে ঘর ও পারলৌকিক জীবনে কবরকে আগুন দ্বারা ভরপুর করুক এবং উভয়জগতে তাদের আযাব দিক।

مَنْ يَاتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْمِ (আমাদেরকে কওমের খবর সরবরাহ করবে কে?)ঃ রসূল (স.)-এর এ আহ্বানে হযরত যুবাইর (রযি.) সাড়া দেন। কিন্তু কোন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, কওমের সংবাদবহনকারী ছিলেন হযরত হুযাইফা (রযি.)। হাফেজ ইবনে হাযার (রহ.) উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য প্রদানপূর্বক বলেন যে, উভয় ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন। যুবাইর (রযি.)-এর ঘটনা ছিল বনূ কুরাইজা সংক্রান্ত। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের সাথে কৃত মিত্র চুক্তি বাস্তবেই লঙ্ঘন করেছে কিনা, তা যাচাই করা ছিল যুবাইর (রযি.)-এর ঘটনা। আর হুযাইফা (রযি.)-এর ঘটনা ছিল কুরাইশদের খবর যাচাই সম্বন্ধে।

فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ঃ এ বাক্যের কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (১) আল্লাহ্র অস্তিত্বই মৌলিক ও বাস্তব অস্তিত্ব। তাঁর অস্তিত্বের বিচারে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসহ সকল সৃষ্টির অস্তিত্ব যেন কোন অস্তিত্বই নয়। অর্থাৎ অনস্তিত্বের ন্যায়। মাওলানা রূমী কত চমৎকারই না বলেছেন ঃ

جمله معشوق است عاشق پرده * زنده معشوق است عاشق مرده

প্রেমিক পর্দামাত্র প্রেমাস্পদই সবকিছু
অস্তিত্ব কেবল প্রেমাস্পদের প্রেমিক সবে মিছু।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) 'কালীদে মসনবীর' মধ্যে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

(২) সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এসব নিশ্চিহ্নের পর কেবল আল্লাহ্র সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। অন্য কিছু রবে না। যেমন আল্লাহ্ বলেছেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্র সত্তা ছাড়া বাকী সবকিছুই ধ্বংস হবে।

(৩) খন্দক যুদ্ধের পর কাফেরদের পক্ষ থেকে কোন চাপের আশঙ্কা মোটেই বাকী থাকবে না। পূর্ববর্তী বাক্য لايَغْزُوْنَا এবং فَاء تَفْرِيع এ অর্থই বুঝায়।

بَابُ مَرْجِعِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ

খন্দক হতে নবীর (স.) প্রত্যাবর্তন ও বনূ কুরাইজা অভিমুখে রওনা

বনূ কুরাইজার ঘটনার বিবরণ এই যে, সালাম বিন মুশকিম, সাল্লাম বিন আবুল হুকাইক (আবু রাফে'), কেনানা বিন রবী প্রমুখ ইহুদীদের উচ্চ পর্যায়ের নেতা আরবের সকল গোত্রে গিয়ে গিয়ে তাদেরকে একযোগে মদীনা আক্রমণ করতে প্ররোচিত করে। যার দরুন বিভিন্ন গোত্রের ১০ হাজার আরব সম্মিলিতভাবে মদীনা আক্রমণে উদ্বুদ্ধ হয়, যা থেকে আত্মরক্ষা করতে মুসলমানদের খন্দক খননের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মুসলমানরা খন্দক খননে ব্যস্ত, ইত্যবসরে খবর পাওয়া গেল যে, বনূ কুরাইজা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করেছে। তারা হুয়াই বিন আখতাবের প্ররোচনার শিকার হয়েছে। যেহেতু মুসলমানগণ মদীনায় স্ত্রী, সন্তান, সম্পদ রেখে খন্দকে অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কোন বন্দোবস্ত ছিল না, তাই যে কোন সময় মদীনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। সেজন্য চুক্তি লঙ্ঘনর খবর মুসলমানদের বড়ই অস্থির করে তোলে। রসূল (স.) সা'দ বিন মুয়াজ, খাওয়াত বিন যুবাইর প্রমুখকে প্রেরণ করে ঘটনার সত্যতা যাচাই করলে ঘটনা সত্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই খন্দক হতে প্রত্যাবর্তনের পরপরই হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বনূ কুরাইজাকে হামলা করতে বলেন। এ যুদ্ধে তিন হাজার মুজাহিদ অংশ নেন। ইহুদীদের মধ্যে বনূ কুরাইজা ছিল সবচে অনিষ্টকারী ও কটুভাষী দল। ফলে আল্লাহ্ তাদের শাস্তিও দেন বড় কঠোর। অনুনয়-বিনয় করা সত্ত্বেও বনূ নযীরের ন্যায় রসূল (স.) তাদের সাথে কোন চুক্তি বা সম্পর্ক রাখেননি। ৫ম হিজরীর জিলক্বদ মাসে বনূ কুরাইজার ঘটনা সংঘটিত হয়।

مَوْكِبُ جِبْرَائِيْل ঃ مَوْكِب-এর অর্থ গতি, চলন। এটা তিনভাবে পড়া যেতে পারে। (১) পেশের সাথে, অর্থাৎ, هٰذَا مَوْكِبُ جِبْرَائِيْل অর্থ, এটা জিবরাঈলের গতিবেগ। (২) যবরের সাথে। তখন উহ্য ইবারত হবে, يَنْظُرُ مَوْكِبَ جِبْرَائِيْل অর্থাৎ, হযরত আনাস জিবরাঈলের গতিবেগ দেখেন। (৩) যেরের সাথে। তখন এটা مِنَ الْغُبَارِ থেকে বদল হবে। আল্লামা কিরমানী বলেন, যদি প্রশ্ন হয় যে, হযরত আনাস (রযি.) কিভাবে জানলেন যে, তিনি জিবরাঈল ছিলেন? উত্তর হলো, সম্ভবত তিনি রসূল (স.) থেকে শুনে অথবা নমুনা-নিদর্শন দেখে আঁচ করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ (বনূ কুরাইজায় গিয়ে সবাই আসরের নামায পড়বে) ঃ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আসরের স্থলে জোহরের কথা এসেছে। অথচ উভয় বর্ণনার উস্তাদ ও সূত্র একই। দু'বর্ণনার মধ্যে বিভিন্ন পন্থায় সমতা বিধান করা যায় ঃ

(১) হতে পারে রসূল (স.) নির্দেশ দেয়ার পূর্বেই কতক সাহাবা জোহরের নামায আদায় করেছিলেন আর কতক সাহাবা তখনও পড়েছিলেন না। যারা জোহরের নামায পড়েননি তাদের ব্যাপারে রসূল (স.) বলেন ঃ لَا يُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ অর্থাৎ, তোমরা জোহরের নামায পড়বে না (বনূ কুরাইজা না গিয়ে)। আর যারা জোহর পড়েন তাদের ব্যাপারে রসূল (স.) বলেন ঃ لَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ অর্থাৎ, (বনূ কুরাইজা না গিয়ে) আসরের নামায পড়বে না।

(২) এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সাহাবাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বনূ কুরাইজা রওনা হন। রসূল (স.) প্রথমে রওনাকারীদের لَا يُصَلِّيَنَّ الظُّهْرَ বলেছেন, আর পরবর্তীতে রওনাকারীদের বলেছেন لَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْرَ

(৩) অথবা হতে পারে, এ মতান্তর ঘটেছে কোন বর্ণনাকারীর থেকে। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আমার কাছে এটা অতি সুস্পষ্ট যে, এ মতান্তর বুখারীর শায়েখ থেকে ঘটেছে। তিনিই হাদীসকে দু'ভাবে বর্ণনা করেছেন। সকল মাগাযী লেখক একমত যে, এটা আসরের নামাযের ঘটনা; জোহরের নামায নয়।

لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا (আমরা তথায় না গিয়ে নামায পড়ব না) ঃ এ দল রসূল (স.)-এর আদেশকে তার প্রকাশ্য অবস্থায় রেখে এ উক্তি করেন।

بَلْ نُصَلِّي ঃ (বরং আমরা নামায পড়ব) এ দল রসূল (স.)-এর আদেশকে প্রকাশ্য অবস্থায় রাখেননি; বরং তারা বুঝেন যে, রসূল (স.)-এর এ নির্দেশ বনূ কুরাইজায় দ্রুত পৌঁছানোর জন্য ছিল মাত্র।*

فَاسْئَلُهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطُوهُ أَوْ بَعْضَهُ (তাদের প্রদত্ত বিষয় পূর্ণ অথবা কিছু অংশ আমি চাইব) ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, মদীনায় হিজরতের পর আনসারগণ তাদের মুহাজির ভাইদেরকে বাগিচার খেজুর গাছ হেবা (দান) করেছিলেন। যাতে তারা তার ফল দ্বারা নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ বনূ নযীর ও বনূ কুরাইজার উপর মুসলমানদের বিজয়ী করলে এবং সেখানকার যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করা হলে, রসূল (স.) মুহাজিরদের বলেন, এখন তোমরা স্বাবলম্বী হয়েছ। আনসারদের হেবা (দান) তাদের প্রত্যার্পণ কর। উম্মে আইমান (হযরত উসামা বিন যায়েদের মাতা) তা অর্পণ করতে অস্বীকার করেন। কেননা তিনি তা তার নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে গেছে

টীকা ঃ যেহেতু উভয় দল রসূল (স.)-এর নির্দেশ ফলো করে, চাই তা শব্দগত হোক বা উদ্দেশ্যগতভাবে, তাই রসূল (স.) পরবর্তীতে কোন দলকে কোনরূপ ভর্ৎসনা করেননি। তাঁর ভর্ৎসনা না করাই অন্যতম প্রমাণ যে, কোন দল রসূল (স.) এর নির্দেশের খেলাফ করেনি। [অনুবাদক (সূত্র ঃ বুখারীর পার্শ্বটিকা)]

www.e-ilm.weebly.com

বলে মনে করেন। যেহেতু উম্মে আইমান শৈশবে রসূল (স.)-এর লালন-পালন করেন, তাই তিনি তার সাথে নরম ব্যবহার ও অত্যন্ত মার্জিত আচরণ করেন। তার অধীনে যে গাছ ছিল, রসূল (স.) তার মূল্য প্রদান করত তাকে খুশী করে দেন।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, হেবা ফেরত নেয়া জায়েয। আর এটাই হানাফী মাজহাবের অভিমত। যেহেতু শাফেয়ী ও অন্যান্যরা হেবা ফেরত নেয়াকে জায়েয বলেন না, তাই তারা এ ঘটনাকে 'কর্জ' বা ঋণ ছিল বলে অভিহিত করেন। প্রত্যুত্তরে আহনাফ বলেন, এটা হতে পারে না। কারণ, এটা কর্জ হলে রসূল (স.) উম্মে আনাসের দান উম্মে আইমানকে প্রদান করতেন না। কেননা, দানবস্তু হেবা করা বৈধ নয়।

তবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হানাফী মাজহাবে হেবা ফেরত জায়েয হলেও আদদুররুল মুখতারের ভাষ্য অনুযায়ী তা মাকরূহে তাহরীমী বা তানযীহী থেকে মুক্ত নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় আনসারগণ এ মাকরূহ কাজ কিভাবে করলেন? এর উত্তর হলো, এ ফেরত কার্য তাদের নিজেদের পক্ষ থেকে ছিল না; বরং রসূল (স.)-এরই নির্দেশক্রমে ছিল। অতএব তাঁদের কোন দোষ নেই।

(লামিউদ্ দারারী)

نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ : অর্থাৎ, বনূ কুরাইজা হযরত সাদের সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রেখে তাদের কেল্লা হতে নেমে আসে।

فَلَمَّا دَنَى مِنَ الْمَسْجِدِ (যখন তিনি মসজিদের কাছাকাছি চলে আসেন): এখানে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ স্থান, বনূ কুরাইজা অবরোধকালে রসূলে আকরাম (স.) যে স্থানটি ইবাদত সম্পন্নের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন।

قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ : এ সম্বোধন আনসারদের লক্ষ্যে। অর্থাৎ, ইনি তোমাদের নেতা। তোমরা তার সম্মানার্থে দাঁড়াও।

সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামায়ে কেরাম এ হাদীস থেকে আগত ব্যক্তির সম্মানার্থে দাঁড়ানো মুস্তাহাব প্রমাণ করেন। তারা বলেন, সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো নিষিদ্ধ নয়; বরং নিষিদ্ধ হলো অনারবদের প্রথার ন্যায় উপবিষ্ট ব্যক্তির সামনে মূর্তির ন্যায় দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। (বুখারী পার্শ্বটিকা)

তবে বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে, এ দণ্ডায়মান সম্মান প্রদর্শনার্থে ছিল না; বরং সাহায্যার্থে ছিল। কেননা, তিনি খন্দক যুদ্ধে আহত হন। যার দরুন গাধার পৃষ্ঠ হতে অবতরণের সময় তাকে সাহায্য করতে রসূল (স.) এ নির্দেশ দেন। যদি বাস্তবিকই এ দণ্ডায়মান সম্মান প্রদর্শনার্থে হত, তবে রসূল (স.) قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ বলতেন, قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ নয়। এ ব্যাখ্যানুপাতে উক্ত হাদীস আগত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ হয় না। (কস্তলানী)

www.e-ilm.weebly.com

(^) فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ (রসূলের নির্দেশে তারা নেমে এল) ঃ এর পূর্বের বর্ণনায় عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ বলতে عَلَى حُكْمِكَ অর্থাৎ, 'সাদের নির্দেশে' উল্লেখিত হয়েছে। এ দু' বর্ণনার মধ্যে সমাধান এই যে, রসূল (স.) দীর্ঘ ২৫ দিন পর্যন্ত বনূ কুরাইজা অবরোধ করে রাখলে তারা নিশ্চিত হয় যে, রসূল আকরাম (স.) এমনিতেই প্রস্থান করবেন না। ফলে তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে রসূল (স.)-এর নির্দেশে নেমে আসে। অতঃপর যেহেতু আউস গোত্র বনূ কুরাইজার মিত্র ছিল, তাই তারা তাদের পক্ষে এ মর্মে সুপারিশ করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি তাদের মার্জনা করুন। রসূল (স.) বলেন, তোমরা এ কথায় রাজি হবে না যে, তোমাদেরই এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে? তারা এ প্রস্তাবে রাজি হলে তখন তারা হযরত সাদের নির্দেশে (কেল্লা) হতে নেমে আসে।

(বুখারীর পার্শ্বটিকায় ইবনে ইসহাকের উক্তি)

وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا (আর যদি যুদ্ধ মওকুফ রাখ তবে রক্তক্ষরণ চালু করে দাও) ঃ হযরত সাদের জখম প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল। জখম জারী করার এ অনুনয় মৃত্যুকামনা ছিল না বিধায় তাঁর এহেন অনুনয় অবৈধ হয়নি। এটা তার শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ছিল মাত্র। যাতে তিনি শাহাদাতের সওয়াব থেকে বঞ্চিত না হন।

فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ (তার শাহরগ থেকে রক্তের ধারা বইতে লাগল) ঃ কস্তলানী গ্রন্থে আছে, সাদের (রযি.) আহত স্থানসহ বুক পর্যন্ত ফুলে গিয়েছিল। যার ফলে আহত স্থান থেকে রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে।

আল্লামা আইনী বলেন, তিনি একদা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একটি ছাগল তার পার্শ্ব অতিক্রমকালে ছাগলটির পা ঠিক তাঁর আহত স্থানে পড়ে। যার দরুন রক্ত অবিরতভাবে পড়তে থাকে।

وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ (মসজিদে বনূ গিফারের একটি তাঁবু ছিল) ঃ ব্যাখ্যাকারীদের কতক ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, এটা তাদের স্বতন্ত্র তাঁবু ছিল। আল্লামা আইনী বলেন, মসজিদে বনূ গিফারদের একটি তাঁবু ছিল। তাঁবুটি মূলত আনসারী মহিলাদের ক্লিনিক ছিল। কারো মতে ইসলামী ক্লিনিক ছিল। সেখানে আহতদের চিকিৎসা করা হত। (লামিউদ্ দারারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০)

আবার কোন কোন বর্ণনা হতে জানা যায়, এটা মূলত ঐ তাঁবু ছিল, যা হযরত সাদের জন্য খাটানো হয়েছিল। বনূ গিফারের স্বতন্ত্র তাঁবু নয়।

(আইনী ১৭তম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا (হঠাৎ দেখা গেল, জখম থেকে রক্তধারা বইছে) ঃ এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, রক্ত যখন নাপাক তখন এরূপ ব্যক্তির জন্য মসজিদে তাঁবু কিভাবে খাটানো হলো? উত্তর হলো, তখন রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং জখম শুকাবার পথে ছিল। দ্বিতীয় উত্তর, এখানে মসজিদ বলতে

www.e-ilm.weebly.com

মসজিদে নববী কিংবা সাধারণতঃ মসজিদ বলতে যা বুঝায় তা উদ্দেশ্য নয়; বরং খন্দক খননের কালে নামায পড়ার জন্য যে স্থান অস্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা উদ্দেশ্য।

কতিপয়ের মতে, মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে নববী। হাফেজ ইবনে হাজার, আইনী প্রমুখের বক্তব্য হতে এটাই বুঝে আসে। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতে, ঐ স্থান দ্বারা উদ্দেশ্য খন্দক খননের সময় যে স্থান নামাযের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। হাদীসের ভাষ্য لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ অর্থাৎ, 'নিকট হতে তার সেবা-শুশ্রূষা করার সুবিধার্থে—এ ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। কারণ মসজিদে নববী বনূ কুরাইজা হতে ছ'মাইল দূরে ছিল। সুতরাং যদি মসজিদে নববী উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তাহলে নিকট হতে সেবা-শুশ্রূষা কিভাবে হয়? (লামিউদ্‌দারারী)

بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

জাতুর-রিকা যুদ্ধ

এ অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য—

১ম বিষয় ঃ লেখকের ভাষ্য প্রসঙ্গে ঃ লেখকের ভাষ্য—وَهِىَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ مِنْ بَنِى ثَعْلَبَةَ مِنْ غَطْفَانَ ঃ টিকাকার বলেন, এ ভাষ্যের দাবী, ছা'লাবা মুহারিবের দাদা। অথচ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা, ছা'লাবা গাতফান বংশের লোক। গাতফানের বংশানুক্রম হল, গাতফান বিন সাদ বিন কায়েস। আর মুহারিবের বংশধারা হল, মুহারিব বিন খসফা বিন কায়েস। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, মুহারিব ও গাতফান পরস্পর চাচাত ভাই। পক্ষান্তরে সা'লাবাকে যদি মুহারিবের দাদা প্রতিপন্ন করা হয় তবে ঊর্ধ্বতনকে অধঃস্তনের দিকে সম্পর্কিত করা আবশ্যক হবে। আর এটা ঠিক নয়। তাই বিশুদ্ধ হলো, উক্ত ভাষ্যটি وَاوْ আতফ সম্বলিত হবে। অর্থাৎ, وَهِىَ غَزْوَةُ مُحَارِبِ خَصَفَةَ وَمِنْ بَنِى ثَعْلَبَةَ পরবর্তী অধ্যায়ে ঠিক এভাবেই ভাষ্য এসেছে।

২য় বিষয় ঃ নামকরণ প্রসঙ্গে ঃ হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ এ যুদ্ধের নামকরণের একাধিক কারণ বর্ণনা করেছেন ঃ

(১) আল্লামা আইনী বলেন, মুজাহিদগণ তাদের ঝাণ্ডা বিভিন্ন রঙের কাপড়ে জোড়া লাগিয়ে বানানোর কারণে এ যুদ্ধের নাম জাতুর-রিকা রাখা হয়েছিল।

(২) ওয়াকেদী বলেন, ঘটনাস্থলে এমন পাহাড় ছিল, যার মাটি লাল ও সাদা রংয়ের ছিল।

(৩) এ যুদ্ধে মুজাহিদদের পা ফেটে যাওয়ায় তার উপর পট্টি বাঁধার কারণে উক্ত নামে নামকরণ করা হয়।

(৪) কেউ বলেন, সেখানে জাতুর-রিকা নামে একটি গাছ থাকায় এ নাম হয়ে যায়।

(৫) মুজাহিদদের ঘোড়া কালো ও সাদা রংয়ের ছিল বিধায় এ নাম হয়।

(৬) কারো মতে, এ যুদ্ধে 'সালাতুল্ খওফ' খণ্ড খণ্ডভাবে পড়ার কারণে এ নাম পড়ে যায়।

www.e-ilm.weebly.com

৩য় বিষয় ঃ জাতুর-রিকা যুদ্ধের কারণ ঃ ওয়াকেদী এ যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করেন, একদা হলব থেকে এক গ্রাম্য লোক মদীনায় এসে বলল যে, আমি বনূ ছা'লাবা ও বনূ আনসারের লোকদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হতে দেখেছি, অথচ তোমরা তাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। এ সংবাদ শ্রবণে রসূল (স.) ৪০০, কারো মতে ৭০০ মুজাহিদ নিয়ে মদীনা হতে রওনা দেন। ওয়াকেদীর এ বর্ণনানুযায়ী বনূ আনমার এবং বনূ মুহারিব ও সা'লাব এক হয়ে গেল।

৪র্থ বিষয় ঃ যুদ্ধের সময়কাল ঃ এ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়, তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিস্তর মতান্তর রয়েছে।

(১) ইবনে ইসহাক বলেন, বনূ নযীরের পর এবং খন্দকের পূর্বে ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত হয়।

(২) ইবনে সা'দ ও ইবনে হিব্বানের মতে ৫ম হিজরীর মুহাররম মাসে।

(৩) ইমাম বুখারীর মতে, খয়বার যুদ্ধের পরে ৭ম হিজরীতে। তখন এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে বুখারী (রহ.) খয়বারের পূর্বে তা উল্লেখ করলেন কেন? আল্লামা যুরকানী এ প্রশ্নের জওয়াব দেন, আমি জানি না যে, যারা এ যুদ্ধ খয়বারের পূর্বে হওয়ার পক্ষপাতী, ইমাম বুখারী (রহ.) তাদের দাবী মেনে নিয়েই তা খয়বারের হওয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছেন, না কি এটা বর্ণনাকারীদের পক্ষ থেকে হয়েছে, নাকি এটা এদিকে ইঙ্গিত করতে আগত যে, জাতুর-রিকা ভিন্ন ভিন্ন দু'যুদ্ধের নাম। একটি খয়বারের পূর্বে আর অপরটি খয়বারের পরে। বাইহাকী (রহ.)[১] তার কিতাবে এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) জাতুর-রিকা যুদ্ধ খয়বারের পরে হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি পেশ করেন।

(১) হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রযি.) খয়বার যুদ্ধের পর ৭ম হিজরীতে হাবশা হতে মদীনায় আসেন এবং বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি জাতুর-রিকা যুদ্ধে শরীক ছিলেন।

(২) হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহর বর্ণনায় আছে, রসূল (স.) জাতুর রিকা যুদ্ধে সালাতুল খওফ আদায় করেছেন। এতদ্ব্যতীত জাতুর-রিকা যুদ্ধ সপ্তমযুদ্ধ হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা, তা খয়বারের পরে হওয়াকেই আবশ্যক করে। কারণ, যুদ্ধের ক্রমবিন্যাস হল— (১) বদর (২) উহুদ (৩) খন্দক (৪) কুরাইজা (৫) মুরাইসি (৬) খয়বার। এ ক্রমবিন্যাস হতে জাতুর-রিকা সপ্তম যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক হয়।

(৩) হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) হতে বর্ণিত, صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِى غَزْوَةِ نَجْدٍ صَلَاةَ الْخَوْفِ অর্থাৎ, আমি নবীর (স.) সাথে নজদ যুদ্ধে 'সালাতুল খওফ' পড়েছি। আর নজদ যুদ্ধ সেটাই জাতুর-রিকা। হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) খয়বারের সময় মদীনা আসেন।

টীকা ঃ ১. ইমাম বায়হাকী (রহ.), জন্ম ঃ ৩৮৪ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৪৫৬ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) এতদ্ব্যতীত হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থে ওয়াকেদীর সূত্রে খালিদ বিন ওলীদের এ হাদীস উল্লেখ করেন ঃ নবী করীম (স.) হুদাইবিয়া অভিমুখে রওনা হলে আসফান নামক স্থানে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। আমি তার উদ্দেশ্য অবগত হয়ে তার পিছু নিলাম। তিনি সাহাবাদের নিয়ে জোহরের নামায পড়লে আমরা তাদের প্রতি অতর্কিতে আক্রমণ করতে চাইলাম। আমরা পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বেই নবী (স.) এ সম্পর্কে অবগত হয়ে যান এবং সাহাবাদের নিয়ে আসরের নামায 'সালাতুল খওফ' পড়েন।

খালিদ বিন ওলীদের এ বর্ণনা উল্লেখ করে হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারীতে বলেন, এ হাদীস থেকে সুপ্রতিভাত হয় যে, হুদায়বিয়ার উমরায় আসফান নামক স্থানে আদায়কৃত সালাতুল খওফই সর্বপ্রথম সালাতুল খওফ। আর তা জাতুর-রিকায় সালাতুল খওফ ব্যতীত ছিল। এটা ছিল খন্দক ও কুরাইজা যুদ্ধের পর। পক্ষান্তরে জাতুর-রিকায় সালাতুল খওফ যা আদায় করা হয়, তা ছিল আসফানের পরের ঘটনা। সুতরাং জাতুর-রিকা খন্দক, কুরাইজা ও হুদায়বিয়ার পরবর্তী ঘটনা। আর এটা খয়বারের পরে জাতুর-রিকা সংঘটিত হওয়ার বক্তব্যকে সুদৃঢ়করণ মাত্র। কারণ, হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর খয়বারের ঘটনা ঘটে।
(ফাতহুল বারী ৭ ঃ ৩২৬)

হযরত জাবেরের একাধিক বর্ণনা প্রসঙ্গে হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, যাবের (রযি.) উভয় ঘটনাকে একত্রে বর্ণনা করেছেন। আর আবু যুবাইর যাবের থেকে যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আসফান সংক্রান্ত। আবু সালমা ওহাব বিন কায়সান এবং আবু মূসা মিসরী হযরত জাবের (রযি.) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা জাতুর-রিকা যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট।

قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى صَلَاةِ الْخَوْفِ (মালেক বলেন, সালাতুল খওফের ব্যাপারে আমার শ্রবণের মধ্যে এটাই সর্ব উৎকৃষ্ট) ঃ হাদীসে সালাতুল খওফের অসংখ্য বিবরণ (পদ্ধতি) বিবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমাদ (রহ.) সালেহ বিন খওয়াতের (রযি.) হাদীস আর আহনাফ ইবনে উমরের হাদীস অনুযায়ী আমলের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ (লাইছও হিশাম থেকে এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন) ঃ এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, মুয়াজের হাদীস মুহারিব ও ছা'লাবা যুদ্ধ সংক্রান্ত। পক্ষান্তরে লাইছের হাদীস আনমার যুদ্ধ সংক্রান্ত, তাহলে অনুরূপতা (মুতাবায়াত) কিভাবে হল? উত্তর হলো, বনূ আনমারের এলাকা বনূ ছালাবার এলাকার নিকটে ছিল। তাই এ দিক দিয়ে এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

إِنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ (জাবের রসূলের সাথে নজদের দিকে যুদ্ধ করেছেন) ঃ যদি প্রশ্ন হয় শিরোনাম 'জাতুর-রিকা যুদ্ধ' অথচ বিভিন্ন

www.e-ilm.weebly.com

হাদীসে নজদ যুদ্ধের বর্ণনা এসেছে, এর হেতু কি? উত্তর হলো, নজদের দিকে যেটা হয় সেটাই জাতুর-রিকা। কেননা, জাতুর-রিকা যুদ্ধ নজদে অনুষ্ঠিত হয়।

لَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ (রসূল তাকে শাস্তি দেননি) ঃ কাফেররা মুসলমান হয়ে যাক, এটাই ছিল রসূল (স.)-এর একান্ত কামনা-বাসনা। তাই রাসূলে আকরাম (স.) কাফেরদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তিকে শাস্তি দেন না। ওয়কেদী বলেন, ঐ ব্যক্তি মুসলমান হয় এবং স্বগোত্রে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়। এতে বহু লোক তার উসিলায় হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়।

وَكَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَيْنِ (রসূল (স.)-এর চার রাকাত আর সাহাবাদের দুই রাকাত ছিল) ঃ নাসায়ী (রহ.) আবু বকর (রযি.) থেকে এভাবে বর্ণনা করেন—

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى بِالْقَوْمِ فِي الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِالْقَوْمِ الْأُخَرِيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعًا -

অর্থাৎ, রাসূলে আকরাম (স.) সাহাবাদের সাথে দু'রাকাত সালাতুল খওফ পড়ে সালাম ফিরান। অতঃপর দ্বিতীয় দল সাহাবাদের সাথে দু'রাকাত পড়ে সালাম ফিরান। সুতরাং নবীজী (স.) মোট চার রাকাত পড়েন।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, রসূল (স.)-এর চার রাকাতের দুই রাকাত ফরজ আর দুই রাকাত নফল ছিল। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীস থেকে নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর নামাযের বৈধতা প্রমাণিত হয়। মোল্লা আলী কারী বলেন, হানাফী মাজহাবের নিকট এ হাদীসটি জটিল। কেননা, যদি রসূল (স.)-এর এ নামাযকে সফরের নামায ধরা হয়, তাহলে এর দ্বারা নফল আদায়কারীর পিছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্তেদার বৈধতা প্রমাণিত হয়, অথচ আহনাফ এ মতের প্রবক্তা নয়। আর যদি মুকীম অবস্থার নামায (صَلَاةُ الْحَضَرِ) ধরা হয়, তবে প্রতি দু'রাকাত অন্তর সালাম ফিরান কিভাবে ঠিক হল? এ প্রশ্নের বিভিন্ন জওয়াব দেয়া হয়েছে। যথা ঃ

(১) এটা হুযূরের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত (২) ইমাম তহাবী বলেন, এটা তখনকার ঘটনা, যখন ফরজ নামায দু'বার পড়া হত (৩) কারো মতে, সফরে রসূল (স.)-এর কছর ও ইতমাম উভয় করার ইখতিয়ার ছিল। এখানে রসূল (স.) ইতমাম তথা নামায পূর্ণ চার রাকাত পড়েছেন। পক্ষান্তরে মুক্তাদীরা কছর করেছেন। (৪) ইমাম তহাবীর[১] বর্ণনায়, ثُمَّ سَلَّمَ শব্দ উল্লেখ নেই। যদি এ বর্ণনা সঠিক হয়, তবে কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না। —হাশিয়ায়ে আশফাকিয়া ১ ঃ ১৭৬

টীকা ঃ ১. ইমাম তহাবী (রহ.), জন্ম ঃ ২২৯ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৩২১ হিজরী

www.e-ilm.weebly.com

جَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَيَّامَ خَيْبَرَ (আবু হুরায়রা খয়বার যুদ্ধের সময় রসূল (স.)-এর নিকটে আসেন) ঃ এ ঘটনা দ্বারা খয়বারের পরে জাতুর-রিকা যুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এহেন প্রমাণ প্রচেষ্টা ঠিক নয়। কারণ, জাতুর-রিকা যুদ্ধ একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ, একটি খয়বারের পূর্বে অপরটি খয়বারের পরে। আর হযরত আবু হুরায়রাহ[২] (রযি.) খয়বারের পরবর্তী যুদ্ধে শরীক হন; এর পূর্বের কোন যুদ্ধে নয়।

بَابُ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلِقِ

বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ

নামকরণ ঃ খুজা'আ গোত্রের পূর্বপুরুষদের মধ্যে খুজাইমা বিন সা'দ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে অত্যন্ত সুদর্শন ও সুশ্রী হওয়ায় তার উপাধি হয় মুস্তালিক। পরবর্তীতে তার বংশধারাকে বনূ মুস্তালিক নামে অভিহিত করা হয়। এ যুদ্ধ উক্ত গোত্রের সাথে সংঘটিত হওয়ায় তার নাম হয় 'বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ'। বনূ মুস্তালিক এলাকায় মুরায়সী নামে পানির একটি কূপ ছিল। তাই এ যুদ্ধকে মুরায়সী যুদ্ধও বলা হয়।

বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পটভূমি ঃ বনূ মুস্তালিকের দলপতি হারেস বিন আবী যিবার তার কওম ও অন্যান্য আরব গোত্র নিয়ে রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিপ্রায়ে রওনা দিয়েছে এ মর্মে রসূল (স.) সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে তার সত্যতা যাচাই করার জন্য হযরত বুরায়দা আসলামীকে (রযি.) প্রেরণ করেন। বুরায়দা (রযি.) নিজেই হারেসের সাথে সাক্ষাৎ ও মৌখিকভাবে জিজ্ঞাসা করলে জানা যায় যে, সত্যই সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাসূলে আকরাম (স.) খুবই জলদি রওনা দেন। পথিমধ্যে তাদের এ গুপ্তচরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। কাফেররা তাকে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য প্রেরণ করে। হযরত উমর (রযি.) তাকে গ্রেপ্তার করে নবীজী (স.)-এর অনুমতিক্রমে হত্যা করেন। কাফেররা রাসূলে আকরাম (স.)-এর রওনা ও গুপ্তচর নিহত হবার খবর শুনে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যায় এবং গোত্রের লোকজন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হারেসের সাথে কেবল তার নিজ গোত্র অবশিষ্ট থাকে। প্রথম আক্রমণেই কাফেররা পরাজিত হয়। সকল নারী-পুরুষ গ্রেপ্তার হয়। বিপুল অর্থ-সম্পদ অর্জিত হয়। কোন মুসলমান এ যুদ্ধে শহীদ হননি।

বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের সময়কাল ঃ ইবনে ইসহাক ৬ষ্ঠ হিজরী, ওয়কেদী ৫ম হিজরী আর মূসা বিন উকবা ৪র্থ হিজরীতে হওয়ার প্রবক্তা। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) 'তাওশীহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, মাগাযী মূসা বিন উকবা গ্রন্থে একাধিক সূত্রে ৫ম হিজরীর উল্লেখ রয়েছে। অতএব এখানে ইমাম বুখারীর ৪র্থ হিজরীর বর্ণনাটা কলম স্খলন (ভুল) হয়েছে।

টীকা ঃ ২. হযরত আবু হুরায়রা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৫৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা সুয়ূতী আরো বলেন, ইবনে ইসহাকের উক্তি হতে এ উক্তিটি অধিক বিশুদ্ধ।

আসাহ্হুস সিয়ার গ্রন্থে আছে, ৪র্থ হিজরীর বর্ণনাটি শুদ্ধ হতে পারে। কারণ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ইফকের ঘটনা এ যুদ্ধেই ঘটে। হযরত আয়েশা (রযি.) বলেন, এটা পর্দার বিধান অবতরণের পরবর্তী ঘটনা। ৫ম হিজরীতে এ ঘটনার সময়ে হযরত যয়নবের (রযি.) বিবাহ সম্পন্ন হয়। ফলে মুরায়সী যুদ্ধ ৫ম হিজরীর পূর্বে হতে পারে না।

খন্দক যুদ্ধের পরে ৬ষ্ঠ হিজরীতে মুরায়সী যুদ্ধ হয় বলে ইবনে ইসহাক যে মন্তব্য করেন তার উপর প্রশ্ন হয় যে, বুখারী-মুসলিমে বর্ণনা এসেছে, ইফক ঘটনার নায়করা বিভিন্ন প্রপাগাণ্ডা শুরু করলে রাসূলে আকরাম (স.) মিম্বরে উঠে বললেন, এ মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করার কেউ আছে কি? তখন হযরত সাদ বিন মুয়াজ (রযি.) বলেন, আল্লাহ্র রসূল, আমি আছি। আর এ বিষয়ে সবাই একমত যে, খন্দকের পর পরেই সাদের ইন্তেকাল হয়ে যায়। তাহলে খন্দকের পরে মুরায়সী যুদ্ধের সময় তিনি কিভাবে অবস্থান করতে পারেন? তাই প্রাধান মত এটাই যে, ৫ম হিজরীতে হযরত যয়নবের (রযি.) বিবাহের পর প্রথমে মুরায়সী অতঃপর এ বছরেই খন্দক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

জানার বিষয়

قَوْلُهُ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ ঃ অর্থাৎ, বিবাহের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা কষ্টকর হওয়ায় মহিলাদের বিবাহ করা আমাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এক দীর্ঘ সময় ধরে স্ত্রীবিহীন অবস্থায় আমাদের এখানে থাকা কঠিন হয়ে গেছে। কেননা মদীনা থেকে তারা বেশি দিন অনুপস্থিত ছিলেন না।

قَوْلُهُ وَاحْبَبْنَا الْعَزْلَ (আমরা আযল করা পছন্দ করতাম) ঃ কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল, লজ্জাস্থানে বীর্য স্খলন করা হলে, বীর্যস্থিতির কারণে বাঁদী বিক্রয়ের অযোগ্য হয়ে যাবে। অথচ তাঁরা মিলনের পূর্ণ স্বাদ উপভোগের সাথে সাথে পরবর্তীতে দাসী বিক্রয় ও তা থেকে মুনাফা লাভের আশাও রাখতেন।

قَوْلُهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ (আমরা এ ব্যাপারে রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম) ঃ তারা যোনিপথের বাইরে বীর্য স্খলনের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা কুরআনে বর্ণিত مَوْءُدَةٌ তথা গোপন হত্যার আওতাভুক্ত হয়ে যায় কিনা-এ আশঙ্কায় তাঁরা রসূলে আকরাম (স.)-এর কাছে আযলের শরয়ী বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

আযল ও বার্থ কন্ট্রোল

(১) আযলের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ আযলের শাব্দিক অর্থ, বিচ্ছিন্ন করা, পৃথক করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় আযল হলো, সন্তান ধারণ রোধ কল্পে বীর্য স্খলিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রীলিঙ্গ হতে পুংলিঙ্গ বের করা (যাতে শুক্রকীট স্ত্রীলিঙ্গের অভ্যন্তরে ঢুকে বীর্যস্থিতি না হয়)।

www.e-ilm.weebly.com

(২) আযল সংশ্লিষ্ট হাদীস : এ প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস এসেছে। যথা :

(১) নবীর (স.) উক্তি : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَفْعَلُوا আযল না করলে তাতে ক্ষতির কিছু নেই।

(২) নবীর (স.) উক্তি : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَاتَفْعَلُوا অর্থাৎ, আযল না করলে তাতে ক্ষতির কিছু নেই।

(৩) নবীর (স.) উক্তি : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ অর্থাৎ, তোমরা এমন কাজ কেন কর?

(৪) হযরত জাবের (রযি.) বলেন : كُنَّا نَعْزِلُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ অর্থাৎ,, রসূলের জামানায় দীর্ঘদিন কুরআন নাযিল হয়, তারপরও আমরা আযল করতাম।

নবীর (স.) প্রথম ও দ্বিতীয় উক্তির ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী বলেন, এ বর্ণনাটি "مَا" ও "لَا" উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারা আযলকে জায়েয বলেন, তাদের মতে নবীর উক্তি "لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَاتَفْعَلُوا" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো لَيْسَ عَدَمُ الْفِعْلِ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, এ কাজ না করা তোমাদের উপর অত্যাবশ্যক নয়। অথবা لَا بَأْسَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا অর্থাৎ, তোমরা তা করলে কোন ক্ষতি নেই। এমতাবস্থায় "لَا" টা অতিরিক্ত (زائد) হবে। (কস্তলানী, তীবী)

পক্ষান্তরে যারা আযল নাজায়েযের পক্ষে তারা বলেন, এখানে لَا টা তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর নবীর (স.) উক্তি— عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا তার পূর্ববর্তী বাক্যকে সুদৃঢ় করতে এসেছে। আল্লামা কুরতুবী বলেন, প্রকৃত ইবারত হবে : لَاتَعْزِلُوْا وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا অর্থাৎ, তোমরা আযল করো না। আযল না করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আর নবীর (স.) উক্তি وَعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا পূর্ববর্তী নিষেধাজ্ঞাকে আরও জোরদার করতে এসেছে।

তবে অন্যান্য উলামায়ে কেরাম এভাবে ব্যাখ্যা দেন যে, لَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا অর্থাৎ, আযল না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। এ ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে, এখানে আযল করলে যে ক্ষতি হবে না তা বলা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ, ক্ষতির সম্ভাবনা নাকচ করা হয়েছে; মূল কার্যকে নয়। সুতরাং এ থেকে (বিপরীত দিক হিসেবে) আযল করায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বলে বুঝে আসে। তারা বলেন, যদি আযলের ক্ষতির সম্ভাবনা নাকচ করাই উদ্দেশ্য হত, তবে রসূলে আকরাম (স.) لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا বলতেন; لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا বলতেন না।

www.e-ilm.weebly.com

(৩) সাহাবাদের আযল করার কারণ ঃ কতিপয় সাহাবী আযল করতেন বলে হাদীস সূত্রে প্রকাশ। তবে তার কারণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

(১) বাঁদীর গর্ভ হতে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়াকে তৎকালে মানুষ পছন্দ করত না। কারণ, সমাজে বাঁদীর সন্তানের অবস্থান ছিল অত্যন্ত নীচে।

(২) বাঁদীর গর্ভ হতে সন্তান জন্ম হলে ঐ বাঁদীকে আর বিক্রি করা যেত না। কারণ, সে মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ হয়ে যেত।

(৩) সন্তানের মা পুনর্বার গর্ভবতী হলে প্রথম সন্তানের সুস্থতায় বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল।

(৪) আযল প্রসঙ্গে ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত ঃ আল্লামা আইনী শায়েখ জয়নুদ্দীন ইরাকী [১] হতে উল্লেখ করেন, মহিলা যদি স্বাধীন হয় এবং সে আযলের প্রতি রাজি হয় তবে অবশ্যই আযল জায়েয। তবে ইবনে আব্দিল বার বলেন, মহিলা স্বাধীন হলে তার অনুমতি ব্যতিরেকে আযল করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। যদি বিবাহিতা অন্যের বাঁদী হয়, তবে ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) মতে, স্বামীর ঐ বাঁদী হতে আযল করতে বাঁদীর অনুমতি জরুরী নয়। অনুরূপভাবে মনিবের থেকেও অনুমতি লাগবে না। সাহেবাইনের মতে বিবাহিতা বাঁদীর অনুমতি নেয়া জরুরী। ইমাম আ'জম, অন্যান্য আহনাফ এবং ইমাম মালেকের মতে, এক্ষেত্রে মাওলার (মনিবের) অনুমতি অপরিহার্য। (আইনী)

(৫) আযল প্রসঙ্গে পরবর্তী উলামায়ে কেরামের অভিমত ঃ হযরত শাহ্ ওয়লীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, মূল কথা হলো, আযলের কল্যাণকর দিকগুলো একে অপরের বিপরীত। বাঁদীর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কল্যাণ হলো আযল করা। পক্ষান্তরে শ্রেণীগত কল্যাণ হলো, আযল না করা। যাতে সন্তান-সন্ততি বেশি হয়। বংশধারা বাকী থাকে। আল্লাহ্র শরয়ী ও গঠনমূলক সাধারণ আহকামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত লাভের তুলনায় শ্রেণীগত লাভের বিষয়টি অগ্রগণ্য। আর নবীজী (স.) لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا উক্তির দ্বারা এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, কোন দুর্ঘটনা তার বাস্তবায়নের পূর্বে সুনিশ্চিত নয়। অনুরূপভাবে এ বিষয়েও সতর্ক করেন, মানুষ দুনিয়াতে কোন কিছু করতে চাইলে তার পিছনে সবল না হলেও দুর্বল কারণ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্র নিয়ম হলো, তিনি ঐ দুর্বল কারণকে সবল করে তার থেকে পূর্ণ ফায়দা প্রদান করেন। মানব যখন বীর্যস্খলনের উপক্রম হয় এবং সে লিঙ্গ বের করে ফেলে তখন তার অজ্ঞাতে ইতিমধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিঙ্গ হতে কয়েক ফোঁটা বীর্য স্ত্রীলিঙ্গের ভিতরে ঢুকে যায়, যা সন্তানের ভ্রূণ সৃষ্টিতে যথেষ্ট। আর এটাই হলো উমরের (রযি.) উক্তির নিগূঢ় রহস্য-তাৎপর্য যে, কেউ কারো সাথে সঙ্গম করলে সে ক্ষেত্রে আযল করাটা বীর্য গর্ভাশয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না।

টীকা ঃ ১. শায়েখ জয়নুদ্দীন ইরাকী (রহ.) মৃত্যু ঃ ৮০৬ হিজরী।

আল্লামা শরফুদ্দীন হুসাইন বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দিল্লাহ আত্তীবী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৭৪৩ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.), ফতহুল মুলহিমে বলেন, মুজাহিদের বর্ণনায় আছে, ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ অর্থাৎ, রসূলে আকরাম (স.)-এর সকাশে আযল প্রসঙ্গ উঠলে তিনি বলেন, তোমরা এরূপ কেন কর? এ হাদীসে রসূল (স.) সুস্পষ্টভাবে আযলের নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেননি; বরং বর্জন-শ্রেয়তার দিকে ইঙ্গিত করেছেন মাত্র। কারণ, সন্তান ভূমিষ্টের ভয়ে আযল করা হলে সেটা ফলপ্রসূ হয় না। কেননা আল্লাহ্ সন্তানের বাজেট একবার পাশ করে ফেললে আযল প্রক্রিয়া তা বাতিল করতে পারে না। বীর্য গর্ভাশয়ে অবস্থান নিবে তবুও আযলকারী তা অনুধাবন পর্যন্ত করতে পারবে না। বীর্যস্থিতি হয়ে সন্তান সৃষ্টি হয়ে যাবেই। আল্লাহ্র সিদ্ধান্ত ও বরাদ্দ কেউ বাতিল করতে পারে না। অতঃপর তিনি বলেন, আযল কয়েকটি কারণে করা হয়॥

(১) বিবাহিতা বাঁদী হতে 'গোলাম' সন্তান না হওয়ার জন্য।

(২) পুরুষ নিঃস্ব-গরীব হওয়া অবস্থায় অধিক সন্তানের চাপ এড়াতে।

(৩) দুগ্ধপায়ী শিশু ও তার মায়ের ক্ষতির আশঙ্কায়।

সুতরাং যে সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে আযল করা হয় তা পুরোপুরি সফল হয় না। কেননা, সন্তান হওয়ার বাজেট একবার হয়ে গেলে তা বাস্তবায়িত হবেই; তা রোধ করার শক্তি কারো নেই। রসূল (স.)-এর একাধিক হাদীসে এ কথাটিই ফুটে উঠেছে।

খাতামুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী[১] (রহ.) বলেন, আযলের বৈধতা-অবৈধতা সংক্রান্ত পূর্বোক্ত সকল বক্তব্যই আইনগত বিধান। তবে ধর্মীয় মানবতার দৃষ্টিতে আযল অপছন্দনীয়। কেননা অসংখ্য হাদীস তা মাকরূহ্ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে।

উপরোল্লিখিত সকল ব্যাখ্যা হতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে আযল মাকরূহ্ ও অপছন্দনীয়। তিরমিযী শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রযি.) হতে বর্ণিত আছে, ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন সাহাবায়ে কেরাম আযল পছন্দ করতেন না। মুয়াত্তা ইমাম মালেকে আছে, তাদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরও (রযি.) ছিলেন।

আর যে সকল সাহাবা আযল করতেন, সম্ভবত রসূল (স.)-এর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারণে তারা তা জায়েয মনে করে তবেই করতেন। অন্যথা সামগ্রিক বর্ণনা হতে সুস্পষ্ট যে, রসূল (স.) সুস্পষ্টভাবে আযলের অনুমতি দেননি। বস্তুত এ কারণেই সুবিজ্ঞ সাহাবাগণ আযল করা অপছন্দ করতেন।

(ফতহুল মুলহিম)

টীকা ঃ ১. আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ.), জন্ম ঃ ১২৯২ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১৩৫১ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আযল বনাম বার্থ কন্ট্রোল

সম্প্রতি কতক আলেম আযলের হাদীসের ভিত্তিতে বার্থ কন্ট্রোল তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণকে জায়েয বলে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে তাদের এ মন্তব্য (ফতোয়া) সঠিক নয়।

(১) উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যা হতে একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, শরয়ী বিবরণ থেকে আযলের বৈধতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়। অতএব তার উপর ভিত্তি করে জন্ম নিয়ন্ত্রণকে কিভাবে বৈধ বলা যেতে পারে?

(২) সাহাবাদের আযলের কারণ আর জন্মনিয়ন্ত্রণের কারণ এক নয়। কেননা জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য হলো, দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি অর্জন করা। অথচ এ কারণ সাহাবাদের আযলে ছিল না। তাই আযলের ভিত্তিতে জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েয বলা মোটেই ঠিক নয়।

(৩) সন্তানের ভয়ে আযল করা যেমন অনর্থক, তেমনি জন্মনিয়ন্ত্রণও অনর্থক বিষয়। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যদি ভ্রূণ সৃষ্টি করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে মানুষের সকল অপচেষ্টা ও কৌশল ব্যর্থ হতে বাধ্য। আল্লাহ্ সন্তান দানের ইচ্ছা করলে তা হবেই। তাঁর সিদ্ধান্ত কেউ রদ করতে পারে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ঔষধ ব্যবহারে অনেক সময় লাভের পরিবর্তে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তব অভিজ্ঞতা এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

(৪) জন্মনিয়ন্ত্রণের মূল কারণ মানুষের রুজি-স্বল্পতার আশঙ্কা। আর এ আশঙ্কা রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ, সৃষ্টিজীবের রুজির দায়িত্ব খোদ স্রষ্টা নিজের হাতে রেখেছেন। আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

(١) وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا الخ

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠের সকল প্রাণীর রুজির জিম্মাদারী আল্লাহ্‌র।

(٢) لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

অর্থাৎ, আপন সন্তানদের তোমরা রুজির ভয়ে হত্যা করো না। আমিই তাদের ও তোমাদের রুজি দিই।

(٣) وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ الخ

এমন অনেক প্রাণী আছে, যারা তাদের খাদ্য মওজুদ রাখে না। আল্লাহ্ই তাদের ও তোমাদের রুজি দান করেন।

(৫) জন্মনিয়ন্ত্রণ তথা ঔষধ ব্যবহারের মাধ্যমে জন্ম রোধ করা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এক চরম ঘৃণ্য কাজ। কারণ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা

www.e-ilm.weebly.com

মানব জাতির বৃদ্ধি ও লালন। অন্যথা মনুষ্য বংশ পতন ও উচ্ছেদকে অপরাধ ও নিন্দনীয় আখ্যায়িত করা হতো না। অথচ আল্লাহ্ বলেন, قَدْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ الخ অর্থাৎ, যারা নিজেদের সন্তানকে অবিবেচকের মত অজ্ঞতাবশতঃ হত্যা করেছে, নিশ্চয় তারা লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অপর আয়াতে বলেন ঃ

وَإِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ الخ

অর্থাৎ, আর যখন সে প্রত্যাবর্তন করে তখন এলাকায় বিপর্যয় সৃষ্টি ও ক্ষেত-খামার এবং বংশ বিনাশে সচেষ্ট হয়।

এক হাদীসে রসূল (স.) বলেন, وَإِنِّىْ أُبَاهِىْ بِكُمُ الْأُمَمَ অর্থাৎ, আমি তোমাদের (সংখ্যাধিক্য) নিয়ে অন্যান্য উম্মতের উপর গর্ব করব।

এতদসত্ত্বেও যদি জন্মনিয়ন্ত্রণকে জায়েয প্রতিপন্ন করা হয়, তাহলে আবশ্যিকভাবে মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহ্ পাক ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অন্ন-বস্ত্র প্রদান করতে অপারগ (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এটা এক চরম অপবাদ, যার থেকে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ মুক্ত।

মোটকথা আমাদের দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে অবাধ চর্চা হচ্ছে, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণ্য এবং সম্পূর্ণ অবৈধ। অবশ্য অসুস্থতাবশতঃ কতক অবস্থায় আযল বৈধ হবার অবকাশ রয়েছে ; (তবে স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ কোনভাবেই জায়েয নয়) (ফতহুল মুলহিম, মা'আরেফুল কুরআন প্রভৃতি)

فَشَامَه ঃ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তি তার খোলা তরবারী গিলাফের অভ্যন্তরে চালান করে দিল। এখানে প্রশ্ন হয়, এ ঘটনাটি জাতুর-রিকা সংশ্লিষ্ট, বনূ মুস্তালিকের নয়; তাহলে তা এ অধ্যায়ে উল্লেখের হেতু কি? উত্তর হলো॥

(১) কোন কোন অনুলিপিতে এ হাদীসটি এ অধ্যায়ে নেই; বরং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আছে। লিপিকার ভুলবশতঃ এখানে উল্লেখ করেছেন।

(২) এ হাদীস মূলত পার্শ্বটিকায় ছিল। লিপিকারের সন্দেহ জাগ্রত হয়। তিনি সন্দেহবশতঃ হাদীসটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

(৩) সম্ভবত উভয় যুদ্ধ নিকটবর্তী সময়ে হওয়ায় বর্ণনাকারী উভয়কে একই যুদ্ধের হুকুমের অন্তর্গত করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ غَزْوَةِ اَنْمَارٍ

আনমার যুদ্ধ

এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, লেখক পূর্বে 'বনূ মুস্তালিক অধ্যায়' এবং পরে 'ইফক অধ্যায়' এনেছেন। আর এটা প্রকাশ্য যে, ইফকের ঘটনা বনূ মুস্তালিক যুদ্ধে ঘটে। অতএব এ দু' অধ্যায়ের মধ্যখানে বনূ আনমার যুদ্ধ উল্লেখ করার হেতু কি? অথচ জাতুর-রিকা যুদ্ধের সাথেই এটা বেশি সাদৃশ্য রাখে; বনূ মুস্তালিকের সাথে নয়! এ প্রশ্নের জওয়াব হলো—

(১) এ 'অগ্র-পশ্চাৎ' ব্যাপারটা লিপিকারের পক্ষ থেকে হয়েছে।

(২) কিরমানী বলেন, অধ্যায় ক্রমবিন্যাসে ইমাম বুখারী (রহ.) গুরুত্বারোপ করেননি।

بَابُ حَدِيْثِ الْاِفْكِ

ইফকের বিবরণ

وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِىْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا : অর্থাৎ, ইমাম যুহ্‌রী বলেন, ঐ চার মুহাদ্দিসের প্রত্যেকে হযরত আয়েশার হাদীসের অংশ বিশেষ আমাকে বর্ণনা করেছেন।

وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ : অর্থাৎ, ঐ চার মুহাদ্দিসের প্রত্যেকের থেকে আমি হযরত আয়েশার হাদীসের অংশবিশেষ সংরক্ষণ করেছি। সারকথা হলো, এ পূর্ণ হাদীসটি মোট এ চারজন থেকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, এ পূর্ণ হাদীস তাদের প্রত্যেকের থেকে তিনি লাভ করেছেন। (বরং অংশ অংশ নিয়ে মোট ৪ জনের থেকে হাদীসটি পূর্ণভাবে আমি পেয়েছি)।

أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ (রসূল তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন) : পুণ্যবতী স্ত্রীগণের মনোরঞ্জনের জন্য রসূল (স.) (সফরের প্রাক্কালে) লটারী করতেন।

فَإِذَا عِقْدٌ لِىْ مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ : অর্থাৎ, হঠাৎ দেখা গেল, ইয়ামানের জিফার নামক শহরের কারিগর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আমার হারটি ছিঁড়ে হারিয়ে গেছে।

لَمْ يَهْبُلْنَ : (তৎকালে সাধারণত) মহিলারা মোটা হত না; বরং হাল্কা-পাতলা হত।

لَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ : তারা গোশত ভরপুর তথা হৃষ্ট-পুষ্ট হত না।

بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ (সৈন্যরা চলে যাবার পর) : অর্থাৎ, সফওয়ান বিন মুয়াত্তাল (রযি.) সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে থাকতেন। যাতে থেকে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া জিনিস পত্র (যেমন, প্লেট ইত্যাদি) উঠিয়ে মালিককে প্রত্যার্পণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا ঃ অর্থাৎ, সফওয়ান (রযি.) উটের সামনের পা বিছিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে সহজে আমি তাতে উঠতে পারি এবং সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন না হয়।

فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ঃ এ বাক্য থেকে হযরত আয়েশা (রযি.)-এর উদ্দেশ্য একথা বর্ণনা করা যে, যারা তাকে কেন্দ্র করে মিথ্যা অপবাদ ও বানোয়াট কাহিনী উদ্ভাবন ও তা প্রচার করেছে, তারা ধ্বংস (অপদস্ত) হয়েছে। কেননা পরে তাদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও মানুষ উভয়ের কাছে লাঞ্ছিত, অপদস্ত ও অপমানিত হয়েছিল।

وَكَانَ الَّذِى تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ ঃ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অপবাদ রটনায় বড় অংশ নেয় এবং তাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

إِنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيَتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدَهُ ঃ অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নিকট ইফকের কাহিনীর বিবরণ পেশ এবং তা নিয়ে উক্ত মজলিসে জোর আলোচনা চলত।

وَيَسْتَمِعُهُ ঃ অর্থাৎ, সে এ ঘটনা প্রমাণ করতে চাইত এবং মনোযোগ দিয়ে শুনত। শ্রবণ করতে অস্বীকার করত না এবং বর্ণনাকারীকে নিষেধও করত না।

يَسْتَوْشِيهِ ঃ অর্থাৎ, সে ঘটনাকে আলোচনার খোরাক বানাত। যাতে সেটা খুব প্রচারিত হয় এবং আলোচনা থেমে না যায়।

فَإِنَّ أَبِى وَوَالِدَهُ ঃ (নিশ্চয় আমার পিতা ও পিতার পিতা) ঃ হযরত হাস্‌সানের পিতার নাম সাবেত, দাদার নাম মুনজির, আর পরদাদার নাম হারাম ছিল। অত্যন্ত বিস্ময় ও আশ্চর্যের কথা হলো, এ চারজনের প্রত্যেকে একশ বিশ (১২০) বছর করে জীবন লাভ করেন।

وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ ঃ এ বাক্য হতে হযরত আয়েশা (রযি.)-এর উদ্দেশ্য এটা বলা যে, প্রয়োজন মিটানোর (ইস্তেঞ্জা করা) ক্ষেত্রে গ্রাম্য লোকদের ন্যায় আমাদের অভ্যাস ছিল; শহুরীদের মত নয়।

فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ (আমি ও উম্মে মেসতাহ চললাম) ঃ মেসতাহ হযরত আবু বকর (রযি.)-এর খালাত ভাই ছিলেন। ইফকের অন্যান্য হোতাদের সাথে তাকেও শাস্তি প্রদান করা হয়। তার মাতার নাম উম্মে সালমা।

أَىْ هَنْتَاهُ ঃ এটা একটি আহ্বানমূলক শব্দ। অর্থাৎ, আরে পাগলী মেয়ে! যেহেতু মানুষদের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রযি.) কম অবগত ছিলেন, তাই হযরত আয়েশাকে এ শব্দ দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে।

وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ (সে ছাড়া বহু মেয়ে রয়েছে) ঃ হযরত আলীর (রযি.) এ উক্তি বিদ্বেষ কিংবা শত্রুতামূলক ছিল না; বরং তিনি আলোচ্য ঘটনার কারণে রসূল (স.)-এর মধ্যে অস্বস্তি ও উদ্বেগ অনুভব করে তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এ মন্তব্য করেন।

www.e-ilm.weebly.com

سَلِ الْجَارِيَةَ (আপনি বাদীকে জিজ্ঞাসা করুন) ঃ এ বাদী হলেন হযরত বারীরা। হতে পারে হযরত আয়েশা তাকে ক্রয়ের পূর্বে তিনি রসূলে আকরাম (স.)-এর খেদমত করতেন। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, ইহা ক্রয়ের পরে এবং আযাদের পূর্বের ঘটনা। তিনি দাসত্বমুক্ত হন মক্কা বিজয়ের পর।

فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ ঃ অর্থাৎ, রসূল (স.) বলেন, আমার পরিবারের ব্যাপারে যে আমাকে কষ্ট দেয়, তার বিরুদ্ধে কে দলীল-প্রমাণ পেশ করবে, আর সে দলীল তার কুকর্মের ক্ষতিপূরণও হবে?

فَقَامَ سَعْدٌ (সাদ দাঁড়িয়ে গেলেন) ঃ এ সাদ হলেন হযরত ইবনে মুয়াজ (রযি.)। আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, এ বাক্যে প্রশ্ন হয় যে, এটা ৫ম হিজরীতে ঘটিত বনূ মুস্তালিক যুদ্ধের ঘটনা। আর হযরত সাদের ইন্তেকাল হয় ৪র্থ হিজরীতে সংঘটিত খন্দক যুদ্ধের পরপরই। তাহলে ৪র্থ হিজরীতে ইন্তেকাল করে কিভাবে ৫ম হিজরীতে এ ঘটনা ঘটল? এ প্রশ্নের জওয়াব হলো॥

(১) কেউ কেউ বলেন, এখানে হযরত সা'দের উল্লেখ রাবীর পক্ষ হতে ভুল হয়েছে। কারণ, রসূল (স.) সাহায্যের আবেদন করলে আবেদনে যিনি সাড়া দেন, তিনি ছিলেন হযরত উসাইদ বিন খুযাইর (রযি.); সা'দ বিন মুয়াজ (রযি.) নন।

(২) ওয়াকেদীর মতে, ৫ম হিজরীতে প্রথমে বনু মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় এরপরে খন্দক যুদ্ধ। অতএব কোন প্রশ্ন থাকে না।

(৩) ইমাম বুখারী (রহ.) মূসা বিন উকবার উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন যে, ৪র্থ হিজরীতে বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূসা বিন উকবা আরো বলেন, বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ খন্দক যুদ্ধের পূর্বে হয়। এ ব্যাখ্যানুপাতেও প্রশ্ন বাকী থাকে না।

(আসাহহুস্ সিয়ার)

لَا أَقُومُ إِلَيْهِ (আমি তার প্রতি দাঁড়াব না) ঃ হযরত আয়েশা (রযি.) তাঁর পিতা-মাতার প্রতি অভিমান করে একথা বলেন। হযরত আয়েশা (রযি.)-এর সতীত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু তারা তাঁর ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন, তাই তাদের ব্যথা দেয়ার উদ্দেশ্যেও তিনি একথা বলেন। সাথে সাথে তাদের ভ্রান্ত অপবাদ থেকে নিজের পবিত্রতারও বহিঃপ্রকাশ এতে হয়েছে।

مَا كَشَفْتُ مِنْ كَنَفِ أُنْثَى ঃ অর্থাৎ, আমি কখনও কোন মহিলার বস্ত্র উন্মোচন করিনি। এটা সহবাস না করার প্রতি ইঙ্গিতবহ। কিন্তু এ হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী হতে আবু দাউদে বর্ণিত এক হাদীস—

جَاءَتْ اِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ زَوْجِي صَفْوَانُ ابْنُ مُعَطَّلٍ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَأَجَابَ عَنْهُ صَفْوَانُ بِأَنِّي رَجُلٌ شَابٌّ فَلَا اَصْبِرُ ـ

www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ, আমরা রসূলের কাছে থাকা অবস্থায় একদা একজন রমণী রসূল (স.)-এর সকাশে এসে এ মর্মে অভিযোগ করল যে, আমার স্বামীর নাম সফওয়ান। আমি নামায পড়তে থাকলে সে আমাকে মারে এবং রোযা রাখলে ভেঙ্গে দেয়। সফওয়ান (রযি.) আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললেন, আমি যুবক মানুষ। ধৈর্য ধরতে পারি না— এর বিরোধ হয়। এ দু'বর্ণনার মধ্যে সমতা বিধান করতে গিয়ে আল্লামা কুরতুবী বলেন, আমি কোন মহিলার কাপড় খুলিনি অর্থ, যিনা (ব্যভিচার) করতে কাপড় খুলিনি। কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার এ সমতার উপর আপত্তি করেন যে, ইফকের ঘটনায় সাঈদ বিন হিলাল হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, قَالَ (أَىْ صَفْوَانُ) مَا أَصَبْتُ اِمْرَأَةً قَطُّ لَا حَلَالًا وَلَا حَرَامًا অর্থাৎ, সফওয়ান বলেন, আমি এ পর্যন্ত কোন মহিলাকে বৈধ বা অবৈধ পন্থায় স্পর্শ করিনি। সেজন্য হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এখানে নফীর দ্বারা উদ্দেশ্য ইফক-ঘটনার পূর্ববর্তী জামানা। হতে পারে, ইফকের পরে তিনি বিবাহ করেন। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে কোন প্রশ্ন বাকী থাকে না।

ইবনে ইসহাক সফওয়ানের ব্যাপারে যে বর্ণনা পেশ করেন, اِنَّهٗ كَانَ حَصُوْرًا অর্থাৎ, তিনি অবিবাহিত (চিরকুমার) ছিলেন। এর জওয়াব হলো, এটা বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবেলায় আসার মত সুপ্রতিষ্ঠিত হাদীস নয়।

كَانَ عَلِىٌّ مُسَلِّمًا فِىْ شَأْنِهَا : এ বাক্যটি দু'ভাবে বর্ণিত। (১) تَسْلِيْم মাসদার থেকে لَامْ বর্ণে যের ও তাশদীদ যোগে (অর্থাৎ, مُسَلِّمًا)। উদ্দেশ্য হলো, হযরত আলী (রযি.) হযরত আয়েশার ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন। (২) হামাবীর[১] বর্ণনায় سَلَامَةٌ মাসদার থেকে لَامْ বর্ণে যবর ও তাশদীদবিহীন (অর্থাৎ, مُسْلَمًا) এসেছে। অর্থ, এ ঘটনার খোঁজ-খবর রাখা হতে হযরত আলী (রযি.) নিজেকে নিরাপদ ও দূরে রাখেন। তিনি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন। কোন বিষয়ে নিজেকে জড়ান নি।

قَالَتْ اِبْنِىْ فِيْمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيْثَ (তিনি বললেন, এ ঘটনা রটনাকারীদের মধ্যে আমার পুত্রও রয়েছে) : হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আনসারদের মধ্য হতে যারা ইফক ঘটনার সাথে জড়িত ছিল এবং যাদের নাম জানা যায়, তারা হলো আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও হাসসান বিন সাবেত। অথচ এ দু'জনের কারো মাতা জীবিত ছিলো না। তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য এটা হতে পারে যে, তিনি দুধ ইত্যাদি জাতীয় মাতা ছিলেন।

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيْبَةٍ * تُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُوْمِ الْغَوَافِلِ

সতী তিনি, বুদ্ধিমতী তিনি অপবাদ চির মুক্ত,
গাফেল-অসতর্কদের গোশত ভক্ষণ হতে ছিলেন চির অভুক্ত।

টীকা : আল্লামা হামাবী (রহ.), মৃত্যু : ১০৯৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ, তিনি কারো পরনিন্দা করতেন না। কেননা, করলে তার গোশত ভক্ষণকারিণী হতেন (কুরআনের ভাষায়)। অভুক্ত থাকতেন না; বরং উদর পূর্ণই থাকত তাঁর।

لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ ঃ অর্থাৎ, যদিও আপনি মুখে আমার প্রশংসামূলক গুণাবলী বর্ণনা করেন, কিন্তু বাস্তবে আমার প্রতি এমন ধারণা রাখেন না; বরং আমাকে অপবাদের পাত্রী বানান। (লামিউদ দারারী)

وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى (অন্ধত্বের তুলনায় কোন্ শাস্তি কঠোরতর?) ঃ হযরত আয়েশা (রযি.)-এর এ উক্তি নিছক ধারণাভিত্তিক। উদ্দেশ্য হলো, প্রথমত এ আয়াত হযরত হাসসানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কারণ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ব্যাপারে। আর যদি মেনেও নেয়া হয় যে, আয়াতটি তাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন উদ্দেশ্য হবে, অন্ধ হয়ে যাওয়া—এটা শাস্তির দিক দিকে কম কিসে?

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, আয়াত হযরত হাসসানকে অন্তর্ভুক্ত করে মেনে নেয়া অবস্থায় প্রকৃত জওয়াব হবে, তওবার মাধ্যমে তার গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। (লামিউদ্ দারারী)

بَابُ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ

হুদায়বিয়ার যুদ্ধ

মক্কা থেকে এক মঞ্জিল আর মদীনা হতে নয় মঞ্জিল দূরত্বে অবস্থিত একটি ছোট জনবসতির নাম হুদায়বিয়া। সেখানকার একটি কূপের নাম অনুসারে পুরো এলাকার নাম রাখা হয়েছে হুদায়বিয়া। তথায় গাছের নিচে সাহাবাগণ রসূল (স.)-এর হাতে বাইয়াত হন। ইতিহাসে এই বাইয়াত 'বাইয়াতুর রিযওয়ান' নামে প্রসিদ্ধ।

হুদায়বিয়া যুদ্ধের পটভূমি

রসূল (স.) মদীনায় স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবাদের সাথে কাবা গৃহের হজ্জ করেছেন এবং কা'বা গৃহের চাবি নিজের কব্জায় নিয়ে নিয়েছেন। রসূল (স.) এ স্বপ্ন দেখে উমরা আদায়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন ১৫০০ সাহাবাসহ রসূল (স.) উমরা আদায়ের নিয়তে মক্কা অভিমুখে রওনা হন। (ফতহুল বারী)

কিন্তু মক্কার মুশরিকরা রসূল (স.)-এর গতিরোধ করে। রসূল (স.) কাবা গৃহে পৌঁছতে পারেন না। অবশেষে কতিপয় শর্তে মক্কার মুশরিকদের সাথে সন্ধি করে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ফলাফল ঃ মুসলমান বনাম কুরাইশদের মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়। পবিত্র কুরআন এ ঘটনাকে ফাতহে মুবিন (প্রকাশ্য বিজয়) বলে আখ্যা দিয়েছে। কারণ, হুদায়বিয়ার সন্ধিই মূলত ইসলামের পরবর্তী বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত এবং আরবে ইসলামের শিকড় গভীরভাবে গ্রথিত করেছে।

كَافِرٌ بِي (আমার সাথে কুফরী করে) ঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এই কুফরী দু'ভাবে হতে পারে।

www.e-ilm.weebly.com

(১) যদি কোন ব্যক্তি জাহেলী যুগের লোকদের মত এ বিশ্বাস সংরক্ষণ করে যে, বর্ষাদাতা ও তার নিয়ন্ত্রক হলো তারকা। বর্ষা তারই বিবর্তনে হয়। তবে সে নিঃসন্দেহে কাফের হবে।

(২) পক্ষান্তরে যদি কেউ প্রকৃত বর্ষাদাতা ও তার নিয়ন্ত্রক আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করে এবং এটাও মনে-প্রাণে জানে যে, বৃষ্টি আল্লাহ্র করুণা হতেই বর্ষিত হয়; তারকারাজির বিবর্তন বৃষ্টির পূর্বাভাস ও উপলক্ষ্য হয় মাত্র। তবে সে প্রকৃত কাফের হবে না। কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাসও মাকরুহমুক্ত হবে না। কারণ এটা এমন বিশ্বাস যা ঈমান ও কুফরের মধ্যে খটকা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। ফলে এতে তার সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মে। তদুপরি এটা জাহেলী তথা মূর্খতাসুলভ কাজও বটে।

عُمْرَةٌ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ : এটা ৬ষ্ঠ হিজরীর ঘটনা। যদি প্রশ্ন হয়, হুদায়বিয়ার বছর উমরার সম্পূর্ণ কার্য সম্পন্ন হয়নি। অতএব তাকে কিভাবে উমরা হিসেবে গণ্য করা হয়? উত্তর হলো, উমরা আদায়ে প্রবল বাধা-বিপত্তির দরুন বাহ্যিকভাবে তাওয়াফ অনাদায় থাকলেও শরীয়ত তাকে পূর্ণ উমরার মান প্রদান করেছে।

وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ : মক্কা বিজয় তথা ৮ম হিজরীতে হুনাইন যুদ্ধ হতে ফিরতি পথে যি'রানা নামক স্থানে এসে রসূল (স.) উমরার ইহরাম বাঁধেন। যদি প্রশ্ন হয়, জিহাদের পথে مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِى الْمُؤَلَّفَةَ الخ অধ্যায়ে হযরত নাফে'র একটি উক্তি এসেছে যে, وَلَمْ يَعْتَمِرِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ وَلَوْ اِعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ অর্থাৎ, রসূল (স.) যি'রানা হতে উমরার ইহরাম বাঁধেন নি। যদি বাঁধতেন তবে ইবনে উমরের কাছে ব্যাপারটি গোপন থাকতো না। যার দরুন উভয় বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায়? উত্তর হলো, এমন জরুরী মনে করা ঠিক নয়। কারণ, হতে পারে হযরত ইবনে উমর (রযি.) তখন অনুপস্থিত ছিলেন। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তাঁর স্মৃতিভ্রম হয়েছে।

وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ : অর্থাৎ, কুরআনের আয়াত إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا-এর মধ্যে যে ফাতাহ্ বা বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে, আমরা 'বাইয়াতুর রেযওয়ান'কেই সে বিজয় বলে গণ্য করতাম। কারণ, 'বাইয়াতুর রেযওয়ান'ই পরবর্তী সকল বিজয়ের উৎস। কেননা, হুদায়বিয়া সন্ধির পর যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যারা এখন পর্যন্ত মদীনায় যেতে ও ইসলাম গ্রহণে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল (যেমন হযরত খালেদ বিন ওলীদ ও হযরত আমর বিন আস) তারা সাহস ফিরে পায়। সন্ধির ফলে অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ লাভ করে। যার দরুন তারা চাক্ষুষভাবে খোদ রসূল (স.)-এর মোজেযা, জীবন প্রবাহ এবং উন্নততর চরিত্র-মাধুর্য অবলোকন করে ইসলামের প্রতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান হয়ে যায়। আর যারা তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে না, তাদেরও ইসলামের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। তাই

www.e-ilm.weebly.com

মক্কা বিজয় হওয়ার সাথে সাথে তারাও ইসলামের ছায়াতলে চলে আসে। এমনকি প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের লোকজনও মক্কাবাসীর দেখাদেখি ইসলামে দীক্ষিত হয়। আর এ সবই ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির ফসল।

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً আমরা নবীর সাথে চৌদ্দশত ছিলাম ঃ হুদায়বিয়ায় উপস্থিত সাহাবাদের সংখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। যথা ঃ (১) ১৩,০০ (২) ১৪,০০ (৩) ১৫,০০ (৪) ১৬,০০। হাদীসের ব্যাখ্যাতাগণ এ বর্ণনাসমূহের মাঝে নিম্নরূপ সামঞ্জস্য বিধান করেছেন—

(১) ইমাম নববী বলেন, প্রকৃত সংখ্যা ১৪০০ হতে কিছু বেশি ছিল। যারা ১৫০০ বলেছেন, তারা খুচরা সংখ্যাকে পূর্ণ হিসেবে ধরেছেন আর যারা ১৪০০ বলেছেন, তারা খুচরা সংখ্যাকে বাদ দিয়েছেন। অর্থাৎ, তার কথা উল্লেখ করেননি।

(২) বায়হাকী (রহ.) ১৪০০ বর্ণনাটিকে অগ্রগণ্য আখ্যা দিয়েছেন এবং এ সংখ্যাকেই বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) কিরমানী বলেন, কেউ কেউ ছোটদেরও গণনা করেছেন বিধায় বর্ণনাসমূহের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা দেয়।

(৪) কারো মতে, বর্ণনাকারীগণ স্ব-স্ব অবগতি মোতাবেক বর্ণনা করেছেন।

(৫) আবার কারো মতে, এটা আনুমানিক একটি সংখ্যা মাত্র। অতএব এতে মতান্তর ঘটাই স্বাভাবিক।

(৬) এটাও হতে পারে যে, মদীনা হতে ১৩০০ রওনা হন, অবশিষ্টরা পথিমধ্যে তাদের সাথে এসে যোগ দেয়। এভাবে প্রথমে ১৪০০ অতঃপর ১৫০০ হয়ে যায়। (লামিউদ্ দারারী)

أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ (পৃথিবীর সর্বোত্তম জামাত তোমরাই) ঃ রসূল (স.)-এর এ উক্তি হতে ঘটনাস্থলে অনুপস্থিতদের তুলনায় উপস্থিতদের এক বিরাট মর্যাদা লাভের বিষয়টি প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাই বলে শিয়াচক্রের এ ব্যাপারে কোন দলীল হয় না যে, হযরত আলী (রযি.) হযরত উসমান (রযি.) হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কারণ, রসূল (স.) কর্তৃক হযরত উসমান (রযি.) মক্কায় প্রেরিত হওয়ায় যদিও বাইয়াতুর রিযওয়ান থেকে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, কিন্তু স্বয়ং রসূল (স.) তাঁর এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে হযরত উসমান (রযি.)-এর বাইয়াত করেন। সেজন্য হযরত উসমানও (রযি.) মর্যাদায় বাইয়াতকারীদের সমতুল্য হয়েছেন।

وَلَوْ كُنْتُ أُبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ ঃ অর্থাৎ, আজ আমার চোখ ভাল থাকলে তোমাদেরকে সেই গাছের স্থানটি দেখাতাম।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, সুদৃঢ় আস্থার কারণে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইবনে উমর (রযি.) এ কথা বলেন। অন্যথা তিনিও জানতেন যে, আলোচ্য গাছটি.

www.e-ilm.weebly.com

মানুষদের স্মৃতিতে নাই। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রযি.) তাঁর পিতা হতে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা হতেও জানা যায় যে, তিনি পরবর্তী বছর এসে গাছটিকে চিনতে পারেন নি।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আরো আছে, হযরত উমর (রযি.) যে বৃক্ষটি কর্তন করেন, তা যে ঐ বৃক্ষই ছিল, এর উপরও কোন প্রমাণ নেই।

খামীস গ্রন্থে এসেছে, গাছটির কথা তথা অবস্থান মানুষ ভুলে যাওয়ার পর একদা উমর (রযি.) সে স্থান দিয়ে গমনকালে জিজ্ঞাসা করেন যে, গাছটি যেন কোথায় ছিল? কেউ বলল এখানে, কেউ বলল ওখানে। এভাবে বিভিন্ন মত প্রকাশ পেলে তিনি বলেন, বুঝেছি; গাছের কথা কারো মনে নেই। অর্থাৎ, গাছটির অবস্থান স্থলের কথা সবাই ভুলে গেছে।

قَلَّدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ ঃ تَقْلِيْد অর্থ কোন জিনিস দ্বারা মালা বানিয়ে তা প্রাণীর গলায় পরানো। যেমন, জুতা ইত্যাদি মালা বানিয়ে গলায় পরানো হয়। আর إِشْعَار অর্থ চুটের উভয় পার্শ্ব কিংবা ডান পার্শ্ব বা বাম পার্শ্বদেশে সামান্য জখম করা, আর সে রক্ত প্রাণীর চুটে মাখিয়ে দেয়া। কোন প্রাণীর গলায় মাল্য ও চুটে রক্তের প্রলেপ থাকলে তা কুরবানীর প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হত।

বজলুল মাজহুদ প্রণেতা লিখেন, শায়েখ ইবনে হাকাম জাহেরী[১] (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অঙ্গহানী হওয়ায় إِشْعَار-কে মাকরূহ বলেন। ইমাম আবু হানীফার এ উক্তি উল্লেখ করে ইবনে হাকাম (রহ.) তাঁর প্রতি আক্রমণ করে বলেন, এ ধরনের বিবেকের প্রতি খুবই আফসোস লাগে, যা রসূলের (স.) হুকুমের পিছু নেয়। ইবনে হাকামের এ ধরনের বল্গাহীন উক্তির জওয়াব দিতে গিয়ে সম্মানিত লেখক বলেন, এটা ইবনে হাকামের মূর্খতা ও স্বল্পজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। কারণ, হানাফী মাজহাবের সবচে বড় আলেম ইমাম ওহাবী (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) إِشْعَار করার ক্ষেত্রে মূর্খদের সীমাতিরিক্ততাকে মাকরূহ বলেন। কেননা, তারা চামড়ার সাথে গোশতও জখম করে প্রাণীকে সীমাহীন কষ্ট দিত। সুতরাং যদি কেউ শুধু চামড়া কাটে আর তা গোশত পর্যন্ত না পৌঁছে, তবে তা মাকরূহ হবে না।

لَا أُحْصِىْ كَمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ ঃ অর্থাৎ, বুখারীর শায়েখ আলী বিন মাদীনী[২] বলেন, আমি আমার শায়েখ সুফিয়ান থেকে এ হাদীস যে কতবার শুনেছি তা গণনার বাইরে। আবার এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, হুদায়বিয়ায় উপস্থিতদের সংখ্যা আমি সুফিয়ান থেকে ঠিক কত যে শুনেছি তা মনে নেই। অর্থাৎ, ১৫০০ না ১৪০০ নাকি ১৩০০ তা সঠিক স্মরণ করতে পারছি না।

টীকা ঃ ১.শায়েখ ইবনে হাকাম জাহেরী (রহ.), জন্মঃ ৩৮৪ হিজরী, মৃত্যুঃ ৪৫৬ হিজরী।
২. হযরত আলী বিন মাদীনী (রহ.), মৃত্যু ২৬৪ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

حَتّٰى سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لَا أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِشْعَارَ وَالتَّقْلِيْدَ ঃ অর্থাৎ, আলী বিন মাদীনী বলেন, আমি আমার শায়েখ সুফিয়ানকে বলতে শুনেছি যে, আমি ইমাম যুহরী হতে إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ বিষয় দু'টি স্মৃতিপটে সংরক্ষণ করিনি।

فَلَا أَدْرِيْ يَعْنِيْ مَوْضِعَ الْإِشْعَارِ وَالتَّقْلِيْدِ أَوِ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ঃ এটা আলী বিন মাদীনীর উক্তি। অর্থাৎ, আলী বিন মাদীনী বলেন, আমার জানা নেই যে, আমার শায়েখ সুফিয়ান তাঁর উল্লিখিত উক্তির দ্বারা শুধু إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ-এর স্থান উদ্দেশ্য নিয়েছেন, নাকি পূর্ণ হাদীস। যদি إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ-এর স্থান উদ্দেশ্য নেন, তাহলে তার দু'ব্যাখ্যা হতে পারে। (১) সুফিয়ান তাঁর এ উক্তির দ্বারা إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ কে অস্বীকার করেছেন যে, ইমাম যুহরী থেকে এটা শ্রবণ করেছি কিনা, তা আমার স্মরণ নেই। অথচ তিনি ইতঃপূর্বে إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ এরই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষ বয়সে ভ্রমহেতু তিনি তা অস্বীকার করেন। (২) আমি আমার শায়েখ ইমাম যুহরী হতে এ কথাটি সংরক্ষণ করতে পারিনি যে, إِشْعَارٌ ও تَقْلِيْدٌ-এর স্থান কোন্‌টা! إِشْعَارٌ টা হাদীর ডান পার্শ্বে হবে না বাম পার্শ্বে! অর্থাৎ, إِشْعَارٌ-এর স্থান নির্ধারণের ব্যাপারে আমি আমার শায়েখ ইমাম যুহরী হতে কোন বর্ণনা শুনিনি, যা আমি তোমাকে বর্ণনা করব। এ ব্যাখ্যানুপাতে তিনি তার পূর্বের বর্ণনাকে অস্বীকার করছেন না। ফলে শেষ বয়সে তিনি ভ্রমের শিকার হয়েছেন—এ ধরনের জওয়াবের কোন প্রয়োজন হয় না। (লামিউদ্ দারারী ৩ ঃ ১৪৫)

لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحِلُّوْنَ بِهَا وَهُمْ عَلٰى طَمْعٍ أَنْ يَدْخُلُوْا مَكَّةَ

(সাহাবাগণ মক্কায় প্রবেশের আশাবাদী থাকায় রসূল তাদের কাছে প্রকাশ করেননি যে, তারা উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে) ঃ যেহেতু রসূল (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন যে, তারা মক্কায় প্রবেশ করত উমরা আদায় করবেন, সেহেতু রসূল (স.) সাহাবাদের নিকট এ কথা প্রকাশ করেন নি যে, তারা হুদায়বিয়ায় উমরা থেকে হালাল হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী এখানে এ কথাটি এজন্য বৃদ্ধি করেছেন, যাতে জানা যায় যে, কষ্টের কারণে ইহরামকে মুবাহ করার জন্য রসূল (স.) মস্তক মুণ্ডনের হুকুম দেন; অবরুদ্ধ হওয়ায় উমরা হতে হালাল হওয়ার জন্য নয়।

ثُمَّ أَصْبَحْنَا نَسْتَفِيْءُ سُهْمَانَهُمَا (অতঃপর আমরা তাদের দু'জনের অংশ চেয়ে প্রকাশ করলাম) ঃ উদ্দেশ্য হলো, মহিলাটির পিতা এবং ভাই এক দীর্ঘ সময় ধরে কেল্লা অবরোধ করে অতঃপর তা বিজয় করে। এতদসত্ত্বেও আমরা এ কেল্লা হতে গনীমতের মাল নিতাম। অথচ এটা ছিল তাদেরই হক।

www.e-ilm.weebly.com

এ বাক্য হতে হযরত উমরের (রযি.) উদ্দেশ্য ছিল ঐ ব্যক্তিকে এটা বলে দেয়া যে, অতিরিক্ত যা দিতে সে অস্বীকার করছে, ঐ মহিলা তার প্রাপক।

فَعَمِيَتْ عَلَيْنَا ঃ অর্থাৎ, বৃক্ষটি আমাদের কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট হয়ে যায়। আমরা চিনতে পারিনি। আল্লামা কিরমানী বলেন, গাছটির নীচে কল্যাণ ও বরকত ধারা অবতীর্ণ হত। গাছটি বেঁচে থাকলে অজ্ঞদের সম্মান প্রদর্শন ও তার পূজা করার সমূহ আশংকা থাকায় মানুষদেরকে ফেতনা থেকে বাঁচাতে গাছটি গুম করে দেয়া হয়। আর এ কাজটি নিঃসন্দেহে বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতই ছিল।

প্রকাশ থাকে যে, ইবনে সা'দ নির্ভরযোগ্য সূত্রে হযরত নাফে' থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমরের (রযি.) কাছে যখন এ মর্মে সংবাদ পৌঁছে যে, মানুষ উক্ত গাছের কাছে গিয়ে নামায পড়ে, সম্মান প্রদর্শন করে; তখন তিনি মানুষদেরকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন এবং ঐ গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। অতঃপর গাছটি কেটে ফেলা হয়।

اَلْاِسْتِبْرَاكُ بِاٰثَارِ الصَّالِحِيْنَ

নেককারদের কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে বরকত হাসিল

নেককারদের পদাঙ্ক বা কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে বরকত হাসিল করা একটি বৈধ ও শরীয়ত অনুমোদিত কাজ। শুধু তা-ই নয়, এটা ভাগ্যেরও ব্যাপার বটে। কিন্তু কতক উলামা এ বিষয়টিকে বেদআত ও শরীয়ত বহির্ভূত বলে দাবী করেন। তাঁরা হযরত উমর (রযি.) কর্তৃক বৃক্ষ কর্তনের বর্ণনাকে নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন। তবে এ বর্ণনা দ্বারা তাদের দলীল প্রদান করা যথাযথ নয়।

আলোচ্য বিষয়ের বৈধতার উপর লামিউদ্ দারারী ও ফতহুল মুলহিমে যে সমস্ত দলীল উল্লিখিত হয়েছে আমরা তা এখানে পেশ করছি—

(১) ইমাম বুখারীর এক শিরোনাম "بَابُ الْمَسَاجِدِ الَّتِىْ عَلٰى طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ" আম্বিয়া ও নেককারদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বরকত হাসিলের বৈধতা বুখারীর এ শিরোনাম প্রমাণ করে। লামিউদ্ দারারী প্রণেতা তাঁর উক্তি لِيَتَبَرَّكَ بِالصَّلٰوةِ وَالدُّعَاءِ فِيْهَا অর্থাৎ, "মসজিদে দোয়া ও নামাযের মাধ্যমে বরকত হাসিল করতে" দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

(২) হযরত ইবনে উমর (রযি.) ঐ সকল স্থান হতে বরকত হাসিল করতেন। আর এ অনুসরণের ব্যাপারে তার দৃঢ়তার কথা সুপ্রসিদ্ধ।

(৩) উতবানের হাদীসে এসেছে যে, তিনি হুযূরের নামাযের স্থানটি তার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করবেন বলে রসূল (স.)-কে তাঁর বাড়ীতে নামায পড়ার অনুরোধ জানালে রসূল তাঁর অনুরোধ রাখেন।

(৪) আইনী বলেন, একাধিক রাবী বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) 'বাতনে রওহা' নামক স্থানে পৌঁছে বলেন, এটা জান্নাতের একটি উপত্যকা। এখানে ৭০ জন নবী নামায পড়েছেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৫) সফিয়্যাহ্ বিনতে নাযদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু মাহজুরার মাথার অগ্রভাগের চুল না কাটার পিছনে এক মজার ঘটনা রয়েছে। একদা হযরত আবু মাহজুরা (রযি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এ চুল কেন কাটেন না বা মুণ্ডান না? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, রসূল (স.) নিজ হাতে যে চুল স্পর্শ করেছেন আমি তা মুণ্ডাব না।

(৬) আবু দাউদে[১] ইয়াজিদ বিন শায়বান থেকে বর্ণিত আছে। রসূল (স.) কফ (কাশি) ফেললেই সাহাবারা কেউ না কেউ তা হাতে নিয়ে আপন মুখে ও শরীরে মালিশ করতেন।

(৭) বুখারীতে আছে, সাহাবায়ে কেরাম রসূল (স.)-এর ওজুর পানি (যা শরীর থেকে পড়ত) নিতে জোর প্রতিযোগিতা করতেন।

(৮) প্রসিদ্ধ আছে যে, নবী (স.) বিদায় হজ্জে তার চুল বণ্টন করে দেন।

(৯) বুখারী শরীফে হযরত ইবনে সীরীনের উক্তি আছে যে, আমি উবায়দাকে বললাম, আমাদের কাছে নবী করীম (স.) এর চুল আছে। আমরা তা হযরত আনাস (রযি.) থেকে লাভ করেছি। এরপর তিনি বলেন, নবী (স.)-এর একটি চুল আমার কাছে থাকা দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কিছু থেকে আমার কাছে অধিক প্রিয়।

(১০) বুখারী শরীফে আছে, উম্মে সালমার (রযি.) কাছে নবী (স.)-এর একটি চুল ছিল। কারো চোখ লাগলে বা অন্য কিছু লাগলে তিনি ঐ চুল ভিজানো পানি দিতেন। আর সে তা পান করত।

আর গাছ কর্তন কাহিনীর জওয়াব হলো। হযরত উমর (রযি.) যে গাছ কর্তন করিয়েছিলেন তা বাইয়াতেরই গাছ ছিল না। ফলে এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যাবে না। ঐ গাছটি বাইয়াতের গাছ না হওয়ার দলীল হলো, খামীস গ্রন্থে আছে, মানুষেরা ঐ গাছের অবস্থান ভুলে যাওয়ার পর একদা উমর (রযি.) উক্ত স্থান অতিক্রমকালে জিজ্ঞাসা করেন যে, গাছটি যেন কোথায় ছিল? কেউ বলল এখানে, কেউ বলল ওখানে। এভাবে বিভিন্ন মতামত আসতে থাকলে তিনি বলেন, বুঝেছি; গাছ অর্থাৎ, তার অবস্থানের স্থল মানুষের স্মৃতিপট হতে মুছে গেছে।

(লামিউদ্ দারারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১)

মুফাসসির ও মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি হযরত শায়েখ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) বলেন, আল্লামা নববী বলেন, এ হাদীস থেকে তিনটি বিষয় জানা যায়। (১) নেককারদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বরকতার্জন (২) তারা যেখানে নামায পড়েছেন সেখানে নামায পড়া ও (৩) তাদের থেকে বরকতের বিষয় তালাশ করা।

টীকা ঃ ১. আবু দাউদ শরীফ ঃ ইমাম আবু দাউদ (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। তিনি ২৭৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা উসমানী বলেন, হযরত ইবনে উমর (রযি.) রসূল (স.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন এবং রসূল (স.)-এর নামাযের স্থানে নামায পড়তেন। আর এটা বর্ণিত আছে খোদ বুখারীর الْمَسْجِدُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ অধ্যায়ে।

মেরাজের কোন কোন হাদীসে আছে যে, সে রাতে জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-কে কয়েকটি স্থানে নেমে নামায আদায় করতে বলেন। (১) ইয়াসরিব (মদীনা) যেখানে তাঁর হিজরত হবে (২) সীনা পর্বতে, যেখানে আল্লাহ্ মূসার (আ.) সাথে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করেন (৩) শুয়াইব (আ.)-এর বাসভবন ও মূসা (আ.)-এর অবস্থানস্থল 'মাদায়েনে' (৪) ঈসা (আ.)-এর জন্মভূমিতে। এ সমস্ত হাদীস অতির নমুক্ত অবস্থায় নেককারদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে বরকত হাসিলের অনুমোদনের প্রতি সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। তিনি আরো বলেন, ১৩৪৪ হিজরীতে ইসলামী বিশ্বের উমরাস্থল মক্কায় গেলে সৌদী সরকার সুলতান আব্দুল আজিজ বিন ফয়সাল এবং সেখানকার গ্রান্ড ও প্রখ্যাত আলেম আব্দুল্লাহ্ বিন বালহীদের সাথে এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম এবং 'এভাবে বরকত অর্জন করা বেদআত ও শরীয়ত অসমর্থিত' সম্বলিত তাদের উক্তি খণ্ডনের উপর প্রমাণবহ এ সমস্ত হাদীস পেশ করলাম। কিন্তু তারা ইবনে সা'দ রচিত তবকাত গ্রন্থে হযরত উমরের সূত্রে নাফে' থেকে বর্ণিত গাছ কর্তনের ঘটনা দ্বারা 'পরস্পর বিরোধ' দেখানো ছাড়া কোন উপযুক্ত ও সন্তোষজনক জওয়াব দেননি। অথচ গাছ কর্তনের বর্ণনাটি বিচ্ছিন্ন একটি বর্ণনা বৈ নয়। কারণ, নাফে' হযরত উমরের সাক্ষাৎ পাননি। আর এটা রসূল (স.)-এর হাদীসও নয়; বরং তা উমর (রযি.) এর গবেষণালব্ধ (اِجْتِهَادْ) মাত্র। তদুপরি এটা কোন মাসআলা বর্ণনা ছিল না; বরং শিরকের সম্ভাব্য পথ রুদ্ধ করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। (ফাতহুল মুলহিম, লামিউদ্ দারারী)

هَنِيْئًا مَّرِيْئًا فَمَا لَنَا (পরম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি তো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি আছে?) ঃ সাহাবায়ে কেরাম রসূল (স.) থেকে যখন জানতে পারেন যে, إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا এর দ্বারা উদ্দেশ্য হুদায়বিয়ার সন্ধি, তখন তারা নিবেদন করেন যে, আপনার প্রাপ্ত আল্লাহ্ প্রদত্ত এ সমস্ত নেয়ামত (পুরস্কার) খুবই তৃপ্তির, সন্তোষজনক। কিন্তু এতে আমাদের জন্য কি আছে? এ সময় আল্লাহ্ নাযিল করেন॥ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ الخ অর্থাৎ, (তাদের জন্য এটা রয়েছে যে) মুমিন নর-নারীকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

প্রকাশ থাকে যে, কোন সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে কোন স্থান বিজয় হলে সরকারের পক্ষ হতে কমান্ডারকে পুরস্কৃত করা হয়। তদ্রূপ যখন রসূল (স.)-এর কমান্ডে হুদায়বিয়ার সন্ধির মত সুস্পষ্ট বিজয় অর্জিত হল তখন আল্লাহ্ রসূল (স.)-কে চার পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। (১) ক্ষমা (২) ব্যাপক কল্যাণ (৩) হেদায়েত ও (৪) আল্লাহ্র সাহায্য। (শাব্বীর আহমদ উসমানী প্রণীত ফাওয়ায়িদুল কুরআন)

www.e-ilm.weebly.com

هَلْ يَنْقُضُ الْوِتْرَ (বেতের নামায বাতিল করা যায়?) ঃ অর্থাৎ, যদি কেউ ঘুমানোর পূর্বে বেতেরের নামায পড়ে এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে আবার তাহাজ্জুদ ইত্যাদি পড়ে, তবে নবী (স.)-এর উক্তি ঃ اِجْعَلُوا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا অর্থাৎ, তোমরা রাতের শেষ নামায বেতের পড়বে-হেতু আবার বেতেরের নামায পড়তে হবে?

فَلَا تُوتِرُ مِنْ اٰخِرِهٖ (তবে শেষ রাতে আর বেতের পড়বে না) ঃ আহনাফ, শাফেয়ী ও মালেকীদের সর্ববাদী মত এটাই।

ثَبَّتَنِىْ مَعْمَرٌ (মা'মার আমাকে সুদৃঢ় করেছেন) ঃ অর্থাৎ, সুফিয়ান বিন উয়ায়না বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমি ইমাম যুহরী থেকে যা কিছু শুনেছি, মা'মার তা আরো সুদৃঢ় করেছেন।

بَعَثَ عَيْنًا لَهٗ (রসূল তাঁর গুপ্তচর পাঠালেন) ঃ রসূল (স.) মদীনা হতে রওনা হয়ে সংবাদ পান যে, মক্কার মুশরিকরা তার বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে। তিনি অবস্থা যাচাইয়ের জন্য ইয়াছার বিন সুফিয়ান খুযায়ী নামে এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে প্রেরণ করেন। (লামিউদ্ দারারী)

أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلٰى عِيَالِهِمْ وَذَرَارِىِّ هٰؤُلَاءِ ঃ অর্থাৎ, তখন রসূল (স.) সাহাবীদের রায় জানতে চান যে, এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি? আমরা এখন মক্কার কুরাইশদের প্রতি মনোযোগ দেব না, আপাতত তাদের ছেড়ে প্রথমে যে সমস্ত কাফের নিজেদের পরিবার-পরিজন রেখে কুরাইশদের সাহায্য করতে বিভিন্ন এলাকা হতে মক্কায় এসেছে-তাদের পরিবার-পরিজনের প্রতি মনোযোগ দিব? আমরা যদি প্রথমে তাদের বস্তিতে হামলা করি এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে গ্রেপ্তার করি, তবে হয়ত কাফেররা তাদের পরিবার-পরিজন রক্ষার্থে মক্কা ছেড়ে নিজেদের এলাকায় ফিরে আসবে এবং আমাদের অনুগত হয়ে যাবে। অথবা এরূপ করবে না অর্থাৎ, তারা ফিরে আসবে না। প্রথম পরিকল্পনা মত কাজ করলে তখন মক্কাবাসীদের অবস্থা জানার জন্য মক্কা হতে আগত দলই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কার্যকর করা হলে, আমরা তাদের পরিবার-পরিজনের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে গ্রেপ্তার করব এবং তাদের মাল-সম্পদ ছিনিয়ে নেব। (লামিউদ্ দারারী)

كَانَ اللّٰهُ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ঃ এ বাক্যের দু'অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (১) عَيْن অর্থ গুপ্তচর। এ অর্থের ভিত্তিতে পুনরায় দু' উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। ক. আমাদের প্রেরিত গুপ্তচরকে আল্লাহ্ মুশরিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন। কারণ গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য এ সূত্রে আমাদের হাতে আসেনি। যেন তাদের নিকট আমরা প্রেরণই করিনি। খ. যদি কাফেররা তাদের পরিবার-পরিজনে ফিরে আসে, তবে কাফেরদের সমবেত হওয়ার অবস্থা জানার জন্য আমাদের মক্কায় গুপ্তচর পাঠানোর কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ মক্কায় কুরাইশ ব্যতীত আর কেউ নেই। সুতরাং তাদের অবস্থান আমরা অতি সহজেই আন্দাজ করতে পারি। (লামিউদ্ দারারী)

www.e-ilm.weebly.com

(২) عَيْن অর্থ কামুসের বর্ণনানুযায়ী 'দল'। এ অর্থ নিলে উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন এলাকা হতে কাফেররা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে আসবে তখন আল্লাহ্ মুশরিকদের দলকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। কারণ, তখন তাদের লোকসংখ্যা কমে যাবে, ফলে অতি সহজে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

লামিউদ্ দারারী প্রণেতা বলেন, আমার মতে এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই হবে। অর্থাৎ, عَيْن অর্থ দল। আর عَيْن অর্থ দলও হয়। যেমন কামুস অভিধানে এ অর্থ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় عَيْن-এর পরিবর্তে আগত عُنُقًا শব্দটি আমাদের এ অর্থকে সমর্থন করে। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৬)

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ خَرَجْتُ عَامِدًا لِهٰذَا الْبَيْتِ (আবু বকর বলেন, আল্লাহ্র রসূল! আমি এ ঘরের তওয়াফ করার আশা করে রওনা দিয়েছি) ঃ অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রযি.) এ মতকে সমর্থন করেননি। কারণ তখন উমরা ভঙ্গ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ মুসলমানরা মদীনা হতে উমরার নিয়তে রওনা দিয়েছিলেন এবং মানুষের মাঝে এটাই প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব যদি এখন তারা কাফেরদের হত্যায় লিপ্ত হয় তবে তা এক ধরনের ধোঁকা হবে। সে জন্য হযরত আবু বকর এ প্রস্তাব (অর্থাৎ, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ) সমর্থন করেননি।

(লামিউদ্ দারারী)

حَتّٰى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْمُؤْمِنَاتِ مَا أَنْزَلَ يَعْنِىْ قَوْلَهُ تَعَالٰى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ الخ (অনন্তর আল্লাহ্ মু'মিন নারীদের প্রসঙ্গে يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمْ আয়াত অবতীর্ণ করেন) ঃ আল্লামা কিরমানী বলেন, এ আয়াতটি এ কথা জানিয়ে দিতে অবতীর্ণ হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কা থেকে আগত লোকদের প্রত্যার্পণের যে শর্তটি সংযোজিত হয়েছে তা কেবল পুরুষদের বেলায় প্রযোজ্য; মহিলাদের ক্ষেত্রে নয়। কারণ তারা এ শর্তের অন্তর্গত ছিল না।

وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيْرٍ ঃ আবু বছীরের ঘটনা হলো, সে হুদায়বিয়া সন্ধির পূর্বে মুসলমান হয় এবং পালিয়ে মদীনায় আসে। কুরাইশরা তাকে ফেরত নিয়ে যাবার জন্য বনূ আমেরের জনৈক ব্যক্তি ও তার গোলামকে রসূল (স.)-এর নিকট প্রেরণ করে। চুক্তি অনুযায়ী রসূল (স.) আবু বছীরকে ফেরত দেন। আবু বছীর বললেন, আল্লাহ্র রসূল আমাকে শত্রুর হস্তে সোপর্দ করছেন? রসূল (স.) বলেন, আল্লাহ্ তোমার ও মক্কাস্থ সকল অসহায়দের ব্যাপারে শীঘ্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। আপাতত তুমি স্বগোত্রে ফিরে যাও। জুল হুলায়ফা পর্যন্ত গিয়ে সে আমেরীকে খোদ তারই তলোয়ার দ্বারা হত্যা করে এবং ফেরার হয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা 'আঈসে' চলে যায়। আবু জানদালও তথায় যান। বর্ণনামতে প্রকাশ, মক্কার ৭০ জন অসহায় মুসলমান সেখানে সমবেত হন। (আসাহহুস সিয়ার ২২৬)

www.e-ilm.weebly.com

كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : অর্থাৎ, যেরূপভাবে আমরা হুদায়বিয়ায় রসূলের (স.) সাথে করেছিলাম অর্থাৎ, কুরবানীর জন্তু জবেহ্ করে এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহ্রাম ভঙ্গ করেছিলাম, ঠিক তদ্রূপ এখানেও যদি ঐ অবস্থার সম্মুখীন হই অর্থাৎ, মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেয়া হয়, তবে আমরা এখানেও ঐরূপ করব।

أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِىْ (আমি উমরার সাথে হজও আবশ্যক করেছি) : আল্লামা আইনী বলেন, এ অংশে إِدْخَالُ الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ 'উমরা করতে করতে হজ্বের নিয়ত' করার বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, উমরা করতে করতে হজ্বের নিয়ত করার বৈধতায় উলামায়ে কেরাম সবাই একমত। অবশ্য এর বিপরীত পন্থা إِدْخَالُ الْعُمْرَةِ عَلَى الْحَجِّ অর্থাৎ, হজ্জ পালন করতে করতে মাঝে উমরা পালনের নিয়ত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ীর পূর্বমতে এটা জায়েয। আর অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তথা ইমাম মালেক (রহ.) এটা নিষেধ করেন। তাঁরা নবী করীম (স.)-এর কার্যের প্রসঙ্গে বলেন যে, এটা কেবল রসূল (স.)-এর বৈশিষ্ট্য। আমরা (আহনাফ) প্রত্যুত্তরে বলি, বৈশিষ্ট্যের দাবীর জন্য দলীল প্রয়োজন।

فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا (রসূল একবার তওয়াফ করেন) : এ হাদীস আইম্মায়ে ছালাছার সমর্থক। কারণ তাঁরা দাবী করেন যে, হজ্জে কিরানের জন্য একবার তওয়াফ ও একবার সায়ী করা যথেষ্ট। তবে আহনাফের মতে যথেষ্ট নয়; বরং দুই তাওয়াফ ও দুই সায়ীর প্রয়োজন। আহনাফের প্রমাণ প্রসিদ্ধ হাদীস বুখারী প্রথম খণ্ডের ২১১, ২২১ ও ২২২ পৃষ্ঠায় এবং বুখারী ২য় খণ্ডের ৬০১ নম্বর পৃষ্ঠার পার্শ্বটীকায় উল্লেখ রয়েছে।

আহনাফ এ হাদীসের জওয়াব দেন যে, (১) এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো রসূল (স.) হজ্ব ও উমরা উভয়ের জন্য এক একবার (মোট দু'বার) তওয়াফ করেছেন। (২) কেউ কেউ জওয়াব দেন যে, এটা কতক সাহাবার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। (৩) আবার কেউ এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, রসূল (স.) মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের জন্য একবার তওয়াফ করেন। (এখানে সে তওয়াফের কথাই ব্যক্ত হয়েছে)।

أَرْسَلَ عَبْدَ اللّٰهِ إِلَى فَرَسٍ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : হযরত উমর (রযি.) এক আনসারী ব্যক্তির (যিনি সেনা ছাউনীর এক প্রান্তে অবস্থান করতেন) কাছে রক্ষিত তাঁর একটি অশ্ব আনার জন্য স্বীয় পুত্র আব্দুল্লাহকে প্রেরণ করেন। এ বর্ণনাটি তার পূর্ব বর্ণনার খেলাপ নয়, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রযি.) একটি গাছের নীচে রসূল (স.)-কে ঘিরে বহু লোকজন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মূল ঘটনা জানতে আব্দুল্লাহকে তথায় প্রেরণ করেন। কারণ, হতে পারে হযরত উমর (রযি.) উভয় কাজের জন্য তাঁকে প্রেরণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ (এটা ঐ ঘটনা, যা মানুষ বর্ণনা করত) ঃ মানুষেরা যখন শুনল যে, ইবনে উমর তাঁর পিতার পূর্বে রাসূলের হাতে বাইয়াত হয়েছেন, আর সাধারণত মানুষেরা বাইয়াত বলতে ইসলামের উপর বাইয়াত বুঝত, তাই মক্কায় হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি সাদের জানা ছিল না। তারা বলত, ইবনে উমর তার পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ (কেউ রসূলকে কোন রকম কষ্ট দেয়নি) ঃ আল্লামা আইনী বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফার কারণে এ হাদীস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, তিনি হুদায়বিয়ার গাছতলায় যারা বাইয়াত হয়েছিলেন তাদের মধ্যেও ছিলেন, আবার উমরাতুল কাযা আদায়ের সময়ও তিনি রসূল (স.) এর সাথে ছিলেন।

أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ ঃ লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে যে, এ বাক্যটি সংক্ষিপ্ত আকারে এসেছে। পুরো ভাষ্য হল, أَتَيْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَبَيَّنَ لَنَا مَا جَرَى لَهُ وَلِأَصْحَابِهِ وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا ذُكِرَ أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِ عَلِيٍّ الَّذِينَ كَانُوا يَأْبَوْنَ الصُّلْحَ وَيُحِبُّونَ الْقِتَالَ وَيَحُضُّونَ عَلَيْهِ اتَّهِمُوا الرَّأْيَ অর্থাৎ, আবু ওয়ায়েল ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমরা সাহলের কাছে সিফফিন যুদ্ধের খবর জানতে চাইলে তিনি আমাদেরকে তার ও তার সাথীর মাঝে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করেন। আর তার সার-সংক্ষেপ হলো, তিনি (সাহল বিন হুনাইফ) হযরত আলীর (রযি.) যে সকল সমর্থক সন্ধি অস্বীকার করত যুদ্ধ করতে চায় এবং এ ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করত তাদেরকে বলেন, তোমরা (নিজেদের) রায়কে ভুল বলে মেনে নাও (কারণ তা সঠিক নয়)।

ইমাম আহমদ (রহ.) তার মুসনাদে হযরত আবু ওয়েলের উক্তি এভাবে ধারণ করেন যে, আমরা সিফফিন যুদ্ধে ছিলাম। যখন সিরিয়াবাসীদের প্রতি যুদ্ধ মারাত্মক রূপ নিল, তখন তারা পালিয়ে টিলার উপর আশ্রয় নিল। এ সময় হযরত আমর বিন আস (রযি.) হযরত মুয়াবিয়াকে (রযি.) পরামর্শ দিলেন যে, হযরত আলী (রযি.) এর কাছে কুরআন শরীফ প্রেরণ করা হোক এবং তাঁকে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি আহ্বান করা হোক। হযরত আলী (রযি.) কখনই এতে অস্বীকার করবেন না। হযরত আলীর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللّٰهِ অর্থাৎ, আমাদের ও আপনাদের মাঝে এ কুরআনই ফায়সালা করবে। অনন্তর সে আয়াত তেলাওয়াত করল— أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ অর্থাৎ, আপনি কিতাবপ্রাপ্তদের প্রতি লক্ষ্য করেন না, যাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের দিকে আহ্বান করা হয়, আপনি তাদের মাঝে ফায়সালা করবেন বলে।

www.e-ilm.weebly.com

তখন হযরত আলী বললেন, ঠিক আছে, আমাদের ও তোমাদের মাঝে আল্লাহ্র কিতাবই ফায়সালা করবে। এ সময় খারেজীরা কাঁধে তলোয়ার নিয়ে এসে বলল, আমিরুল মু'মিনীন! যারা টিলায় আশ্রয় নিয়েছে আমরা তাদের সাথে নিজেদের তলোয়ার দিয়ে ততক্ষণ যুদ্ধ করব, যতক্ষণ আল্লাহ্ আমাদের ও তাদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা না করেন। এ শুনে সাহল বিন হুনাইফ তাদের সম্বোধন করে বলেন, তোমরা যে কুরআনিক ফায়সালাকে খারাপ মনে করছ এবং আমার প্রতি যুদ্ধ না করার অপবাদ দিচ্ছ, এটা সঠিক নয়; বরং তোমরা যে নিজেদের রায় মত চলছ এটাকে অভিযুক্ত কর এবং নিজেদের রায় ত্রুটি বলে মেনে নাও। আমার প্রতি যুদ্ধ না করার অপবাদ দিও না। কারণ যেমন আমি হুদায়বিয়ার দিন যুদ্ধে ভীত এবং অবহেলাকারী ছিলাম না তদ্রূপ আজও যুদ্ধে ভীত কিংবা তাতে ত্রুটি ও অবহেলাকারী নই।

কিন্তু যেরূপভাবে কেবল রসূল (স.)-এর হুকুমের খেলাপ করা হবে বলে হুদায়বিয়ার দিন যুদ্ধ হতে বিরত ছিলাম, তদ্রূপ সিফফিনেও মুসলমানদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে বিরত রয়েছি। কারণ, হুদায়বিয়ায় আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সন্ধি কল্যাণ থেকে খালী নয়। হুদায়বিয়ায় আমরা সকলে লড়তে চেয়েছিলাম এবং তাতেই কল্যাণ দেখেছিলাম। কিন্তু রসূল (স.)-এর রায় ছিল এর বিপরীত। তবে পরিশেষে হুযূরের রায় অনুযায়ী সন্ধি থেকেই কল্যাণ ধারা প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন সেখানে মুশরিকদের সাথে সন্ধিতে কল্যাণ লাভ হয়, তবে এখানে তো মুসলমান মুসলমানের প্রতিপক্ষ, মুসলমানের হাতে মুসলমান মারা যাচ্ছে। তাহলে এখানে সন্ধি কল্যাণকর হবে না কেন? অতএব তোমরা মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে বলে যে অভিপ্রায় নিয়েছো এটা তোমাদের ভুল সিদ্ধান্ত। তোমরা নিজেদের রায়কে ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ মেনে নাও, আমাকে অবিবেচক প্রতিপন্ন করো না। (লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১২, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮)

فَلَقَدْ رَأَيْتُنِىْ يَوْمَ أَبِىْ جَنْدَلٍ (অবশ্যই আমি আবু জানদালে [হুদায়বিয়ার দিন] উপস্থিত ছিলাম) ঃ আবু জানদালের নাম আল-আস বিন সুহাইল। আবু জানদালের দিন দ্বারা উদ্দেশ্য হুদায়বিয়ার দিন। হুদায়বিয়ার দিনকে আবু জানদালের দিন বলার কারণ হলো, আবু জানদাল মক্কায় মুসলমান হলে মক্কাস্থ অন্যান্য অসহায়-দুর্বল মুসলমানদের মত তাকেও অত্যাচার-নিপীড়ন প্রশিক্ষণের ব্লাকবোর্ড বানানো হয়। তারা তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিল। সুযোগ পেয়ে হুদায়বিয়ার দিন তিনি অতি কৌশলে রসূল (স.)-এর কাছে পৌঁছান। সন্ধিপত্রে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর হয়ে যাবার পর আবু জানদালের পিতা সাহল বিন আমর রসূল (স.)-এর কাছে এসে বলে যে, চুক্তি অনুযায়ী আপনি আবু জানদালকে ফেরত দিয়ে যান। রসূল (স.) আবু যানদালকে তার পিতার হাতে সমর্পণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

হুদায়বিয়ার দিন যে সমস্ত বিষয়ে মুসলমানরা অত্যন্ত কষ্ট ও আঘাতপ্রাপ্ত হন তন্মধ্যে আবু জানদালকে তার পিতার নিকট অর্পণ করা ছিল অন্যতম। সেজন্য হুদায়বিয়ার দিনকে আবু জানদালের দিন বলা হয়।

وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَا بِنَا إِلٰى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هٰذَا الْأَمْرِ ঃ হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে যুদ্ধের বিস্তার এবং মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহত বিপর্যয়ের কারণ হলো, পূর্বে আমরা যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়ে তা হতে পরিত্রাণের জন্য কাঁধে তলোয়ার নিতাম, তখন তা আমাদের সহজ-সরলতার দিকে নিয়ে যেত এবং বিষয়টি আমাদের উপর সহজতর হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানের ঘটনাটি আমাদের উপর এমন কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তার কোন সমাধান বের হচ্ছে না।

مَا نَسُدُّ مِنْهَا خُصْمًا إِلَّا انْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصْمٌ ঃ অর্থাৎ, আমার এক বিপর্যয়ের প্রতিবিধান করলে অন্য বিপর্যয় দেখা দিচ্ছে। এক ছিদ্র বন্ধ করছি তো দ্বিতীয় ছিদ্র প্রকাশ পাচ্ছে। অথবা এটা উদ্দেশ্য যে, এক ফেতনার মোকাবেলা করতে না করতে অন্য ফেতনা প্রকাশ পাচ্ছে।

আল্লামা আইনী বলেন, শিরোনামের সাথে এ হাদীসের সম্পর্ক فَلَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ বাক্যের দিক দিয়ে। কারণ, আবু জানদালকে ফেরত দানের ঘটনা হুদায়বিয়ার দিনই ঘটে।

بَابُ قِصَّةِ عُكْلٍ وَ عُرَيْنَةَ

উক্‌ল্ ও উরায়নার ঘটনা

إِنَّ نَاسًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ ঃ (উক্‌ল্ ও উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনায় এল) ঃ 'উক্‌ল্' ও 'উরায়না' দুটি গোত্রের নাম। আগতদের মধ্যে উরায়নার চারজন আর উকলের তিনজন মোট সাতজন লোক ছিল। তারা জি-করাদ যুদ্ধের পর ৬ষ্ঠ হিজরীর জুমাদাস সানীতে মদীনায় এসেছিল।

(হাশিয়ায়ে আশফাকিয়া)

وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِيْنَةَ ঃ অর্থাৎ, মদীনার আবহাওয়া তাদের অনোপযোগী হলো। কারণ তারা গোয়ালী (দুধ ব্যবসায়ী) ছিল; কৃষিজীবী ছিল না। তাই গম ও যবের রুটি খেয়ে তাদের পেট ফুলে যায়। তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا (তারা উটের দুধ ও পেশাব পান করে) ঃ এ হাদীসকে দলীলরূপে গ্রহণ করে ইমাম আহমাদ, মালেক এবং আসহাবে জাহেরী বলেন, ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর পেশাব পাক। তবে অন্যান্য ইমাম নাপাক বলেন। তারা এ হাদীসকে 'রহিত' বলে দাবী করেন।

আল্লামা আইনী বলেন, রসূল (স.) তাদের রোগ নিরাময় সম্পর্কে ওহী মারফৎ অবগত হন। আর রোগমুক্তির গ্যারান্টি থাকলে তখন হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা

www.e-ilm.weebly.com

গ্রহণ বৈধ। যেরূপভাবে ক্ষুধায় চরম অস্থির অবস্থায় মরা খাওয়া এবং তৃষ্ণাকাতর অবস্থায় শরাব পান করা বৈধ। তাই এ ব্যাখ্যানুপাতে হাদীসকে মানসুখ (রহিত) বলার প্রয়োজন হয় না।

قَوْلُهُ وَقَتَلُوْا رَاعِىَ النَّبِيِّ ﷺ (তারা নবীর রাখালকে হত্যা করল) ঃ রসূল (স.)-এর উক্ত রাখালের নাম ছিল ইয়ামার। তিনি রসূল (স.)-এর গোলাম ছিলেন। বনূ ছা'লাবা যুদ্ধে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। একবার রসূল (স.) তাকে অতি উত্তমরূপে নামায পড়তে দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাকে আযাদ করে দেন। রসূল (স.) তাকে হাররা নামক স্থানে উট চরানো ও তা দেখাশুনা করার কাজে নিযুক্ত করেন।

قَوْلُهُ فَسَمَّرُوْا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمْ (সাহাবারা তাদের চোখ ফুটো করে এবং হাত কেটে ছিল) ঃ (খুনের বদলা (কিসাস) হিসেবে তাদের এ শাস্তি দেয়া হয়। কারণ, তারা উট চুরি করে নিয়ে যাবার সময় রাখালের হাত-পা কেটে দেয়। চোখ ও জিহ্বায় কাঁটা ফুটিয়ে দেয় এবং অঙ্গচ্ছেদন করে। মুসলমান হওয়ার পরে তারা মুরতাদ হয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

قَوْلُهُ مَا تَقُوْلُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْقَسَامَةِ (এ হলফের ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?) ঃ অভিধানে قَسَامَة অর্থ اَلْإِقْسَام তথা হলফ করানো। শরীয়তের পরিভাষায় ঐ শপথকে قَسَامَة বলা হয়, যা জখম, প্রহার অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার নিদর্শন সম্বলিত নিহত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার এলাকার (সন্দেহভাজন) ৫০ জন থেকে নেয়া হয়। নিহতের অভিভাবক এ ৫০ জন নির্বাচন করেন।

(হেদায়া ও তার পার্শ্বটিকা ৪ ঃ ৬২৪)

হলফদান প্রসঙ্গে ইমামদের অভিমত

আহনাফের অভিমত হলো, কোন এলাকায় যদি কারো লাশ উদ্ধার হয় আর ঘাতক অজ্ঞাত থাকে, এমতাবস্থায় নিহতের অভিভাবক যদি কোন ব্যক্তি বা কোন দলের বিরুদ্ধে হত্যার দাবী করে, তবে অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ অর্থাৎ, 'বাদীর দায়িত্ব প্রমাণ পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।' নবীজী (স.)-এর এ উক্তি মোতাবেক সে তার দাবীর স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করবে। যদি উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে পারে তাহলে কিসাস নেয়া হবে।

পক্ষান্তরে বাদী (অভিভাবক) যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তাহলে এলাকার সন্দেহভাজন ৫০ জন এ মর্মে শপথ দেবে যে, "আমরা তাকে হত্যা করিনি আর খুনী সম্পর্কে কিছু জানি না।" যদি তারা শপথ দেয় অথবা শপথ দিতে অস্বীকার করে, তাহলে উভয় অবস্থায় রক্তপণ ওয়াজিব হবে। সকল বর্ণনার আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়।

www.e-ilm.weebly.com

পক্ষান্তরে আইম্মায়ে ছালাছার অভিমত হলো, বাদী দাবী করা অবস্থায় যদি ঘটনাস্থলে এমন আলামত মেলে, যা বাদীর দাবীর সত্যতা প্রমাণ করে। যেমন বিবাদীর রক্তমাখা তলোয়ার ইত্যাদি-তাহলে বাদী পক্ষকে শপথ দিতে বলা হবে। যদি তারা শপথ দেয়, তাহলে ইমাম শাফেয়ীর মতে বিবাদীর উপর রক্তপণ আসবে। চাই সে হত্যা ঠাণ্ডা মাথায় হোক বা ভ্রমজনিত হোক। ইমাম মালেক ও আহমাদের মতে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার কারণে কিসাস আর ভ্রমজনিত হত্যার কারণে রক্তপণ (দিয়াত) ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে বাদীরা যদি শপথ না দেয়, তবে বিবাদীদের শপথ দিতে বলা হবে। যদি তারা শপথ দেয়, তবে তারা কিসাস ও দিয়াত থেকে পরিত্রাণ পাবে। আর শপথ না দিলে দিয়াত ওয়াজিব হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আহনাফের নিকট আলামত লাভের কোন ধর্তব্য নেই।

(হেদায়া ঃ কসামা অধ্যায়-৬৩৪, লামিউদ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮)

قَوْلُهُ قَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ (আপনার পূর্ব খলীফাগণ এভাবে ফায়সালা) দেন ঃ এখানে خُلَفَاء বলতে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের মত খলীফা উদ্দেশ্য। কারণ, রসূল (স.) কিংবা খোলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে কেউ শপথের মাধ্যমে কিসাস গ্রহণের হুকুম দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ মেলে না। অবশ্য খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এ হুকুম দিয়েছিলেন। বস্তুত এ কারণেই হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) পরামর্শের মুখাপেক্ষী হন।

قَوْلُهُ وَأَبُوْ قِلَابَةَ خَلْفَ سَرِيْرِهِ (আবু কিলাবা তার আসনের পশ্চাতে ছিলেন) ঃ তাফসীর পর্বে ৬৬৩ পৃষ্ঠায় আছে, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) আবু কিলাবার কাছে জানতে চাইলেন, আবু কিলাবা! (এ প্রসঙ্গে) তোমার অভিমত কি? তিনি জওয়াব দিলেন, তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে হত্যা করা ইসলামে বৈধ আছে বলে আমার জানা নেই॥(১) বিবাহের পর ব্যভিচারকারী (২) অন্যায়পূর্বক কাউকে হত্যাকারী ও (৩) আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

মোটকথা, যখন আবু কিলাবা হত্যা বৈধতার কারণ তিনটিতে সীমাবদ্ধতার কথা ব্যক্ত করল আর তার মধ্যে শপথ নেই, তখন ফলাফল দাঁড়াল যে, শপথের ভিত্তিতে কিসাসের হুকুম দেয়া জায়েয হবে না। আবু কিলাবার উক্তির উপর আম্বাসা বিন সাঈদ আপত্তি উত্থাপন করে বলেন যে॥

قَوْلُهُ فَأَيْنَ حَدِيْثُ أَنَسٍ فِى الْعُرَنِيِّيْنَ ঃ অর্থাৎ, আপনি তো হত্যা বৈধতার কারণ তিনটিতে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। তাহলে উরনাইন হাদীসের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? কারণ তাদের হত্যা করা হয়, অথচ তা এ তিন কারণের অন্তর্গত নয়! তাই জানা গেল, হত্যা বৈধতার কারণ তিনটিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো হতে পারে। আবু কিলাবা তার জবাব দিতে বলেন—

www.e-ilm.weebly.com

قَوْلُهُ وَإِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ঃ জবাবের সার কথা হলো, উরনাইনের ঘটনা ঐ তিন কারণের বাইরে নয়; বরং তিনের মধ্যেই তা আছে। কেননা তারা অন্যায়ভাবে রাখালকে হত্যা করে আল্লাহ ও তার রসূল (স.)-এর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

তাফসীর পর্বে আরো আছে যে, এর পরে আম্বাসা আবু কিলাবার উক্তি (অর্থাৎ, শপথের ভিত্তিতে হত্যা নাজায়েয) সত্যায়ন করত খুশি হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ! আমাদের আহনাফ ও শাফেয়ীদের প্রসিদ্ধ মতও এটা। তবে ইমাম মালেক ও আহমাদ (রহ.) এর মতে কোন কোন ক্ষেত্রে শপথের ভিত্তিতে কিসাসের হুকুম প্রদান জায়েয।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীস ব্যাখ্যাতাদের নিকট প্রসিদ্ধ হলো, হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.) শপথের ভিত্তিতে হুকুম প্রদানের পক্ষে ছিলেন না। ইমাম বুখারীরও অভিমত এটা (হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের ব্যাপারে)। তবে মুহাদ্দিসে কাবীর শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, এটা সঠিক নয়। কারণ, তিনি (উমর বিন আব্দুল আযীয) শপথের ভিত্তিতে হুকুম প্রদানের বিষয়টি অস্বীকার করেন নি; বরং শপথের ভিত্তিতে কিসাসের ফায়সালা অস্বীকার করেছেন মাত্র। আর এটাই হানাফীদের অভিমত। (লামিউদ দারারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩-৯৪)

بَابُ غَزْوَةِ ذِيْ قَرَدٍ

জী-করাদ যুদ্ধ

ذِيْ قَرَدٍ ঃ মদীনা হতে এক মঞ্জিল দূরত্বে গাতফান এলাকার নিকটবর্তী একটি ঝর্নার নাম। এ যুদ্ধের অপর নাম গবাহ যুদ্ধ। গবাহ অর্থ বন। কিন্তু এখানে শিলা পর্বতের নিকটস্থ রসূল (স.)-এর উট অবস্থানের ময়দান উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের পটভূমি ঃ একদা রসূল (স.) স্বীয় গোলাম হযরত রবাহকে উট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তার সাথে হযরত সালামা বিন আকওয়াও ছিলেন। হযরত সালামার কাছে হযরত তলহা বিন আব্দুল্লাহর ঘোড়া ছিল। তারা প্রত্যুষে পথিমধ্যে ছিলেন; ইত্যবসরে উয়ায়না বিন হাসান অথবা আব্দুর রহমান বিন উয়ায়না রসূলের উট পালের উপর হামলা চালায়। এ রাখাল আসফান গোত্রের এক ব্যক্তি ছিল। কারো মতে, সে হযরত আবু যরের পুত্র ছিল। তবে ইবনে কাইউম এ অভিমতকে 'বিরল' বলে দাবী করেছেন।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত সালামা 'ছানিয়াতুল বিদা' নামক স্থানে পৌঁছলে ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন এবং শত্রুর ছায়া তার নজরে আসে। তিনি রবাহকে বলেন, তুমি এ ঘোড়া নিয়ে গিয়ে তলহাকে দিয়ে দিও এবং ঘটনা সম্পর্কে রসূলকে অবহিত করো।

যুদ্ধের সময়কাল ঃ সহীহ বুখারীতে আছে, হুদায়বিয়ার পর খয়বারের তিন দিন পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তবে ঐতিহাসিকদের মতে এ যুদ্ধ হুদায়বিয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, বুখারীর তথ্য ও বর্ণনা ঐতিহাসিকদের

www.e-ilm.weebly.com

উক্তি হতে অধিক বিশুদ্ধ। কতিপয়ের মতে, এ দু'উক্তির মধ্যে এভাবে সমতা বিধান করা যেতে পারে যে, এ ঘটনা দু'বার ঘটে। একবার হুদায়বিয়ার পূর্বে। আরেকবার হুদায়বিয়ার পরে।

ثُمَّ انْدَفَعْتُ عَلٰى وَجْهِىْ ঃ অর্থাৎ, ডান-বামে তাকানো ছাড়াই দ্রুততার সাথে সোজা আগে চলে গেলাম।

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ ঃ অর্থাৎ, আজ বর্বর-কুলীনের ধ্বংসের দিন। প্রকৃতপক্ষে اَلرُّضَّعُ শব্দটি رَاضِعٌ-এর বহুবচন। অর্থ-দুধপানকারী। কিন্তু এখানে এর দ্বারা বর্বর-কুলীন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

যেহেতু আরবে কিছু লোকদের রীতি ছিল যে, তারা উটের দুধ এই আশঙ্কায় দোহন করত না যে, দুধ দোহনের শব্দ শুনে ফকীর-মিসকীন আসবে এবং তা লাভের আকাঙ্ক্ষা করবে। অথচ আজও এ ধরনের চিন্তা-চেতনাকে অত্যন্ত হীন ও নীচু মন-মানসিকতা হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। তাই এখানে اَلرُّضَّعُ থেকে اَللِّئَامُ তথা 'কুলীন' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

খয়বার যুদ্ধ

হালাবী বলেন, 'খয়বার' আমালেকা গোত্রের এক ব্যক্তির নাম। সে অত্র এলাকায় বসবাস করার কারণে তার নামানুসারে এলাকাটির নাম হয় খয়বার। এ ব্যক্তি ঐ ইয়াসরিবের ভাই ছিল। যার নামে মদীনার নাম রাখা হয়েছিল। কারো মতে, ইহুদীদের ভাষায় কেল্লাকে খয়বার বলা হয়। তাই কেল্লার নামানুসারে এলাকার নাম হয় খয়বার। অত্র এলাকায় বিশাল বিশাল আটটি কেল্লা ছিল।

যুদ্ধের পটভূমি ঃ আসাহহুস সিয়ারে আছে, রসূল (স.) হুদায়বিয়া হতে মদীনা ফেরার পথে সূরা ফাতহের প্রাথমিক আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। যাতে রয়েছে وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً অর্থাৎ, তিনি তাদেরকে নিকটবর্তী বিজয় ও বিপুল যুদ্ধলব্ধ দান করবেন। যেহেতু দৌলতের দিক দিয়ে খয়বার প্রসিদ্ধ ছিল, তাই সকলে এটাকে খয়বার বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে মনে করেন। তদুপরি খয়বারে ইতিমধ্যে ইসলামের বড় বড় শত্রুরা সমবেত হয়েছিল। ফলে তা ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেজন্য রসূল (স.) খয়বার আক্রমণের ইচ্ছা পোষণ করেন। খয়বার যুদ্ধে রসূল (স.)-এর সাথে ১৪০০ সাহাবা, ২০০ ঘোড়া এবং অনেক উট ছিল। খয়বারে মোট ৮টি কেল্লা ছিল। (১) আননাতাহ (২) আশ্‌শাক (৩) আন নাঈম (৪) আল কুতাইবা (৫) আল ওতীহ (৬) আস্ সালালিম (৭) আল ক্বমূস ও (৮) ছআব বিন মুআজ কেল্লা। কেল্লাগুলো অত্যন্ত মজবুত ও দুর্ভেদ্য ছিল।

সর্বাগ্রে আন্‌নাতাহ ও আশ্‌শাক বিজয় হয়। আল্‌কুতাইবা, আল ওতীহ ও আস্ সালালিম দীর্ঘদিন যাবত অবরুদ্ধ থাকে। ক্বমূস কেল্লা হযরত আলী (রযি.)-এর

www.e-ilm.weebly.com

হাতে বিজিত হওয়ায় তাঁকে খয়বার বিজয়ী বলা হয়। এখানে চূড়ান্ত সংঘর্ষ হয়। কামুস কেল্লা বিজয়ের সময় মারহাব নামীয় এক ইহুদী রণসঙ্গীত গাইতে থাকে ঃ

أَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ أُمِّىْ مَرْحَبًا * شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبًا

আমি সে ব্যক্তি মাতা রেখেছে মারহাব নাম যার,
আমি বাহাদুর আরও অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার।

প্রত্যুত্তরে হযরত আলী (রযি.) বলেন—

أَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ دَمِىْ حَيْدَرَهْ * كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرِهْ

আমি সে ব্যক্তি, রক্ত রেখেছে নাম যার হায়দার,
বাঘের মতই অতি বিপদজনক হয় আমার কারবার।

যুদ্ধের সময়কাল ঃ হালাবী বলেন, রসূল (স.) হুদায়বিয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর ৬ষ্ঠ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষ এবং ৭ম হিজরীর কারো মতে সাত দিন, কারো মতে বিশ দিন অথবা প্রায় এসময় পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করার পর খয়বার অভিমুখে রওনা হন। অতএব বিশুদ্ধ মত হলো, রসূল (স.) খয়বার অভিমুখে ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে রওনা হন। যারা ৬ষ্ঠ হিজরীর কথা বলেন তাদের কথা সঠিক নয়। (আইনী)

ফলাফল ঃ খয়বারের চূড়ান্ত পতন হয়। আর এ পতনের ফলে ফিদাক, ওদীল কুরা ও তীমা -এর ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করে এবং জাযিরাতুল আরবের সকল ইহুদীর উপর ইসলামের চূড়ান্ত রাজনৈতিক বিজয় অর্জিত হয়।

فِدَاءٌ لَكَ (আমি আপনার প্রতি কুরবান) ঃ কারো মতে, এ বাক্য রসূল (স.)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল, আপনার হক ও সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারে আমাদের থেকে যে ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, আপনি তা ক্ষমা করে দিন। বাক্যের শুরুতে আগত اَللّٰهُمَّ-এর দ্বারা দোয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং তার দ্বারা কথা শুরু করা হয়েছে মাত্র। (কস্তলানী)

আবার কারো মতে, এ বাক্য আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। তবে এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং মহব্বত ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন উদ্দেশ্য। কেননা আল্লাহর শানে এহেন শব্দ ব্যবহার করা যায় না। কারণ তা কেবল নশ্বর ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। (তাওসীহ)

মাযুরী বলেন, রূপকার্থে এর দ্বারা আনসারগণ উদ্দেশ্য। কারণ 'ফেদা' শব্দটি অপ্রিয় স্থলে ব্যবহৃত হয়। অতএব তার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে না। মর্মার্থ হলো, আমার সত্বা আপনার জন্য নিবেদিত। অথবা হতে পারে, আলোচ্য বাক্যের দ্বারা আলাপের মাঝখানে শ্রোতাকে পুনঃ সম্বোধন ও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

যেহেতু اَلْقِيَنْ سَكِيْنَةً এবং وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ দোয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। তাই জানা যায় যে, আলোচ্য বাক্য আল্লাহকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে; অন্যের

www.e-ilm.weebly.com

উদ্দেশ্যে নয়। সেজন্য টিকাকার তাওশীহ্ গ্রন্থের উক্তি আর আল্লামা আইনী মাযুরীর উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

مَا أَبْقَيْنَا ঃ এটা পূর্বোক্ত ফেল فَاغْفِر-এর মাফউল হওয়ায় যবরের স্থলে পতিত হয়েছে। আর فِدَاءً لَكَ এখানে একটি নতুন বাক্য মাত্র (جُمْلَه مُعْتَرِضَه) অর্থ হলো, আমাদের কৃত গুনাহ-খাতা আপনি মার্জনা করুন। অধিকাংশ বর্ণনায় اَلْاِتْقَاءُ মাসদার হতে مَا اتَّقَيْنَا এসেছে। অর্থাৎ, আমরা যে সকল নিষিদ্ধ বিষয়ে জড়িয়ে পড়েছি। কুতাইবার বর্ণনায় اَلْاِقْتِضَاءُ মাসদার হতে مَا اقْتَفَيْنَا এসেছে। অর্থাৎ, যে সমস্ত গুনাহ আমরা অতীতে করেছি তা ক্ষমা করে দিন। আল্লামা আইনী বলেন, এ রণসঙ্গীত প্রসঙ্গে এটাই সবচে প্রসিদ্ধ বর্ণনা।

إِنَّا إِذَا صِيْحَ بِنَا أَبَيْنَا ঃ অর্থাৎ, যখন আমাদের অন্যায়ের প্রতি আহ্বান করা হয়, আমরা অস্বীকার করি (অর্থাৎ, তাতে সাড়া দিই না)। অন্য বর্ণনায় أَبَيْنَا-এর স্থলে أَتَيْنَا এসেছে। অর্থাৎ, আমাদের ন্যায়ের পথে কিংবা জিহাদের প্রতি আহ্বান করলে, আমরা তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই।

وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوْا عَلَيْنَا ঃ অর্থাৎ, তারা দীপ্তকণ্ঠে আমাদের ইচ্ছা ও সাহায্য প্রার্থনা করে।

قَالُوْا عَامِرُ بْنُ الْاَكْوَعِ ঃ ইনি সালামা বিন আকওয়ানের চাচা। আল্লামা আইনী বলেন, জিহাদ পর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, এটা আব্দুল্লাহ্ বিন রওহার উক্তি। রসূল (স.) খন্দক খননের সময় পংক্তিটি বারবার পড়েন। অতঃপর আইনী বলেন, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ, হতে পারে উভয়ে এ পঙক্তি আবৃত্তি করেন।

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ (মুসলমানদের মধ্যে হতে জনৈক ব্যক্তি বললেন) ঃ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, এ ব্যক্তি হযরত উমর (রযি.) ছিলেন।

"وَجَبَتْ" ঃ অর্থাৎ, আপনার এ দোয়ার বরকতে শাহাদাত অথবা জান্নাত অনিবার্য হয়ে গেছে। এ কথা বলার কারণ হলো, সাহাবারা রসূল (স.)-এর অভ্যাস সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন যে, তিনি কারো জন্য ইস্তেগফার করলে তিনি নিশ্চিত শহীদ হয়ে যেতেন।

لَوْلَا اَمْتَعْتَنَا بِهِ ঃ অর্থাৎ, আপনি আমেরকে কেন দীর্ঘায়ু হতে দিলেন না, তাহলে আমরা তার বীরত্ব দ্বারা উপকৃত হতে পারতাম।

فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ (তরবারী আমেরের হাঁটুতে এসে লাগে) ঃ আয়াস বিন মাসলামার বর্ণনায় আছে, আমরা খয়বারে এলে তাদের বড় বাহাদুর মারহাব নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে এই বলতে বলতে ময়দানে নেমে আসে।

www.e-ilm.weebly.com

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّىْ مُرَحَّبُ * شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

আমি মারহাব, খয়বার আছে অবগত অভিজ্ঞ আমি বাহাদুর আরো সশস্ত্র।

তার জওয়াব দিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত আমের বিন আকওয়া ময়দানে আসেন এবং মুখে বলতে থাকেন ঃ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّىْ عَامِرٌ * شَاكِى السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ

আমি আমের, খয়বার আছে অবগত যানবাজ আমি, বাহাদুর আরো সশস্ত্র

এরপর প্রত্যেকে একে অপরের প্রতি হামলা করে। এ সময় মারহাবের তলোয়ার আমেরের ঢালে এসে বিদ্ধ হয়। আমের নীচ দিয়ে তার পায়ে তলোয়ার মারেন। তলোয়ার তার পায়ে না লেগে নিজের হাঁটুতে এসে আঘাত করে। তিনি এ আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন।

إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ ঃ অর্থাৎ, তিনি আল্লাহর বড় আবেদ এবং একজন বীর মুজাহিদ ছিলেন। তাই তার জন্য ডবল প্রতিদান ও পুরস্কার রয়েছে।

قَلَّ عَرَبِيٌّ مُشَابِهًا مِثْلَهُ ঃ مُشَابِهًا শব্দটি اَلْمُشَابَهَةُ মাসদারের اِسْمِ فَاعِلْ এর সীগা। অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বে তার মত আরব খুব কমই আছে। আবার কোন বর্ণনায় مَشٰى بِهَا অর্থাৎ, اَلْمَشْىُ মাসদার হতে مَاضِى-এর সীগা বর্ণিত হয়েছে। অর্থ ভূপৃষ্ঠে অথবা মদীনায় অথবা যুদ্ধে তার মত আরব খুব কমই দেখা যায়।

نَشَاءَ بِهَا ঃ নুন ও হামযা শব্দযোগে। بِهَا-এর ضَمِيْر টি اَلْحَرْبُ বা بِلَادْ اَلْعَرَب-এর দিকে ফিরেছে। অর্থ, রণক্ষেত্রে অথবা আরব শহরে তার মত অনেক কম আরব প্রতিপালিত ও পরিণত যুবক হয়েছে।

صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً (আমরা খয়বারে প্রত্যুষে প্রস্তুতি নিলাম)

এ বর্ণনাটি পূর্ববর্তী বর্ণনা أَتٰى خَيْبَرَ لَيْلًا অর্থাৎ, তিনি রাতে খয়বারে আসেন-এর বিপরীত নয়। কারণ উদ্দেশ্য হলো, তিনি রাতে পৌঁছে সেখানে রাতযাপন করেন। অতঃপর প্রত্যুষে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। (কস্তলানী)

فَخَرَجُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ (তারা সরু পথ দিয়ে দ্রুত বের হয়) ঃ অর্থাৎ, খয়বারের ইহুদীরা ক্ষেত-খামারে কাজ করতে কৃষি যন্ত্রপাতি লাঙ্গল, কোদাল ইত্যাদি নিয়ে কেল্লার সরু পথ দিয়ে বের হয়। হঠাৎ দূরে সৈন্যদের উপর চোখ পড়লে তারা আঁৎকে চেঁচিয়ে ওঠে।

مُحَمَّدٌ وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ (সত্যিই ঐ যে মুহাম্মাদ ও তার সেনাবাহিনী!) ঃ রসূল (স.) তাদের উপর আক্রমণোদ্দত হলে সবাই কেল্লার দিকে দৌড় দেয় এবং তাতে আশ্রয় নেয়। ওদিকে সাহাবাগণও উচ্চস্বরে তাকবীর দিতে

www.e-ilm.weebly.com

দিতে কেল্লার দিকে অগ্রসর হন। সর্বপ্রথম আননাতাহ কেল্লায় যুদ্ধ শুরু হয়। অতঃপর একে একে ছআব, কমূস এবং যুবাইর কেল্লায় যুদ্ধ হয়। এক প্রান্তে অবস্থিত কয়েকটি কেল্লা অতি অল্প সময়ে পদানত হলেও অপর প্রান্তের তিনটি কেল্লা আল কুতাইবা, আল ওতীহ ও আস্‌সানা অধিকারের বাইরে থেকে যায়। এ সমস্ত দুর্গে চতুর্দিক থেকে ইহুদীরা এসে সমবেত হয়। চৌদ্দ দিন তাদের উপর অবরোধ আরোপ থাকে। তবুও তারা যুদ্ধ করতে দুর্গের বাইরে বের হয় না। এমতাবস্থায় রসূল (স.) মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) নিক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিলে মৃত্যু অনিবার্য দেখে ইহুদী প্রধান ইবনে আবীল হুকাইক সন্ধির জন্য ছুটে আসে এবং কতিপয় শর্তের উপর সন্ধি স্থাপিত হয়। (লামিউদ দারারী)

فَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا (রসূল দাসত্ব মুক্তিকে তার মোহর নিরূপণ করেন) ঃ এটা কেবল রসূল (স.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। কিন্তু ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে রসূল (স.) ব্যতীত অন্যের জন্যও এটা জায়েয।

رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً ঃ জনৈক ব্যক্তি কোন ইহুদীকে চাই সে একা হোক বা দলবদ্ধ থাকুক-কাউকে রেহাই দিত না। কথিত আছে, এ ব্যক্তির নাম ছিল কুজমান। সে ইহুদী দেখলেই তার পিছু নিত এবং হত্যা করে ছাড়ত।

ঘটনাটি উহুদ না খয়বারের এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে। হযরত আবু হুরায়রার ভাষ্য অনুযায়ী এটা খয়বারের ঘটনা। ইবনুল জাওযী বলেন, সাহল বিন সাদের হাদীসের সম্পর্ক উহুদ যুদ্ধের সাথে। আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস এখানে উল্লেখের কোন অর্থ নেই। কারণ, বাহ্যিকভাবে খয়বার যুদ্ধের সাথে এ হাদীসের কোনই সম্পর্ক নেই। লেখকের পূর্ববর্তী বর্ণনাধারা হতে যদিও উভয় বর্ণনা অভিন্ন বলে জানা যায়, কিন্তু হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, উভয়ের বর্ণনাধারায় তারতম্য বা অমিল রয়েছে। সেজন্য সাফাফাতীর মতে এটা ভিন্ন দু'বাক্য। আল্লামা কস্তলানী বলেন, হতে পারে তার প্রতি প্রথমে তীর নিক্ষেপ করা হয়। এতে মৃত্যু না হলে কষ্ট সহ্য না করতে পেরে দ্রুত মৃত্যুর জন্য তিনি তলোয়ারের আশ্রয় নেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে ভিন্ন বাক্য বলার প্রয়োজন হয় না।

أَمَّا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (হয়ত সে জাহান্নামী) ঃ আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, আত্মহত্যা অবশ্যই গুনাহের কাজ। তবে গুনাহের দ্বারা বান্দা কাফের হয় না। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কিভাবে দোযখী বলা হলো? উত্তর হলো ঃ

(১) হয়ত ওহী মারফত রসূল (স.) তার ঈমান না থাকা সম্পর্কে অবগত হন।

(২) অথবা এটা অবগত হন যে, আত্মহত্যাকে সে হালাল মনে করে শীঘ্রই মুরতাদ হয়ে যাবে।

(৩) অথবা উদ্দেশ্য হলো, সে ঐ পাপী ঈমানদারদের অন্তর্গত, যারা প্রথমে দোযখে গিয়ে অতঃপর পরিত্রাণ পাবে।

(৪) অথবা সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করলে সে দোযখে যাবে।

www.e-ilm.weebly.com

মাহ্লাব বলেন, এ হাদীস থেকে আবশ্যক হয় না যে, কেউ আত্মহত্যা করলেই তাকে জাহান্নামী ফতোয়া দেয়া হবে।

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (পাপীর দ্বারা) ঃ এখানে اَلِف لاَمْ টা عَهْد তথা নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্যও হতে পারে। তখন উদ্দেশ্য হবে, আত্মহত্যাকারী। অথবা اَلِف لاَمْ টা جِنْس বা জাতিবাচকের জন্যও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, যে কোন পাপী ব্যক্তি। অতএব পাপী হলেও তার থেকে বা দ্বারা দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা নেয়া যাবে বলে প্রতীয়মান হয়।

لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ (কোন সফলতা ও শক্তি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া হয় না) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ও সাহায্য ছাড়া মানুষের কোন চেষ্টা স্বার্থক হতে পারে না এবং মানুষ নিজের অবস্থা পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় না। বাক্যটি আল্লাহর গুপ্তভাণ্ডারের অন্তর্গত। কেননা এতে একত্ববাদের সূক্ষ্ম দর্শন রয়েছে। আর তা এভাবে যে, এ বাক্যে মানবের সকল প্রকার কৌশল, চেষ্টা, লম্ফ-ঝম্ফ এবং শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যর্থ ঘোষণা ও খণ্ডন করে একমাত্র আল্লাহর জন্য তা সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা জগতে যা কিছু আমরা দেখি, শুনি এবং হয় সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি ও দান। সবকিছুই তার উদ্ভাবন, সহায়তা ও তাওফিকের দ্বারাই হয়। (কস্তলানী)

فَرَأَى طَيَالِسَةً (তিনি চাদর ও পাগড়ী দেখলেন) ঃ এটা طَيْلَسَانٌ-এর বহুবচন। শব্দটি ফার্সী থেকে আরবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থ, এক ধরনের চাদর অথবা ছোট পাগড়ী, যা আরবরা কাঁধের উপর রেখে ব্যবহার করে।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হযরত আনাস (রযি.) স্বচক্ষে খয়বারের ইহুদীদের প্রায় সময় চাদর পরিধান করতে দেখেন। অন্যত্র এমনটি ছিল না। অতঃপর তিনি বসরা এলে সেখানকার লোকদেরকে প্রায় সময় এ ধরনের চাদর পরিধান করতে দেখেন। সেজন্য তিনি তাদেরকে খয়বারের ইহুদীদের সাথে তুলনা করেছেন। তবে এ থেকে চাদর পরিধান করা মাকরূহ সাব্যস্ত হয় না।

আল্লামা আইনী বলেন, যদি মাকরূহ না হবে তবে তার তুলনা করার কি প্রয়োজন ছিল? যদি বলা হয়, এটা হলুদ রংবিশিষ্ট হওয়ায় হযরত আনাস তা অপছন্দ করেন। তবে প্রত্যুত্তরে বলা হবে, প্রথমত একথার কোন প্রমাণ নেই যে, তারা হলুদ রংবিশিষ্ট চাদরই পরিধান করত। আর যদি হলুদ রং মেনেও নেয়া হয়, তবে বলা হবে, এ রংয়ের চাদর পরিধান করা খোদ রসূল (স.) থেকে বর্ণিত আছে। (আইনী)

اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ ঃ অর্থাৎ, তুমি নম্র পন্থা অবলম্বন করবে।

أَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ (তুমি লাল উটের মালিক হবে) ঃ আরবদের নিকট লাল উট অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও উত্তম সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। এর দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ও ধন-ভাণ্ডারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

وَكَانَتْ عَرُوْسًا (সফিয়াহ নববধূ ছিলেন) ঃ عَرُس শব্দটি পুরুষ মহিলা (বর ও কনে) উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا (তার স্বামী নিহত হয়) ঃ তার স্বামীর নাম ছিল কেনানা বিন রবী।

فَاصْطَفَاهَا ঃ অর্থাৎ, রসূল (স.) হযরত সফিয়াহকে নিজের জন্য নির্বাচন করেন। আর এ নির্বাচন ঐ মাল থেকে ছিল, যা গনীমতের মাল বণ্টন ও বাইতুল মালে এক পঞ্চমাংশ প্রদানের পূর্বেই মূল মাল থেকে নেয়া হত। (এ অধিকার রসূল একাই সংরক্ষণ করতেন।)

কেউ বলেন, গ্রেপ্তারের পূর্বে তার নাম ছিল যয়নাব। তিনি সফী[১] (صَفِى) মালের অন্তর্ভুক্ত থাকায় পরবর্তীতে তার নাম 'সফিয়্যাহ' হয়ে যায়।

الأَنْطَاعُ ঃ এটা نِطْعٌ-এর বহুবচন। অর্থ দস্তরখান। الأَقِطُ ঃ অর্থ মাখন।

إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُهُ (তিনি স্ত্রী বা বাদীদের একজন ছিলেন) ঃ এহেন সংশয়ের কয়েকটি কারণ বর্ণিত হয়েছে। (১) কারো মতে বিবাহ ও ওলীমা (বৌভাত অনুষ্ঠান) উভয়তে যারা শরীক হন তাদের এ খটকা লাগে। আর যারা উভয় অনুষ্ঠান কিংবা এক অনুষ্ঠানে শরীক হন তাদের এ খটকা লাগে না। (২) হতে পারে এ খটকা লাগে বিবাহ ও ওলীমার পূর্বে, পরে নয়। (৩) যাদের খটকা লাগে তাদের জানা ছিল না যে, এটা ওলীমার খানা। তারা একে রসূল (স.) এর পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র কোন খানার দাওয়াত মনে করেন।

মুতা হারাম প্রসঙ্গ

نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ (নবীজী মুতা বিবাহ করতে নিষেধ করেন) ঃ মুতা বিবাহ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনুল মুনজির বলেন, পরবর্তী আলেমদের কারো কারো মতে, যদিও মুতার অবকাশ ছিল কিন্তু বর্তমানে কতিপয় রাফেজী ব্যতিরেকে আর কেউ মুতার অবকাশের পক্ষপাতী আছেন বলে আমার জানা নেই।

মুতা বিবাহ বৈধ প্রবক্তাদের প্রমাণাদি ঃ যারা মুতা বিবাহকে জায়েয বলেন, তারা নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল প্রদান করেন- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً তারা এ আয়াত থেকে তিনভাবে বিষয়টি প্রমাণিত করেন। (১) আয়াতে اِسْتِمْتَاعٌ-এর কথা এসেছে نِكَاحٌ-এর নয়। আর تَمَتُّعٌ ও اِسْتِمْتَاعٌ (মুতা) একই জিনিস। (২) আল্লাহ এ আয়াতে বিল দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আর মুতা বিবাহের সংজ্ঞাই হল, বিল প্রদানের চুক্তিতে কোন

টীকা ঃ গনীমতের মাল হতে রসূল (স.) নিজের জন্য প্রথমে যে মাল গ্রহণ করেন তাকে সফী বলা হয়। পছন্দ অনুযায়ী এ মাল নেয়ার অধিকার বিশেষভাবে রসূল (স.) কে প্রদান করা হয়। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

মহিলাকে যথেচ্ছা ভোগ করা। (৩) আল্লাহ্ পাক উপভোগের পর বিল মিটিয়ে দিতে বলেছেন, আর মুতা বিবাহে এটাই হয়ে থাকে। তারা হযরত উবাই, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের (রযি.) কেরাত

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ إِلٰى أَجَلٍ مُّسَمًّى এর দ্বারা নিজেদের প্রমাণকে সুদৃঢ় করেছেন।

মুতা বিবাহ্ অবৈধ প্রবক্তাদের প্রমাণাদি ঃ বাদায়ে গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, মুতা বিবাহ নাজায়েয হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও বিবেকলব্ধ (আকলী) প্রচুর দলীল বিদ্যমান। যথা ঃ

কুরআনিক প্রমাণ ঃ

(১) আল্লাহর উক্তি ঃ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ إِلاَّ عَلٰى أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ الخ অর্থাৎ, "স্বার্থক জীবন তাদের, যারা যৌনাঙ্গ কন্ট্রোল করেছে; তবে স্বীয় স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ব্যাপারটি স্বতন্ত্র।" এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বিবাহিত স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া আর যে কোন মহিলার সাথে সহবাস হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এটা অতীব সুস্পষ্ট যে, 'মুতা' বিবাহও নয় আবার মালিকানাভুক্ত বিষয়ও নয়। মুতা 'বিবাহ' না হওয়ার প্রমাণ হলো, মুতা তালাক ছাড়াই বাতিল হয়ে যায় এবং তাতে উত্তরাধিকারত্ব প্রযোজ্য হয় না। বিবাহ এর বিপরীত। ফলে প্রমাণিত হল যে, মুতা কখনও বিবাহ্ নয়।

(২) আল্লাহ্ বলেন, فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ অর্থাৎ, যারা এটা (পূর্বোক্ত দু'ক্ষেত্র) ব্যতীত অন্য ক্ষেত্র খুঁজে ফেরে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। এ আয়াতে বিবাহিত স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া (সঙ্গমের) অন্য ক্ষেত্র অনুসন্ধানকারীকে সীমালঙ্ঘনকারী সাব্যস্ত করায় এটা জানা গেছে যে, এ দু'ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যৌনাঙ্গ ব্যবহার তথা সঙ্গম হারাম।

(৩) আল্লাহ্ বলেন, وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ الاية অর্থাৎ, তোমরা স্বীয় দাসীদের অর্থের বিনিময়ে যৌনকর্মী হতে বাধ্য করবে না। কোন কোন লোক তার বাদীকে অন্যের কাছে (সম্ভোগের জন্য) ভাড়া দিত।' এ আয়াতে আল্লাহ্ এহেন জঘন্যবৃত্তি হতে নিষেধ করেছেন।

হাদীসিক প্রমাণ ঃ (১) হযরত আলী (রযি.) থেকে বর্ণিত, إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ অর্থাৎ, রসূল (স.) মহিলাদের সাথে মুতা বিবাহে আবদ্ধ হতে নিষেধ করেছেন।

(২) অন্য হাদীসে এসেছে ঃ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَهُوَ يَقُوْلُ إِنِّىْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْمُتْعَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَئٌ

www.e-ilm.weebly.com

فَلْيُفَارِقْهُ فَإِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ, রসূল (স.) কা'বা ঘর ও মাকামে ইব্রাহীমের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি তোমাদের মুতা করার অনুমতি দিয়েছিলাম। বর্তমানে যারা এ চুক্তিতে আছ, শীঘ্র বাতিল কর। কারণ আল্লাহ্ মুতা বিবাহ কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন।

ইজমাভিত্তিক প্রমাণ ঃ মুতার প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ বিশেষত আহলে সুন্নাতগণ তা করা হতে সম্পূর্ণ বিরত রয়েছেন।

আকলী দলীল ঃ বিবাহের প্রবর্তন নিছক যৌন লিপ্সা চরিতার্থের জন্য নয়, বরং তার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিবাহের প্রবর্তন হয়, মুতা হতে তা অর্জিত হয় না। অতএব মুতা শরীয়ত সমর্থিত হতে পারে না।

বিরোধী পক্ষের দলীলের জওয়াব ঃ মুতার বৈধতার প্রবক্তাগণ তাদের দাবীর স্বপক্ষে যে আয়াত পেশ করেন, তার জওয়াব নিম্নরূপ ঃ

(১) আয়াতে اِسْتِمْتَاعٌ بِالنِّكَاحِ (অর্থাৎ, বিবাহের মাধ্যমে উপভোগ) উদ্দেশ্য। اِسْتِمْتَاعٌ بِالْمُتْعَةِ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, আয়াতের অগ্র-পশ্চাতে বিবাহের আলোচনা চলছে।

(২) যদি মেনেও নেয়া হয় যে, আয়াতে اِسْتِمْتَاعٌ بِالْمُتْعَةِ উদ্দেশ্য, তবে তখন এটা আমাদের উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস দ্বারা মানসুখ বলে গণ্য হবে। আর তারা যে কেরাতের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা বিরল একটি কেরাত মাত্র। দলীলের জন্য এমন বিরল কেরাত যথেষ্ট নয়। হযরত আবু বকর ও উমর (রযি.) এর যুগে সাহাবাগণ কর্তৃক মুতা করার বর্ণনার জওয়াব হলো, এটা তখনকার ঘটনা, যখন মুতা নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন না। অবহিত হওয়ার পর তাঁরা তা পরিহার করেন।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, সকল বর্ণনা এ ব্যাপারে একমত যে, মুতার বৈধতার কাল প্রলম্বিত না হতেই তা হারাম হয়ে যায়। মুতা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা হয়েছে। কতিপয় রাফেজী ব্যতিরেকে কেউ এর বিরোধিতা করে বলে জানা যায় না। রাফেজীদের এ বিরোধীতা ধর্তব্য নয়। তারা নিজেদের দাবীর সমর্থনে বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) মুতা মুবাহের প্রবক্তা ছিলেন। তাদের এ উক্তি মেনে নিলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ আসাহহুস সিয়ারে আছে, "একাধিক সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস কর্তৃক অভিমত পরিবর্তনের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।" তাই পূর্বে মতান্তর থাকলেও বর্তমানে ফোকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে 'মুতা' হারাম।

মুতা হারামের সময়কাল ঃ মুতা হারাম হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্নমুখী বর্ণনা এসেছে। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফতহুল বারীতে এ ব্যাপারে ছয় ধরনের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। (১) খয়বার যুদ্ধের সময় (২) উমরাতুল কাযার

www.e-ilm.weebly.com

সময় (৩) মক্কা বিজয়কালে (৪) আউতাস যুদ্ধের সময় (৫) তাবুক যুদ্ধের সময় এবং (৬) বিদায় হজ্জের সময়। এ সমস্ত বর্ণনার বিবরণ দিয়ে তিনি লেখেন, উল্লিখিত বর্ণনাসমূহের মধ্যে খয়বার ও মক্কা বিজয়কালীন সংক্রান্ত বর্ণনাটি অধিক সুস্পষ্ট ও সর্বাধিক বিশুদ্ধ। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন কিতাবে নিম্নোক্ত আরও বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ

(১) ইবনে হাজার বলেন, খয়বার ও মক্কা বিজয়ের সময় মুতা হারাম হয়। তিনি এ বিষয়ে আল্লামা নববীর উক্তি তুলে ধরেছেন যে, "মুতা হারাম ও জায়েয দু' দু'বার করে সংঘটিত হয়। খয়বারের পূর্বে হালাল ছিল; খয়বারে এসে তা হারাম হয়ে যায়। পুনরায় মক্কা বিজয়ের সময় হালাল হয়। এর কিছুদিন পরে তা চিরদিনের জন্য হারাম ঘোষিত হয়। দু'দু'বার করে হালাল ও হারামের বিষয়টি কেউ অস্বীকার করেননি। শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইসলামে কেবল মুতাই একবার হালাল হয়ে পরে হারাম হয়েছে। দ্বিতীয় বার আবার হালাল হয়ে পুনরায় হারাম হয়েছে অর্থাৎ, দু'বার হালাল ও দু'বার হারাম হয়েছে। (২) আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে এসেছে, মুতা নিষিদ্ধতার হুকুম মক্কা বিজয়ের সময় সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়; তৎপূর্বে নয়। ছবরা বিন মা'বাদের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِى الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের দিন বলেন, লোকসকল! মহিলাদেরকে উপভোগ করতে আমি তোমাদের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহ তা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন।

আর খয়বার ও উমরাতুল কাযার সময় যে নিষেধাজ্ঞা আসে, তা আল্লাহর আদেশক্রমে ছিল না; বরং এক বিশেষ প্রয়োজনে রসূল (স.) এ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। আর বিদায় হজ্জের নিষেধাজ্ঞার দ্বারা পূর্বোক্ত নিষেধাজ্ঞা সুদৃঢ় করা উদ্দেশ্য ছিল মাত্র।

(৩) লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে, বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বিভিন্নমুখী বর্ণনার মধ্যে এক চমৎকার সমন্বয় সাধিত হতে পারে। সংক্ষেপে তা হলো, স্থানীয় এলাকায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় মুতা কখনও হালাল ছিল না; বরং তা কেবল বিশেষ চাহিদা ও একান্ত প্রয়োজনে সফর অবস্থায় হালাল করা হয়। নিম্নের বর্ণনাটি এ কথারই প্রমাণ বহন করে—

(১) ইবনে মাসউদ (রযি.) বলেন ঃ كُنَّا نَغْزُوْ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَرَخَّصَ لَنَا اَنْ تَنْكِحَ অর্থাৎ, যুদ্ধকালীন সফরে আমাদের সঙ্গে স্ত্রী থাকত না। তাই রসূল (স.) আমাদের মুতা বিবাহ করার সুযোগ দেন।

www.e-ilm.weebly.com

(২) হযরত আবু যর (রযি.) বলেন, إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِحَرْبِنَا وَخَوْفِنَا অর্থাৎ, গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিস্থিতিতে মুতার অনুমতি ছিল।

(৩) ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি কেবল এ ফতোয়া দিয়েছি যে, একান্ত অপারগের পক্ষে মরা খাওয়া জায়েয।

উপরোল্লিখিত বর্ণনার আলোকে পরিশেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিভিন্ন স্থানে মুতা হারাম বিষয়ক যে সকল বর্ণনা এসেছে তার দ্বারা সাময়িক হারাম উদ্দেশ্য ছিল মাত্র। কারণ, নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তনের পর আর তাঁদের মুতার প্রয়োজন ছিল না। ফলে সফর বা দূর এলাকায় মুতা স্থায়ীভিত্তিতে হারাম ছিল না; বরং সর্বশেষ ঘোষণায় তা স্থায়ীভাবে সর্বাবস্থায় হারাম করা হয়।

ইসলামে ঘোড়ার বিধান

وَرَخَّصَ فِى الْخَيْلِ (রসূল (স.) ঘোড়ার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন) ঃ (১) ইমাম আবু হানীফা, মালেক এবং অপর একদল উলামায়ে কেরামের মতে ঘোড়ার গোশত খাওয়া মাকরূহ। অতঃপর তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন, মাকরূহে তাহরীমী, আর আল্লামা ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (রহ.)[১] বলেন, মাকরূহে তানযীহ।

(২) ইমাম শাফেয়ী, আহমাদ, আবু ইউসুফ[২] মুহাম্মদ ও অপর একদল আলেমের মতে, ঘোড়ার গোশত খাওয়া মুবাহ। জায়েযের পক্ষাবলম্বনকারীগণ হযরত যাবের (রযি.)-এর আলোচ্য হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত করেন। আর হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর প্রমাণাদি নিম্নরূপ ঃ

(১) আল্লাহ পাক বলেন, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً অর্থাৎ, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা তোমাদের বাহন এবং সৌন্দর্যের প্রতীক। তিনি বলেন ঃ ঘোড়ার ক্ষেত্রে সর্বাধিক অনুগ্রহ হল তার গোশত ভক্ষণ করা। অথচ আল্লাহ পাক ঘোড়ার অনুগ্রহ বর্ণনা করতে গিয়ে এখানে সে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেননি। বড় অনুগ্রহের কথা বর্জন করতঃ ছোট অনুগ্রহ বর্ণনা হতে অনুমিত হয় যে, তার গোশত খাওয়া মাকরূহ।

(২) আল্লাহ পাক বলেন, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ অর্থাৎ, তোমরা কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়তে হাতিয়ার ও পালিত ঘোড়া যথাসম্ভব প্রস্তুত রাখ। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, ঘোড়া একটি যুদ্ধাস্ত্র। ঘোড়া খাওয়া মুবাহ্ করে দিলে এ যুদ্ধাস্ত হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। অতএব তা মাকরূহ হওয়াই সমীচীন।

টীকা ঃ ১. হযরত ফখরুল ইসলাম বাযদাভী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৪৮২ হিজরী
২. ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), জন্ম ঃ ১১৩ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১৮২/১৮৩ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

اَلْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْر (ঘোড়ার ললাটে কল্যাণ ছাপ অঙ্কিত) ঃ এ বাক্য ঘোড়া মূল্যবান প্রাণী হওয়ার ব্যাপারটি সুপ্রতিষ্ঠিত করে, যা প্রকারান্তরে তা মাকরূহ হওয়াকেই বুঝায়। এর বিপরীতে হযরত জ াবের (রযি.) বর্ণিত হাদীসের জওয়াব হলো, আল্লাহ পাক ঘোড়াকে খচ্চর ও গাধার সাথে উল্লেখ করেছেন। আর এ দু'প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম। ফলে ঘোড়ার গোশত যে হারাম হবে, তা এর থেকে বুঝে আসে। আর সবচে বড় কথা হলো, হাদীস কখনও কুরআনের মোকাবেলায় দলীল হতে পারে না।

শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, ইন্তেকালের তিন দিন পূর্বে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) পূর্ববর্তী মত বর্জন করে ঘোড়ার গোশত খাওয়া মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে সর্বশেষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন।

اَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ (ডেগ উপুড় করে দাও) ঃ ইমাম নববী বলেন, ডেগ উপুড় করে দেয়ার নির্দেশ ছিল তার মধ্যস্থ গোশত নাপাক হওয়ার কারণে। কারো মতে অপ্রয়োজনীয়তা হেতু এ নির্দেশ ছিল। কারো মতে, বণ্টনের পূর্বে ঐ গাধাটি হস্তগত করায় শাস্তি স্বরূপ এ নির্দেশ দেয়া হয়।

গাধার গোশতের বিধান ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা ও উলামায়ে কেরামের মতে পালিত গাধার গোশত খাওয়া হারাম। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। ইমাম মালেক (রহ.) হতে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়-(১) জমহুরের ন্যায় হারাম (২) ইবনুল আরাবী বলেন, তাঁর প্রসিদ্ধ অভিমত মাকরূহ ও (৩) মুবাহ।

যারা মুবাহ বলেন, তাদের দলীল আল্লাহর উক্তি قُلْ لَّآ أَجِدُ فِيْمَا أُوْحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا... অর্থাৎ বলে দিন, প্রাপ্ত ওহীতে আমি হারাম পাইনি, তবে....।

জমহুর এ আয়াতের জওয়াবে বলেন, আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। আর গাধার গোশত খাওয়া হারাম সংক্ষিপ্ত হাদীসটি মাদানী। অতএব আয়াতটি মানসুখ। বুখারী শরীফের ৫৩০ নম্বর পৃষ্ঠার পার্শ্বটিকায় উল্লেখ হয়েছে যে, এ আয়াতে বর্ণিত সূত্রের ভিত্তিতে প্রমাণ পেশ করা কেবল তখনই সঠিক হবে, যখন রসূল (স.) এর পক্ষ হতে হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যাবে না। অথচ একাধিক হাদীস এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে। আর কোন হুকুম হালাল-হারামের মধ্যে সাংঘর্ষিক হলে, তখন হারামই প্রাধান্য পায়।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, রসূল (স.)-এর বক্তব্য فَإِنَّهَا رِجْسٌ (তথা তা নাপাক) হতে তার গোশত খাওয়া হারামই বুঝে আসে। সাথে সাথে এটাও বুঝে আসে যে, গাধা নিজেই নাপাক; অন্যের কারণে তা নাপাক ব্যাপারটি এমন নয়।

www.e-ilm.weebly.com

ইবনে দাকীকুল ঈদ[১] (রহ.) বলেন, ডেগ উপুড় করে দেয়ার নির্দেশ তার গোশত নাপাক হওয়ার কারণে ছিল। তদুপরি আবু সা'লার বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে হারামের কথা এসেছে। অতএব, হারামের হুকুম প্রত্যাহার করা যাবে না।

প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধের বণ্টন বিধান

لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا ঃ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গনীমতের হিস্‌সা (অংশ) কতটুকু পাবে, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে। সৈনিক পদাতিক হলে সর্বসম্মতিক্রমে সে মোট মালের একাংশ পাবে। পক্ষান্তরে সৈনিক অশ্বারোহী হলে ইমাম আবু হানীফা ও যুফারের[২] মতে, মুজাহিদ (সৈনিক) নিজের এবং অশ্বের এক এক অংশ করে মোট দুই অংশ পাবে।

ইমাম মালেক (রহ.), শাফেয়ী (রহ.), আহমাদ (রহ.), আবু ইউসুফ (রহ.), মুহাম্মদ (রহ.), ইসহাক[৩] (রহ.) প্রমুখের মতে ঘোড়ার জন্য দু'অংশ এবং আরোহীর জন্য এক অংশ মোট তিন অংশ হবে।

ইমাম আবু হানীফার প্রমাণাদি ঃ তিনি নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন ঃ

(১) হযরত মেকদাদ (রযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে—

اَنَّهٗ كَانَ يَوْمَ بَدْرٍ عَلٰى فَرَسٍ فَاَسْهَمَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهٖ سَهْمٌ وَاحِدٌ وَلَهٗ سَهْمٌ

অর্থাৎ, তিনি বদরযুদ্ধে অশ্বারোহী ছিলেন। রসূল (স.) তাঁকে (গনীমতের মাল হতে) দু'অংশ দেন। একাংশ তাঁর ঘোড়ার ও অপরাংশ তাঁর নিজের।

(তবরানী)

(২) হযরত যুবাইর বিন আওয়াম[৪] (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, شَهِدْتُ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَارِسًا فَضُرِبَ لِيْ سَهْمٌ وَلِلْفَرَسِ سَهْمٌ অর্থাৎ, বনূ কুরাইজা যুদ্ধে আমি অশ্বারোহী ছিলাম। রসূল (স.) আমাকে একাংশ ও ঘোড়ার জন্য একাংশ প্রদান করেন। (আল ওয়াকেদী)

(৩) হযরত আয়েশা (রযি.) বলেন ঃ

أَصَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَاَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهَا ثُمَّ قَسَّمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَأَعْطَى الْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الرَّاجِلَ سَهْمًا

টীকা ঃ ১. ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহ.), মৃত্যু ঃ ৭০২ হিজরী।
২. ইমাম যুফার (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৫৮ হিজরী।
৩. ইমাম ইসহাক বিন ইব্রাহীম (রহ.), মৃত্যু ঃ ২৩৮/২৪৩ হিজরী।
৪. হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রযি.), মৃত্যু ঃ ৩৬ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ, বনূ মুস্তালিক যুদ্ধ হতে প্রাপ্ত গনীমত হুযূরের কজায় এলে তিনি তা হতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে অবশিষ্ট গনীমত মুসলমানদের মধ্যে অশ্বারোহীকে দু'অংশ আর পদাতিককে একাংশ করে বণ্টন করে দেন। (ইবনে মারদূয়া)

(৪) হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত—

اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَعْطَى اَلْفَارِسَ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) অশ্বারোহীকে দু'অংশ আর পদাতিককে এক অংশ প্রদান করেন। (আবু দাউদ)

ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণনার জওয়াব ঃ আলোচ্য বর্ণনাটি আইম্মায়ে ছালাছা ও সাহেবাঈনের দলীল। কারণ, এ বর্ণনায় ঘোড়ার জন্যে দু'অংশ ও ব্যক্তির জন্য এক অংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ বর্ণনার নিম্নরূপ জওয়াব প্রদান করেন—

(১) ইবনে উমরের বর্ণনাটি খয়বারের পূর্বেকার হওয়ায় যেহেতু রহিতের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই এ হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

(২) হতে পারে এ ব্যাপারটি তখনকার, যখন গনীমত বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল রসূল (স.)-এর উপর। তিনি যথেচ্ছা যতটুকু দেয়ার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব সংরক্ষণ করতেন।

(৩) অনেক সময় আরবী টাইপ হতে আলিফ বিলোপ করা হয়। তাই হতে পারে এখানেও لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ বাক্যটি আসলে ছিল لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ

(৪) এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, لِلْفَرَسِ مَعَ صَاحِبِهِ سَهْمَيْنِ অর্থাৎ, ঘোড়া তার মালিকসহ দু'অংশ।

(৫) ইবনে উমরের বর্ণনাটি অন্যান্য রাবী এবং তারই অন্য বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, ইবনে উমরের এক বর্ণনায় لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ আর অপর বর্ণনায় لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ এসেছে। ফলে তার বর্ণনা إِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا অর্থাৎ, 'দু' বিষয় দ্বন্দ্বমুখর হলে উভয় পরিত্যাজ্য হবে" সূত্র অনুযায়ী অগ্রহণযোগ্য এবং যে সমস্ত বর্ণনা দ্বন্দ্বমুক্ত তা প্রাধান্য পাবে।

(৬) ইবনে হুমাম[১] বলেন, ইবনে উমরের বর্ণনাটিকে 'বিস্তারিত বিবরণ' আখ্যা দেয়াই উত্তম। কারণ, তখন উভয় প্রকার বর্ণনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান সম্ভব।

(৭) বজলুল মাজহুদ প্রণেতা বলেন, যখন আলোচ্য অধ্যায়ের বর্ণনাসমূহ পরস্পর বিরোধী, তখন আমরা ইসলামী নির্দেশনা অনুযায়ী কিয়াসের শরণাপন্ন হব।

টীকা ঃ ১. আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম (রহ.), মৃত্যু ঃ ৮৬১ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আর কিয়াস ঘোড়ার জন্য এক অংশ হওয়ার বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, যুদ্ধে সৈনিকই প্রধান। আর ঘোড়া যুদ্ধাস্ত্র হওয়ায় তার অনুগামী মাত্র। কেননা শুধু সৈন্য দ্বারা যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে, কিন্তু শুধু ঘোড়া দ্বারা যুদ্ধ হয় না। অতএব প্রধানের উপর অনুগামীকে প্রাধান্য দান ঠিক হবে না। আর হযরত নাফে থেকে যে ব্যাখ্যা এসেছে, তা তার ব্যক্তিগত ধারণা মাত্র। আর কোন রাবীর ব্যক্তিগত ধারণা দলীল হয় না। (বজলুল মাযহুদ)

وَنَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ঃ অর্থাৎ, আব্দে মানাফ সূত্রে উসমান, যুবাইর বনূ হাশেম এবং বনূ মুত্তালিক সকলেই একই স্তরের। কারণ, উসমান হলো আবদে শামসের বংশধর, আর যুবাইর নওফেলের বংশধর। আর আবদে শামস, নওফেল, হাশেম, মুত্তালিব সকলে আবদে মানাফেরই বংশধর।

إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ (বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব মানসিকতা ও গোত্রগত দিক দিয়ে অভিন্ন) ঃ কারণ ইসলাম ও জাহেলী যুগে উভয় এক থাকে। একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। সেহেতু খয়ফে বনী কেনানায় (আবু তালেব উপত্যকা) উভয় একই সাথে অবরুদ্ধ থাকে। বনূ আবদে শামস ও বনূ নওফেল এর বিপরীত।

سَبَقْنَاكُمْ بِالْهِجْرَةِ (হিজরতে আমরা তোমাদের থেকে প্রথম) ঃ এ কথাটি বাস্তবিক। কারণ, মদীনায় রসূল (স.)-এর পূর্বে হযরত উমর (রযি.)-এর হিজরত হয়। আর হযরত আসমা ও তাঁর অপর সাথীদের হিজরত হয় প্রাথমিক হিজরতের ছয় বছর পর। কারণ হযরত আসমা প্রমুখ খয়বার যুদ্ধের সময় মদীনায় আসেন। হযরত উমর (রযি.)-এর মুখ থেকে এ উক্তি অসতর্কতার মুহূর্তে বের হয়। অথবা তা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রকাশার্থে ছিল মাত্র। (লামিউদ দারারী)

أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ঃ ইনি রসূল (স.)-এর স্ত্রী হযরত মায়মুনার (রযি.) বোন, হযরত আব্বাস (রযি.)-এর স্ত্রী লুবাবার (উম্মে ফজল) বোন এবং হযরত জাফর বিন আবু তালেবের স্ত্রী ছিলেন। হযরত জাফরের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর (রযি.) তাকে বিবাহ করেন। তিনি মুহাম্মাদ বিন আবু বকরের মাতা ছিলেন। হযরত আবু বকর (রযি.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত আলী (রযি.) তাকে বিবাহ করেন।

لَيْسَ بِأَحَقَّ بِي مِنْكُمْ (উমর আমার কাছে তোমাদের থেকে বেশি হক রাখে না অর্থাৎ, প্রিয় নয়) ঃ রসূল (স.)-এর এ উক্তি হতে হযরত উমর (রযি.) ও অন্যান্য মুহাজিরদের তুলনায় হাবশায় হিজরতকারীদের অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক হয় না। কারণ, এটা আংশিক মর্যাদা মাত্র। আর এ আংশিক মর্যাদার দ্বারা সার্বিক মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয় কথা হলো, এখানে আধিক্যকে অস্বীকার করা হয়েছে; সমতাকে নয়। আর এটা অতি সুস্পষ্ট যে, সকল মুসলমান অধিকারের প্রশ্নে এক সমান।

www.e-ilm.weebly.com

إِنِّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رِفْقَةٍ (আমি আশয়ারী দলের কুরআন পাঠের আওয়াজ চিনতে পারি) ঃ এ বাক্যে ঐ সকল আশয়ারীদের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে, আপনাপন শয়নকক্ষে মানুষ আরাম করার সময় যারা মধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করে।

وَمِنْهُمْ حَكِيْمٌ إِذَا لَقِىَ الْخَيْلَ (হাকীম তাদের একজন; যখন কোন অশ্বারোহীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়) ঃ এ বাক্যে হাকীমের প্রশংসা করা হয়েছে যে, সে তার সাথীদের পূর্বে দুশমনের প্রতি মনোযোগী হয়। এরপর স্বীয় সাথীদেরকে তাদের সাথে লড়তে উত্তেজিত করে।

إِذَا لَقِىَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُوَّ الخ ঃ হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এটা রাবীর সংশয়। এখানে তিন ধরনের সম্ভাবনা রয়েছে। (১) خَيْل দ্বারা উদ্দেশ্য خَيْل الْمُسْلِمِيْنَ। তখন উদ্দেশ্য হবে, তার সাথীরা পদাতিক ছিল। সেজন্য তিনি (হাকীম) অশ্বারোহীদের এ মর্মে নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা তাদের (পদাতিক সৈন্যদের) অপেক্ষা কর। যেন সকলে সম্মিলিতভাবে একযোগে শত্রুর প্রতি আক্রমণ করতে পারে।

(২) الْخَيْل দ্বারা উদ্দেশ্য, خَيْلُ الْمُشْرِكِيْنَ তখন উদ্দেশ্য হবে, শত্রু তথা মুশরিকদলের সাথে হাকীমের সাক্ষাৎ হলে, তিনি একা হওয়া সত্ত্বেও তাদের এ বলে হুমকি দিতেন যে, "আমার সাথীরা তোমাদের অপেক্ষা করতে বলেছে। তাঁরা আসছে; তোমরা কোথায় যাচ্ছ?" এটা তার পূর্ব বীরত্বেরই বহিঃপ্রকাশ।

(৩) خَيْل দ্বারা উদ্দেশ্য خَيْلُ الْعَدُوِّ অর্থাৎ হাকীম শত্রুর সম্মুখীন হলে আপন বীরত্বহেতু তাদের থেকে পলায়ন করতেন না; বরং তাদের প্রতি মনোযোগী হন। শত্রু ফিরে যেতে চাইলে তিনি বলতেন, কোথায় যাচ্ছ? আমাদের অশ্বারোহীদের অপেক্ষা কর। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসছে।

وَلَمْ يُقَسِّمْ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرَنَا (রসূল আমাদের ব্যতীত ময়দানে অনুপস্থিত অন্য কাউকে গনীমতের মালের অংশ দেননি) ঃ আহনাফের মতে, গনীমতের মাল দারুল ইসলামে জমা করার পূর্বে যারা মুজাহিদদের সাথে এসে শরীক হবে, তারাও গনীমতের অংশ পাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ীর মতে, যুদ্ধের পরে যারা আসবে, তারা গনীমতের অংশ পাবে না। (হেদায়া, আইনী)

আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস থেকে আহনাফ প্রমাণিত করেন যে, যুদ্ধ শেষে গনীমতের মাল দারুল ইসলামে উপস্থিত ও জমা করার পূর্বে যারা সৈন্যদের সাথে এসে শরীক হবে তারাও গনীমতের অংশ পাবে। শাফেয়ীদের দলীল, اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ অর্থাৎ, রণক্ষেত্রে উপস্থিতরাই গনীমতের প্রাপক।

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা আইনী তাদের এ দলীলের জওয়াব দেন যে, এ বর্ণনাটি হযরত উমর (রযি.)-এর উক্তি মাত্র, রসূল (স.)-এর উক্তির ব্যাপারটি অপ্রসিদ্ধ।

কতিপয় শাফেয়ী আহনাফের দলীলের জওয়াবে বলেন যে, এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু মূসা (রযি.)। তিনি জানতেন না যে, তারা গনীমত জমা করার পূর্বেই উপস্থিত হন। হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তাঁর এক উক্তিতে বলেন, যুদ্ধ সমাপ্তির পর গনীমত জমা করার পূর্বে যারা উপস্থিত হবে, তারা গনীমতের হিসসা পাবে।

আল্লামা আইনী বলেন, তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে দলীল প্রয়োজন। ইবনে হিব্বান বলেন, হাবশায় হিজরতকারীদেরকে গনীমতের মাল থেকে নয়; বরং খুমুস থেকে দেয়া হয়। আইনী বলেন, এ কথারও প্রমাণ চাই। —আইনী।

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلٰى (রসূল বললেন, হ্যাঁ) ঃ

এখানে প্রশ্ন হয় যে, রসূল (স.) উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে পরে ইরশাদ করেন, لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا অর্থাৎ, চাদর তার উপর অগ্নি প্রজ্বলিত করবে—অতঃপর আবার بَلٰى তথা 'হ্যাঁ' কিভাবে বললেন? এ প্রশ্নের জওয়াবে কোন কোন ব্যাখ্যাকারক একে তাসহীফ বলেছেন অর্থাৎ, তাঁরা بَلٰى-এর অর্থ 'সত্যই' করেছেন।

ইমাম নববী বলেন, সাহাবারা ঐ ব্যক্তির শহীদ তথা বিনা হিসাবেই জান্নাতে যাবার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করায় রসূল (স.) তাদেরকে অত্যন্ত তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করেন এবং তাদের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বরং সে খেয়ানতের কারণে দোযখে যাবে।

লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে, এখানে بَلٰى অর্থ 'না'। ভারতীয়রা কণ্ঠ পরিবর্তন ও দীর্ঘশ্বাস ہاں (বাংলাতে হুঁ) যেরূপ বলে, ঠিক তদ্রূপ এখানে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার بَلٰى শব্দটি তার প্রকৃত অর্থেও ব্যবহৃত হওয়া সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা এভাবে যে, প্রথমে রসূল (স.) এ শব্দ দ্বারা তার শাহাদাতকে প্রমাণিত করেন অতঃপর তার অবাধ্যতাহেতু শাস্তির কথাও উল্লেখ করেন। কেননা, শাহাদাত পাপের বিরোধী নয়।

لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا ঃ ঐ ব্যক্তির উপর অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার কারণ হলো, বণ্টনের পূর্বে গনীমতের মালে খেয়ানত করা। ফতহুল বারীতে আছে, হতে পারে খোদ এ চাদরই অগ্নিতে পরিণত হবে। আর তা দ্বারা তাকে আঘাত করা হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, সেটা নিজেই অগ্নি হবে না; বরং তার শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার কারণ হবে।

www.e-ilm.weebly.com

لَوْ لَا أَنْ أَتْرُكَ أٰخِرَ النَّاسِ بَبَّانًا : بَبَّانًا শব্দের প্রথম بَاء টি যবর ও দ্বিতীয় بَاء টি তাশদীদযুক্ত হবে। কেউ এর অর্থ করেন, شَيْئًا وَاحِدًا অর্থাৎ, একই বস্তু। কেউ অর্থ করেন, مُسْتَوِيًا অর্থাৎ, বরাবর। আর কেউ করেন, طَرِيْقَةً وَاحِدَةً অর্থাৎ, এক রাস্তা। বাক্যের মর্মার্থ হলো, সর্বদা নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত একদল লোক আমার পরে যদি না থাকত, তবে আমি বিজিত অঞ্চলের জমিজমা মুজাহিদদের মাঝে তদ্রূপ বণ্টন করে দিতাম, যেমন রসূল (স.) খয়বারের জমিজমা বণ্টন করে দিয়েছিলেন। আমি কেবল মুসলিম জনসাধারণের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তা মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করিনি; বরং সর্বদার জন্য তা ওয়াকফ করছি। তাদের জন্য এটা 'বিশেষ ফান্ড' স্বরূপ রেখে যাচ্ছি। যাতে তারা প্রয়োজনের মুহূর্তে ঐ জমির ফসলাদি বণ্টন করে তা থেকে উপকৃত হতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এটা তো মুজাহিদদের হক ছিল, তিনি কিভাবে বণ্টন করলেন না? উত্তর হলো, হযরত উমর (রযি.) মুজাহিদদের রাজি করেই এ কাজটি করেন। সাথে সাথে তিনি তাদের এটাও বলে রাখেন যে, ইমাম কোন সময় ভাল মনে করলে তা মুজাহিদদের মধ্যেও বণ্টন করে দিতে পারেন। (আইনী)

وَإِنَّ حَزَمَ خَيْلِهِمْ لِلِيْفٍ : حُزُمٌ এটা حِزَامٌ-এর বহুবচন। অর্থ, ঘৌড়াসন। (ঘোড়ার পৃষ্ঠোপরি ঐ সীট যাতে ঘোড় সওয়ার বসে) বাক্যের অর্থ, তাদের ঘৌড়াসনগুলো অবশ্য খেজুরের ছালের ছিল। يَا وَبْرُ : অর্থাৎ, ছোট বন বিড়াল।

لَاتَقْسِمْ لَهُمْ (আপনি তাদের গনীমতের অংশ দিবেন না) : এ বাক্য হতে জানা যায় যে, হযরত আবু হুরায়রার পক্ষ হতে এ আবেদন হয়। কিন্তু প্রথম বর্ণনানুযায়ী জানা যায়, এটা হযরত আবানের (রযি.) আহ্বান ছিল। এ বৈপরীত্বের সমাধান হলো, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবান ও হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) উভয়ের পক্ষ হতে এ অনুরোধ করা হয় যে, অপরকে না দেয়া হোক। আবু হুরায়রা বলেন, এ আবান বিন নওফেল (যিনি উহুদ যুদ্ধে কাফের ছিলেন এবং খয়বারের পূর্বে মুসলমান হন) সাহাবী নুমান আনসারীর ঘাতক। আর আবান (রযি.) বলেন, যুদ্ধে আবু হুরায়রার কোন ভূমিকা নেই। অতএব তিনি যুদ্ধ লভ্যাংশ পাবার যোগ্য নন।

فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ : রসূল (স.) তাদের কাউকে যুদ্ধলব্ধ মাল দেননি। কারণ, তারা যুদ্ধ সমাপ্তি ও গনীমতের মাল দারুল ইসলামে জমা করার পরে খয়বারে এসেছিলেন।

لَا نُوْرَثُ হাদীস বনাম হযরত ফাতেমা ও আবু বকরের মতবিরোধ :

فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى أَبِيْ بَكْرٍ فِيْ ذٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ (ফাতেমা এ ব্যাপারে হযরত আবু বকরের প্রতি খুব রুষ্ট হন। ফলে তিনি

www.e-ilm.weebly.com

মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে আলাপ করেন না) ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, হযরত আবু বকর (রযি.) হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া সত্ত্বেও হযরত ফাতেমার (রযি.) রুষ্ট হওয়ার অর্থ কি? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, শরীয়তে কথা বন্ধ করা নিষিদ্ধ। তাহলে হযরত ফাতেমা এমনটি করলেন কেন?

ঘটনার বিশদ বিবরণ ঃ উল্লিখিত প্রশ্নদ্বয়ের জওয়াব নিম্নরূপ। (১) কারো মতে, হযরত ফাতেমা (রযি.) হযরত আবু বকরের প্রতি রুষ্ট হন নি। আর যে সকল বর্ণনায় এসেছে যে, فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلٰى اَبِىْ بَكْرٍ অথবা فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ তার সমাধান হলো, এটা বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র। তাঁরা "হযরত ফাতেমা কর্তৃক কথা বর্জন" থেকে এমনটি বুঝে তা বর্ণনা করেন। বাকী থাকে কথা বর্জন প্রসঙ্গ। মূলত ব্যাপারটি সার্বিক নয়; বরং এটা শুধু মিরাস সংক্রান্ত কথা বর্জন ছিল। অর্থাৎ, হযরত আবু বকর কর্তৃক হাদীস পেশ করার পর তিনি মিরাস সংক্রান্ত কোন আলোচনা হযরত আবু বকরের সাথে করেননি। তবে এ উত্তর বুখারীর বর্ণনার সম্পূর্ণ খেলাফ। কারণ বুখারীতে এসেছে, ফাতেমা আবু বকরের প্রতি রুষ্ট হন।

(২) সেজন্য কেউ কেউ এ জবাব দেন, হযরত ফাতেমার রাগ মিরাস না দেয়ার কারণে ছিল না; বরং সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে হযরত আবু বকর তাঁকে কোন দান বা উপঢৌকন না দেয়ার কারণে ছিল। কারণ, হাদীসের দৃষ্টিতে যদিও তিনি তাকে মিরাস দেয়া থেকে বিরত থাকেন; কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে কিছু হাদিয়া-তোহফা দিয়ে তাঁকে খুশি করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি এ মানবতা ও সৌজন্যতা দেখাননি।

(৩) কোন কোন ইমামের মতে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে তিনি হযরত আবু বকর (রযি.)-এর সাথে দেখা- সাক্ষাৎ বর্জন ও যোগাযোগ রাখা হতে বিরত থাকেন। এটা শরীয়ত নিষিদ্ধ নয়। কারণ, কথা বর্জন নিষিদ্ধ হওয়ার শর্ত হলো, উভয়ের মাঝে সাক্ষাৎ হলে একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং নিজেদের মধ্যে সালাম বিনিময় না হওয়া। অথচ কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় না যে, তাঁদের পরস্পরে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু সালাম-কালাম হয়নি; বরং মূল ঘটনা হলো, হযরত ফাতেমা আবু বকর (রযি.) হতে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এসে পারিবারিক কাজে মনোনিবেশ করেন। একেই বর্ণনাকারী هِجْرَان তথা 'কথা বন্ধ' দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

হযরত আবু বকর (রযি.) হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া সত্ত্বেও হযরত ফাতেমার রুষ্ট হওয়ার কারণ হলো, হযরত আবু বকর (রযি.) হাদীসটির ব্যাপকার্থ হতে প্রমাণ পেশ করেন। পক্ষান্তরে হযরত ফাতেমা (রযি.) রসূল (স.)-এর উক্তি لَانُوْرَثُ-কে সীমিত অর্থে প্রযোজ্য করেন। যেহেতু হাদীসটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে যে, তা

www.e-ilm.weebly.com

عَامٌ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ ও হতে পারে, সেহেতু হযরত ফাতেমা রাগান্বিত হন এবং আবু বকরের (রযি.) সাথে দেখা- সাক্ষাৎ বর্জন করেন।

(৪) বায়হাকী (রহ.) শা'বী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, أَنَّ أَبَابَكْرٍ أَعَادَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ هٰذَا أَبُوْ بَكْرٍ يَسْتَاذِنُ عَلَيْكِ قَالَتْ أَتُحِبُّ أَنْ أٰذَنَ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَأَذِنَتْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَتَرَضَّاهَا فَرَضِيَتْ অর্থাৎ, হযরত আবু বকর (রযি.) ফাতেমার সেবা-শুশ্রূষায় এলে হযরত আলী (রযি.) তাঁকে বলেন, ইনি আবু বকর, তোমার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন! তিনি বলেন, আমি অনুমতি দিলে আপনি খুশী হবেন; আলী (রযি.) বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি অনুমতি দিলে আবু বকর আসেন এবং তাঁকে খুশি করেন। হযরত ফাতেমাও এ পরস্পর আলোচনায় অত্যন্ত প্রীত হন। এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হলে আর কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না।

(৫) শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) লামিউদ দারারী গ্রন্থে লেখেন, মিরাসের মাল না পাবার কারণে অথবা আবু বকর (রযি.) বিশেষ দৃষ্টি না দেয়ার কারণে হযরত ফাতেমা (রযি.) তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন বলে যে কথাটি প্রচলিত আছে, প্রকৃতপক্ষে যদিও এ কথার সম্বন্ধ হযরত ফাতেমা (রযি.)-এর প্রতি প্রদান করা শোভনীয় নয়। তথাপি কঠোরতার সাথে দায়িত্ব পালন এবং এতে কোন নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা না করার কারণেই তা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এই হলো সাহাবাদের গৌরবময় কীর্তি। পারস্পরিক সকল বাদানুবাদের নেপথ্যে এটাই ছিল মূল কারণ অর্থাৎ, তারা যা সত্য ও সঠিক বলে মনে করতেন তা প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতেন এবং এ ব্যাপারে কাউকে কোন ছাড় দিতেন না।

রসূলের কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমা, আলী ও মীরাসের অন্যান্য দাবীদাররা জানতেন যে, لَانُوْرِثُ হাদীসটি عَامٌ নয়; বরং এ নীতি শুধু স্থাবর বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অস্থাবর বস্তুর মধ্যে মিরাস হতে পারে। পক্ষান্তরে মীরাসের বিরোধী মহল উক্ত হাদীসটিকে ব্যাপকার্থে প্রয়োগ করেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে হযরত ফাতেমার অসন্তুষ্টি ছিল একটি শরয়ী বিষয় ও দাবীর বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য; সম্পদের লোভে নয়। হযরত ফাতেমার যথাযোগ্য মানসম্মত ব্যাখ্যানুসরণ করলে বুখারীর হাদীসের আর ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন হয় না। আর শরয়ী বিষয়ের জন্য কথা বন্ধের বৈধতা বহু হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ এক হাদীসে এসেছে, نَهَى النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِ كَعْبٍ وَصَاحِبِهِ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً অর্থাৎ, রসূল (স.) মুসলমানদেরকে কা'ব ও তাঁর সাথীদের সাথে পঞ্চাশ দিন কথা বলতে নিষেধ করেন। (লামিউদ দারারী ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৫০০-২)

وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ ঃ হযরত ফাতেমার (রযি.) জীবদ্দশায় তাঁর সম্মান ও মর্যাদার খাতিরে হযরত আলী (রযি.)-এর প্রতি সকলের এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। হযরত আলীও ফাতেমাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

www.e-ilm.weebly.com

اِسْتَنْكَرَ عَلِىٌّ وُجُوهَ النَّاسِ (আলী (রযি.) মানুষের দৃষ্টিকে ভাল বুঝলেন না) ঃ হযরত ফাতেমার (রযি.) ইন্তেকালের পর হযরত আলীর উপর থেকে মানুষের বিশেষ দৃষ্টি সরে যায়। পূর্বের মত মানুষ তাঁকে সম্মান করত না। এ দু'অবস্থার তারতম্যের কারণ হলো, এতদিন তিনি হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত হননি। হযরত ফাতেমার জীবদ্দশায় তিনি তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মানুষেরা তাঁকে অবস্থার শিকার মনে করতেন। কিন্তু হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের পর যেহেতু পূর্বের মত কোন ব্যস্ততা ছিল না; তাই এ সময় বাইয়াত না হওয়ায় মানুষের চোখে তিনি হাল্কা হয়ে যান। লোকজন তাঁকে ভাল নজরে দেখত না।

وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبُو بَكْرٍ (হযরত আবু বকরকে হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের খবর দেয়া হয় না) ঃ আবু বকরকে হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের খবর না দেয়াটা বিদ্বেষ কিংবা রাগারাগির কারণে ছিল না; বরং (১) তিনি কঠিন বিপদের সম্মুখীন হওয়ায় তার পক্ষে খবর দেয়া সম্ভব হয় না। (২) অনাত্মীয়ের (গায়রে মাহরাম) উপস্থিতির ব্যাপারে হযরত ফাতেমার অসন্তুষ্টি (৩) হযরত আলী (রযি.) ধারণা করেন যে, বিষয়টি তার কাছে গোপন থাকবে না; বরং কোন না কোন মারফত তিনি জানবেনই।

وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرِ ঃ অর্থাৎ, ঐ ছয় মাস নাগাদ হযরত আলী হযরত আবু বকরের হাতে বাইয়াত হননি। এ বাইয়াত না হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন দোষণীয় ছিল না; বরং মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্যের বাইয়াতই যথেষ্ট।

আল্লামা আইনী বলেন, মজলিসে শূরা তথা কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে কোন একজন নবনির্বাচিত খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেই যথেষ্ট হবে। সবার বাইয়াত হওয়া জরুরী নয়। আবার এটাও আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেকেই উপস্থিত হয়ে হাতে হাত দিয়ে তা করতে হবে। বরং এতটুকু আনুগত্য ও সমর্থনই যথেষ্ট যে, সে নির্বাচিত খলীফার বিরোধিতা করবে না, তাঁর বিরুদ্ধে দল-উপদল গঠন কিংবা তৃতীয় কোন প্যানেল (ধারা) সৃষ্টি করবে না। হযরত আলী (রযি.)-এর অবস্থাও ঠিক এরূপ ছিল। হযরত আবু বকরের কাছে উপস্থিত হতে বিলম্ব ছাড়া তাঁর থেকে বিরোধিতামূলক কোন কিছুই প্রকাশ হয়নি।

এ হাদীসের ভিত্তিতে খারেজীরা হযরত আলী (রযি.)-এর প্রতি বিষোদগার ও ছয় মাস নাগাদ বাইয়াত না হওয়ার অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু ইতঃপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় কিছু নয়। দ্বিতীয় জওয়াব হলো, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রযি.) হতে বিশুদ্ধ-হাদীসে এসেছে যে, إِنَّ عَلِيًّا بَايَعَ أَبَابَكْرٍ أَوَّلَ الْأَمْرِ অর্থাৎ, হযরত আলী প্রথমবারেই হযরত আবু বকর (রযি.) এর হাতে বাইয়াত হন। এ হাদীসের আলোকে খারেজীদের আপত্তি কর্পূরের মত উড়ে যায়।

www.e-ilm.weebly.com

আর মুসলিমের বর্ণনায় ইমাম জুহরী হতে বর্ণিত রেওয়ায়েত ঃ জনৈক ব্যক্তি তাকে বলেন, হযরত আলী (রযি.) হযরত ফাতেমা (রযি.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত এবং বনূ হাশেমের কেউ আবু বকরের হাতে বাইয়াত হননি-এর জওয়াব হলো বায়হাকী (রহ.) হাদীসটি এ মর্মে দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন যে, ইমাম যুহরী (রহ.) হাদীসের সনদ বর্ণনা করেননি। পক্ষান্তরে আবু সাঈদ কর্তৃক বর্ণিত ধারাবাহিক সূত্রে আগত হাদীসটি অধিকতর বিশুদ্ধ।

দ্বিতীয় জওয়াব হলো, হযরত ফাতেমার ইন্তেকালের পরে হযরত আলীর বাইয়াতটি ছিল দ্বিতীয় বাইয়াত। আর তার উদ্দেশ্য ছিল, মীরাস প্রসঙ্গ উত্থাপন ও হযরত আবু বকরের কার্যালয়ে ঠিকমত উপস্থিত না হওয়ার কারণে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় অপনোদন করা।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, আলোচ্য প্রসঙ্গে হযরত আবু বকর ও আলীর মধ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতি ও অপারগতা বিষয়ে কেউ ইনসাফের দৃষ্টিতে চিন্তা করলে অবশ্যই জানবে যে, তাঁরা আপসে একে অপরের মর্যাদা অবশ্যই স্বীকার করতেন। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তাঁদের অন্তর ভরপুর ছিল। মানুষ হিসেবে কখনো প্রবৃত্তির শিকার হলেও সততা, বিশ্বস্ততা ছিল তাঁদের অগাধ।

بَابُ الشَّاةِ الَّتِىْ سُمَّتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ

ছাগলের গোশতে বিষ মিশিয়ে খয়বারে রসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

شَاةٌ فِيْهَا سَمٌّ (বিশ মিশ্রিত ছাগল) ঃ ইহুদীদের প্রবীণ নেতা সাল্লাম বিন মুশকিমের স্ত্রী যয়নাব বিনতে হারেস বিষ মিশিয়ে রান্না করা একটি ছাগল রসূল (স.)-এর নিকট হাদীয়া হিসেবে প্রেরণ করে। কোন বর্ণনায় আছে যে, গোশত নিজেই বিষ মিশ্রণের তথ্য ফাঁস করে দেয়। রসূল (স.) সঙ্গে সঙ্গে মুখে গ্রহণকৃত গোশত থু-থু করে ফেলে দেন। কিন্তু বিশর বিন বারা বিন মারুর (রযি.) তিক্ততা অনুভব করা সত্ত্বেও রসূল (স.)-এর সম্মুখে থু-থু করে ফেলে দেয়াকে আদবের খেলাফ মনে করে তা গিলে ফেলেন। কিছুক্ষণ পর এতেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, রসূল (স.) প্রথমে মহিলাকে মাফ করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিশরের ইন্তেকালের দরুণ হত্যার বদলাস্বরূপ (قِصَاصًا) তাকে হত্যা করেন। কোন বর্ণনায় এসেছে যে, মহিলাটি মুসলমান হয়ে যাওয়ায় রসূল (স.) তাকে ক্ষমা করে দেন। এর তিন বছর পর রসূল (স.) ইন্তেকালের সময় বলেন যে, খয়বারের বিষের প্রতিক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। বিষক্রিয়া তীব্র অনুভূত হচ্ছে। মূলত এ কারণে ইমাম যুহরী বলেন, রসূল (স.) শহীদী মৃত্যুবরণ করেন। (আসাহ্হুস সিয়ার)

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ غَزْوَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

যায়েদ বিন হারেসা যুদ্ধ

রসূল (স.) সাতটি যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। হযরত সালমা বিন আকওয়া হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ غَزَوْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ يُؤَمِّرُ عَلَيْنَا অর্থাৎ, আমি যায়েদ বিন হারেসের সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। রসূল (স.) তাঁকে আমাদের আমীর (সেনাপতি) নিযুক্ত করেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) উল্লিখিত সাত যুদ্ধের বর্ণনা নিম্নরূপ প্রদান করেন— (১) ৫ম হিজরীর জুমাদাল উখরাতে নজদবাসীদের প্রতি (২) ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউসসানীতে বনূ সালীমের প্রতি (৩) এ বছরেরই জুমাদাল উলাতে কুরাইশ কাফেলা অভিমুখে (৪) এ বছরেরই জুমাদাল উখরাতে বনূ সা'লাবার প্রতি (৫) বনূ হাকামের প্রতি (৬) ওয়াদিউল কুরার প্রতি এবং (৭) বনূ ফুযারা অভিমুখে।

কিন্তু অধ্যায়গত হাদীসে সে যুদ্ধ নির্ণয় করা হয়নি, যাতে তিনি আমীর নিযুক্ত হন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হতে পারে এখানে শেষ যুদ্ধই লেখকের উদ্দেশ্য।

بَابُ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ

উমরাতুল কাযা প্রসঙ্গ

নামকরণ ঃ আল্লামা সুহাইলী বলেন, হুদায়বিয়ার উমরার 'কাযা উমরা' হওয়ায় এর নাম উমরাতুল কাযা বা কাযা উমরা রাখা হয়নি; বরং কুরাইশ তথা মক্কার মুশরিক এবং মুসলমানদের মধ্যে হুদায়বিয়ায় লিখিত সন্ধিচুক্তি কার্যকরী হওয়ায় উমরাতুল কাযা নামে নামকরণ করা হয়। কারণ, হুদায়বিয়ার উমরা কাযা হয়েছিল না যে, তার কাযা আবশ্যক হবে। বরং হুদায়বিয়ার উমরা পরিপূর্ণ উমরা ছিল। এ কারণেই হুদায়বিয়ার উমরাকে রসূল (স.)-এর উমরা চতুষ্টয়ের একটি গণনা করা হয়। তবে কতিপয়ের মতে উমরাতুল কাযাটা হুদায়বিয়ার উমরার কাযা ছিল। আর তাকে স্বতন্ত্র উমরা হিসেবে পরিগণিত করার কারণ হলো, তারও পূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব রয়েছে।

আল্লামা আইনীর উদ্ধৃতি ঃ হাকিম বলেন, যুদ্ধ বর্ণনাকারী আইম্মায়ে কেরাম থেকে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রকাশ, ৭ম হিজরীর জিলকদ মাসের চাঁদ উঠলে রসূল (স.) সাহাবাদেরকে উমরার কাযা করার নির্দেশ দেন। এ হাদীস প্রথম বক্তব্যকে খণ্ডন করে।

ফাতহুল বারীতে এ উমরার চারটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। (১) উমরাতুল কাযা (২) উমরাতুল কজিয়্যাহ (৩) উমরাতুল কিসাস ও (৪) উমরাতুস্ সুলাহ।

যুদ্ধ পর্বে উমরাতুল কাযার উল্লেখ ও তাকে যুদ্ধ আখ্যা দেয়ার কারণ সম্পর্কে আল্লামা আইনী বলেন, ইহরামের বছর ও তার পরবর্তী বছরে মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের ফলে লেখক যুদ্ধ পর্বে উমরার উল্লেখ করেছেন। যদিও বাস্তবে কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়নি। আর যুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করতে তরবারির যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক নয়।

www.e-ilm.weebly.com

পক্ষান্তরে আল্লামা কস্তলানী বলেন, উমরাকে যুদ্ধ পর্বে উল্লেখের কারণ হলো, রসূল (স.) কুরাইশদের প্রতারণার আশঙ্কায় অস্ত্রে সজ্জিত ও যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েই রওনা দেন। আর যুদ্ধ শব্দ ব্যবহারের জন্য বাস্তবে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া জরুরী নয়।

রসূল (স.) ৭ম হিজরীর জিলকদ মাসে উমরার নিয়তে মদীনা হতে রওনা হন। এ সফরে মহিলা ও শিশু ব্যতিরেকে দু'হাজার মুসলমান নবীজীর সফরসঙ্গী ছিলেন। সশস্ত্র অবস্থায় রসূল (স.) মদীনা হতে রওনা হন। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী রসূল (স.) বাতনে ইয়াজুজ নামক স্থানে পৌঁছে সকল অস্ত্র-শস্ত্র সেখানেই রেখে দেন। সাথে শুধু আত্মরক্ষার তলোয়ার ছিল। রসূল (স.) তিন দিন মক্কায় থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوْا هٰذَا مَا قَاضَانَا عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

(তারা সন্ধিপত্র প্রস্তুত করলে তাতে লিখেন যে, আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ (স.) সিদ্ধান্ত নিয়েছেন) ঃ هذا তথা 'এ' দ্বারা ব্রেনস্থ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ বর্ণনাটি ভুল। শুদ্ধ বর্ণনা হলো ঃ

هٰذَا مَاقَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

كَتَبُوْا (তারা লিখলেন) ঃ এ শব্দ হতে কেউ কেউ ভ্রান্তির কবলে পড়েছেন। কারণ, তারা এর দ্বারা কুরাইশদের বুঝেছেন। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। কেননা সন্ধি লেখক কুরাইশ ছিলেন না, বরং মুসলমান ছিলেন। যেহেতু সন্ধিপত্রের লেখা মুসলমানদের রায়ে হয়, এজন্য লেখক একজন হওয়া সত্ত্বেও রূপকভাবে সকলের কথা বলা হয়েছে।

فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكْتُبَ فَكَتَبَ (রসূল পত্রটি নেন। তিনি হস্তলিপিতে পারদর্শী ছিলেন না, তথাপি লিখেন) ঃ এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আল্লাহ কুরআনে বলেন, اَلرَّسُوْلُ النَّبِىُّ الْأُمِّىُّ অর্থাৎ, মুহাম্মাদ উম্মী নবী ও রসূল। আর أُمِّى (উম্মী) লিখতে পারেন না, তবে এখানে রসূল (স.) কিভাবে লিখলেন? আল্লামা আইনী এর জওয়াবে বলেন ঃ (১) উম্মী তাকে বলে, যে ভাল করে লিখতে পারে না। এটা নয় যে, একেবারে লিখতে পারে না (২) প্রকৃতপক্ষে লেখক ছিলেন হযরত আলী (রযি.)। রসূল (স.)-এর নির্দেশক্রমে তিনি লেখায় নবীজীর প্রতি রূপকভাবে এ সম্বন্ধ দেয়া হয় (৩) রসূল (স.) মোজেজা স্বরূপ নিজেই লেখেন। আল্লামা কাজি আয়াজ (রহ.) এ শেষোক্ত ব্যাখ্যাকে প্রাধান্য দেন।

আল্লামা কস্তলানী বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেন যে, فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْكِتَابَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ أَرِنِىْ مَكَانَهَا فَمَحَاهَا فَعَادَهَا لِعَلِيٍّ فَكَتَبَ

www.e-ilm.weebly.com

عَلِى অর্থাৎ, নবীজী পত্রটি নিয়ে আলীকে বললেন, আমাকে (রসূলুল্লাহ লিখিত) স্থানটি দেখিয়ে দাও। অতঃপর তিনি তা কেটে দিয়ে পুনরায় আলীর প্রতি বাড়িয়ে দিলে আলী (রযি.) লিখেন। এ ব্যাখ্যা প্রদান করে আল্লামা কস্তলানী সামনে লেখেন ঃ এ ব্যাখ্যার দ্বারা 'নবীজী লিখেছেন' বলে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয় তা দূরীভূত হয়ে যায়।

সন্ধির শর্তাবলী ঃ যে সকল শর্তের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তা নিম্নরূপ ঃ

(১) আগামী দশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে।

(২) উভয় পক্ষ সম্পূর্ণ নির্ভয় ও নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো প্রতি আক্রমণ করবে না।

(৩) মুসলমানরা এ বছর ফিরে যাবেন।

(৪) আগামী বছর আসবেন এবং তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। তবে শর্ত হলো তরবারী খাপবদ্ধ থাকবে।

(৫) কোন মুসলমান কুরাইশের নিকট আশ্রয় নিলে কুরাইশরা তাকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে না।

(৬) কুরাইশদের কেউ অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া মুসলমানদের কাছে আশ্রয় নিলে, তারা তাকে ফেরৎ দানে বাধ্য থাকবে।

(৭) এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতারণা-ধোঁকা দিবে না। বন্ধুর ন্যায় একে অপরের প্রতি আস্থা রাখবে। যুদ্ধ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। সন্ধির সময়সীমা পূর্ণ করবে।

(৮) কোন প্রকার চুরি ও খেয়ানত হবে না। প্রত্যেকের জান-মাল একে অপরের থেকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যভাবে হেফাজত থাকবে।

(৯) কোন গোত্র কুরাইশদের সাথে চুক্তি করতে চাইলে, তারা তা করতে পারবে। অনুরূপ কোন গোত্র মুহাম্মদের (স.) সাথে চুক্তি করতে চাইলে তারাও তা করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না।

(আসাহহুস সিয়ার)

فَتَبِعَتْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِى يَاعَمِّ يَاعَمِّ (চাচাজান-চাচাজান বলে ডাকতে ডাকতে হামযার কন্যা নবীজীর পিছে পিছে এল) ঃ প্রসিদ্ধ উক্তি অনুযায়ী হামযার কন্যার নাম উমারা। বংশের দিক থেকে সে নবীজীর চাচাত বোন ছিল। রসূল (স.) এর সমুচ্চ মর্তবা ও মর্যাদাহেতু সে এখানে চাচাজান, চাচাজান বলে ডাক দিয়েছে। অথবা হযরত হামযা রসূল (স.) এর দুধ ভাই ছিলেন বলে সে চাচাজান বলে সম্বোধন করে।

فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌّ (رض) فَأَخَذَ بِيَدِهَا (আলী তাকে কাছে টেনে নিলেন এবং হাত ধরলেন) ঃ যদি এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মক্কা থেকে কাউকে নিয়ে যাওয়া, এটা তো মুশরিকদের শর্তের বিরোধী হয়ে গেল। উত্তর হলো, মুমিন মহিলারা উক্ত

www.e-ilm.weebly.com

শর্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় উত্তর হলো, নবীজী (স.) নিজে তাকে বের করেননি এবং কাউকে তাঁর সাথে যাওয়ার নির্দেশও দেননি। তদুপরি মুশরিকরা তার ফেরতও দাবী করেনি। (কস্তলানী)

كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ أَرْبَعًا ঃ হজ্ব পর্বের বর্ণনায় দুইটি উমরার কথা এসেছে। সেখানে আরও অতিরিক্ত রয়েছে যে, إِحْدٰى هُنَّ فِى رَجَبَ অর্থাৎ, একটি রজব মাসে। আইনী ও কস্তলানীর হস্তলিপিতে এ বর্ণনাতেও বর্ধিত অংশটুকু মওজুদ রয়েছে।

وَمَا اعْتَمَرَ فِى رَجَبَ قَطُّ (নবীজী রজবে কখনও উমরা করেননি) ঃ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এটাও এসেছে যে, وَابْنُ عُمَرَ يَسْمَعُ فَمَا قَالَ لَا وَلَا نَعَمْ بَلْ سَكَتَ অর্থাৎ, ইবনে উমর হযরত আয়েশার এ কথা শুনে তিনি হ্যাঁ-না কিছু বলেন নি; বরং নীরব থাকেন।

ইমাম নববী বলেন, হযরত আয়েশার অস্বীকারের উপর ইবনে উমরের চুপ থাকাটা প্রমাণ করে যে, বিষয়টি তার কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়। অথবা ব্যাপারটি তিনি ভুলে গেছেন। অথবা তিনি সন্দেহে পতিত হন। বস্তুত এ কারণেই হযরত আয়েশার নেতিবাচক উক্তি হযরত ইবনে উমরের ইতিবাচক উক্তির উপর প্রাধান্য পায় নতুবা সূত্র মোতাবেক ইতিবাচক উক্তিই নেতিবাচকের উপর অগ্রগণ্য হওয়ার কথা।

وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا إِلَّا شَوَاطَ الثَّلَاثَةَ (নবী তাদেরকে তিনবার রমল (বীরত্বব্যঞ্জক অবস্থায় প্রদক্ষিণ) করতে নির্দেশ দিলেন) ঃ কস্তলানী বলেন, মুশরিকরা إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ অর্থাৎ,, 'তিনি তোমাদের প্রতি প্রাধান্য বিস্তার করলেও ইয়াসরিবের আবহাওয়া তাদের দুর্বল করে দিয়েছে' একথা বললে আল্লাহ পাক রসূল (স.)-কে বিষয়টি অবহিত করেন। ফলে রসূল (স.) সাহাবাদের রমল করার নির্দেশ দেন।

لِيَرَى الْمُشْرِكِيْنَ قُوَّتَهُمْ (যাতে মুশরিকরা তাদের শৌর্য-বীর্য দেখে নেয়।

লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে যে, একই বিষয়ের একাধিক কারণ হতে পারে। ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় এ কারণ বর্ণিত হয়েছে যে, ইব্রাহীমকে (আ.) হজ্বের আহকাম পালনের নির্দেশ দেয়া হলে শয়তান সায়ীর সময় তার সামনে এসে গতিরোধ করলে ইব্রাহীম (আ.) তাকে পরাজিত করে সম্মুখ পানে অগ্রসর হন। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় হযরত হাজেরার সায়ীকে এর কারণ নিরূপণ করা হয়েছে।

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُوْنَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ঃ রসূল (স.) উমরাতুল কাযার এ সফরে মক্কা হতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত 'সারিফ' নামক স্থানে হযরত মায়মুনাকে

www.e-ilm.weebly.com

(রযি.) বিবাহ করেন। ঘটনাক্রমে এ স্থানে তাঁর বাসর রাত অনুষ্ঠিত হয় আবার পরবর্তীতে এ স্থানেই হযরত মায়মুনা (রযি.) ইন্তেকাল করেন।

মুহরিমের বিবাহ বৈধতার উপর আহনাফ এ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন। কেননা এ হাদীসে ইহরাম অবস্থায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তবে সঙ্গম অবৈধ। পক্ষান্তরে আইম্মায়ে ছালাছার মতে ইহরাম অবস্থায় নিজে যেমন বিবাহ করা জায়েয নেই, তেমনি অন্যকেও বিবাহ দেয়া জায়েয নেই। উভয় পক্ষের হাতে হাদীস রয়েছে। তবে আহনাফ মেধাশক্তি, দৃঢ়তা ও আস্থার দিক বিবেচনায় হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনাকে অন্যান্যদের বর্ণনার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

بَابُ غَزْوَةِ مُوْتَةَ

মুতা যুদ্ধ

مُـوْتَـةَ শব্দটির মীম বর্ণে পেশ হবে। সিরিয়ার বাইতুল মুকাদ্দাসের দু'মিল দূরবর্তী বালকার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম মুতা। যদিও রসূল (স.) এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন না, তথাপি মুহাদ্দিসগণ একে 'মুতা যুদ্ধ' নামে অভিহিত করেন।

যুদ্ধের পটভূমি ঃ রসূল (স.) এক পত্র লিখে হারেস বিন উমাইর আযাদীকে দূত হিসেবে বসরার শাসকের কাছে প্রেরণ করেন। রোম সম্রাটের পক্ষ হতে সিরিয়ার শাসক শারাহবীল বিন আমর গসসানী দূতকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে। ইতঃপূর্বে রসূল (স.)-এর প্রেরিত কোন দূত হত্যার শিকার না হওয়ায় রসূল (স.) সর্বপ্রথম এ ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত হন। তিনি শারাহবীলকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হযরত যায়েদ বিন হারেসের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন। ৮ম হিজরীর জুমাদাল উলায় এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ফলাফল ঃ ইমাম যুহরী থেকে বর্ণিত আছে, হযরত খালিদ বিন ওলীদ[১] (চতুর্থ পর্যায়ে) সেনানায়ক নিযুক্ত হলে আল্লাহ মুসলমানদের বিজয় দান করেন। (ইবনে হিশাম)

فَوَاللّٰهِ مَا أَنْتَ تَفْعَلُ وَمَا تَرَكْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَنَاءِ ঃ ইমাম নববী (রহ.) এ বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহর শপথ, রসূল (স.) তোমাকে যে কাজে নিয়োগ করেছেন তুমি তা করতে অপারগ। অথচ এ অপারগতার খবর তাঁকে জানাওনি। তাহলে তিনি তোমার পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ করে অস্বস্তি থেকে একটু আরাম করতে পারতেন!

اِبْنُ ذِى الْجَنَاحَيْنِ ঃ মুতা যুদ্ধে হযরত জাফরের[২] দু'হাত কেটে যাওয়ায় আল্লাহ তাকে দু'টি ডানা দান করেন, যাতে তিনি জান্নাতে উড়তে পারেন। (কস্তলানী)

আল্লামা আইনী বলেন, দু'ডানা দ্বারা উদ্দেশ্য (১) ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী ও (২) আত্মিক শক্তি। এটা হযরত জাফরকে দান করা হয়।

টীকা ঃ ১. হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রযি.), ইন্তেকাল ঃ ২১ হিজরী
২. হযরত জাফর বিন আবী তালেব (রযি.), মৃত্যু ঃ ৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

أُغْمِىَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ ঃ অর্থাৎ, অসুস্থতাহেতু আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন (মূর্ছা যান)।

تُعَدِّدُ عَلَيْهِ ঃ অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার বোন তার কৃতিত্ব উল্লেখ করে করে কাঁদছে, যা বৈধ নয়।

قِيْلَ لِىْ أَنْتَ كَذَالِكَ (আমাকে বলা হল, তুমি কি বাস্তবেই অনুরূপ) ঃ এটা নেতিবাচক জিজ্ঞাসা। এটা ভর্ৎসনা ও হেয় প্রতিপন্নের পন্থায় বলা হয়।

بِهٰذَا (এ কারণে) ঃ অর্থাৎ, পূর্ববর্তী হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী "তার বোন উমরা কাঁদতে থাকায়"। মুরসালে উবাই গ্রন্থে এসেছে যে, রসূল (স.) তার শয্যা পাশে যান। তিনি মূর্ছা গেলে রসূল (স.) এ মর্মে দোয়া করেন যে, যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে গিয়ে থাকে তবে মৃত্যুকষ্ট লাঘব করুন, অন্যথা তাকে সুস্থ করে দিন। এরপরে তাঁর কিছুটা হুঁশ ফিরে এলে তিনি বলেন, যখন প্রিয় বোন আমার মৃত্যুর ধারণায় উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও সজোরে কাঁদছিল, তখন এক ফেরেশতা লৌহ ডাণ্ডা উঠিয়ে বলল, তুমি বাস্তবেই এমনি? যদি আমি "হ্যাঁ' বলতাম, তবে সে ডাণ্ডা দ্বারা আমাকে ঠাণ্ডা করে দিত। (অর্থাৎ, বেদম প্রহার করতো।)

فَلَمَّا مَاتَ ঃ সুতরাং মুতা যুদ্ধে যখন তার (ইবনে রওয়াহা) ইন্তেকাল হয়।

لَمْ تَبْكِ عَلَيْهِ ঃ অর্থাৎ, আব্দুল্লাহ বিন রওয়াহার বোন তাঁর ইন্তেকালের সময় কাঁদেনি। কারণ, অসুস্থতাবস্থায় তিনি বেহুঁশ হয়ে পরবর্তীতে হুঁশ ফিরে পেয়ে তাঁকে কাঁদতে নিষেধ করেছিলেন। এ থেকে জানা যায় যে, পূর্বের অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেননি।

بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ إِلَى الْحُرُقَاتِ

রসূল (স.) কর্তৃক উসামাকে হুরুকা গোত্রের প্রতি প্রেরণ

اَلْحُرُقَاتُ ঃ হুরুকাত (তথা "ভস্মীভূত করা"র দিকে সম্বন্ধ যুক্ত) জুহাইনার একটি গোত্রের নাম। হুরকা নামক জনৈক ব্যক্তির নামে এ গোত্র পরিচিত লাভ করে। হুরকার প্রকৃত নাম নুহাইশ বিন আমের বিন সালাবা। এক ব্যক্তি পুরো এক গোত্রকে হত্যা করে সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়ায় পরবর্তীতে তারা হুরকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ গোত্রের বিভিন্ন শাখার দিকে লক্ষ্য করে حُرُقَاتٌ (বহুবচন) বলা হয়েছে।

ইমাম বুখারীর শিরোনাম থেকে বুঝা যায় যে, এ যুদ্ধের আমীর ছিলেন হযরত উসামা বিন যায়েদ (রযি.)। ৮ম হিজরীর রজব মাসে মুতা যুদ্ধে তার পিতা হযরত যায়েদ বিন হারেসার (রযি.) ইন্তেকালের পর তিনি আমীর নিযুক্ত হন। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা ৮ম হিজরীর মুতা যুদ্ধের পরের ঘটনা।

www.e-ilm.weebly.com

তবে যুদ্ধবেত্তাদের মতে এ যুদ্ধটি সারিয়াহ্ গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ লায়ছী নামে প্রসিদ্ধ। এতে গালেব লায়ছী সেনানায়ক ছিলেন। ৭ম হিজরীর রমযান মাসে তার নেতৃত্বে সাইফ্'র প্রতি এ সারিয়া প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধেই হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তিকে উসামা (রযি.) হত্যা করেন। আল্লামা কস্তলানী বুখারীর বর্ণনাকে প্রাধান্য দান করত তাকেই সত্য-সঠিক আখ্যা দিয়েছেন।

اِنِّىْ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَالِكَ الْيَوْمِ (এ দিনের পূর্বে যদি আমি মুসলমান না হতাম (বরং আজ হতাম) ঃ হযরত উসামার এ উক্তিটি অতিরঞ্জন মাত্র; বাস্তবিক নয়। অথবা উদ্দেশ্য হলো, তিনি এ উক্তি দ্বারা একটি পূত-পবিত্র ইসলামের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন।

غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ (আমি নবীজীর পাশে থেকে সাতটি যুদ্ধ করেছি)

আর তা হলো ঃ (১) খয়বার (২) হুদায়বিয়া (৩) হুনাইন (৪) জি্ব করাদ (৫) মক্কা বিজয় (৬) তায়েফ ও (৭) তাবুক। কোন বর্ণনায় সাতটির স্থলে নয়টির কথা এসেছে। এ বর্ণনাটি সঠিক হলে অবশিষ্ট দু'টি সম্ভবত (১) ওয়াদিউল-কুরা ও (২) উমরাতুল কাযা হবে।

مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُوْبَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةَ (আমাদের নেতৃত্ব দেন একবার আবু বকর আরেকবার উসামা) ঃ ঐতিহাসিকগণ লিখেন, যে সকল যুদ্ধে হযরত আবু বকরকে (রযি.) আমীর নিযুক্ত করে পাঠানো হয়, তা হলো ঃ (১) বনূ ফাযারার প্রতি (২) বনূ কিলাবের প্রতি (৩) বালকার পার্শ্ববর্তী উবনার প্রতি। ঐতিহাসিকগণ বাকী চারটি যুদ্ধের উল্লেখ করেননি।

কস্তলানী বলেন, হাদীসে শব্দের সংকোচন ঘটেছে। প্রকৃত শব্দ ছিল وَمَرَّةً عَلَيْنَا غَيْرُهَا

بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ
মক্কা বিজয় যুদ্ধ

وَمَا بَعَثَ حَاطِبُ بْنُ أَبِىْ بَلْتَعَةَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِغَزْوِ النَّبِيِّ ﷺ

অর্থাৎ, নবীজীর যুদ্ধাভিযান পরিচালনা সম্পর্কে অবহিত করতে হাতেব মক্কাবাসীর প্রতি পত্র প্রেরণ করেননি।

মক্কা বিজয় যুদ্ধের পটভূমি ঃ হুদায়বিয়ায় মক্কার মুশরিক ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি কুরাইশরা ভঙ্গ করায় মূলত এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হুদায়বিয়ায় সম্পাদিত চুক্তির অন্যতম একটি শর্ত ছিল, কোন গোত্র কুরাইশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তারা নিঃসঙ্কোচে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। অনুরূপ কোন গোত্র রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তি করতে চাইলে তারাও তা করতে পারবে। এ শর্তানুসারে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বনূ বকর কুরাইশদের সাথে আর বনূ খোযা'আ রসূল (স.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়। এ দু'গোত্রের মধ্যে ইসলামের পূর্ব হতে

www.e-ilm.weebly.com

শত্রুতা চলে আসছিল। বনূ বকর ও কুরাইশরা মিলে বনূ খোযাআর প্রতি চরম নির্যাতন চালায়। বনূ খোযা'আর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে কার্যত কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে। কারণ বনূ খোয়াআ রসূল (স.)-এর মিত্র ছিল। আমর বিন সালেম খোযাযী মদীনায় এসে রসূল (স.)-এর কাছে সাহায্যের আবেদন করে। তার এ আবেদনের প্রেক্ষিতে মক্কা বিজয়ের সূচনা ঘটে। (আসাহহুস সিয়ার)

মক্কা যুদ্ধপূর্বক বিজয় হয়, সন্ধিমূলক নয় ঃ মক্কা বিজয় যুদ্ধে রসূল (স.) রীতিমত ডান বাহিনী, বাম বাহিনী হিসেবে সৈন্য বিন্যাস করেন। একদিক হতে হযরত খালেদ (রযি.) আর অপর দিক হতে হযরত যুবাইর (রযি.) নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন।

ইকরামা, সফওয়ান প্রমুখ কিছু বর্বর সৈন্য নিয়ে প্রতিরোধ করে। কিন্তু পরাস্ত হয়ে পলায়ন করে। তারা হযরত কুরয বিন জাবের ফিহরী ও খুনাইস বিন খালিদ বিন রবীয়াকে শহীদ করে। তাঁরা হযরত খালেদের সৈন্যদলে ছিলেন। কিন্তু সৈন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিন্ন রাস্তা দিয়ে গমনকালে কাফেররা তাঁদের শহীদ করে দেয়। এ সংবাদ খালেদ (রযি.) অবহিত হলে তিনি তাদের উপর চড়াও হন এবং হত্যা করতে আরম্ভ করেন। এতে ১২ জন নিহত ও অবশিষ্টরা পলায়ন করে।

فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ (সেখানে উটে আরোহিতা এক মহিলা পাবে, তার কাছে একটি পত্র আছে) ঃ এ হাওদায় উপবিষ্টা মহিলার নাম ছিল সারা। হাতেব (রযি.) তাকে দশ দেনারে নিয়োগ করেছিলেন। এ মহিলা হযরত হাতেবের পক্ষ হতে মক্কাবাসীর নিকট যে পত্র নিয়ে রওনা হয় তার ভাষ্য ছিল নিম্নরূপ ঃ

কুরাইশগণ! রসূল (স.) তুফানের গতিসম্পন্ন রাতের ন্যায় সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে ধাবমান। আল্লাহর শপথ। তিনি তোমাদের বিরুদ্ধে একা এলেও আল্লাহ তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য করবেন এবং তার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। অতএব নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হও। ওয়াস সালাম। (আইনী)

دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ (আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি এ মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দিই) ঃ হযরত উমর (রযি.) হাতেবের প্রতি মুনাফিক শব্দ উচ্চারণের কারণ হলো, তার আভ্যন্তরীণ কার্য বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত ছিল। হযরত হাতেবের (রযি.) এ পত্র প্রেরণের পিছে সন্তোষজনক জবাব থাকায় রসূল (স.) তাঁর অপারগতা মেনে নেন। কারণ, তাঁর এ পত্র প্রেরণ ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক ছিল না।

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (তিনি বদরে শরীক ছিলেন) ঃ এটা হাতেবকে হত্যা না করার কারণ বর্ণনা।

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (তোমার জানা আছে কি যে, নিশ্চয় আল্লাহ বদরী সাহাবাগণের ভবিষ্যত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত

www.e-ilm.weebly.com

আছেন?) ঃ "কেবলমাত্র বদরে উপস্থিতির কারণেই তার এত বড় অপরাধ ক্ষমা হয়ে গেল? বলে যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয় উল্লেখিত বাক্যে সে সৃষ্ট প্রশ্নেরই জওয়াব বিধৃত হয়েছে।

اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ঃ অর্থাৎ, ভবিষ্যতে তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার। এহেন ইখতিয়ার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশার্থে ছিল মাত্র। এ আদেশ তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত নয়।

فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ (আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি) ঃ এ ঘোষণা আখেরাতে বাস্তবায়িত হবে। অর্থাৎ, আখেরাতে তোমাদের কোন বিচার নেই, সেখানে তোমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। অতএব, দুনিয়াতে তাদের থেকে শাস্তিযোগ্য কোন কার্য প্রকাশ পাওয়ায় তাদের উপর শাস্তি বিধান প্রযোজ্য হলে, তা উক্ত ঘোষণার বিরোধী হবে না। (কারণ, শাস্তি এটা দুনিয়ার ব্যাপার আর আল্লাহর ক্ষমা সেটা আখেরাতের ব্যাপার।)

تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ঃ এটা পূর্বোক্ত বাক্য لَاتَتَّخِذُوْا-এর মধ্যস্থ ضَمِيْر থেকে হাল (حال) হয়েছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক বন্ধুত্বের সূত্রে রসূল (স.)-এর গোপন তথ্য অবহিত করতে তাদেরকে (মুশরিকদের) বন্ধু বানিও না।

بَابُ غَزْوَةِ الْفَتْحِ فِىْ رَمَضَانَ

রমযানে মক্কা বিজয় যুদ্ধ

রসূল (স.) ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মদীনা হতে রওনা দেন। তাঁর সাথে দশ হাজার সৈন্য ছিল।

ফলাফল ঃ উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই মক্কা বিজয় হয়। এ বিজয়ে সমগ্র আরবে ইসলামের শিকড় মজবুতভাবে গ্রথিত হয়।

وَمَعَهُ عَشَرَةُ أَلاٰفٍ (নবীজীর সাথে দশ হাজার সৈন্য ছিল) ঃ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় ১২ হাজার উল্লিখিত হয়েছে। সামঞ্জস্য হলো, মদীনা হতে মূলত ১০ হাজার রওনা হয়। কিন্তু পথিমধ্য হতে আরও দু'হাজার সৈন্য তাদের সাথে এসে যোগ দেয়।

عَلٰى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِيْنَ وَنِصْفٍ (সাড়ে আট বছরের মাথায়) ঃ ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয় হওয়ায় প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এ সাড়ে আট বছর কিভাবে হল? এ প্রশ্নের জবাব দিতে ব্যাখ্যাকারীগণ একাধিক সম্ভাবনার কথা বর্ণনা করেছেন। একটি হলো, বছর শুরু হয় মুহাররম হতে। ৮ম বছর শুরু হলে তার প্রথম তিন মাস অর্থাৎ, রবিউল আউয়ালের শেষ পর্যন্তকে॥আংশিকের নামকরণ-সামষ্টিকের নামের দ্বারা॥এ নিয়মের ভিত্তিতে রূপকভাবে এক বছর ধরা হয়েছে। অতঃপর রবিউল আউয়ালের শেষ তথা রবিউস্ সানী থেকে রমযান পর্যন্ত আর অর্ধ বছর ধরা হয়েছে।

তবে এ বক্তব্য ও মতামতকে ভুল আখ্যা দিয়ে বলা হয় যে, সঠিক কথা হলো মক্কা সাড়ে সাত মাসের মাথায় বিজয় হয়।

www.e-ilm.weebly.com

উমদাতুল কারী গ্রন্থে আছে, প্রকৃত হিসাব অনুপাতে ৭ বছর ৯ মাস হয়। কারণ, মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরীর রমযান মাসে আর রসূল (স.) মদীনায় শুভাগমন করেন (প্রথম হিজরীর) রবিউল আউয়াল মাসে।

اِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰخِرُ فَالْاٰخِرُ (নবীজীর সর্বশেষ কার্যপন্থাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হবে) ঃ অর্থাৎ, সর্বশেষ কার্যপন্থা পূর্ববর্তী কার্যপন্থার জন্য রহিতকারী বলে বিবেচিত হবে।

রমযান মাসে (শর্তসাপেক্ষে) রোযা না রাখারও অবকাশ রয়েছে-এ প্রসঙ্গে উপরোক্ত উক্তিটি জমহুরের দলীল। কেউ কেউ কুরআনের আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ দ্বারা দলীল দেন যে, রমযান মাস আগমন করলে যারা নিজ এলাকায় থাকবে, তাদের জন্য রোযা না রাখার কোন সুযোগ নেই।

জমহুর জওয়াবে বলেন যে, এ হাদীসে তাদের অভিমত খণ্ডন করা হয়েছে। আর কুরআনের আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ এটা তাদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সমগ্র মাস নিজ এলাকায় অবস্থান করে। কারণ, আয়াতে এটা বলা হয়নি যে, কেউ মাসের কিছু অংশ এলাকায় থাকলে পুরো মাসই তার রোযা রাখতে হবে। (বরং যখন এলাকায় থাকবে তখন রোযা রাখবে আর সফরে গেলে তখন ইখতিয়ার।)

خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ رَمَضَانَ إِلٰى حُنَيْنٍ (রসূল রমযানে হুনাইন অভিমুখে রওনা হন) ঃ রমযানে রওনার বিষয়টি প্রশ্নাতীত নয়। কারণ, মক্কা বিজয় হয় ৮ম হিজরীর রমযানে। এরপর রসূল (স.) ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হুনাইন অভিমুখে রওনা হন শাওয়াল মাসে, রমযানে নয়। তবারী (রহ.) এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, এখানে রওনার দ্বারা উদ্দেশ্য 'রওনার ইচ্ছা করা'। আর আরবে এভাবে বলার বহুল প্রচলন রয়েছে।

بَابُ أَيْنَ رَكَزَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّايَةَ

রসূল (স.) পতাকা কোথায় স্থাপন করেন?

حَتّٰى اَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ (তারা মাররুজ জাহরানে এলেন) ঃ মক্কা হতে ষোল মাইল দূরবর্তী একটি স্থানের নাম 'মাররাজ জাহরান'।

فَإِذَا هُمْ بِنِيْرَانٍ كَاَنَّهَا نِيْرَانُ عَرَفَةَ (অতঃপর তারা আরাফার আগুনের ন্যায় এখানে ওখানে আগুন জ্বলতে দেখল)ঃ আরবদের প্রথা ছিল, তারা আরাফায় গেলে খুব আগুন জ্বালাত। ইবনে সা'দ বলেন, নবীজী মাররুজ্ জাহরানে পৌঁছে সাহাবাদের আগুন জ্বালাতে নির্দেশ দেন। দশ হাজার লোক সেখানে অগ্নি প্রজ্বলিত করেন।

www.e-ilm.weebly.com

রসূল (স.) এক বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্কায় রওনা হয়েছেন শুনে কুরাইশরা অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। তারা সংবাদ সংগ্রহে আবু সুফিয়ানকে প্রেরণ করে। তাকে বলে দেয়, মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমাদের জন্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে নিবে। আবু সুফিয়ান রওনা হয়। হাকীম বিন হাজাম ও বুদাইল বিন ওরাকাও তার সাথে ছিল। তারা মুসলমান বাহিনী দেখে অত্যন্ত ঘাবড়ে যায়। সে রাতে হযরত উমরের (রযি.) পাহারাদারী (নাইট সেন্ট্রির দায়িত্ব) ছিল। অপর এক প্রহরী তাদের গ্রেপ্তার করে হযরত উমর (রযি.)-এর কাছে নিয়ে যায়। পরিশেষে সকলে হযরত আব্বাস (রযি.)-এর সাথে রসূলের সকাশে উপস্থিত হলে তারা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হয়। রসূল (স.) তাঁদের সম্মানার্থে ঘোষণা করেন যে, "হাকীম ও আবু সুফিয়ানের গৃহে যে আশ্রয় নিবে সে নিরাপদ।"

اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ اَلْيَوْم تَسْتَحِلُّ الْكَعْبَةَ ঃ অর্থাৎ, আজকের দিন ঘোরতর যুদ্ধের দিন। আজ কা'বাকে বৈধ করে দেয়া হবে (হত্যার জন্য)।

حَبَّذَا الْيَوْمُ الذِّمَارِ ঃ অর্থাৎ,, ধ্বংসের দিন অথবা হরমবাসীদের প্রতি ক্রোধ ও তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের দিন কতই না সুন্দর। অবস্থার শিকার ও অপারগ হওয়ায় শ্লেষভরে আবু সুফিয়ান এ উক্তি করে। (কস্তলানী)

খাত্তাবী (রহ.) বলেন, আবু সুফিয়ান আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে যে, তাঁর এতটুকু ক্ষমতা ও অধিকার অর্জিত হোক, যার দ্বারা সে স্বগোত্রকে বাঁচাতে ও তাদের বিপদ দূর করতে পারে।

কেউ কেউ উল্লিখিত বাক্যের এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, সে দিন সুন্দর হোক, যে দিন মুছিবত থেকে আমাকে হেফাজত করা আপনার জিম্মায় আবশ্যক।

ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত সা'দ اَلْيَوْمُ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ বললে এক মুহাজির (হযরত উমর) রসূল (স.)-কে বলেন যে, আল্লাহর রসূল! আমি কুরাইশদের জন্য সা'দকে নিরাপদ মনে করছি না। রসূল (স.) এ কথা শুনে হযরত আলীকে বলেন, তুমি এখনি গিয়ে তার (সাদ) থেকে পতাকা নিয়ে নাও এবং ঐ পতাকা বহন করে তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে। আর আল উমরী (রহ.) মাগাযী গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, আবু সুফিয়ান নবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি আপনার নিজ গোত্র হত্যার এ নির্দেশ দিয়েছেন কি? রসূল (স.) বললেন, না। অতঃপর আবু সুফিয়ান রসূল (স.)-কে আল্লাহ ও আত্মীয়তার দোহাই দিলে রসূল (স.) বলেন, আবু সুফিয়ান! আজ ক্ষমার দিন। আজ আল্লাহ কুরাইশকে সম্মানিত করবেন। এরপর তিনি সাদের কাছে লোক পাঠিয়ে তার হাত থেকে পতাকা নিয়ে তারই পুত্র কায়েসের হাতে দেন। আর মূসা বিন উকবার মাগাজী গ্রন্থে যুহরী থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) যুবাইর বিন আওয়ামকে ঝাণ্ডা প্রদান করেন।

www.e-ilm.weebly.com

এ তিন বর্ণনার মাঝে সমতা এভাবে হতে পারে যে, মক্কায় প্রবেশের পূর্বে হযরত আলীকে হযরত সা'দ বিন উবাদার নিকট থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে প্রেরণ করা হয়। এতে সাদের কষ্ট ও মানহানি হতে পারে ভেবে পরে তাঁর পুত্র কায়েসকে ঝাণ্ডা প্রদান করা হয়। কায়েস (রযি.) থেকে রসূল (স.)-এর কষ্টমূলক কোন ঘটনা ঘটে যাবার আশঙ্কা করত পিতা সাদ (রযি.) পুত্র কায়েস (রযি.) থেকে ঝাণ্ডা নিয়ে নিতে রসূল (স.)-কে অনুরোধ করলে রসূল (স.) এর অনুমতিক্রমে হযরত যুবাইর (রযি.) ঝাণ্ডা নিজ দায়িত্বে নেন।

كَذَبَ سَعْدٌ ঃ অর্থাৎ, এ উক্তিতে সাদের বুঝের ভুল হয়েছে।

هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ (আকীল আমাদের জন্য কোন ঘর রেখেছে কি?) ঃ হিজরতের পর আকীল আব্দুল মুত্তালিবের সমস্ত ঘর-বাড়ি বিক্রি করে দেয় আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় আকীল কাফের থাকায় সে তার উত্তরাধিকারী হয়।

لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ (মু'মিন কাফেরের ওয়ারিশ হবে না এবং কাফের মু'মিনের ওয়ারিশ হবে না) ঃ এ সূত্রানুযায়ী আকীল আবু তালেবের ওয়ারিশ হয়। হযরত আলী ও জাফর (রযি.) ওয়ারিশ হতে পারেন না। তারা ওয়ারিশ হলে নবী (স.) তাদের গৃহে পদার্পণ করতে পারতেন। কারণ, এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদের উপর রসূল (স.)-কে প্রাধান্য দিতেন।

مَنْزِلُنَا إِنْشَاءَ اللّٰهُ إِذَا فَتَحَ اللّٰهُ الْخَيْفَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ (আল্লাহ বিজয় দান করলে ইনশাআল্লাহ্ আমাদের রেস্ট হাউজ (বিশ্রামাগার) হবে বনূ কেনানা উপত্যকা, যেখানে কুরাইশরা কুফরীর উপর অটল থাকতে শপথ করেছিল) ঃ রসূল (স.) মক্কা বিজয়ের একদিন পূর্বে এ ঘোষণা দেন। রেস্ট হাউস (বিশ্রামাগার) হিসেবে বনূ কেনানা নির্বাচনের কারণ হলো, এটা সে স্থান-রসূল (স.), বনূ হাশেম ও বনু মুত্তালিবকে মক্কা থেকে বের করে দিয়ে কুরাইশরা যেখানে তাদের অবরোধ করে রেখেছিল। তাই তিনি অতীত স্মৃতি স্মরণ করত আল্লাহর অনুগ্রহের অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চান। কেননা, আল্লাহ্ মক্কার উপর বিরাট বিজয় দান করেছেন এবং কাফেরদের উপর চূড়ান্ত প্রাধান্য দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি এটা দেখাতে চান যে, যারা তার সাথে অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করেছে এবং বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিয়েছে তাদের উপর প্রতিশোধের সব রকম শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত মার্জিত ব্যবহার করেছেন।

বনূ কেনানা উপত্যকার (আবু তালেব উপত্যকা) অবরুদ্ধতার বিবরণ ঃ হযরত জাফর ও তার সাথীদের সাথে আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশী খুবই মার্জিত ব্যবহার করছেন এবং তাদের যথেষ্ট মর্যাদা ও সম্মান করছেন—এ সংবাদ কুরাইশদের কাছে পৌঁছলে, তারা প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে এবং (নাউযুবিল্লাহ) রসূল (স.)-কে হত্যা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তারা বনূ হাশেমের বিরুদ্ধে এক

www.e-ilm.weebly.com

অঙ্গীকারনামা প্রস্তুত করে, যার মধ্যে মুসলমানদেরকে পূর্ণাঙ্গরূপে বয়কটের এ ঘোষণা ছিল যে, তাদের সাথে বিবাহ-শাদী হবে না। ক্রয়-বিক্রয় চলবে না এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা হবে না।

মানসুর বিন ইকরামা অঙ্গীকারনামা লিখে কাবাগৃহে টাঙিয়ে দেয়। যার শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ এই দুর্ভাগার হাত অচল ও অবশ করে দেন।

নবুওয়াতের ৮ম বছরের শুরুর দিকে কুরাইশরা মুসলমানদেরকে মক্কা হতে বহিষ্কার করে আবু তালেব উপত্যকায় অবরুদ্ধ করে রাখে। হজ্জের মওসুম ছাড়া তারা কোথাও বের হতে পারত না। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত তারা অত্যন্ত দুর্বিষহ জীবন যাপন করে। পরিশেষে আল্লাহ তার প্রিয় রসূল (স.)-কে জানিয়ে দেন যে, উক্ত অঙ্গীকারনামা পোকায় খেয়ে ফেলেছে। আল্লাহর নাম ব্যতিরেকে তাতে আর কোন লেখা বাকী নেই। আবু তালেব কুরাইশ কাফেরদের ডেকে বলল যে, আমার ভাতিজা অঙ্গীকারনামার ব্যাপারে এরূপ বলছে। তোমরা গিয়ে দেখ, যদি কথাটি সত্য হয়, তবে তোমরা জুলুম-নির্যাতন বন্ধ কর। আর যদি মিথ্যা হয়, তবে তাকে হত্যা করে ফেল। ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে কুরাইশরা একে অপরকে এ ঘৃণ্য কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগল। আবু তালেব বলল, ব্যাপার যখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, তখন আমরা এখানে বন্দী ও অবরুদ্ধ হয়ে থাকব কেন? অতঃপর কুরাইশরা সেখানে হাজির হল এবং তাদেরকে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে বলল। এভাবে দীর্ঘ তিন বছর পর তারা স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে।

اِبنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِاَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اُقْتُلْهُ (ইবনে খাতাল কাবার গিলাফ আঁকড়ে ছিল। রসূল তাকে ওখানে ঐ অবস্থায় হত্যা করতে বলেন) ঃ ইবনে খাতালের নাম জাহেলী যুগে আব্দুল উয্‌যা আর ইসলামের যুগে আব্দুল্লাহ ছিল। মক্কা বিজয়ের দিন রসূল (স.) যাদের খুন বৈধ ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন খাতালও ছিল। তার খুন-বৈধতার ঘোষণা দেয়ার কারণ হলো, সে প্রথমে মুসলমান হয়ে পুনরায় মুরতাদ হয়ে যায়। তদুপরি সে এক ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যাও করে। তার দু'টি শিল্পী বাঁদী ছিল*। সে তাদের দ্বারা গান পরিবেশনার মাধ্যমে রসূল (স.)-এর কুৎসা রটনা করাত।

মোটকথা, এ সকল অপরাধের কারণে তাকে জমজম এবং মাকামে ইব্রাহীমের মধ্যস্থলে হত্যা করা হয়। রসূল (স.) ঐ দু'বাঁদীকেও হত্যার নির্দেশ দেন। একজনকে হত্যা করা হয় আর অপরজন বেঁচে যায় এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে।

মক্কা বিজয়ের দিন রসূল (স.) যাদের হত্যার ঘোষণা দেন, তাদের নাম হলো ঃ (১) আব্দুল্লাহ বিন খাতাল (২) আব্দুল্লাহ বিন সারাহ (৩) ইকরামা বিন আবু জাহেল (৪) হিছার বিন আসওয়াদ (৫) আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা (৬) কা'ব বিন যুহাইর (৭) হামজা (রযি.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী (৮) মিকবাস বিন খবাবা (৯) হুয়াইরিছ বিন নাকীদ (কবি) প্রমুখ।

টীকা ঃ ঐ দু'বাদীর একজনের নাম 'কুরাইবা', আর অপরজনের নাম 'ফারতানা' ছিল। (আল মিসবাহুল মুনীর-২৬৯ পৃষ্ঠা। অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

কেউ কেউ এ হাদীস থেকে প্রমাণ করেন যে, মক্কার হেরেমে খুনের বদলা (قَتْل وَاجِب) নেয়া নিষিদ্ধ নয়। কারণ, ইবনে খাতালকে হেরেমেই হত্যা করা হয়। অথচ কুরানের আয়াত وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ امِنًا অর্থাৎ, 'হেরেমে যেই-ই প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ'। উক্ত আয়াত থেকে বুঝে আসে যে, হেরেম শরীফে কোন প্রকার কতল জায়েয নেই।

আল্লামা আইনী এ প্রশ্নের জওয়াব দেন যে, ইবনে খাতালের ঘটনা তখনকার, যখন মক্কায় হত্যা করা রসূল (স.)-এর জন্য জায়েয ও হালাল করে দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। সুতরাং এ সময়টা উক্ত আয়াতের অন্তর্গত নয়। বাকী সময়ে (কেয়ামত পর্যন্ত) হত্যা-আক্রমণ বৈধ হবে না। অতএব আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকল না।

قَالَ مَالِكٌ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا نَرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا

(ইমাম মালেক বলেন, আল্লাহই সম্যক অবহিত। আমাদের জানা মতে রসূল সেদিন মুহরিম ছিলেন না) ঃ শাফেয়ী ও অন্যান্যদের মতে, মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা কেবল হজ্জ ও উমরা পালনেচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য ওয়াজিব। এ ছাড়া অন্যদের জন্য ইহরাম বাঁধার প্রয়োজন নেই। রসূল (স.) যেহেতু মক্কা বিজয়ের জন্য আসেন, হজ্জ কিংবা উমরার জন্য নয়, তাই তার জন্য ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ বৈধ হয়েছে। বস্তুত এ কারণেই তিনি মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। এখানে ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত ইমাম মালেক (রহ.) এর উপরোক্ত উক্তিটি শাফেয়ী প্রমুখদের সমর্থনে এনেছেন। তবে আহনাফের মতে সর্বাবস্থায় মীকাত পার হতে ইহরাম বাঁধা জরুরী। ইহরাম ব্যতিরেকে মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। আহনাফের পক্ষ হতে আলোচ্য হাদীসের নিম্নরূপ জওয়াব দেয়া হয়—

(১) ইমাম মালেকের উক্তি অনুযায়ী রসূল (স.) সেদিন মুহরিম ছিলেন না। কেননা, কোন বর্ণনায় তাঁর হালাল হওয়ার কথা পাওয়া যায় না। রসূল (স.) ইহরাম ছাড়াই মক্কা প্রবেশের কারণ হলো, ইহরামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মক্কার সম্মান প্রদর্শন। কিন্তু যখন মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাকে হালাল ঘোষণা করা হয় যে, انه عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أُحِلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ অর্থাৎ, রসূল (স.) বলেন, একদিনের জন্য আমার তরে মক্কাকে হালাল করা হয়েছে। তখন ইহরামের মূল কারণ অবশিষ্ট ছিল না। ফলে ইহরাম ছাড়াই নবীজীর জন্য মক্কায় প্রবেশ জায়েয হয়। (লামিউদ দারারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৪০)

(২) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে রসূল (স.) সেদিন মুহরিমই ছিলেন। কিন্তু শিরস্ত্রাণ পরিধান করেন প্রয়োজনের খাতিরে। কেননা প্রয়োজন অনুচিত কাজকে

www.e-ilm.weebly.com

লঘু করে দেয়। ইবনে আবী শায়বা তাউস হতে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, لَمْ يَدْخُلِ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ إِلاَّ مُحْرِمًا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنَّهُ لَبِسَ السِّلاَحَ لِضَرُورَةِ الْحِفْظِ وَكَفَّرَ لِذَالِكَ - অর্থাৎ, রসূল (স.) মক্কা বিজয়ের দিন ইহরাম ছাড়াই মক্কায় প্রবেশ করেননি। তবে তিনি শুধু আত্মরক্ষার তাগিদে যুদ্ধবস্ত্র পরিধান করেন এবং পরে তার কাফফারা আদায় করে দেন। (আইনী)

(৩) অথবা বলা হবে, ইহরাম ব্যতিরেকে মক্কায় প্রবেশ করা, এটা কেবল রসূল (স.)-এর বৈশিষ্ট্য ছিল। (অন্যের জন্য তা জায়েয নেই)। (আইনী)

فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِىْ يَدِهِ ঃ রসূল (স.) প্রতিমা ও প্রতিমাপূজকদের লাঞ্ছিত-অপমানিত করতে এবং এ সমস্ত প্রতিমা যে লাভ-ক্ষতি প্রদানের শক্তি রাখে না, এমনকি নিজেদের ক্ষতি নিজেরা প্রতিহত করতেও পারে না তা দেখাতে তিনি হাতের ছড়ি দ্বারা তাদের (প্রতিমা) আঘাত করতে থাকেন।

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ঃ অর্থাৎ, সত্যধর্ম (ইসলাম) এসে গেছে। বাতিল (প্রতিমা) কিছু সৃষ্টিও করতে পারে না আবার পুনরায় ফেরতও আনতে পারে না। কারণ, বাতিল মিথ্যাই। আর মিথ্যা সত্যের সামনে কখনও টিকে থাকতে পারে না।

وَفِىْ أَيْدِيْهِمَا مِنَ الْأَزْلاَمِ (তাদের হাতে লটারী-তীর ছিল) ঃ أَزْلاَم ঐ তীরকে বলে, যার সাহায্যে জাহেলী যুগের লোকজন নিজেদের ভাল-মন্দ ভাগ্য পরীক্ষা করত। যদি তারা সফর, বিবাহশাদী বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হত এবং করা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগত, তখন তারা ঐ তীর বের করে দেখত এবং তীরের নির্দেশানুযায়ী কর্মপন্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত।

আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) তাঁর ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, এ তীর কাবা গৃহে কুরাইশদের সবচে বড় প্রতিমা হুবাইলের কাছে রক্ষিত থাকত। আর কেউ কেউ বলেন, এ তীর তাদের থলিতেই থাকত। মোটকথা, ঐ তীরের একটির গায়ে أَمَرَنِى رَبِّى আর অপরটির গায়ে نَهٰى نِى رَبِّى প্রভৃতি লেখা থাকত। তারা না দেখে একটি তীর বের করত এবং যা খোদিত তীর বের হত তদনুযায়ী কাজ করত।

যেহেতু এটা প্রতিমাদের থেকে এক ধরনের পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা ছিল, যা মূলত নিরেট মূর্খতা, শিরক, কল্পনা পূজা এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যাচারের ভিত্তিতে তারা করত, তাই কুরআন তীব্র কঠোর ভাষায় এটা হারাম ঘোষণা করেছে।

(ফাওয়ায়েদুল কুরআন)

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ

মক্কার উর্দ্ধপ্রান্ত দিয়ে মহানবীর (স.) প্রবেশ

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ اِمِنْ كَدَاءِ الَّتِى بِأَعْلَى مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ كَدَى (বিজয়ের বছর নবীজী মক্কার উর্ধ্বপ্রান্ত 'কদা' এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং 'কুদাই' এলাকা দিয়েও প্রবেশ করেন)

লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে, কুদাই এলাকা দিয়ে প্রবেশের ঘটনা প্রথমবার, আর কদা এলাকা দিয়ে শুভাগমন হয় দ্বিতীয়বার। আর তা এভাবে হয় যে, রসূল (স.) মদীনা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে মক্কার নিম্নপ্রান্ত এলাকা কুদাই দিয়ে প্রবেশ করেন। অতঃপর মক্কা থেকে কুদায় (উর্ধ্বপ্রান্ত এলাকা) যান এবং সেখানে তাঁবু স্থাপন ও জিনিসপত্র রেখে স্থানটি (অন্তর্বর্তীকালীন) বাসভবন বানান। অতঃপর এ কুদা হতে পুনরায় মক্কায় প্রবেশ করে তওয়াফ ইত্যাদি সম্পন্ন করেন।

بَابُ مَنْزِلِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ

বিজয়ের দিন মহানবীর (স.) আবাস

اِغْتَسَلَ فِى بَيْتِهَا (রসূল উম্মে হানীর গৃহে গোসল করেন) ঃ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল এভাবে যে, রসূল (স.) উম্মে হানীর গৃহে আগমনপূর্বক তথায় গোসল করত চাশতের নামায পড়েন। এটা مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْشَاءَ اللّٰهُ بِخَيْفِ بَنِىْ كِنَانَةَ-এর বিরোধী নয়। কারণ, রসূল (স.) উম্মে হানীর গৃহকে বাসভবন বানিয়ে অবস্থান করেননি; বরং সেখানে গিয়ে গোসল করে নামায পড়েছেন মাত্র। অতঃপর বনূ কেনানা উপত্যকায় আবার চলে আসেন।

بَابٌ-অধ্যায়· (শিরোনামবিহীন)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِىْ رُكُوعِهِ (হযরত আয়েশা (রযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী রুকূতে গিয়ে বলতেন) ঃ এখানে বর্ণনাটি সংক্ষিপ্তরূপে এসেছে। তাফসীর পর্বে (৭৪২ পৃ.) ভাষ্য উদ্ধৃত হয়েছে— مَا صَلَّى النَّبِيُّ بَعْدَ أَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيهَا.... অর্থাৎ, ... إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসূল (স.) প্রতি নামাযে سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ পড়তেন। এ বর্ণনা হতে মক্কা বিজয়পর্বে আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখের ক্ষেত্রে যে যথেষ্ট মিল রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। (কারণ, নবীজী এ দু'আ পড়তেন সূরা নসর অবতীর্ণের পর, আর সূরা নসর অবতীর্ণ হয় মক্কা বিজয়ের পর।)

www.e-ilm.weebly.com

إِنِّي أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ : অর্থাৎ, আল্লাহ কর্তৃক মক্কা হারাম প্রতিপন্ন করার বিষয়টি আমি তোমার থেকে ভাল জানি। তোমার শোনা ঠিক আছে কিন্তু তুমি তার উদ্দেশ্য বোঝনি।

إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا (হারাম শরীফ কোন অপরাধী ও অবাধ্যকে আশ্রয় দেয় না) :

আমর বিন সাঈদ হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের (রযি.) প্রতি ইঙ্গিত করত এ কথা বলেন। কারণ, তার আকীদা ছিল যে, ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হওয়া ওয়াজিব। অতএব ইবনে যুবাইর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত না হওয়ায় তিনি তার দৃষ্টিতে অপরাধী ও অবাধ্য হয়েছেন। কিন্তু আমরের এ আকীদা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, ইবনে যুবাইর এমন কোন অপরাধ করেননি যার দরুন তিনি শরয়ী দণ্ডের যোগ্য হবেন এবং তাঁকে অবাধ্য আখ্যা দেয়া সঙ্গত হবে। বরং ইয়াযিদের তুলনায় তিনিই খেলাফতের বেশি হকদার ছিলেন। কারণ তিনি সাহাবী ছিলেন এবং ইয়াযিদের পূর্বেই তার হাতে বাইয়াত শুরু হয়।

بَابُ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَكَّةَ زَمَنَ الْفَتْحِ

বিজয়কালীন সময়ে মহানবীর (স.) মক্কায় অবস্থান

أَقَامَ النَّبِيُّ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ (মহানবী মক্কায় ১৯ দিন অবস্থান করে দুই রাকাত করে নামায পড়েন) : মক্কা বিজয়ের পূর্বে ৪র্থ হিজরীতে কসর নামাযের বিধান অবতীর্ণ হয়। এ বিধান অনুযায়ী রসূল (স.) মক্কা বিজয়কালীন সময়ে নামায কসর পড়তে থাকেন। কারণ তিনি আজ প্রত্যাবর্তন করবেন, কাল প্রত্যাবর্তন করবেন–সদা এ আশায় ছিলেন। এ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে মুক্ত হওয়ার ইতিমধ্যেই ১৯ দিন পার হয়ে যায়।

মক্কা বিজয়ের সময়ে মক্কাতে রসূল (স.)-এর অবস্থানের ব্যাপারে আগত বর্ণনাগুলো বিপরীতমুখী। কোন বর্ণনায় ১৫ দিন, কোন বর্ণনায় ১৭ দিন আবার কোন বর্ণনায় ১৯ দিন এসেছে।

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বহুমুখী এ বর্ণনার মাঝে সমতা বিধান করতে গিয়ে বলেন, ১৯ দিনের প্রবক্তারা মক্কায় আগমন-নির্গমনের দিনকেও গণনা করেছেন। ১৮ দিন যারা বলেন, তারা এর মধ্য হতে একদিনকে বাদ দিয়েছেন। আর ১৭ দিনের পক্ষে যারা, তারা আগমন-নির্গমনের দু'দিনকে বাদ দিয়েছেন। আর ১৫ দিনের বর্ণনাকে ইমাম নববী (রহ.) দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) এ অধ্যায়ে হযরত আনাস ও ইবনে আব্বাসের (রযি.) দু'টি বর্ণনা এনেছেন। প্রথম বর্ণনায় أَقَمْنَا عَشْرًا অর্থাৎ, আমরা দশ দিন অবস্থান করেছি, আর শেষ বর্ণনায় أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا অর্থাৎ, নবী (স.) ১৯ দিন মক্কায় অবস্থান করেন, উল্লিখিত হয়েছে। উভয় বর্ণনার মাঝে সাম স্য এই যে, হযরত আনাসের হাদীসটি বিদায় হজ্জ সংশ্লিষ্ট। কারণ, রসূল (স.) ঐ

www.e-ilm.weebly.com

সফরে ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। কেননা তিনি চার তারিখে মক্কায় প্রবেশ করেন আর চৌদ্দ তারিখে তথা হতে প্রস্থান করেন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটি মক্কা বিজয় সংশ্লিষ্ট। হযরত আনাসের হাদীস এ অধ্যায়ে উল্লেখের কারণ সম্ভবত এই যে, তিনি এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করতে চান যে, উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ দু'বর্ণনা দু'সফর সংশ্লিষ্ট।

وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ (আমি ছয় বা সাত বছর বয়সী ছিলাম) ঃ এ হাদীসের দ্বারা শাফেয়ীগণ বুদ্ধিমান বালকের ইমামতি জায়েয হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন। তবে আহনাফের মতে এরূপ বালকের ইমামতি জায়েয নেই। আহনাফের দলীল নিম্নরূপ ঃ

(১) ইবনে আব্বাস বলেন, لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِىْ لَا يَحْتَلِمُ অর্থাৎ, নাবালেগ বালক ইমামতি করতে পারবে না।

(২) ইবনে মাসঊদ বলেন, لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِىْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ অর্থাৎ, শরীয়তের দণ্ডবিধি প্রযোজ্য হয় না এমন বালক ইমামতি করতে পারবে না।

(৩) এতদ্ব্যতীত একটি বিশেষ কারণ হলো, সে مُتَنَفِّلٌ তথা নফল আদায়কারী। ফলে مُفْتَرِضٌ তথা ফরয আদায়কারীর পক্ষে তার ইক্তেদা করা অর্থাৎ, তার ইমামতিতে নামায পড়া জায়েয হবে না।

আর আমর বিন সালামার ইমামতির বর্ণনার জওয়াব হলো, উক্ত ঘটনাটি নবীজীর জ্ঞাতসারে ছিল না; বরং সেখানকার লোকেরা নিজেদের ইচ্ছে মত হযরত আমরকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করেন। তাই এক ছোট বালকের ইমামতি দ্বারা কিভাবে ব্যাপক ভিত্তিক প্রমাণ পেশ করা যেতে পারে? শাফেয়ীগণের প্রতি বড়ই আশ্চর্য লাগে যে, তারা আবু বকর, উমর ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবাদের উক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ না করে এক ছোট বালকের ইমামতি ও উক্তি দ্বারা দলীল প্রদান করেন।

أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِىْ وَقَّاصٍ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ (সা'দ (রযি.) যামআর বাঁদীর পুত্র নিয়ে নিল) ঃ বুখারী ব্যাখ্যাতা আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, মূল ঘটনা হলো, জাহেলী যুগে ব্যভিচারের জন্য বাঁদী যৌনকর্মীর ব্যবস্থা ছিল। আরবের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাদের কাছে গমনাগমন করত। বাঁদীর গর্ভে সন্তান এলে কখনও মনিব দাবী করত, কখনও পুরুষ যৌনকর্মীও সন্তানের দাবী করত। আর যদি মনিব মারা যেত এবং বাচ্চার দাবী ও অস্বীকার কোনটাই না করতো তবে মৃত্যুর ওয়ারিশরা বাচ্চার দাবী করলে নবজাতক তাকে দিয়ে দেয়া হত। আর মনিব অস্বীকার করলে দেয়া হতো না। রসূল (স.)-এর স্ত্রী হযরত সাওদার পিতা হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের (রযি.) ভাই উতবা বিন আবী ওয়াক্কাস মৃত্যুকালে (সে কাফের অবস্থায় মারা যায়) স্বীয় ভাই সা'দকে ওসিয়ত করে যায় যে, যামরায় বাঁদীর বাচ্চা হলে, তাকে নিয়ে আসবে। কারণ সে বাচ্চা আমারই। মক্কা বিজয়ের কালে হযরত সা'দ মক্কায় গেলে সাদৃশ্যতাহেতু তিনি বাচ্চা চিনতে পেরে তাকে নিজের অধীনে নিয়ে

www.e-ilm.weebly.com

নেন। আবদ বিন যামআ সাদের (রযি.) সাথে এ নিয়ে বিরোধে লিপ্ত হয় এবং দাবী করে যে, সে আমার ভাই। আমার পিতৃ ঔরসেই তার জন্ম হয়েছে। পক্ষান্তরে সা'দ (রযি.) বলেন, সে আমার ভাতিজা। রসূল (স.) জাহেলী প্রথা বিলোপ করে বলেন, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ অর্থাৎ, সন্তানের প্রাপক শয্যাপতি এবং আবদ বিন যাময়ার স্বপক্ষে তিনি ফায়সালা প্রদান করেন।

যেহেতু চালচলন ও বাহ্যিক সামঞ্জস্য ধর্তব্য হয়, তাই হযরত সা'দ (রা) তাঁর দাবীর সমর্থনে তা পেশ করেন। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যভিচারীর সাদৃশ্য ও সনাক্তের দাবী ধর্তব্য না হওয়ায় তা শরয়ী দলীলের বিরোধিতা করতে অপারগ। আর শরয়ী দলীল হলো, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ অর্থাৎ, শয্যাপতির জন্য সন্তান আর ব্যভিচারীর জন্য লাঞ্ছনা, বঞ্চনা।

শরীয়তের বিচারে ভাই হওয়ায় যদিও হযরত সওদার (রযি.) ঐ বালক থেকে পর্দা করার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু নবীর স্ত্রীদের মান-সম্মান আল্লাহর নিকট বহু উর্ধ্বে হওয়ায় রসূল (স.) হযরত সাওদাকে সতর্কতামূলক পর্দা করার নির্দেশ দেন।

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ ঃ অর্থাৎ, সন্তান শয্যাপতির। চাই সে স্বামী হোক বা মনিব। আর ব্যভিচারীর জন্য লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, সে সন্তানের প্রাপক নয়।

لَا يُخْتَلٰى خَلَاهَا ঃ অর্থাৎ, তাজা ঘাস কর্তন করা যাবে না। হেদায়া গ্রন্থে আছে, মানুষ কর্তৃক উৎপন্ন নয় এবং মালিকানাবিহীন হারাম শরীফের (স্বতঃউদগত) ঘাস ও বৃক্ষ কেউ কর্তন করলে তার উপর দণ্ড আরোপিত হবে। তবে তা শুকিয়ে গেলে পরে কর্তনে কোন দণ্ড আসবে না। কারণ তা বর্ধনশীল নয়। পশু-প্রাণী হারামের ঘাসে চরানো যাবে না এবং ইযখির (এক প্রকার ঘাস) ছাড়া অন্য কিছু কাটাও যাবে না।

হযরত আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, পশু-প্রাণী চরানোতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ এটা প্রয়োজনীয় বিষয়। আর চতুষ্পদ প্রাণীকে তা হতে বিরত রাখা কষ্টকর। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর মতে চতুষ্পদপ্রাণী হারাম শরীফের ঘাস খেতে পারবে। আর আহমাদ (রহ.)-এর অভিমত আমাদের অভিমতেরই অনুরূপ।

بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰي "وَيَوْمَ حُنَيْنٍ"

'হুনাইন যুদ্ধ' প্রসঙ্গ

'হুনাইন' তায়েফের নিকটবর্তী একটি উপত্যকার নাম। আরাফাতের দিক থেকে মক্কা এবং হুনাইনের মধ্যে দশ মাইলের কিছু বেশি ব্যবধান রয়েছে।

হুনাইন যুদ্ধের পটভূমি ঃ মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান হুনাইন ও আওতাসে হাওয়াযিন, সাকীফ, মুজার প্রভৃতি গোত্র বসবাস করত এবং মক্কার আশে পাশে ভেড়া, ছাগল ও উট চরাত। রসূল (স.) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সংবাদ পেয়ে তারা চূড়ান্ত ভাগ্য পরীক্ষার পরিকল্পনা নিয়ে দেশ ও জাতির হেফাজতের উদ্দেশ্যে সম্মিলিতভাবে প্রাণপণ চেষ্টা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। তাদের নেতা মালেক বিন

www.e-ilm.weebly.com

আওফ নযরী সকল হাওয়াযিন, সাকীফ ও অন্যান্য গোত্রের চার হাজার লোককে হুনাইন উপত্যকায় সমবেত করে। সৈন্যদের সাথে তাদের স্ত্রী, সন্তান ও প্রচুর সংখ্যক চতুষ্পদ প্রাণীও নেয়া হয়। যাতে অন্তত তাদের রক্ষার্থে জীবন দেয়া সহজ হয়ে যায়। রসূল (স.) এ সংবাদ অবগত হয়ে ৮ম হিজরীর ২রা শাওয়ালে ১২ হাজার মুসলমানকে সাথে নিয়ে হুনাইন উপত্যকা অভিমুখে রওনা হন। তায়েফের নিকটস্থ এ উপত্যকা আরাফার ভায়া হয়ে মক্কা থেকে দশ মাইলের কিছু বেশি দূরে জুল মাযাযের পার্শ্বে অবস্থিত। সকালে মুসলিম বাহিনী হুনাইন উপত্যকা অভিমুখে রওনা হয়। তারা তিহামার এক উপত্যকার মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিল। শত্রুরা পূর্বেই সেখানে ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ফাঁদ তৈরী করে। গলি, সুড়ঙ্গ ও সংকীর্ণ স্থানে স্থানে তারা ঘাপটি মেরে বসে থাকে। মুসলিম বাহিনী তাদের এ ষড়যন্ত্র ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত না থাকায় তাঁরা নির্ভয়ে পথ অতিক্রম করছিল। এহেন অবস্থায় সম্পূর্ণ তাদের অগোচরে শত্রুরা একযোগে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে। আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে প্রথম দিকে পিছু হটে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কিন্তু রসূল (স.) এক চুল পরিমাণও পিছু হটেন নি। তিনি স্বীয় পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রযি.)-কে يَا أَهْلَ الشَّجَرَةِ অর্থাৎ, "গাছের নীচে বাইয়াত গ্রহণকারীগণ"! বলে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করতে নির্দেশ দেন। এ আহ্বানে কিছু লোক ফিরে আসে। রসূল (স.) ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনীকে সংগঠিত করে দুশমনদের প্রতি পরিকল্পনামূলক তীব্র আক্রমণ চালাবার নির্দেশ দেন এবং নিজে খঞ্জর হাতে মাটিতে নেমে একমুষ্টি মাটি নিয়ে তাদের লক্ষ্যে ছুঁড়ে মারেন। এতে সেখানে অবস্থানরত সকল মুশরিকদের চোখে ঐ মাটি গিয়ে পড়ে। ফলে কাফেররা অসহায় ও বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করে এবং আল্লাহ মুসলমানদের চূড়ান্ত বিজয় দান করেন।

ইবনে ইসহাক যুবাইর বিন মুতঈম থেকে বর্ণনা করেন, আমরা স্পষ্ট দেখলাম যে, আমাদের ও শত্রুদের মধ্যে চাদরের মত একটি বস্তু আসমান থেকে জমিনে পড়ল। তার মধ্যে কালো পিঁপড়া ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে পাখীতে উপত্যকা ভরে গেল। এরপরেই শত্রুদের পরাজয় হয়। আমাদের কারো এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকে না যে, এসব আল্লাহর ফেরেশতাই ছিল। (আসাহহুস সিয়ার প্রভৃতি)

গনীমত বন্টন ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) তায়েফ থেকে যি'রানা এসে যি'রানাবাসীদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হুনাইনের বন্দীদেরকে তাদের কাছে প্রত্যার্পণ করেন। এরপর সাহাবাগণ রসূল (স.)-কে গনীমত বন্টন করে দেয়ার অনুরোধ করলে তিনি প্রস্তুতি নিলেন। প্রথতে তিনি সাহাবাদের কিছু ওয়াজ-নসিহত করেন। এরপর গনীমতের মাল বন্টন করে দেন। মাথাপিছু প্রত্যেকের ভাগে ৪টি উট এবং ৪০টি ছাগল পড়ে। আর প্রত্যেক অশ্বারোহী পান ১২টি উট এবং ১২০টি বকরী।

www.e-ilm.weebly.com

এদিন রসূল (স.) নব মুসলিমদের মনোরঞ্জনার্থে তাদেরকে বিপুল মাল প্রদান করেন। তাঁর দান ও বখশিশ সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল। রসূল (স.) কর্তৃক যি'অরানায় কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রকে এ বিপুল মাল প্রদানের তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারায় কেউ কেউ বিশেষ করে আনসারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং কেউ কেউ নবীর (স.) মর্যাদার পরিপন্থি কিছু উক্তিও করে বসেন।

কোন বর্ণনায় সুস্পষ্ট পাওয়া যায় না যে, মনোরঞ্জনার্থে রসূল (স.) যি'রানায় যে মাল প্রদান করেন, তা মোট গনীমত হতে প্রদান করেন, নাকি খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) থেকে। তাই এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত হয়।

ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.) বলেন, খুমুস থেকে নয়; বরং খুমুসেরও খুমুস থেকে দেন; যা নবীজীর একান্ত অংশ ছিল। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ উক্তি জোরদার মনে হয়। কারণ, রসূল (স.) ঐ বিপুল সম্পদ প্রদানের প্রাক্কালে সাহাবাদের অনুমতি নেননি। আর রসূল (স.)-এর এ নীতি ছিল না যে, তিনি সাহাবাদের মাল বা তাদের হককে তাদের অনুমতি ব্যতিরেকে অন্যকে প্রদান করবেন। সুতরাং রসূল (স.) যদি বাস্তবেই ঐ মাল খুমুস থেকে দেন, তবে আর কোন আপত্তি থাকে না। অনুরূপ যদি খুমুস ব্যতীত বাকী মাল (মোট গনীমত) থেকে দেন তবুও কোন প্রশ্ন নেই। কারণ, প্রয়োজন বেশি দেখা দিলে ইমামের জন্য এরূপ প্রদান করা বৈধ। কেননা ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর জনতার স্বার্থ অগ্রগণ্য। আর বর্ণনার বিবরণে জানা যায় যে, আনসারদের এ আপত্তি ছিল না যে, তাদের অধিকার অন্যকে প্রদান করা হয়েছে; বরং শুধু এতটুকু আপত্তি ছিল, অধিকার প্রাপ্তি ছাড়া পুরস্কার ও সম্মানের যোগ্য আমরাও তো ছিলাম। কিন্তু এটা প্রকাশ্য যে, এ বখশিশ-পুরস্কার প্রদানে রসূল (স.)-এর এ পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল যে, তিনি যেখানে ভাল মনে করবেন, সেখানেই তা ব্যয় করবেন। এতে উচ্চবাচ্যের কোন অবকাশ নেই। মনোরঞ্জনার্থে প্রদানের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও বিরাট কল্যাণ নিহিত ছিল, তা পরবর্তীতে প্রকাশ পায়।

ফলাফল ঃ হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্র পরাজিত হয় এবং বিপুল গনীমত মুসলমানদের করায়ত্তে আসে। এত বন্দী ও গনীমত তাঁরা ইতঃপূর্বে লাভ করেনি। তন্মধ্যে ২৪ হাজার উট, ৪০ হাজারেরও বেশি ভেড়া-ছাগল এবং ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) উকিয়া রৌপ্য উল্লেখযোগ্য ছিল। (আসাহহুস সিয়ার)

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ حِيْنَ جَاءَهٗ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ (হাওয়াযিন প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে এলে নবীজী দাঁড়িয়ে যান)

রসূল (স.) হুনাইন থেকে রওনা দিয়ে নাখলা, ক্বরথ্ প্রভৃতি হয়ে পুনরায় তায়েফ আসেন। এখান থেকে তিনি যি'রানায় গমন করলে তাঁর সকাশে হাওয়াযিনদের এক প্রতিনিধি দল আসে। ওয়াকেদী বলেন, এ প্রতিনিধি দলটি ২৪ সদস্য বিশিষ্ট ছিল। (কস্তলানী)

www.e-ilm.weebly.com

جَوْلَةٌ : فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ -এর অর্থ অগ্র-পশ্চাৎ। অর্থাৎ, মুসলমানরা ইতস্তত, বিক্ষিপ্ত তথা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হযরত বারা বিন আযেবের বর্ণনাতে প্রকাশ যে, ঘটনা হলো, জনৈক ব্যক্তি বারা বিন আযেবকে (রযি.) জিজ্ঞাসা করেন, হুনাইন যুদ্ধে আপনারা রসূল (স.)-কে একা ফেলে পলায়ন করেছিলেন? প্রত্যুত্তরে তিনি বলেন, বাস্তব কথা হলো, রসূল (স.) একটুও পিছু হটেননি। অবশ্য একথা সত্য যে, অগ্রবর্তী বাহিনী যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ও নিরস্ত্র ছিল। অপরদিকে হাওয়াযিনরা তাঁদের উপর একযোগে তীব্র হামলা চালায়। তারা তীরন্দাজে খুব পারদর্শী ছিল। পতঙ্গের মত ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসতে থাকে এবং কোন তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। ফলে বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। তবে রসূল (স.) নিজের স্থান হতে পিছপা হন না। তিনি অটল-অবিচল ছিলেন।

مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ (যুদ্ধে কোন কাফেরকে হত্যা করলে প্রমাণসাপেক্ষে কাফেরের উপস্থিত সকল মাল ঐ হত্যাকারী পাবে) : রণাঙ্গনে কোন মুসলমান কোন কাফেরকে হত্যা করলে ঐ কাফেরের শরীর ও বাহনে যে বস্ত্র, যুদ্ধাস্ত্র অথবা অন্য কোন বস্তু থাকে, তাকে 'সলব' বলে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.), আহমাদ (রহ.), বুখারী (রহ.) ও অন্যান্য হাদীসবেত্তাদের মতে হত্যাকারীকে নিহতের সলব প্রদান করা ওয়াজিব। চাই ইমাম তা প্রদানের জন্য পূর্ব ঘোষণা দেন বা না দেন। সর্বাবস্থায় হত্যাকারী সলবের প্রাপক হবে। তারা হযরত আবু কাতাদাহ (রযি.)-এর এ হাদীস প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে বলেন, مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ... এ হাদীসটি শরীয়তের একটি অমোঘ বিধান।

পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও আবু হানীফা (রহ.) বলেন, হত্যাকারী নিহতের সলব পাবার অধিকার কেবল তখনই সংরক্ষণ করেন, যখন ইমাম (যুদ্ধের পূর্বে বা যুদ্ধক্ষেত্রে) তা প্রদানের ঘোষণা দেন। ইমামের ঘোষণা ব্যতিরেকে হত্যাকারী সলব পাবার যোগ্য হয় না। তারা উক্ত হাদীসের জওয়াবে বলেন, রসূল (স.) এটা 'উদ্বুদ্ধকরণার্থে পুরস্কার স্বরূপ' বলেছেন; শরীয়তের বিধান হিসেবে নয়। বদর ও হুনাইনে উদ্বুদ্ধের জন্য এ পুরস্কার (সলব) ঘোষণার প্রয়োজন পড়ে। (বিস্তারিত জানার জন্য বজলুল মাজহুদ গ্রন্থ দেখা যেতে পারে।)

لَا تُطْعِهِ اُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ : অর্থাৎ, রসূল! আপনি কুরাইশী দুর্বল (বিলাসী) ব্যক্তিকে সলবের মাল দিবেন না। –লামিউদ দারারী। কাপুরুষ ও দুর্বল-প্রকৃতিহেতু এ সামঞ্জস্য দেয়া হয়েছে। যেরূপ হযরত আবু কাতাদাহ শক্তি ও বীরত্ব হেতু তাকে বাঘের মত বলা হয়েছে।

بَابُ غَزْوَةِ اَوْطَاسٍ

আওতাস যুদ্ধ

হুনাইন উপত্যকায় হাওয়াযিনরা পরাজিত হলে তাদের একদল তায়েফ, আরেক দল নাখলা ও অপর দল আওতাস অভিমুখে চলে যায়। রসূল (স.) হযরত আবু মূসা

www.e-ilm.weebly.com

আশয়ারীর চাচা উবাইদ বিন সালীম আবু আমেরের নেতৃত্বে একদল মুসলিম সৈন্য আওতাস অভিমুখে প্রেরণ করেন। উবাইদ (রযি.) তথায় শহীদ হলে হযরত আবু মূসা (রযি.) নিজেই নেতৃত্ব সামলে নেন। অতঃপর তাঁর হাতে বিজয় অর্জিত হয়।

فَقَتَلَ دُرَيْدَ : দুরাইদের হত্যাকারী রবীয়া বিন রাফে (ইবনে ইসহাক) বা যুবাইর বিন আওয়াম ছিলেন।

بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

তায়েফ যুদ্ধ

হাওয়াযিন ও সাকীফের যে দল পলায়ন করে তায়েফে যায়, তন্মধ্যে তাদের নেতা মালেক বিন আউফ নযরীও ছিল। সেজন্য রসূল (স.) নিজেই মুসলিম বাহিনীর সাথে হুনাইন থেকে তায়েফ যান। ৮ম হিজরীর এ শাওয়ালেই "তায়েফ যুদ্ধ" অনুষ্ঠিত হয়।

ইবনে হিশামের মতে ১৭, ইবনে ইসহাকের মতে ২০ থেকে বেশি এবং ইবনে সা'দের মতে ১৮ দিন তায়েফ অবরুদ্ধ থাকে। রসূল (স.) ৪০ দিন পর্যন্ত তায়েফবাসীদের প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ অব্যাহত রাখেন। এ যুদ্ধে সর্বমোট ১২ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

ফলাফল : তায়েফবাসী আত্মসমর্পণ করে না। বিজয় অর্জন না করেই মুসলমানগণ মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

وَعِنْدِي مُخَنَّثٌ (আমার কাছে একজন নপুংসক বসা ছিল) : মহিলার ন্যায় যার চাল-চলন, উঠা-বসা প্রবৃত্তি ও মানসিকতা তাকে হিজড়া বা নপুংসক বলে। কারণ সে মহিলার মত নরম ও নাজুক প্রবৃত্তির হয়। এ হাদীসে ঐ নপুংসকের নাম 'হাইত' বলা হয়েছে। কারো মতে, এটা তার উপাধি। নাম হলো মায়ে' (مَانِع)। (কস্তলানী)

يَقُولُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ : আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া হলেন উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার ভাই। তিনি মক্কা বিজয় যুদ্ধে মুসলমান হন। এবং তায়েফ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। উক্ত নপুংসক আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম ছিল।

فَعَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ يَعْنِى اَلْزِمْ إِبْنَةَ غَيْلَانَ (গয়লানের মেয়েকে আপনি বিবাহ করে নেন)

গয়লানের মেয়ের নাম বাছিয়া বা বাদেনা ছিল। সে মুসলমান হয়। রসূল (স.)-এর কাছে সে ইস্তেহাযার (অনিয়মিত রক্তক্ষরণ) মাসআলা জিজ্ঞাসা করে। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রযি.) তাকে বিবাহ করেন।

গয়লান সাকাফী ছিল। তায়েফ বিজয়ের পর সে মুসলমান হয়। সে প্রতিনিধি দলের সাথে পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে গেলে কিসরা তার মেধার ভূয়সী প্রশংসা করেন। কিসরা তাঁর আহার্য বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি البر। তথা গম বলে

www.e-ilm.weebly.com

জবাব দেন। এতে কিসরা বলেন, هٰذَا الْعَقْلُ مِنَ الْبُرِّ لَا مِنَ اللَّبَنِ وَالتَّمَرِ অর্থাৎ, এটা গমোৎপন্ন মেধা; দুধ ও খেজুরের নয়।

فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ (সে চারভাঁজে আসে এবং আটভাঁজে ফিরে যায়) ঃ অর্থাৎ, গয়লানের মেয়ে স্থুলবডি ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যবতী হওয়ায় গয়লানের মেয়ের পেটে (চর্বির) চার ভাঁজ পড়েছিল। যখন সে সামনের দিক থেকে আসে তখন পেটের চার ভাঁজ দেখা যায়। আর যখন প্রস্থান করে তখন পশ্চাৎ হতে ঐ চারভাঁজ দুই পাশে (কাঁখে) চার-চার মোট আট ভাঁজ দৃষ্টিগোচর হয়।

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَدْخُلَنَّ هٰؤُلَاءِ عَلَيْكَ (রসূল বলেন, তারা যেন তোমাদের কাছে কখনও না আসে) ঃ নপুংসকদের ব্যাপারে রসূল (স.)-এর প্রথমে ধারণা ছিল যে, তারা غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ তথা সেক্সমুক্ত পুরুষ। কিন্তু হাইতের উক্ত মন্তব্য শুনে রসূল (স.) যখন বুঝতে পারেন যে, নপুংসকও এ ধরনের বিষয় বোঝে অর্থাৎ, তাদের সেক্সবোধ আছে, তখন তিনি স্ত্রীদেরকে তার থেকে পর্দা করার নির্দেশ দেন এবং তাকে স্ত্রীদের নিকট গমনাগমন করতে নিষেধ করে দেন।

لَمَّا حَضَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الطَّائِفَ (যখন নবীজী তায়েফে উপস্থিত হন) ঃ অবরোধের সময়সীমা প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। যথা ঃ ১৭, ১৮ এবং ১৯ দিন।

وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِيْ أُنَاسٍ ঃ অর্থাৎ, মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম আবু বুকরা (রযি.) তায়েফের কেল্লায় উঠেন, অতঃপর বাইরে বেরিয়ে আসেন। কারণ, তিনি কেল্লার অভ্যন্তরে মুসলমান হন। এভাবে ছাড়া অন্য কোন পন্থায় তাঁর বের হওয়া সম্ভব ছিল না।

আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে আছে, রসূল (স.)-এর ঘোষক এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, কোন গোলাম কেল্লা থেকে বেরিয়ে আমার কাছে চলে এলে সে আযাদ। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে প্রায় ২৩ জন গোলাম বেরিয়ে মুসলিম বাহিনীতে আশ্রয় নেয়। রসূল (স.) তাদের আযাদ করে দেন। হযরত আবু বুকরাও তাদের মধ্যে ছিলেন। আবু বু করার নাম নুফাই (نُفَيْع) বিন হারেস বা মাবরূহ ছিল। তিনি খুব ভোরে রসূল (স.)-এর কাছে আসেন বিধায় তিনি তার উপনাম আবু বুকরা রাখেন। তিনি হারেস বিন কালদাহ সাকাফীর গোলাম ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হিসেবে পরিচিত হন। বসরায় তিনি বসবাস করেন এবং ৫১ হিজরীতে সেখানেই তার ইন্তেকাল হয়। তিনি উষ্ট্রযুদ্ধে (জঙ্গে জামাল) কোন পক্ষ সমর্থন করেন না; বরং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকেন।

www.e-ilm.weebly.com

ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ (তিনি ছিলেন ২৩ জনের একজন) ঃ এ বর্ণনার দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী বর্ণনার অস্পষ্টতাকে দূর করা। কারণ সেখানে فِى النَّاسِ। শব্দের মর্মার্থ অস্পষ্ট ছিল। অর্থাৎ, মানুষদের মধ্য হতে বলতে উদ্দেশ্য হলো, তায়েফবাসীদের মধ্য হতে যে ২৩ জন লোক (গোলাম) ইসলাম আনয়নের স্পৃহায় কেল্লা থেকে নেমে এসেছিলেন হযরত আবু বুকরাও (রযি.) তাদের একজন ছিলেন। মূসা বিন উকবা ও হাকীমের ধারণা, তায়েফ কেল্লা হতে হযরত আবু বুকরা ছাড়া আর কেউ বের হয়নি। কিন্তু সহী বুখারীর এ বর্ণনা তাদের উক্ত ধারণাকে খণ্ডন করে। আর কেউ কেউ এ দু' মতামতের মধ্যে এভাবে সমতা বিধান করেন যে, প্রথমে আবু বুকরা নেমে আসে এরপর অন্যান্যরা তাঁর দেখাদেখি কেল্লা হতে নীচে নেমে আসে।

لَمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ يَوْمَ حُنَيْنٍ (যখন আল্লাহ তার রসূলকে হুনাইন যুদ্ধে বিপুল মালে ফাঈ দান করেন) ঃ যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যতিরেকে অর্জিত মালকে যদিও মালে ফাঈ বলে, কিন্তু فَئِى শব্দ আগত সকল বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি দিলে এটাই বুঝে আসে যে, যে কোন সম্পদ ও ভূমি যেভাবেই হোক নবীজীর একান্ত অধিকারে এলেই তাকে ফাই নামে অভিহিত করা হয়। (আসাহহুস সিয়ার)

সেজন্য আল্লামা ইবনে হাজার আসকলানী উপরোক্ত বাক্যের এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, لَمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ غَنَائِمَ الَّذِيْنَ قَاتَلَهُمْ অর্থাৎ, যখন আল্লাহ পাক নবীকে (স.) তাদের গনীমত দিলেন, যাদের তিনি হত্যা করেছেন। কেননা, হুনাইনের গনীমত সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পরেই অর্জিত হয়েছিল।

قَسَّمَ فِى النَّاسِ فِى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ ঃ অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের দিন যারা চাপের মুখে দুর্বলভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, রসূল (স.) তাদের খুশী ও মনোরঞ্জনার্থে গনীমতের মাল তাদের মাঝে বণ্টন করেন।

وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ঃ অর্থাৎ, রসূল (স.) আনসারদেরকে গনীমতের মাল মোটেও দেন না। কারণ, তাদের ঈমান ও ইসলামের দৃঢ়তার ব্যাপারে রসূল (স.) পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেজন্য যাদের মধ্যে তিনি দুর্বলতা ও দোদুল্য ভাব দেখেন, তাদেরকে গনীমত প্রদান করেন। যাতে ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায় এবং সুকৌশলে তাদের হৃদয় জয় করাও সম্ভব হয়। মোটকথা মনোরঞ্জনার্থে নব মুসলিমদের প্রদান এবং আনসার ও মুহাজিরদের না দেয়ার মধ্যে বহু সূক্ষ্ম তাৎপর্য ও বিরাট স্বার্থ নিহিত ছিল।

আর কেউ কেউ বলেন, মনোরঞ্জনার্থে যা দেয়া হয়, তা গনীমত হতে দেয়া হয় না; বরং খুমুস হতে দেয়া হয়। আর আনসারদের মোটেও এ প্রশ্ন ছিল না যে, আমাদের প্রাপ্য অন্যকে দেয়া হয়েছে; বরং তাদের অভিযোগ শুধু এটুকু ছিল যে, প্রাপ্য ব্যতিরেকে পুরস্কার ও সম্মানের আমরাও তো যোগ্য ছিলাম; শুধু কুরাইশরা কিংবা গোত্রপতিরা নয়। আর কারো মতে, এটা ছিল গনীমতের মধ্যে রসূল (স.) এর

www.e-ilm.weebly.com

নিজস্ব ক্ষমতার প্রয়োগ। তবে তার কারণ এটা ছিল যে, আনসাররা প্রথমে পরাজিত হলে কাফেররা পরবর্তীতে চূড়ান্ত পর্যুদস্ত হওয়া পর্যন্ত তাঁরা আর মাঠে ফেরেনি। বস্তুত এ কারণে আল্লাহ পাক গনীমতের ব্যাপারটি নবীজীর কর্তৃত্বে ছেড়ে দেন। (কস্তলানী, আসাহহুস সিয়ার)

فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوْا إِذَا لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ أَوْ كَأَنَّهُمْ وَجَدُوْا إِذْ لَمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ (নব মুসলিমরা যে মাল পেল আনসারগণ তা না পাওয়ায় যেন ক্ষুব্ধ হলেন। অথবা রাবী বলেন, তারা যেন চিন্তিত হলেন) ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন প্রতিলিপিতে এভাবে ডবল বাক্যের উল্লেখ নেই। আবার কোন প্রতিলিপিতে ডবল আছে। ডবলভাবে উল্লেখের কারণ সম্পর্কে বলা হয় যে, এটা মূলতঃ রাবীর সন্দেহ ও সংশয়ের ফল। অর্থাৎ, রাবীর সন্দেহ হয় যে "فَكَأَنَّهُمْ" শব্দের শুরুতে فَاء হবে কিনা। এবং এটাও বলা হয় যে, প্রথম وَجَدُوْا টা مَوْجِدَةٌ (অর্থাৎ, ক্রোধ) শব্দমূল (মাসদার) হতে নির্গত। আর দ্বিতীয় وَجَدُوْا টা وَجْدًا (অর্থাৎ, চিন্তা) মাসদার হতে নির্গত। সুতরাং ডবলভাবে উল্লেখের লাভটা সুস্পষ্ট। (অর্থাৎ, দু'স্থানে দু'অর্থে ব্যবহৃত।)

قَالَ لَوْ شِئْتُمْ قُلْتُمْ (নবীজী বলেন, তোমরা চাইলে বলতে পারতে) ঃ রসূল (স.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য এটা প্রকাশ করা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর তাদের কোন অনুগ্রহ নেই, বরং তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর বিরাট ইহসান রয়েছে। কারণ, নবীর (স.) বলা সত্ত্বেও যখন তারা গনীমত লাভের আকাঙ্ক্ষা পুনঃ উল্লেখ করেছে, তখন তাদের এই উল্লেখ করাটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর প্রতি তাদের কোন অনুগ্রহ নেই; বরং তাদের প্রতিই রয়েছে রসূল (স.)-এর অনুগ্রহ। কেননা হিজরত করে রসূল (স.) যদি মদীনায় না যেতেন এবং তাদের মাঝে অবস্থান না করতেন, তবে তাদের ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে আজকের মর্যাদার ব্যবধান সৃষ্টি হত না। কিন্তু রসূল (স.) হিজরত করে মদীনায় গমন এবং তাদের মধ্যে অবস্থানের ফলে তাঁরা অন্যান্য লোকদের থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েছে এবং তাঁদের মান-মর্যাদা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুত এ কারণেই রসূল (স.) বলেন ঃ أَتَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ وَتَذْهَبُوْنَ بِالنَّبِيِّ إِلَى رِحَالِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা কি চাওনা যে, অন্যেরা ছাগল, উট নিয়ে যাবে আর তোমরা নিজেদের এলাকায় স্বয়ং নবীকে (স.) নিয়ে যাবে?

لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ اِمْرَأً مِنَ الْاَنْصَارِ (যদি হিজরতের ঘটনা না ঘটত, তবে আমি আনসারীই হতাম) ঃ মানুষের সম্পর্ক কখনও বংশগত হয়; যেমন কুরাইশী। আবার কখনও দুধসম্পর্ক হয়, যেমন মীর, ছয়রাফী। রসূল (স.)-এর উদ্দেশ্য এ দুটোর কোনটা নয়। কারণ اَلْاِنْتِقَالُ مِنَ النَّسَبِ إِلَى النَّسَبِ 'বংশ

www.e-ilm.weebly.com

পরিবর্তন' শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। তদুপরি রসূল (স.)-এর বংশ উন্নত ও সম্ভ্রান্ত। অনুরূপভাবে الاِنْتِقَالُ مِنَ الاِعْتِقَادِ إِلَى الاِعْتِقَادِ তথা আকীদা পরিবর্তনও উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, রসূল (স.)-এর দ্বীনই ছিল তাঁদের দ্বীন।

অতএব উদ্দেশ্য হবে, হিজরত করার কারণে আমি মুহাজির নামে পরিচিত। কিন্তু যদি এরূপ না হত, তবে আমি তোমাদের (আঞ্চলিক) নাম ধারণ করতাম এবং তোমাদের শহর দারুল আনসার (মদীনা)-এর দিকে সম্পর্কিত হতাম।

আর খাত্তাবী (রহ.) বলেন, রসূল (স.)-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মাতা যেহেতু নাজ্জারী রমণী ছিলেন আর আরবরা মাতৃবংশকে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন মনে করত, তাই এ হিসেবে বংশগত দিক দিয়েও রসূল (স.)-এর এ উক্তি সঠিক। রসূল (স.)-এর এ উক্তি বস্তুত আনসারদের মনোরঞ্জন ও তাঁদের সম্মান-মর্যাদার কথা মানুষদেরকে অবহিত করানোর জন্য ছিল। আনসারদের অনুকূলে এটা ছিল রসূল (স.)-এর অন্যতম বিনয় প্রকাশ মাত্র। কারণ, যদিও তাঁরা সাহায্য, মহব্বতে অগ্রাধিকার এবং মুহাজিরদের আশ্রয় প্রদান বিশেষণে ভূষিত কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক মুহাজিরদের সুউচ্চ মর্যাদার স্তরে তাঁরা কখনও পৌঁছতে পারেন না। মুহাজিরদের অন্যান্য ফজীলতের জন্য রসূল (স.)-এর এ উক্তিটুকুই যথেষ্ট। সুতরাং রসূল (স.) মুহাজিরী নবী; আনসারী নয়। (আইনী, কস্তলানী)

لَسَلَكْتُ وَادِىَ الأَنْصَارِ وَشُعْبَهَا (অবশ্যই আমি আনসারী উপত্যকা ও গিরিপথে চলব) ঃ যেহেতু আরবভূমির অধিকাংশ উপত্যকা ও গিরিপথ অঞ্চল, আর প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় গোত্রের সাথে সহ অবস্থান করে, তাই রসূল (স.) এখানে আনসারদের সাথে সহ অবস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

রসূল (স.) আরও বলেন, اَلأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ। যে বস্ত্র শরীরে লেগে থাকে তাকে شِعَارٌ বলে। আর যে বস্ত্র তার (شِعَارٌ এর) উপর পরিধান করা হয় তাকে دِثَارٌ বলে। রসূল (স.) এর দ্বারা আনসারদের সাথে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা ও অন্যান্যদের তুলনায় তাঁরা যে রসূল (স.)-এর বেশি নিকটতম তা মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِىْ اِثْرَةً (তোমরা আমার পরে হক নষ্ট হতে দেখবে) ঃ অর্থাৎ, ফায়ের যে মালে তোমাদের অধিকার রয়েছে, তাতে তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হবে।

مَعَ النَّبِيِّ عَشَرَةُ آلاَفٍ مِنَ الطُّلَقَاءِ (নবীজীর সাথে দশ হাজার সাহাবী ও আজাদ গোলামরা ছিল) ঃ এখানে مِنْ শব্দটি بَيَانِيَة তথা বর্ণনা জ্ঞাপক নয়। কারণ ১০ হাজার, এটা طُلَقَاء-এর সংখ্যা নয়; বরং তার এক দশমাংশ তথা দশ ভাগের এক ভাগও নয়। সেজন্য مِن-এর পূর্বে একটি واو উহ্য মেনে নিতে হবে অর্থাৎ, وَمِنَ الطُّلَقَاءِ

www.e-ilm.weebly.com

আল্লামা কুশমীহানী (রহ.) এর বর্ণনায় حَرْفِ عَطْف (সংযোগ বর্ণ-(واو) এবং حَرْفِ جَرْ (مِنْ) ব্যতীতই এসেছে। অর্থাৎ, عَشَرَةُ الاَفٍ وَالطُّلَقَاءِ আর এটাই সঠিক।

بَابُ السَّرِيَّةِ الَّتِىْ قِبَلَ نَجْدٍ

নাজদ অভিমুখে প্রেরিত সারিয়্যাহ

ইবনে সা'দ ও অন্যান্য যুদ্ধবেত্তাগণ বলেন, রসূল (স.) মক্কা বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করার পূর্বে ৮ম হিজরীর শা'বান মাসে এ সারিয়াহ প্রেরণ করেন।

بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ إِلٰى بَنِىْ جَذِيْمَةَ

রসূল (স.) কর্তৃক খালিদকে (রযি.) বনূ জাযীমার প্রতি প্রেরণ

হযরত কিরমানী (রহ.) বলেন, বনূ জাযীমা হল আব্দুল কায়েসের একটি গোত্র। আর আল্লামা আইনী বলেন, ব্যাপারটি এমন নয়, বরং তারা হল জাযীমা বিন আমের বিন আবদে মানাফ বিন কেনানা, যারা মক্কার নিম্নবর্তী অঞ্চল ইয়ালামলামে বসবাস করত।

সকল যুদ্ধবেত্তা একমত যে, মক্কা বিজয়ের পর এবং হুনাইনের প্রতি মনোনিবেশের পূর্বে ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাসে রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদকে (রযি.) বনূ জাযীমার প্রতি প্রেরণ করেন। তার সাথে ৩৫০ জন মুহাজির ও আনসার ছিল। তাদের প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ ছিল না।

صَبَأْنَا صَبَأْنَا (আমরা সাবী আমরা সাবী) ঃ কেউ মুসলমান হলে কুরাইশরা তাকে সাবী বলত। সে জন্য বনু জাযীমারা সাবী-সাবী বলে ওঠে। হযরত ইবনে উমর (রযি.) তাদের এ উক্তি হতে বোঝেন যে, তারা এর দ্বারা প্রকৃত ইসলামেরই ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু ইসলাম শব্দ পরিবর্তনের ফলে হযরত খালিদ বোঝেন যে, তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ ও লজ্জাহেতু তারা সুস্পষ্টভাবে ইসলামের ঘোষণা দেয়নি এবং প্রকৃতপক্ষে তারা অনুগতও নয়। এ ধারণানুপাতে হযরত খালিদ (রযি.) তাদের হত্যা করেন।

اَبْرَئُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ (খালিদ যা করেছে এ ব্যাপরে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ; এর সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই)

হযরত খালিদ (রযি.) তাদের ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তাদের উক্তি 'আমরা সাবী'-এর উদ্দেশ্য অনুধাবন করার পূর্বেই তাদের হত্যা করার কারণে রসূল (স.) উপরোক্ত উক্তি করেন।

কস্তলানী প্রভৃতি গ্রন্থে আছে, তাদের হত্যায় হযরত খালিদের পক্ষ হতে ব্যাখ্যা বিদ্যমান থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে কিসাসের বিধান বলবৎ হয়নি। ইবনে ইসহাক বলেন, পরে রসূল (স.) বনূ জাযীমার নিহতদের রক্তপণ আদায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হযরত আলীকে (রযি.) প্রেরণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُزَافَةَ

আব্দুল্লাহ বিন হুযাফা সারিয়া

তবাকাতে ইবনে সা'দ[১] গ্রন্থে আছে, জেদ্দায় কিছু হাবশী এসেছে এ মর্মে খবর ছড়িয়ে পড়লে রসূল (স.) ৯ম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে আলকমা বিন মুজাযযিয মুদলিযীর নেতৃত্বে তিন ব্যক্তিকে তথায় প্রেরণ করেন। তাঁরা সেখানে পৌঁছলে হাবশীরা সবাই পলায়ন করে। সাহাবারা জাযীরার কিছু এলাকা পর্যন্ত তাদের অনুসন্ধান করেন। কিন্তু তারা সমুদ্রে লা-পাত্তা হয়ে যায়। সাহাবারা ফিরে আসেন। কিন্তু এরই মধ্যে কেউ কেউ স্বীয় পরিবারে যেতে অত্যন্ত ব্যস্ততা ভাব দেখায়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমী ছিলেন তাদেরই একজন।

ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক আব্দুল্লাহ ইবনে হুজাফা সারিয়া ও আলকমা বিন মুজাযযিয মুদলিযী সারিয়াহ উভয়টি এক অধ্যায়ে উল্লেখ করায় জানা যায় যে, উভয় একই ঘটনা। তবে কারো কারো মতে, উভয় ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা।

وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةُ الْأَنْصَارِ (এটা আনসারী সারিয়াহ নামে কথিত) ঃ ফাতহুল বারীতে আছে, এ বাক্যের দ্বারা হয়ত একাধিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এখানে أَنْصَار দ্বারা পারিভাষিক আনসার উদ্দেশ্য নয়; বরং এটা আরও ব্যাপকার্থবোধক। অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমী (রযি.) তাদের অন্তর্গত ছিলেন, যারা রসূল (স.)-কে বিশেষ সাহায্য-সহযোগিতা করেন।

আল্লামা আইনী (রহ.) ইবনুল যাওজীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন যে, এটা কতিপয় রাবীর ভ্রান্তি মাত্র। কারণ, আব্দুল্লাহ বিন হুজাফা সাহমী (রযি.) কুরাইশী মুহাজির ছিলেন; আনসারী নয়।

بَابُ بَعْثِ أَبِى مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ

হযরত আবু মূসা ও মুয়াজকে (রযি.) ইয়ামানে প্রেরণ

قَالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا ঃ অর্থাৎ, হযরত আবু মূসা বলেন, আমি দিন-রাত নিয়মিত এভাবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করি যে, কিছু অংশ পড়ি, ফের কিছু সময় আরাম বা অন্য কাজ করি। অতঃপর আবার পড়ি। এভাবে চলে রাত-দিন।

وَمَكَثْنَا بِذَالِكَ حَتّٰى أُسْتُخْلِفَ عُمَرُ رض (উমর খলীফা হওয়া পর্যন্ত আমরা এভাবে করতে থাকি) ঃ অসংখ্য বর্ণনা মতে প্রকাশ যে, হযরত উমর (রযি.) হজ্জে তামাত্তু (একই বছর হজ্জ ও উমরা আদায়) হতে নিষেধ করতেন। এ প্রসঙ্গে মতানৈক্য রয়েছে যে, হযরত উমর (রযি.) فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ তথা উমরা আদায়ের নিমিত্তে হজ্জ বাতিল করা অর্থাৎ, হজ্জের ইহরাম বেঁধে এসে উমরা

টীকা ঃ (১) তবকাতে ইবনে সা'দ ঃ ইবনে সাদ (রযি.) কর্তৃক প্রণীত, তিনি ২৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

আদায়ের মাধ্যমে তা ভঙ্গ করাকে নিষেধ করতেন, নাকি হজ্জের মাসসমূহে হজ্জে তামাত্তু করতে নিষেধ করতেন। আল্লামা কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রযি.) فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ-কে একান্ত বিদায় হজ্জের বছরের বিধান বলে মনে করতেন। আর ইমাম নববী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রযি.) হজ্জের মাসসমূহে উমরা করে পুনরায় ঐ বছর হজ্জ করতে নিষেধ করতেন। প্রথম বিষয়ের ব্যাপারে نَهِى টা نَهِى تَحْرِيْمِى আর দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাপারে نَهِى تَنْزِيْهِى হবে।

প্রকাশ থাকে যে, فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমাদ ও কতিপয় আসহাবে জাহেরীর মতে তা জায়েয। তারা হযরত আবু মূসার (রযি.) এ হাদীস এবং যে সমস্ত বর্ণনায় সাহাবাগণ কর্তৃক ঐরূপ করার কথা এসেছে তা দ্বারা দলীল প্রদান করেন।

তবে জমহুরে উলামায়ে কেরামের মতে فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ সংক্রান্ত বিধান রহিত হয়ে গেছে। তারা আরও বলেন, এ বিধান কেবল সাহাবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং শুধু ঐ বছরের জন্যই ছিল। কেননা, জাহেলী যুগে হারাম মাস চতুষ্টয়ে উমরা করা অবৈধ মনে করা হত। তাই উক্ত জাহেলী প্রথার অবসান ঘটাতে সে বছর রসূল (স.) সাহাবাদের فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ-এর নির্দেশ দেন। তবে পরবর্তীতে এ নির্দেশ ও বিধান বাতিল করা হয়। এ বিধান যে শুধুমাত্র ঐ বছর সাহাবাদের জন্যই ছিল আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজার একটি বর্ণনা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রসূল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো॥ أَرَأَيْتَ فَسْخَ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ عَامَّةً ؟ فَقَالَ بَلْ لَكُمْ خَاصَّةً অর্থাৎ, فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ-এর বিধান কেবল আমাদের জন্য, নাকি গোটা মানব জাতির জন্য? প্রত্যুত্তরে নবীজী বলেন, না এটা শুধু তোমাদেরই জন্য।

অনুরূপভাবে হজ্জের মাসসমূহে তামাত্তু বৈধ হবার ব্যাপারেও মতভেদ রয়েছে। হযরত উমর (রযি.) প্রমুখ তা নিষেধ করতেন। তারা আল্লাহর নির্দেশ ঃ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় কর' দ্বারা দলীল প্রদান করতেন। কেননা, আল্লাহর এ নির্দেশ তথা হজ্জ ও উমরার পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় ঠিক তখনই হতে পারে, যখন প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আদায় করা হবে। তদুপরি উমরা হজ্জের মাস ছাড়া অন্য মাসে আদায় করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ আল্লাহ বলেন, اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ অর্থাৎ, হজ্জের মাসসমূহ সুবিদিত। তবে পরবর্তীতে হারাম মাসসমূহে তামাত্তুর বৈধতার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে। (লামিউদ দারারী)

www.e-ilm.weebly.com

قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ (গোত্রের এক ব্যক্তি বলেন, ইব্রাহীমের মাতার চক্ষু শীতল হয়েছে) ঃ ইব্রাহীম (আ.)-এর মাতার এ চক্ষু শীতলতার কারণ হলো, তিনি এমন একটি সন্তান প্রসব করেছেন যাকে আল্লাহ নিজ বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। এ খুশির খবরে তার হৃদয় আনন্দে টইটম্বুর।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, উক্ত লোকটি এ উক্তি নামাযের মধ্যে করেন, অপরদিকে 'কথা বলা'তো নামায ভঙ্গের অন্যতম কারণ। তাহলে হযরত মুয়াজ (রযি.) ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন না কেন? ব্যাখ্যাকারগণ এর বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন—

(১) লোকটি শরয়ী বিধান সম্পর্কে অবিদিত থাকায় তাকে 'অপারগ' হিসেবে গণ্য করা হয়।

(২) হতে পারে হযরত মুয়াজ (রযি.) তাকে পুনরায় নামায পড়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু রাবী তা উল্লেখ করেননি।

(৩) অথবা লোকটি মুসল্লীদের পিছনে ছিল, নামাযে শরীক ছিল না।

(৪) আইনী জবাব দেন, হতে পারে তখন পর্যন্ত হযরত মুয়াজ (রযি.) নামায পুনরাবৃত্তির বিধান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না।

بَابُ بَعْثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ

হযরত আলী ও খালিদকে ইয়ামানে প্রেরণ

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন ও যি'রানায় গনীমতের মাল বণ্টন করার পর সর্বপ্রথম হযরত খালিদ (রযি.) অতঃপর তার স্থলাভিষিক্ত করে হযরত আলীকে (রযি.) ইয়ামানে প্রেরণ করা হয়।

وَكُنْتُ أَبْغَضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ (আলী গোসল করলে আমি তার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগলাম) ঃ হযরত বুরাইদা (রযি.) হযরত আলীকে (রযি.) খুমুস থেকে এক বাঁদী নিজের জন্য নির্বাচন করত তার সাথে সহবাস করেছে জেনে তিনি তাঁর প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট এবং অন্তরে বিদ্বেষভাব পোষণ করতে লাগলেন। কারণ, তিনি এটাকে আত্মসাৎ মনে করেন, যা শরয়ী দলীল দ্বারা নিষিদ্ধ।

আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের উপর দু'টি প্রশ্ন হয়। (১) গর্ভমুক্ততা যাচাই (ইস্তেবরা) ব্যতিরেকে বাঁদীর সাথে সহবাস কিভাবে বৈধ হল? (২) বাঁদীকে নিজের জন্য নির্বাচন করা কিভাবে বৈধ হল?

প্রথম প্রশ্নের দু'জওয়াব হতে পারে ঃ (১) বাঁদীটি নাবালেগা ছিল, বিধায় গর্ভমুক্ততা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয়নি। (২) হযরত আলী তাকে নির্বাচনকালে তার

www.e-ilm.weebly.com

মিন্স (হায়েজ) চলছিল। এর একদিন এক রাতের পর সে হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তিনি তার সাথে সহবাস করেন। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জওয়াব হলো, গনীমতের মাল প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন ও আমীরের নিজের জন্য মাল নির্বাচন করে নেয়া যেরূপভাবে আমীরের জন্য জায়েয, তদ্রূপ নায়েবে আমীরের জন্যও জায়েয।

লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে, হাদীসে এমন কোন বিবরণ নেই, যার থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আলী (রযি.) গর্ভমুক্ততা যাচাই ব্যতিরেকে সহবাস করেছেন। অতএব হতে পারে, গর্ভমুক্ততা যাচাই করত কিছুদিন তথা এক মিন্সকালীন সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি সহবাস করেন। এ সেই বাঁদী, যার গর্ভে পরবর্তীতে মুহাম্মাদ বিন হানাফিয়াহ (রহ.)-এর জন্ম হয়।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা নবীর (স.) কন্যার বর্তমানে শয্যাশায়িনী বানাতে বাঁদী নির্বাচন ও তা ব্যবহার করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। বিবাহ এর বিপরীত। কেননা তা জায়েয নেই।

(১) غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ ঃ কোঠরাগত চক্ষুষ্মান ব্যক্তি। (২) مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ ঃ চোয়ালের হাড় প্রায় বহিরাগত। (৩) نَاشِزُ الْجَبْهَةِ ঃ উঁচু কপাল বিশিষ্ট। (৪) مُشَمِّرُ الْإِزَارِ ঃ পাজামা টাখনুর (গোড়ালীর) নীচে পরিধানকারী।

কথিত আছে, ঐ ব্যক্তির নাম ছিল জুল খুয়াইছিরা তায়মী। আবু দাউদে তার নাম নাফে এসেছে। আল্লামা সুহাইলী (রহ.) এ বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর ইবনে সা'দ গ্রন্থে তার নাম হারকুস জুহাইর বলা হয়েছে।

لَا لَعَلَّهُ اَنْ يَكُوْنَ يُصَلِّىْ (না, হতে পারে সে নামায পড়ে) ঃ কুরতুবী বলেন, ঐ ব্যক্তি হত্যার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রসূল (স.) তাকে হত্যা করতে হযরত খালিদকে (রযি.) নিষেধের কারণ হলো, যাতে মানুষ এ অপপ্রচার না করতে পারে যে, এ ব্যক্তির (অর্থাৎ, নবীজীর) হাত থেকে কেউ রক্ষা পায় না, এমনকি যে তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী চলে এবং নামায পড়ে তাকেও তিনি হত্যা করেন।

আর খাত্তাবী (রহ.) বলেন, ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে নিষেধের কারণ হলো, রসূল (স.) জানতেন, খোদায়ী বাজেটে (তাকদীরে) এটা নির্ধারিত আছে যে, ভবিষ্যতে তার বংশে এমন মানুষ জন্ম নিবে, যারা নিজেদের অন্যায়-অপরাধের কারণে হত্যার যোগ্য হবে। সুতরাং সে হত্যাই হবে এ অপরাধের যোগ্য শাস্তি। আর এতেই অধিক কল্যাণ নিহিত।

يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ رَطْبًا ঃ অর্থাৎ, নিয়মিত আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের কারণে তাদের জিহ্বা তরতাজা থাকবে। অথবা এর দ্বারা সুমিষ্ট কণ্ঠ ও মধুর সুর উদ্দেশ্য।

www.e-ilm.weebly.com

لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ঃ তাদের কুরআন তেলাওয়াত কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না। অর্থাৎ, তার প্রভাব তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হবে না এবং অন্তরে কোন আবেদন সৃষ্টি করবে না। যাতে তারা এ নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এবং তার থেকে উপকৃত হয়। অথবা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তাদের আমল কবুল করবেন না।

يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ (তারা দ্বীন [আনুগত্য] হতে বের হয়ে যাবে) ঃ এখানে দ্বীন দ্বারা খাত্তাবীর উক্তি অনুযায়ী হয়ত ইমামের আনুগত্য ও খলীফার আনুগত্য উদ্দেশ্য। কেননা, এটা সর্বস্বীকৃত যে, খারেজীরা ভ্রান্ত গ্রুপ হওয়া সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের অন্তর্গত। অথবা দ্বীন দ্বারা পূর্ণাঙ্গ দ্বীন উদ্দেশ্য। টীকাকার বলেন, উল্লেখিত হাদীসে খারেজীদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে যে, তারা খলীফাদের আনুগত্য করে না।

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ ঃ অর্থাৎ, তাদের (খারেজীদের) অভ্যুদয়কাল পেলে সামুদ গোত্রের ন্যায় তাদের সমূলে বিনাশ করব। আর এটা প্রকাশ্য যে, রসূল (স.)-এর যুগে তাদের অভ্যুদয় হয়নি; বরং সর্বপ্রথম হযরত আলী (রযি.)-এর শাসনামলে তাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ হয়।

লামিউদ দারারী গ্রন্থে আছে, যে পাপিষ্ঠ (জুল খুয়াইসিরা) রসূল (স.)-এর বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করে, শাস্তি হিসেবে তাকেও হত্যা করা জায়েয ছিল। কিন্তু এক বিশেষ স্বার্থে রসূল (স.) তাকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। কারণ, এমনটি করা হলে মানুষ তাঁর সংস্পর্শ হতে দূরে সরে যেত। আর তাতে দ্বীনের প্রচার প্রসার ব্যাহত হত। পরবর্তী অবস্থা এর বিপরীত। কেননা তখন ইসলাম দিকবিদিক প্রসার লাভ করেছে। তখন তাদের হত্যা করাতে ইসলামের ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

بَابُ غَزْوَةِ ذِى الْخَلَصَةِ

জুল খালাচা যুদ্ধ

ذُوالْخَلَصَةِ ঃ এটা একটি মন্দির বা প্রতিমার নাম। আল্লামা মুবাররদ (রহ.) আবু উবায়দা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, বর্তমানে এ স্থানে একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত। আর তা খছআম গোত্র অধ্যুষিত শহর আবলাতে অবস্থিত।

اَلْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ وَالْكَعْبَةُ الشَّامِيَّةُ ঃ ফাতহুল বারীতে আছে, ইয়ামানে এ মন্দির অবস্থিত হওয়ায় তাকে اَلْكَعْبَةُ الْيَمَانِيَّةُ তথা ইয়ামানী কা'বা বলা

www.e-ilm.weebly.com

হয়। আর শাম (সিরিয়া) অভিমুখী তার একটি দরজা থাকায় তাকে اَلْكَعْبَةُ الشَّامِيَةُ তথা শামীয় কা'বাও বলে।

بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ

জাতুস সালাসিল যুদ্ধ

নামকরণ হেতু ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, سلسل একটি ঝর্নার নাম। এ ঝর্নার নামেই যুদ্ধের নামকরণ করা হয় 'জাতুস-সালাসিল' বা 'ঝর্না যুদ্ধ'। আর কারো মতে, কেউ যাতে রণাঙ্গন হতে পলায়ন না করতে পারে, তার জন্য মুশরিকরা পরস্পর জিঞ্জিরাবদ্ধ হয়েছিল বিধায় এ যুদ্ধকে জাতুস্ সালাসিল বা 'জিঞ্জিরী যুদ্ধ' বলে। মদীনা হতে দশ মাইল দূরবর্তী ওয়াদিউল-কুরা হতে সামান্য আগে এ স্থানটি অবস্থিত।

যুদ্ধের পটভূমি ঃ ইবনে সা'দ বলেন, কুযাআর একটি দল মদীনার উপকণ্ঠে হামলা চালানোর পাঁয়তারা করছে–এ মর্মে রসূল (স.) খবর পেয়ে হযরত আমর বিন আসকে (রযি.) সেনাপ্রধান নিয়োগ করে তথায় প্রেরণ করেন। ৩০০ প্রবীণ আনসার ও মুহাজিরও তাঁর সাথে ছিলেন। এ বাহিনী শত্রু শিবিরের কাছাকাছি পৌঁছে তাদের সংখ্যাধিক্য সম্পর্কে অবগত হন। ফলে হযরত আমর বিন আস (রযি.) নবীজীর কাছে দূত মারফত অতিরিক্ত সাহায্য প্রার্থনা করেন। রসূল (স.) আবু উবায়দা বিন জাররাহকে (রযি.) দু'শ সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। আর তাঁকে আমেরের সাথে মিলে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার এবং নিজেদের অভ্যন্তরে কোনরূপ মতবিরোধ সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেন। হযরত আবু উবায়দা তথায় পৌঁছে নামাযের সময় হলে তিনি ইমামতি করতে চান। কিন্তু আমর (রযি.) বাধা দিয়ে বলেন, আমি আমীর (অতএব ইমামতি আমিই করব)। হযরত আবু উবায়দা তাঁর কথা মেনে নেন। কোনরূপ বিরোধিতা করেন না।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, হযরত আমর বিন আমের (রযি.) এর স্বপ্নদোষ হয়। কিন্তু তিনি গোসল করেন না। তায়াম্মুম করেই ফজরের নামাযের ইমামতি করেন। যেহেতু মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি মুসলমান হন, আর রসূল (স.)-এর ইচ্ছা ছিল তার মনোরঞ্জন বিধান, তাই রসূল তাঁকে কিছু বলেন না।

যুদ্ধের সময়কাল ঃ ৮ম হিজরীর জুমাদাল উখরাতে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

ফলাফল ঃ মুসলমানগণ বনূ কুযাআর প্রতি হামলা করলে তারা পলায়ন করে এবং ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

www.e-ilm.weebly.com

فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ (আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাকে বেশী ভালবাসেন?) হযরত আবু বকর, উমর ও অন্যান্য বড় বড় সাহাবা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রসূল (স.) আমরকে আমীর নিযুক্ত করলে তিনি মনে মনে নিজেকে রসূল (স.)-এর সবচে প্রিয়পাত্র মনে করে রসূল (স.)-এর কাছে অত্যন্ত আবেগ নিয়ে উল্লিখিত কথা জিজ্ঞাসা করেন। বায়হাকী গ্রন্থে আগত এক দীর্ঘ হাদীসে ঘটনাটি এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে।

بَابُ ذَهَابِ جَرِيرٍ رض إِلَى الْيَمَنِ

ইয়ামানে হযরত জারীরের (রযি.) গমন

ইয়ামানবাসীকে ইসলামের দাওয়াত এবং প্রয়োজনবোধে তাদের সাথে জিহাদ করতে রসূল (স.) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাযালীকে (রযি.) ইয়ামানে প্রেরণ করেন। এটা জুলখলসার মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রেরণ ছিল না (বরং ভিন্ন আরেক প্রেরণ ছিল) (ফাতহুল বারী)

فَلَقِيتُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ذَا كَلَاعٍ وَ ذَا عَمْرٍو (আমি দু'ইয়ামানী-জু-কালা' ও জু-আমরের সাথে সাক্ষাৎ করেছি) ঃ তারা দু'জন ইয়ামানের দুই বড় নেতা ছিলেন। কস্তলানী গ্রন্থে আছে, তারা ইয়ামানের বাদশাহ ছিলেন। আল্লাহর রসূল (স.) ইসলামের দাওয়াত দিতে তাদের নিকট হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহকে প্রেরণ করেন। তাঁরা মুসলমান হয়ে যান।

فَجَعَلْتُ أُحَدِّثُهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (আমি তাদেরকে রসূল সম্পর্কে বর্ণনা করি) ঃ অর্থাৎ, যখন হযরত আলী (রযি.) সফর শেষে মদীনা ফিরছিলেন, তখন তাঁর সাথে ঐ দু'ব্যক্তিও রওনা হন। হযরত জারীর তাদের কাছে রসূল (স.) এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু তাঁরা মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে ইয়ামানে ফিরে যান। অতঃপর হযরত উমর (রযি.)-এর শাসনামলে তাঁরা আবার মদীনা সফর করেন।

لَقَدْ مَرَّ عَلَى أَجَلِهِ مُنْذُ ثَلَاثٍ (তাঁর মৃত্যু তিনদিন আগে হয়ে গেছে) ঃ এখানে শর্তের জওয়াব উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ, إِنْ أَخْبَرْتَنِي بِهَذَا أَخْبَرْتُكَ بِهَذَا তথা আপনি আমাকে এ বিষয়ে অবহিত করলে আমি আপনাকে অন্য বিষয়ে অবহিত করব। জু-আমরের এ অবহিত করা মদীনা হতে কোন আগন্তুক হতে শ্রবণ করতে হবে। অথবা তিনি জাহেলী যুগে জ্যোতিষী ছিলেন। আর সে সুবাদেই তিনি এ সংবাদ দেন। অথবা সে পূর্ববর্তী কিতাব সূত্রে বলেছে। অথবা হতে পারে তিনি

www.e-ilm.weebly.com

ইসলাম গ্রহণ করে মুহাদ্দাস হয়ে গিয়েছিলেন। (মুহাদ্দাস ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার সাথে আল্লাহ্ নিজেই কথোপকথনের ইচ্ছা করেন।)

إِنَّا قَدْ جِئْنَا وَلَعَلَّنَا سَنَعُودُ (আমরা এসেছিলাম এবং আশা করি অনতিবিলম্বে আবার মদীনা আসব) ঃ অর্থাৎ, আমরা মদীনায় আসি। কিন্তু পথিমধ্যে রসূল (স.)-এর (স.) ইন্তেকালের সংবাদ পেয়ে প্রত্যাবর্তন করি। তবে আমাদের এ প্রত্যাবর্তন ইসলাম-বিমুখতা কিংবা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের কারণে ছিল না; বরং বিশেষ প্রয়োজনেই আমরা ফিরে আসি। বস্তুত রসূল (স.)-এর সাথে সাক্ষাতের তীব্র আগ্রহের কারণে আমরা কয়েকদিনের জন্য জরুরী কাজ স্থগিত রেখেছিলাম। কিন্তু যখন এখানে এসে রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ পেলাম তখন আপাতত আমরা ফিরে যাচ্ছি। প্রয়োজন সেরে আবার আসব ইনশাল্লাহ্!

بَابُ غَزْوَةِ سَيْفِ الْبَحْرِ

সমুদ্র উপকূলবর্তী যুদ্ধ

سَيْفُ الْبَحْرِ ঃ অর্থাৎ, সমুদ্রের উপকূল। স্থানটি মদীনা হতে পাঁচ মঞ্জিল দূরে জুহাইনা গোত্রের পার্শ্বে অবস্থিত।

যুদ্ধের কারণ ঃ হুদায়বিয়া সন্ধি ভঙ্গের পর কুরাইশ কাফেলার অনুসন্ধানে এ সারিয়া প্রেরণ করা হয়।

যুদ্ধের সময়কাল ঃ অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের মতে, ৮ম হিজরীর রজব মাসে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। তবে ইবনে কাইউম ও ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ, হুদায়বিয়া সন্ধির পর সন্ধি বলবৎ থাকাকালীন রসূল (স.) কর্তৃক কুরাইশ বা তাদের মিত্রদের প্রতি কোন সারিয়াহ প্রেরণের প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসূল (স.) কখনও অঙ্গীকার ভঙ্গ করতেন না। এটা তার খুবই অপ্রিয় ছিল। সেজন্য ধারণা করা হয় যে, এ ঘটনা ৬ষ্ঠ হিজরীর হুদায়বিয়ার পূর্বেকার কোন ঘটনা হবে। তবে মাওলানা শাহ আব্দুল হক সাহেব শায়খুল ইসলাম ইবনুল ইরাকী হতে উল্লেখ করেন যে, ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের সামান্য পূর্বের এবং কুরাইশদের চুক্তি ভঙ্গের কিছু পরের। অতএব কোনই বৈপরীত্য নেই।

হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহের (রযি.) কমান্ডে ৩০০ মুহাজির ও আনসারের সমন্বয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় এ সারিয়াহ প্রেরিত হয়। এ যুদ্ধে

টীকা ঃ বুখারী শরীফের টীকায় مُحَدَّثٌ এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ঃ وَهُوَ مَنْ أُلْقِيَ فِي رَوْعِهِ شَيْءٌ مِنْ قِبَلِ الْمَلَائِكَةِ অর্থাৎ, যার অন্তরে ফেরেশতার পক্ষ হতে কোন বিষয়ে ধারণা বা তথ্য প্রদান করা হয়। (বুখারী ১ ঃ ৫২১) আর "মু'জামুল ওয়াসীত" অভিধানে বলা হয়েছে ঃ সঠিক ধারণাকারীর নাম মুহাদ্দাস। কেমন যেন, সে যেমনটি ধারণা করেছিল, তেমনই ঘটেছে। (পৃষ্ঠা ঃ ১৬০) (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

সৈন্যদের রসদ পথ্য শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা গাছের পাতাও খেয়েছিলেন বিধায় এ সারিয়াকে 'খবত' তথা দুর্ভিক্ষের যুদ্ধ (পাতাঝরা যুদ্ধ) বলা হয়।

ফলাফল ঃ দীর্ঘদিন অবস্থানের পরও কুরাইশ কাফেলার সাথে মুসলমানদের সাক্ষাৎ ঘটেনি।

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ (নবীজী আবু উবায়দাকে তাদের সেনানায়ক নিযুক্ত করেন) ঃ এটা তার উপনাম। আসল নাম আমের বিন আব্দুল্লাহ জাররাহ্ ফিহ্‌রী কুরাইশী।

لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا ঃ অর্থাৎ, রসদের ঘাটতিকে প্রতিক্রিয়াশীল পেলাম। আর তা এভাবে যে, আমরা প্রত্যহ এক খেজুরেও মোটামুটি স্বস্তিতে ছিলাম। কিন্তু রসদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর সে স্বস্তিটুকুও দূর হয়ে যায়।

فَأَكَلَ مِنْهَا الْقَوْمُ ثَمَانِ عَشَرَةَ لَيْلَةً (সৈন্যরা ১৮দিন মাছ খেল) ঃ সাহাবাদের মাছ খাওয়ার সময়সীমা সম্বন্ধে আগত বর্ণনাসমূহ বিভিন্নমুখী। এ বর্ণনায় ১৮ দিন, আমর বিন দীনারের বর্ণনায় ১৫ দিন এবং আবু যুবাইরের বর্ণনায় এক মাসের কথা এসেছে। এ বর্ণনাসমূহের মাঝে এভাবে সমতা বিধান হতে পারে যে, মাছ খাওয়ার প্রকৃত সময় ছিল ১৮ দিন। যারা ১৫ দিনের কথা বর্ণনা করেছেন। তারা উভয় দিকের খুচরাংশ তথা ৩ দিন বাদ দিয়েছেন। কারণ আরবের নিয়মই হলে খুচরাংশ বাদ দেয়া। আর যারা এক মাসের কথা বর্ণনা করেছেন, তারা মাছ খাওয়ার সময়ের সাথে পূর্ণ সফরকালীন সময়ও উল্লেখ করেছেন।

ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ (অতঃপর আবু উবায়দা তাকে নিষেধ করেন) ঃ হযরত আবু উবায়দা কর্তৃক কায়েস বিন সা'দকে এ নিষেধের কারণ হলো, তিনি এ ঋণের কারবার পিতার সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতেন। অথবা মাল তার ছিল না; বরং পিতারই ছিল। তাই পিতা কর্তৃক তার ঋণ পরিশোধ না করার আশঙ্কা থাকায় তিনি তাকে নিষেধ করেন।

قَالَ انْحَرْ ঃ এখানে কার্য সম্পাদন তথা জবেহের হুকুম প্রদান উদ্দেশ্য নয়। কারণ, উট জবেহের সময় গত হয়ে গেছে। তা ছাড়া এ সময় মুজাহিদরাও নেই এবং তাদের ক্ষুধাও নেই। বরং উদ্দেশ্য হলো, উট জবেহের উপর তাদেরকে আরও উত্তেজিত ও উদ্বুদ্ধ করা। উক্তির মর্ম হলো, هَلَّا دُمْتُمْ تَنْحَرُوْنَ অর্থাৎ, আর কেন জবেহ করছ না? সুতরাং اِنْحَرْ-এর অর্থ হবে, আরও জবেহ করতে।

(লামিউদ দারারী)

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম মালেক (রহ.), শাফেয়ী (রহ.) ও অন্যান্য উলামায়ে কেরাম سَمَكٌ طَافِى (মরে ফুলে চিৎ হওয়া মাছ) খাওয়া জায়েয ও হালাল হওয়ার ব্যাপারে এ হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান করেন। পক্ষান্তরে হানাফী মাজহাবে سَمَكٌ طَافِى খাওয়া মাকরূহ। (হেদায়া)

www.e-ilm.weebly.com

আহনাফ অন্যান্যদের জওয়াবে বলেন, তাদের এহেন দলীল প্রদান সঠিক নয়। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রযি.) যে 'আম্বার' মাছ খান, তা سَمَكٍ طَافِى ছিল না। কেননা سَمَكٍ طَافِى বলা হয় ঐ মাছকে যা প্রাকৃতিক কোন কারণ (যেমন– তীব্র ঠাণ্ডা, ভীষণ গরম, প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাত ইত্যাদি) ছাড়াই আপনাপনি মারা যায় এবং উল্টে চিৎ হয়ে ভেসে থাকে। আর যা এমন নয় তা سَمَك طَافِى নয়। ঐ আম্বার মাছ سَمَك طَافِى হওয়ার উপর কোন সুস্পষ্ট বিবরণ হাদীসে নেই। হতে পারে, আল্লাহ সাহাবাদের রুজি প্রদান করতে প্রচণ্ড ঢেউয়ের মাধ্যমে ঐ মাছকে তীরে নিক্ষেপ করেন। পানি দূরে চলে যাওয়ার কারণে মাছটি সেখানেই মারা যায়। সে জন্যই কোন কোন বর্ণনায় তাকে আল্লাহর নেয়ামত বলে অভিহিত করা হয়েছে। (মা'আরেফে মদীনা)

بَابُ حَجِّ أَبِى بَكْرٍ بِالنَّاسِ

হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ্বব্রত পালন

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল (স.) তাবুক হতে ফিরে রমযান, শাওয়াল ও জিলকদ মাসে নিষ্ক্রিয় থাকেন। অতঃপর মুসলমানদের হজ্ব আদায়ে নেতৃত্ব দিতে হযরত আবু বকর (রযি.)-কে হজ্বের আমীর নিযুক্ত করে হজ্বব্রত পালনার্থে প্রেরণ করেন। ইবনে সা'দ বলেন, আবু বকর (রযি.)-এর সাথে ৩০০ হজ্ব পালনেচ্ছুক রওনা হন। রসূল (স.) তাঁর সাথে ২০টি বুদনাও (কুরবানীর উট) প্রেরণ করেন। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত আবু বকর (রযি.) প্রস্থানের পর সূরা তওবার কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। সদ্য অবতীর্ণ বিধান ঘোষণা করতে রসূল (স.) হযরত আলী (রযি.)-কে প্রেরণ করেন। ইবনে সা'দ বলেন, হযরত আবু বকর (রযি.) আরায নামক স্থানে পৌছে আলীকে (রযি.) জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি আমীর (দলপতি) হয়ে এসেছেন নাকি দলের সদস্য হিসেবে? হযরত আলী জওয়াবে বলেন, সদস্য হয়ে এসেছি মাত্র।

হযরত আবু বকর (রযি.)-এর নেতৃত্বে এ হজ্জ কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়, তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। মুজাহিদের মতে, জিলকদ মাসে। আর কারো মতে, জিলহজ্জ মাসে।

পুনরায় এ বিষয়েও মতান্তর সৃষ্টি হয় যে, হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে সম্পাদিত হজ্জ ফরজ ছিল, না-কি নফল? আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে আছে, হযরত আবু বকরের নেতৃত্বে এ হজ্জ পালন ছিল হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। কেননা তখন পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি।

اٰخِرُ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ كَامِلَةً (পূর্ণাঙ্গরূপে অবতারিত শেষ সূরা) ঃ এখানে كَامِلَةً (পূর্ণাঙ্গ) শব্দের কারণে প্রশ্ন উত্থিত হয়। কারণ, এ সূরা আংশিকভাবে অবতীর্ণ হয়। সেজন্য তার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে بَعْضُهَا অর্থাৎ, অংশবিশেষ অথবা

www.e-ilm.weebly.com

مُعْظَمُهَا অর্থাৎ, প্রধান অংশ। কেননা এ সূরার অনেক আয়াত এমন আছে, যা রসূল (স.)-এর ওফাত সনের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। তাই 'সূরা' দ্বারা সম্ভবত উভয় স্থানে اَلْقِطْعَةُ مِنَ الْقُرْاٰنِ তথা কুরানের অংশবিশেষ বা اِضَافَةً بَيَانِيَةً (বর্ণনামূলক সম্বন্ধ) উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, مِنْ اٰخِرِ سُوْرَةٍ نَزَلَتْ (অবতীর্ণ একটি সূরার শেষাংশ)। (কস্তলানী)

بَابُ وَفْدِ بَنِىْ تَمِيْمٍ

বনী তামীম প্রতিনিধি দল

এ স্থান হতে ইমাম বুখারী (রহ.) আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে রসূল (স.)-এর খেদমতে (কার্যালয়ে) আগত প্রতিনিধি দলের বর্ণনা শুরু করেছেন।

মক্কা বিজয়ের পর সমগ্র আরবের চিন্তা-চেতনায় এক বিরাট বিপ্লব সূচিত হয়। চতুর্দিক থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল আগমনের ধারা শুরু হয়।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, রসূল (স.) যি'রানা হতে প্রত্যাবর্তনের পর অর্থাৎ, ৮ম হিজরী ও তার পরবর্তী সময়ে প্রতিনিধি দল আসতে থাকে। কয়েকটি প্রতিনিধি দল ইতঃপূর্বেও এসেছিল। কিন্তু ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি দলের ব্যাপক আগমন হয়। বস্তুত এ কারণে এ বছরকে سَنَةُ الْوُفُوْدِ বা 'প্রতিনিধি বছর' বলা হয়।

اَتٰى نَفَرٌ مِنْ بَنِىْ تَمِيْمٍ النَّبِىَّ (নবীজীর সকাশে বনূ তামীমের একটি দল এল) ঃ ইবনে ইসহাক বলেন, এ প্রতিনিধি দলে বনূ তামীমের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ছিলেন। কস্তলানী বলেন, এটা ৯ম হিজরীর ঘটনা। তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশপূর্বক হুজরা সমূহের (নবী-ভবনের) বহিরপার্শ্ব হতে আহ্বান করতে থাকে, (মুহাম্মাদ) বাহির হও, জলদি আস। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়, اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ, যারা আপনার ভবনের পশ্চাৎ হতে আপনাকে ডাকে, তাদের বেশিরভাগই অবুঝ ধরনের।

যাই হোক, দীর্ঘ আলোচনার পর তারা মুসলমান হয়ে যায়। রসূল (স.) তাঁদের প্রত্যেককে ১২ উকিয়া করে (হাদিয়া স্বরূপ) প্রদান করেন।

بَابٌ অধ্যায় (শিরোনামবিহীন)

আল্লামা ওয়াকেদী (রহ.) বর্ণনা করেন, বনূ তামীমের লোকজন খোযায়া গোত্রের লোকজনের উপর সাঁড়াশী আক্রমণ করলে রসূল (স.) উয়ায়না বিন হাসান ফুযারীকে ৫০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে বনূ তামীমের সাথে যুদ্ধ করতে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে মুহাজির ও আনসারদের কেউ ছিলেন না। সৈন্যদল মরুভূমি অঞ্চলে বনূ তামীমের প্রতি আক্রমণ করলে তারা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা ১১ জন পুরুষ, ২১ জন মহিলা ও ৩০ জন বালককে গ্রেপ্তার করে মদীনায় নিয়ে

www.e-ilm.weebly.com

আসেন। ইবনে সাদ বলেন, এটা ৯ম হিজরীর ঘটনা। এর পরেই বনূ তামীমের প্রতিনিধি দল রসূল (স.)-এর সকাশে আগমন করেন।

بَابُ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ

আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দল

একটি বড় গোত্র 'আব্দুল কায়েস'। তারা আব্দুল কায়েস বিন আকসার প্রতি সম্বন্ধিত। তারা বাহরাইনে বসবাস করত।

উল্লেখ্য যে, আব্দুল কায়েসের দু'প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। একটি ৮ম হিজরীর মক্কা বিজয়ের পূর্বে। আর তারাই বলেছিল, حَالَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ الخ অর্থাৎ, আমাদের ও আপনার মাঝে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মুযার গোত্রের কাফেররা প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। এ প্রতিনিধি দলে ১৩ বা ১৪ জন সদস্য ছিল। দ্বিতীয় প্রতিনিধি দল এসেছিল 'প্রতিনিধি আগমন বছর' ৯ম হিজরীতে। তাতে ৪০ সদস্য ছিল। অধ্যায়গত হাদীসে যে প্রতিনিধি দলের কথা বলা হয়েছে, তারা প্রথম প্রতিনিধি দল, দ্বিতীয় দল নয়। কারণ, ৯ম হিজরীতে প্রতিনিধি আগমন বছরে যখন দ্বিতীয় দল আসে তখন মুযারদের কাফেররা আর প্রতিবন্ধক ছিল না।

এ প্রতিনিধি দলের আগমনের কারণ হলো, মুনকিয বিন হাইয়ান নামে এক ব্যক্তি জাহেলী যুগে হিজর থেকে ইয়াসরিব (মদীনা) বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি-রফতানি করত। মুসলমানদের হিজরতের পরবর্তী সময়ে সে একবার মাল নিয়ে মদীনায় আগমন করে। সে এক স্থানে বসেছিল। ইত্যবসরে রসূল (স.)-কে সম্মুখ দিক থেকে আসতে দেখে সে দাঁড়িয়ে যায়। রসূল (স.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি মুনজিকয বিন হাইয়ান? সে জবাব দেয়, জি হ্যাঁ। রসূল (স.) তার কাছে ভাল-মন্দ জিজ্ঞাসা করেন। অতঃপর তার এলাকার নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকদের এক এক করে নাম ধরে তাদের হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করেন। এতে সে বিস্মিত হয় এবং মুসলমান হয়ে যায়। অতঃপর সে হিজর অভিমুখে রওনা হয়। রসূল (স.) আব্দুল কায়েসের একটি দলের নামে পত্র লিখে তার কাছে প্রদান করেন। কিন্তু কয়েক দিন পর তার স্ত্রী বিষয়টি জেনে ফেলে। তার স্ত্রী মুনজির বিন আয়েজের কন্যা ছিল। ইনি সেই মুনযির, যাকে রসূল (স.) 'আল-আশায' বা চিহ্নধারী উপাধি প্রদান করেন। কারণ তার চেহারায় একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। পরবর্তীতে এ উপাধিতেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হযরত মুনযির নামায পড়তেন এবং কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তার স্ত্রী বিষয়টি ভাল নজরে দেখত না। ফলে সে পুরো ঘটনা তার পিতার কাছে খুলে বলে। পিতা মেয়ের এ অভিযোগ শুনে জামাতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জামাই-শ্বশুরের মধ্যে একান্ত আলোচনা হয়। এতে তার অন্তরেও ইসলামের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয়। এরপর আল-আশায স্বীয় গোত্রের কাছে রসূল (স.)-এর পত্র নিয়ে যান। পত্রের আবেদন ও

www.e-ilm.weebly.com

বিষয়বস্তু শ্রবণে তাদের অন্তরেও ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই রসূল (স.)-এর সকাশে উপস্থিত হওয়ার তীব্র ইচ্ছা ব্যক্ত করে।

إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ الخ (যদি আমি তা বেশি...) ঃ আবু যামরার বক্তব্যের সারকথা হলো, নবীয (আঙ্গুর বা খেজুর ভিজান পানি) অতিরিক্ত পান করলেও তা তৎক্ষণাৎ আমাকে নেশাগ্রস্ত করে না। কিন্তু যদি তা অধিক পরিমাণ পান করে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হই এবং দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করি, তাহলে এ দু'কারণে (নবীয বেশী পান ও সভা-সমিতিতে বেশিক্ষণ অবস্থান) আমার আশঙ্কা হয় যে, মাদকাসক্ত ব্যক্তির ন্যায় আমার থেকেও অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ পাবে এবং এতে আমি অপমান-লাঞ্ছনার সম্মুখীন হব। তাহলে এমতাবস্থায় এ জাতীয় নবীয পান আমার জন্য বৈধ হবে কিনা?

فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ الخ (নবীজী বলেন, আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দল আগমন করেছে) ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ হাদীস দ্বারা রসূল (স.)-এর বর্ণিত পাত্র চারটি নিষিদ্ধ হওয়ার উপর দলীল প্রদান করেন। আর তা এভাবে যে, রসূল (স.) এ পাত্রসমূহে নবীয বানিয়ে তা পান করতে নিষেধ করেছেন। কেনন এ সকল পাত্রস্থ নবীযে দ্রুত নেশা সৃষ্টি হয়। সুতরাং যখন তা পান করায় এক সময় না এক সময় তুমিও নেশাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা কর তখন তোমার জন্য তা পান করা হারাম হবে। কারণ, ঐ পাত্র চতুষ্টয়ের ব্যবহার নাজায়েয হওয়ার মূল কারণ, তোমার নবীযেও বিদ্যমান। আর হাদীসে সুস্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়েছে كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ অর্থাৎ,, সমস্ত মাদকদ্রব্য হারাম।

اَلدُّبَّاءُ ঃ লাউয়ের বশ (শুকনা লাউয়ের খোল)।

اَلْحَنْتَمُ ঃ সবুজ পাত্র অথবা যে কোন রংয়ের মাটির পাত্র।

اَلنَّقِيْرُ ঃ বাঁশের মোথা অথবা খেজুর বৃক্ষের গোড়া, যার অভ্যন্তর ভাগ খননকৃত হয়।

اَلْمُزَفَّتُ ঃ তৈলাক্ত বা আলকাতরা লাগানো পাত্র।

শরাব (মদ্যপানীয়) হারাম হওয়ার পর রসূল (স.) এ চার প্রকার পাত্রকেও হারাম ঘোষণা করার কারণ হলো, তার মধ্যে মদের ক্রিয়া বাকী থাকত অথবা পাত্র চতুষ্টয়ের ব্যবহারের সাথে মদ পানের বেশ সাদৃশ্য ছিল। উপরন্তু এগুলোর ব্যবহার মদের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিত।

এ হাদীসের উপর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রসূল (স.) তাদের চারটি বিষয়ের নির্দেশ দেন, কিন্তু হাদীসে পাঁচটি বিষয় এসেছে। উলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বিভিন্ন জওয়াব দিয়েছেন। যথা ঃ

(১) ইবনে বাত্তাল বলেন, যে চারটি বিষয়ের ওয়াদা তাদের দেয়া হয়, রসূল (স.) প্রথমে সে চারটি বিষয় উল্লেখ করেছেন। অতঃপর পঞ্চম বিষয়টি অতিরিক্তভাবে বলেছেন। কারণ, তারা ছিল মুযার গোত্রীয় কাফেরদের প্রতিবেশী।

www.e-ilm.weebly.com

অনেক সময় তাদের সাথে এদের যুদ্ধ করার প্রয়োজন পড়ত। আর তাতে গনীমত অর্জিত হত। তাই গনীমত থেকে খুমুস আলাদা করার হুকুমটিও সাথে সাথে প্রদান করেন।

(২) شَهَادَتَيْن টা মৌলিক চারটি বিষয়ের অন্তর্গত নয়। কারণ এ বিষয়ে তারা পূর্বেই অবগত ছিল। তাই আদিষ্ট বিষয়ের অন্তর্গত কেবল অবশিষ্ট চারটি, যেগুলো সম্পর্কে ইতঃপূর্বে তাদের জানা ছিল না যে, এগুলো ঈমানেরই স্তম্ভ।

(৩) কাজী বায়যাভী (রহ.) বলেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে হাদীসে চার আদিষ্ট বিষয়ের মাত্র একটি উল্লিখিত হয়েছে। আর তা হলো আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়। এর পরে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় মূলত ঐ ঈমানেরই ব্যাখ্যা মাত্র। অবশিষ্ট তিনটি বিষয় বর্ণনাকারী ভুলক্রমে বা সংক্ষিপ্তহেতু বাদ দিয়েছেন।

(৪) এটাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের কথাটি আদিষ্ট চারটি বিষয়ের অন্তর্গত নয়; বরং তা একটি স্বতন্ত্র বাক্য। আর হাদীসের মধ্যে শব্দের অগ্র-পশ্চাতও হয়েছে। মূলতঃ ভাষ্য হবে أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَهُمْ عَقَبَه بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ بِأَرْبَعٍ অর্থাৎ, রসূল (স.) তাদেরকে প্রথমে ঈমানের দাওয়াত দেন। এরপর চারটি বিষয় পালন এবং অপর চারটি বিষয় হতে নিষেধ করেন।

(৪) ইবনুস্ সালাহ বলেন, أَنْ تُوَدُّوْا خُمُسًا বাক্যটি أَرْبَعٌ-এর উপর আতফ হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, أَىْ أَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَبِإِعْطَاءِ الْخُمُسِ অর্থাৎ, রসূল (স.) চারটি বিষয় পালন ও (বায়তুল মালে) খুমুস প্রদানের (জমা দেয়ার) নির্দেশ দেন।

(৬) অথবা বর্ণনাকারী নামায ও যাকাতকে একই (অভিন্ন) গণ্য করেছেন। কেননা কুরআনে বিষয় দু'টি পাশাপাশি একত্রে উল্লিখিত হয়েছে।

(৭) অথবা বলা হবে, খুমুস প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন কোন প্রকার নয়; বরং তা যাকাতেরই অন্তর্গত। নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল পৃথককরণের দিক থেকে উভয়টি (যাকাত ও খুমুস) সমান।

এ বর্ণনায় হজ্জ প্রসঙ্গটি উল্লেখ না হওয়ার ব্যাপারেও বিভিন্ন উক্তি রয়েছে।

(১) আল্লামা কিরমানী বলেন, তখন পর্যন্ত হজ্জ ফরজ হয়নি। কারণ, এ প্রতিনিধি দলের আগমন হয় ৮ম হিজরীতে। আর হজ্জ ফরজ হয় নবম হিজরীতে।

(২) অথবা রসূল (স.) হজ্জের বিষয়টি এ কারণে উল্লেখ করেননি যে, তিনি জানতেন মুযার গোত্রের কাফেরদের কারণে তারা হজ্জে যেতে সক্ষম নন।

(৩) অথবা হতে পারে, ইসলামের সকল বিধান বর্ণনা করা রসূল (স.)-এর উদ্দেশ্য ছিল না; বরং কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে অবগত করানোই ছিল মূল লক্ষ্য।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) অথবা হতে পারে মূল হাদীসে হজ্জের কথাও ছিল, কিন্তু রাবী সংক্ষেপহেতু তা উল্লেখ করেননি। মুসনাদে আহমাদে হজ্জের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

فَهُمَا هَاتَانِ (জোহরের পরের দু'রাকাত এটা) ঃ কতিপয় শাফেয়ী এ হাদীস থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করেন যে, আসরের পর দু'রাকাত নামায পড়ায় কোন ক্ষতি নেই। তবে জমহুর উলামায়ে কেরাম আসরের পর নামায পড়ার অনুমতি দেন না। তারা এ হাদীসের জওয়াবে বলেন, এটা রসূল (স.)-এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য মাত্র। (অন্যের জন্য তা বৈধ নয়।) জমহুরের দলীল নিম্নরূপ ঃ

(১) এক হাদীসে এসেছে, اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ أُمِرْتُ بِهَا অর্থাৎ, রসূল (স.) বলেন, আমাকে এটা পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(২) অপর বর্ণনায় এসেছে, اِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ اَفَنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا قَالَ لاَ অর্থাৎ, হযরত উম্মে সালামা (রযি.) নবীজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এ দু'রাকাত ছুটে গেলে আমরা কি তা কাযা করব? তিনি জওয়াবে বলেন, 'না'।

(৩) নবীজী এ দু'রাকাত প্রত্যেকদিন পড়তেন, অথচ শাফেয়ীগণ প্রত্যেকদিন পড়ার কথা বলেন না। (বুখারীর পার্শ্বটিকা ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৫)

বনূ হানীফা প্রতিনিধি দল ঃ মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী ইয়ামামায় অবস্থানরত একটি প্রসিদ্ধ ও বড় গোত্রের নাম বনূ হানীফা। ৯ম হিজরীতে তাদের এ প্রতিনিধি দল মদীনায় আসে। তাদের সাথে মুসায়লামা কাজ্জাবও ছিল। আল্লামা ওয়াকেদী বলেন, এ প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিল মোট ১৭ জন।

حَدِيْثُ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ঃ এ ব্যক্তি বিশিষ্ট সাহাবাদের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বে রসূল (স.)-এর কাছে আসেন। ইমাম বুখারী (রহ.) এ কথাটি অপ্রাসঙ্গিকভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন।

قَدِمَ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ (নবীজীর জীবদ্দশায় মুসায়লামা মদীনায় আসে) ঃ ভণ্ড মুসায়লামা স্বগোত্রের সাথে ৯ম হিজরীতে মদীনায় আসে। তখন সে নিজেকে মুসলমান বলে প্রকাশ করে। কিন্তু ইয়ামামায় ফিরে ১০ম হিজরীতে সে হঠাৎ নবুওয়াতের দাবী করে বসে।

صَاحِبُ الْيَمَامَةِ ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুসায়লামা কাজ্জাব। এ পাপিষ্ঠ নরাধম ইয়ামামা যুদ্ধে নিহত হয়। হামযার হত্যাকারী ওয়াহশী (রযি.) তাকে হত্যা করেন। ১২ হিজরীতে হযরত আবু বকরের শাসনামলে মুসলিম বাহিনী ও মুসায়লামার অনুগত বাহিনী বনূ হানীফার মাঝে এ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে হাফেজ ও অন্যান্য সাহাবা মিলে মোট ৪৫০ জন মুসলমান শহীদ হন। হযরত সাবেত বিন কায়েস আনসারীও (রযি.) এ যুদ্ধে শহীদ হন। আনসারদের ঝাণ্ডা তাঁর হাতে ছিল। হযরত

www.e-ilm.weebly.com

খালিদ বিন ওলীদ (রযি.) ছিলেন মুসলিম সেনাপতি। এ যুদ্ধে বনূ হানীফার ৪০ হাজার যোদ্ধা অংশ নেয়। তন্মধ্যে নিহত হয় ২১ হাজার। এ যুদ্ধে আনসার কমান্ডার হযরত সাবেত বিন কায়েসের সম্পর্কীয় একটি বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। আর তা হলো, হযরত সাবেত (রযি.) শহীদ হওয়ার সময় তাঁর কাছে একটি লৌহবর্ম ছিল। তাঁর শাহাদাতের পর এদিক দিয়ে একজন মুসলমান অতিক্রমকালে তিনি ঐ লৌহবর্ম তুলে নেন। জনৈক সাহাবী স্বপ্নে হযরত সাবেতকে তার প্রতি এ মর্মে ওসিয়ত করতে শুনেন যে, আমি তোমাকে একটি বিষয়ে ওসিয়ত করছি। তুমি তা আন্তরিকতার সাথে পালন করো। আর সে ওসিয়ত হলো, আমি শহীদ হলে জনৈক মুসলমান আমার লৌহবর্ম আত্মসাৎ করে। লোকটি সেনা ছাউনীর সীমান্তে থাকে। তিনি ঐ লৌহ বর্ম সনাক্তের কিছু আলামতও তাকে দেখান। তিনি আরও বলেন, তুমি হযরত খালিদের কাছে গিয়ে অনুরোধ করবে, যেন তিনি লোকটির হাত থেকে আমার ঐ লৌহবর্মটি উদ্ধার করেন। আর যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করবে, তখন হযরত আবু বকর (রযি.)-কে বলবে, আমি এত এত ঋণী। তিনি যেন তা আদায় করে দেন। আবু বকরকে আরও বলবে, অমুক আমার গোলাম। আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। ওসিয়ত অনুযায়ী ঐ সাহাবী হযরত খালেদের কাছে এসে স্বপ্ন বৃত্তান্ত সব খুলে বলেন। হযরত খালিদ লোক পাঠিয়ে ঐ ব্যক্তির কাছ থেকে হযরত সাবেতের লৌহবর্মটি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। অতঃপর স্বপ্ন দেখা সাহাবী হযরত আবু বকরের কাছে যান এবং তাঁকে ঘটনা খুলে বলেন। হযরত আবু বকরও (রযি.) তাঁর ওসিয়ত অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ দেন। হযরত সাবেত ব্যতীত আর কারো মৃত্যুর পর তার ওসিয়ত পালন ও অনুরোধ কার্যকর করার ঘটনা জানা যায় না। (কিরমানী)

بَابُ قِصَّةِ الْاَسْوَدِ الْعَنَسِى

আসওয়াদ আনসীর ঘটনা

রসূল (স.)-এর যুগের শেষের দিকে ইয়ামানের শহর সানআতে আসওয়াদ আনসী নামে জনৈক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করে এবং সানআর গভর্নর মুহাজির বিন আবী উমায়য়ার উপর চরম প্রভাব বিস্তার করে। আসওয়াদ আনসীর সাথে ছুহাইক ও সুকাইক নামীয় দুই শয়তান থাকত। তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করতো। সানয়া প্রদেশে রসূলের গভর্নর বাজান আগমন করতঃ কিছুদিন পর তিনি ইন্তেকাল করলে তারা (ঐ দু'শয়তান) আসওয়াদ আনসীকে খবরটা জানিয়ে দেয়। আসওয়াদ আনসী স্বগোত্রকে নিয়ে সানআ আক্রমণ করে দখল করে নেয় এবং বাজানের বিধবা স্ত্রী মারযাবানাকেও জোরপূর্বক বিবাহ করে নিয়ে যায়।

রসূল (স.) তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে ফায়রুজ দায়লামীকে প্রেরণ করেন। তিনি স্বীয় সাথীদের সাথে আসওয়াদের রাষ্ট্রীয় ভবনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। রাষ্ট্রীয় ভবনের প্রবেশ পথে এক হাজার সশস্ত্র প্রহরী বসানো হয়েছিল বিধায় তারা

www.e-ilm.weebly.com

রাতে প্রাচীর টপকিয়ে তার মূল বাসভবনে প্রবেশ করেন। ফায়রুজের সাথে মারযাবানের গোপন চুক্তি অনুযায়ী মারযাবানা আসওয়াদকে অতিরিক্ত শরাব পান করায়। এ সময় সে অচেতন ও বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল। ফায়রুজ দায়লামী এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন এবং কাছে গিয়ে তাকে হত্যা করে তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। তিনি বাজানের স্ত্রী মারযাবানা এবং মূল্যবান ও দামী মাল-সম্পদ নিয়ে বেরিয়ে আসেন। রসূল (স.)-এর অন্তিম অসুস্থতায় এ ঘটনা ঘটে। সাহাবায়ে কেরাম শুভ সংবাদটি মদীনায় দ্রুত প্রেরণ করেন। রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের একদিন পূর্বে এ খবরটি মদীনায় পৌঁছে। রসূল (স.) সাহাবাদের ডেকে এ শুভ সংবাদ শোনান এবং বলেন, "فَازَ فَيْرُوْزُ" অর্থাৎ, ফায়রুজ কামিয়াব। (বুখারীর পার্শ্বটীকা)

بَابُ قِصَّةِ أَهْلِ نَجْرَانَ

নাজরানবাসীদের ঘটনা

মক্কা থেকে সাত ক্রোশ দূরে খ্রীস্টান অধ্যুষিত একটি শহরের নাম নাজরান। তবকাতে ইবনে সা'দ গ্রন্থে আছে, রসূল (স.) নাজদবাসীদের প্রতি একটি পত্র লিখেন। তাদের একটি দল মদীনায় আসে। এ দলে ১৪ জন সদস্য ছিল। আসরের সময় তারা মসজিদে নববীতে প্রবেশপূর্বক তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী পূর্বমুখী (কাবার বিপরীতমুখী) হয়ে নামায পড়ে। রসূল (স.) তাদেরকে ডেকে পাঠান। তারা উপস্থিত হলে রসূল (স.) তাদের প্রতি বিরাগভাব প্রদর্শন করেন। কোন কথা বলেন না। হযরত উসমান (রযি.) তাদের জানান যে, তোমাদের অহংকারসুলভ এবং রেশমী পোষাকের কারণে রসূল (স.) তোমাদের সাথে কথা বলছেন না। অতঃপর তারা সাধারণ পোষাক পরে নবীজীকে সালাম দিল, তিনি সালামের জওয়াব দেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করল না। অনন্তর রসূল (স.) তাদেরকে মুবাহালার (দু'পক্ষ আপন পরিবার-পরিজন নিয়ে এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একথা বলা যে, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন) চ্যালেঞ্জ দেন, কিন্তু তারা তাতে সম্মত হল না এবং ফিরে গেল। অতঃপর নবীজীর সকাশে তাদের নেতা সাইয়েদ ও আকেব এসে সন্ধির আবেদন করে। রসূল (স.) সন্ধিপত্র প্রস্তুতের নির্দেশ দেন এবং কতিপয় শর্তে উভয় পক্ষের মাঝে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তন্মধ্যে এক শর্ত এটাও ছিল যে, রজব মাসে এক সহস্র 'সেট বস্ত্র' ও সফর মাসে এক সহস্র 'সেট বস্ত্র' প্রদান করবে। তারা উক্ত চুক্তিপত্র নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসে। এর কয়েকদিন পরেই সাইয়েদ ও আকেব উভয় নেতা রসূল (স.)-এর সকাশে এসে মুসলমান হয়ে যায়। রসূল (স.) নাজরানবাসীদের প্রতি আবু উবায়দা বিন জাররাহকে প্রেরণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, তাদের থেকে সদকা ও ট্যাক্স আদায় করতে হযরত আলীকে (রযি.) তথায় প্রেরণ করা হয়। আসল ঘটনা হলো, হযরত আবু উবায়দা সন্ধির মাল আনতে তথায় যান এবং ফিরে আসেন। এরপরে তাদের মধ্যে

www.e-ilm.weebly.com

যারা মুসলমান ছিল, তাদের থেকে সদকা আর অমুসলিমদের থেকে ট্যাক্স আদায় করতে রসূল (স.) হযরত আলীকে (রযি.) প্রেরণ করেন। (আইনী)

بَابُ قِصَّةِ عُمَّانَ وَالْبَحْرِيْنِ

উম্মান ও বাহ্‌রাইনের ঘটনা

বাহ্‌রাইনের নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম 'উম্মান'। আর সিরিয়ার অন্তর্গত স্থানের নাম আম্মান।

بَابُ قُدُوْمِ الْأَشْعَرِيِّيْنَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ

আশয়ারী ও ইয়ামানীদের আগমন

قُدُوْمُ الْأَشْعَرِيِّيْنَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ : আরবীতে একে عَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ বলে। অর্থাৎ, ব্যাপক বিষয়কে সীমিত বিষয়ের সাথে সংযুক্তকরণ। কারণ, আশয়ারীরা ইয়ামানের অধিবাসী ছিল।

ইমাম বুখারী (রহ.) আশয়ারী ও ইয়ামানীদের আগমনকে এক অধ্যায়ে উল্লেখ করায় উভয় গোত্রের একত্রে আগমনের ধারণা জন্মে। অথচ বাস্তব ঘটনা এমন নয়; বরং উভয় দল আলাদা আলাদা আসে। আশয়ারীদের আগমন ঘটনাটি ৭ম হিজরীর খয়বার বিজয়ের সময়কার। আর ইয়ামানীদের হিময়ার দলের ঘটনাটি ৯ম হিজরীর।

لَمَّا قَدِمَ أَبُوْ مُوْسَى اَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ : অর্থাৎ, হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রযি.) হযরত উসমানের যুগে খলীফার পক্ষ হতে কুফার আমীর (শাসক) নিযুক্ত হয়ে এলে তিনি যাহ্‌দাম গোত্রের (অর্থাৎ, জারম গোত্র) প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকারী এর দ্বারা ইয়ামানীদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। কারণ, যাহ্‌দাম গোত্র ইয়ামানীদের অন্তর্গত নয়। (পার্শ্বটীকা)

فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيْنَ : রসূল (স.) তাবুক যুদ্ধের পরিকল্পনা নিলে তিনি আশয়ারীদের ডেকে পাঠান। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা আগমন করে।

فَجَاءَ نَاسٌ مِنَ الْيَمَنِ (অতঃপর ইয়ামানী কিছু লোক আসে) : এখানে প্রশ্ন হলো, বনূ তামীম উপদল ৯ম হিজরীতে আসে আর আশয়ারী উপদল আসে ৬ষ্ঠ হিজরীতে খয়বার বিজয়ের সময়। তাহলে এখানে দু'দল কিভাবে একত্রিত হল? উত্তর হলো, হতে পারে যখন বনূ তামীম উপদল আসে, তখন আশয়ারীদেরও কিছু লোক মদীনায় আসে।

اَلْإِيْمَانُ هٰهُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ (নবীজী স্বহস্তে ইয়ামানের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ঈমান ওদিকে অর্থাৎ, ঈমানের দিপ্তীময় প্রসার এক সময় ইয়ামানে ঘটবে) : এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রসূল (স.)-এর অপর উক্তি اَلْإِيْمَانُ يَمَانٌ-এর মধ্যে ইয়ামান দ্বারা উদ্দেশ্য ইয়ামানবাসী, আনসার নয়। কিন্তু

www.e-ilm.weebly.com

আনসাররা মূলত ইয়ামানী হওয়ায় কেউ কেউ ইয়ামানী বলতে আনসারগণ উদ্দেশ্য বলে ধারণা করেছেন। আনসারীগণ সম্মুখে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও নবীজীর স্বহস্তে ইয়ামানের প্রতি ইঙ্গিত করাটাই প্রমাণ করে যে, ইয়ামানী বলতে ইয়ামানের অধিবাসীরাই উদ্দেশ্য।

اَلْجَفَاءُ وَغِلَظُ الْقُلُوْبِ فِى الْفَدَّادِيْنَ (মোটা গলা ও কর্কশ ভাষীরা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের) ঃ اَلْفَدَّادِيْنَ শব্দটি দু'রকম পড়া যেতে পারে। (১) দাল শব্দটি তাশদীদ-যোগে [اَلْفَدَّادِيْنَ], তখন অর্থ হবে ভারী, কর্কশ বা বিকট আওয়াজ। (২) দাল শব্দটি তাশদীদবিহীন (اَلْفَدَادِيْنَ) তখন অর্থ হবে, চাষ যন্ত্রপাতি। অতএব বাক্যের মর্মার্থ হবে, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর রাখাল এবং কৃষক-চাষীদের সাধারণ অভ্যাসের ন্যায় যারা বিকট আওয়াজ করে, চেঁচিয়ে কথা বলে এবং সর্বদা শোরগোল করে, তারা অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর স্বভাবের হয়। বক্ষমান হাদীসে এ জাতীয় লোকদের নিন্দাবাদ করা হয়েছে। কেননা, সাধারণত তারা দ্বীনি ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং পরকালের ব্যাপারে হয় অত্যন্ত বেপরোয়া।

ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) বলেন, যারা দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধারে জাহেল বদদ্বীন দুনিয়াদারদের পিছনে ঘুর ঘুর করে অথবা চতুষ্পদ প্রাণীর মাঝে দিন-রাত অবস্থান করে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষাবাদ নিয়ে রাত-দিন মশগুল থাকে, অনুরূপভাবে বাজারে-বাজারে, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও আড্ডাখানায় এবং যেনতেন অনুষ্ঠানে গিয়ে যারা নিজেদের মূল্যবান জীবন নষ্ট করে, তারাও অত্র হাদীসের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

عِنْدَ أُصُوْلِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ ঃ এ বাক্যের মর্মার্থ হলো, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণী হাঁকিয়ে নেয়ার সময় যারা চেঁচায় এবং জোরে জোরে আওয়াজ করে।

مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ (যে স্থান থেকে শয়তানের শিং উদিত হয়) ঃ এ বাক্য দ্বারা (মদীনার) পূর্ব দিকে অবস্থিত রবীয়া ও মুযার অবস্থানস্থল উদ্দেশ্য। বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করার তাৎপর্য হলো, সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে শয়তান সূর্যের উদয় স্থলে এসে দাঁড়ায়। ফলে যখন সূর্য উদিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদের অবস্থান শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী স্থানে হয়। অর্থাৎ, শয়তানের মাথার দুই পার্শ্বে। আর সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের উদয় স্থলে শয়তানের দাঁড়ানোর কারণ হলো, যাতে সূর্য পূজারীদের সূর্য পূজার সাথে সাথে তারও পূজা হয়ে যায়।

اَلْإِيْمَانُ يَمَانٌ ঃ يَمَان মূলে يمنى ছিল। ياء-কে বিলোপ করে তার বদলে مِيْم-এর পরে اَلِف সংযোজন করা হয়েছে। অর্থ প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমান হলো ইয়ামানীদের ঈমান। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের পরবর্তী রূপ। কেননা, প্রথম বাক্যে ইয়ামানীদের গুণাগুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তাদের অন্তঃকরণ নরম ও সদয় প্রকৃতির। এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং তাদের

www.e-ilm.weebly.com

অন্তর ঈমান-নূরে আলোকিত হয়েছে। সে জন্যই রসূল (স.) তাদের 'পূর্ণাঙ্গ ঈমানের' ভূয়সী প্রশংসা করেন।

وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَّةٌ ঃ অর্থাৎ, যেরূপভাবে তাদের অন্তর ঈমানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে, তেমনি তা হিকমাতেরও উৎসস্থল। (কস্তলানী)

উলামায়ে কেরাম হিকমতের বহু সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তবে সর্বোৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হলো, হিকমত (প্রজ্ঞা) ঐ জ্ঞানালোক, যার দ্বারা দ্বীনের সঠিক বুঝ অর্জিত হয়। কুরআন-হাদীস এ সংজ্ঞাটিকেই সমর্থন করে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا অর্থাৎ, যিনি হিকমত তথা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছেন।

রসূল (স.) বলেন, مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ অর্থাৎ, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ ঃ হাদীসের সূত্র ও ভাষ্যে উল্লিখিত আলকমার দিক থেকেই শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল রয়েছে। কেননা, এ আলকমা হলেন নখয়ী। আর 'নখয়া' ইয়ামানের একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম।

দাউস ও তুফাইল বিন আমর দাউসীর ঘটনা ঃ ইয়ামানের একটি গোত্রের নাম দাউস।

اَلطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِي ঃ এটা এক ব্যক্তির নাম। তিনি মক্কায় আসেন এবং মুসলমান হন। রসূল (স.) তাঁকে স্বীয় গোত্রের প্রতি (ইসলাম প্রচারক হিসেবে) প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে দীর্ঘদিন মানুষদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দেন। কিন্তু এতে ব্যর্থ হন। তাই ফিরে এসে বলেন, إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَ অর্থাৎ, দাউসের ধ্বংস অনিবার্য। রসূল তাদের হেদায়েতের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন। যার ফলে তিনি ও তাঁর গোত্র খয়বারের সময় মদীনা আসেন (এবং মুসলমান হন)। তিনি [হযরত তুফাইল (রযি.)] ইয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হন। (বুখারী শরীফ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضـ ঃ হাকেম বলেন, হযরত আবু হুরায়রার প্রকৃত নাম আব্দুর রহমান বিন উমর। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। আবু হুরায়রা হলো তার উপনাম। এ কুনিয়াত এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, যেন এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন নামই নেই। তিনি খয়বারের বছর (সপ্তম হিজরী) মুসলমান হন। রসূল (স.)-এর থেকে তিনি সর্বমোট ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্য হতে বুখারী ও মুসলিম (রহ.) উভয় একযোগে ৩২৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবাদের মধ্যে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী বলেন, তিনশর'ও অধিক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর

www.e-ilm.weebly.com

থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রযি.) তাঁকে বাহরাইনের গভর্নর নিযুক্ত করেন। অবশ্য পরে তিনি বরখাস্ত হন। কিছুদিন পর আবার তাঁকে গভর্নর নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। মৃত্যু অবধি তিনি মদীনায় বসবাস করেন এবং ৫৭ কিংবা ৫৮ হিজরীতে ৭৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। কথিত আছে, আকীক নামক স্থানে তাঁর ইন্তেকাল হয়। পরে মরদেহ মদীনায় আনা হয়। মদীনার শাসক ওয়ালীদ বিন উকবা বিন আবু সুফিয়ান তাঁর জানাযা নামায পড়ান।

بَابُ قِصَّةِ وَفْدِ طَيْ وَحَدِيْثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ

তাঈ প্রতিনিধি দল ও আদী বিন হাতেমের কাহিনী

প্রতিনিধি আগমন বছর অর্থাৎ, ৯ম হিজরীতে রসূল (স.) হযরত আলীকে তাঈ গোত্রের মন্দির ভাঙ্গতে প্রেরণ করেন। আদী বিন হাতেম ইসলামী ফৌজ দেখে স্বীয় পরিবার-পরিজন নিয়ে সিরিয়ায় চলে যান। অতঃপর ৯ম হিজরীর শা'বান মাসে রসূল (স.)-এর সকাশে মদীনায় আসেন। ওয়াকেদী বলেন, তিনি ১০ম হিজরীর শা'বান মাসে মদীনায় আসেন। এরপরে রদ্দার তথা ধর্মান্তরিতের বছর নিজ গোত্রের সদকার মাল নিয়ে হযরত আবু বকর (রযি.)-এর কাছে আসেন। তিনি স্বগোত্রকে মুরতাদ হওয়া থেকে বাধা দেন। হযরত আলী (রযি.) এর সাথে তিনি জঙ্গে জামাল ও সিফফীনে শরীক হন। ৬৭ হিজরীতে মুখতারের যুগে ১২০ বছর বয়সে তিনি কুফায় ইন্তেকাল করেন।

فَلَا أُبَالِى إِذًا ঃ অর্থাৎ, আপনি (উমর) যখন আমার মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল তখন অন্যকে আমার উপর প্রাধান্য দিলে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

بَابُ حَجَّةِ الْوِدَاعِ

বিদায় হজ্জ

حَجَّةُ الْوِدَاعِ ঃ وَاوْ দু'ভাবে পড়া যায়। (১) যবর যোগে অর্থাৎ, وَدَاعْ (২) যের যোগে অর্থাৎ, وِدَاعْ

এ হজ্জকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। যথা ঃ

(১) হাজ্জাতুল বিদা ঃ নবীজী বিদায় হজ্জে সমবেত লাখো সাহাবাকে বিদায় জানান এবং এভাবে লক্ষাধিক সাহাবার সাথে একত্রে এটাই ছিল নবীজীর শেষ হজ্জ পালন। তাই এ হজ্জকে হাজ্জাতুল বিদা বলা হয়।

(২) হাজ্জাতুল ইসলাম ঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার পর রসূল (স.) কেবল এই একটিই হজ্জ করেন বলে তাকে হাজ্জাতুল ইসলাম বলা হয়।

(৩) হাজ্জাতুল বালাগ ঃ রসূল (স.) এ হজ্জে কথা ও কাজের মাধ্যমে শরীয়তের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করেন বলে তাকে হাজ্জাতুল বালাগ বলা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) হাজ্জাতুত্ তামাম ওয়াল কামাল (পূর্ণাঙ্গ হজ্জ) ঃ আল্লাহ পাক এ হজ্জেই اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ। অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম।' —এ আয়াত অবতীর্ণ করেন বিধায় তাকে হাজ্জাতুত্ তামাম্ ওয়াল কামাল বলা হয়।

হজ্জ ফরযের সময়কাল ঃ প্রাধান্যপ্রাপ্ত উক্তি হতে ৯ম হিজরীতে কুরআনের আয়াত, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً (অর্থাৎ, কেবল আল্লাহর জন্য মানুষদের বাইতুল্লাহর হজ্জ করা কর্তব্য, যারা সেখানে যেতে সক্ষম) অবতীর্ণ হলে হজ্জ ফরজ হয়।

হাফেজ ইবনে হাজার ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামের মতে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণরূপে পালন কর) আয়াত অবতীর্ণ হলে হজ্জ ফরজ হয়। কিন্তু এ অভিমতটি কয়েকটি কারণে দুর্বলা যথা—

(১) এ আয়াতে হজ্জ ও উমরা পূর্ণরূপে আদায় করতে বলা হয়েছে, হজ্জ ফরযের হুকুম জানানো হয়নি।

(২) যদি এর দ্বারা হজ্জ ফরজ হয়, তবে উমরাও ফরজ হওয়া আবশ্যক। অথচ তা ফরজ নয়, বরং সুন্নাত মাত্র।

(৩) একাধিক বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, হিজরতের পর রসূল (স.) শুধুমাত্র একটিই হজ্জ 'বিদায় হজ্জ' করেন। যদি ৬ষ্ঠ হিজরীতেই হজ্জ হয়ে থাকে, তবে রসূল (স.) হজ্জ পালনে এত বিলম্ব করতেন না।

(৪) বর্ণনামতে প্রকাশ, রসূল (স.) ৬ষ্ঠ হিজরীতে মক্কায় গিয়ে শুধু উমরা আদায় করেন, হজ্জ না। আর এটা কি করে হতে পারে যে, রসূল (স.) শুধু সুন্নাত আদায় করবেন, ফরজ আদায় করবেন না। (আসাহহুস সিয়ার)

হজ্জের উদ্দেশ্যে রসূল (স.)-এর যাত্রা ঃ ইবনে কাইউমের গবেষণা ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী রসূল (স.) ১০ম হিজরীর ২৫শে জিলকদের এক জুমুআর খুতবায় মুসলমানদের হজ্জের ট্রেনিং দেন। ২৬ শে জিলকদে মসজিদে নববীতে জোহরের নামায আদায় করেন এবং মানুষদেরকে পুনরায় হজ্জসহ বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করেন। অতঃপর জোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে মদীনা হতে রওনা হন। মদীনা হতে ছয় মাইল দূরে জুল-হুলায়ফা নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করেন। সেখানে রসূল (স.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায (আসর থেকে পরদিন জোহর পর্যন্ত) আদায় করেন। নবী-সহধর্মীনিগণ সকলে তাঁর সাথে ছিলেন। তিনি (অজ্ঞাত স্ত্রীর সাথে) মিলনোত্তর গোসল ছাড়াও নতুন গোসল করে সেখানেই ইহরাম বাঁধেন। সেখান থেকে রওহা, ইছায়া, উরয এবং আবওয়া হয়ে সারিফ নামক স্থানে পৌঁছান। এখানে হযরত আয়েশার (রযি.) মিন্স (হায়েজ) শুরু হয়। রসূল (স.)

www.e-ilm.weebly.com

সেখান থেকে জী-তওয়া পৌঁছেন। রবিবারের অপরাহ্ন সেখানেই অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে জিলহজ্জের চার তারিখ বিদায় নেয়। পঞ্চম তারিখে ফজরের নামায আদায়ান্তে গোসল সেরে মক্কায় রওনা হন। তিনি যহুনমুখী ঊর্ধ্বপ্রান্তে অবস্থিত শানিয়াতুল উলা এলাকা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। চাশতের সময় সোজা মসজিদে হারামে যান এবং তওয়াফ করেন। এরপর সাফা-মারওয়ার (দু'টি পাহাড়) মধ্যস্থলে সায়ী করেন। সায়ী শেষে মারওয়া থেকে নেমে তিনি মক্কার বাইরে ৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৮ই জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার দিন সোবহে সাদিকের পর মীনায় রওনা হন। রাতে সেখানেই অবস্থান করেন। শুক্রবার সকালে আরাফায় যান। সূর্য ঢলে গেলে নিজের উটনী কছওয়ার উপর আরোহণ করত বাতনে ওদীতে আসেন এবং এক ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন, যা ইসলামের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। অতঃপর সূর্যের লালিমা অন্তর্হিত হলে তিনি আরাফা হতে মুজদালিফা যান এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে (ইশার প্রথম সময়ে) পড়ে নিদ্রা যান। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বে মুজদালিফায় অবস্থান করেন। তারপর সেখান থেকে মীনায় আসেন। এখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন। তারপর কুরবানীর স্থলে যান এবং ৬৩টি উট নিজের হাতে নহর (জবেহ) করেন। এরপর হলক (মস্তক মুণ্ডন) করে মীনা থেকে মক্কায় আসেন এবং তওয়াফে জিয়ারত করেন। অতঃপর মক্কা থেকে ফিরে গদীরেখুমে পৌঁছান এবং তথায় একটি ভাষণ দেন। (আসাহহুস সিয়ার)

রসূল (স.) কোন্ হজ্জ করেন? ঃ প্রকাশ থাকে যে, ফোকাহাদের (ইসলামী আইনবেত্তা) পরিভাষায় হজ্জ তিন প্রকার। (১) কিরান (২) তামাত্তু ও (৩) ইফরাদ।

হজ্জে কিরানের সংজ্ঞা ঃ মিকাত থেকে একত্রে হজ্জ ও উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে প্রথমে উমরা সম্পন্ন করত (হালাল না হয়ে) পুনরায় হজ্জ সম্পাদন করা। (ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে হজ্জে কিরানই সর্বোত্তম হজ্জ।)

হজ্জে তামাত্তুর সংজ্ঞা ঃ মীকাত থেকে শুধু উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় এসে উমরার কার্য সম্পন্ন করত হালাল হয়ে ৮ই জিলহজ্জে পুনরায় হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের কার্যাবলী পালন করা। (ইমাম আহমাদ (রহ.)-এর মতে এ হজ্জই সর্বোত্তম)

হজ্জে ইফরাদের সংজ্ঞা ঃ মীকাত থেকে কেবল হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে শুধু হজ্জই আদায় করা। (ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর মতে তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে হজ্জে ইফরাদই সর্বোত্তম।)

এ তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে রসূল (স.) কোন্ হজ্জ সম্পাদন করেন, তা নিয়ে চরম মতবিরোধ রয়েছে। তিন প্রকার হজ্জের ব্যাপারেই বর্ণনা থাকায় কেউ কিরান, কেউ তামাত্তু আর কেউ ইফরাদ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

রসূল (স.)-এর হজ্জ সংক্রান্ত যে বিস্তারিত রিপোর্ট বা তথ্য এ পর্যন্ত জানা গেছে, তা হলো —

রসূল (স.) হজ্জ-উমরা উভয়ের নিয়ত করেন। কিন্তু উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক তওয়াফ ও সায়ী করেন নি। যেহেতু আগত বর্ণনাসমূহের মাঝে সমন্বয় সাধন অত্যন্ত জটিল, তাই উলামায়ে কেরামের মধ্যে এহেন মতান্তর সৃষ্ট হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া ও হাফেজ ইবনে কাইউমের বর্ণনা অনুযায়ী প্রকৃত ঘটনা হলো, সাহাবাদের যামানায় ফোকাহাদের বর্তমান প্রচলিত এ পরিভাষার অস্তিত্ব ছিল না। এ পরিভাষা পরে নির্দিষ্ট ও চালু হয়েছে। বুখারীর এক বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, তামাত্তু অর্থ হজ ও উমরা একত্রে করা। অথচ এটাই কিরানের অর্থ।

রসূল (স.) হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য পৃথক পৃথক তওয়াফ ও সায়ী না করায় কিছু সাহাবা একে হজ্জে 'ইফরাদ' বলে ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে তিনি হজ্জ ও উমরা উভয় ক্ষেত্রে তালবীহ ও তাহলীল উভয় করেছেন বিধায় কিছু সাহাবা একে 'তামাত্তু' আর কিছু সাহাবা 'কিরান' বলে ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং সাহাবারা যে তামাত্তু, কিরান বা ইফরাদ শব্দ ব্যবহার করেছেন তা একান্তই আভিধানিক দিক দিয়ে, ফোকাহাদের প্রচলিত পরিভাষার দিক দিয়ে নয়।

অবশ্য হজ্জ ও উমরায় রসূল (স.) কর্তৃক তালবীহ ও তাহলীল পাঠের কথা অধিক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হওয়ায় কিরানের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। ১৭ জন সাহাবা হতে তা বর্ণিত হয়েছে। অতএব ফোকাহাদের পরিভাষা অনুযায়ী তিনি হজ্জে কিরানই পালন করেন। যেহেতু রসূল (স.) হজ্জ ও উমরার জন্য পৃথক পৃথক তওয়াফ ও সায়ী করেননি, তাই তাঁর হজ্জ পারিভাষিক অর্থে 'তামাত্তু' ছিল বলা যায় না।

وَاهِلِّىْ بِالْحَجِّ وَدَعِى الْعُمْرَةَ (তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধ এবং উমরার ইহরাম ভেঙ্গে ফেল) ঃ প্রকাশ থাকে যে, হজ্জ সফরের এক পর্যায়ে সারফ নামক স্থানে এসে হযরত আয়েশার হায়েজ শুরু হয়। হযরত আয়েশা (রযি.)-এর এ হায়েজ ঘটনার উপর ফোকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের বড় বড় মতবিরোধের ভিত্তি রচিত হয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি মতবিরোধ হলো, যদি কোন মহিলা উমরার নিয়ত করে, অতঃপর তার হায়েজ এসে যায় (যেমন, হযরত আয়েশার এসেছিল) তবে সে মহিলার করণীয় কি?

ইমাম আবু হানীফা ও কুফী আলেমগণ বলেন, সে উমরার ইহরাম ভঙ্গ করত হজ্জে ইফরাদের নিয়ত করবে। তাদের দলীল, হযরত আয়েশা (রযি.)-এর সূত্রে হযরত উরওয়া কর্তৃক বর্ণিত বুখারী-মুসলিমের এ হাদীস। কেননা এ হাদীস সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, তার প্রথম ইহরাম বাকী থাকে না। যার দরুন রসূল (স.) প্রথম ইহরাম ভঙ্গের নির্দেশ দেন। হযরত আয়েশা রসূল (স.)-এর নির্দেশে (ইহরাম ভঙ্গ করতে) চুলে চিরুণী করেন অর্থাৎ, চুল আঁচড়ান। যদি প্রথম ইহরাম বাকী থাকত, তবে তিনি চুল আঁচড়াতে পারতেন না। তদুপরি রসূল (স.)

www.e-ilm.weebly.com

তানঈমের উমরাকে (যা আয়েশা পরবর্তীতে আদায় করেন) প্রথম উমরার পুনঃ আদায় বা স্থলাভিষিক্ত বলে অভিহিত করেন। যদি প্রথম ইহরাম বাকী থাকত, তবে তানঈমের উমরা প্রথম উমরার পুনঃ আদায় বা স্থলাভিষিক্ত হত না; বরং পূর্বেরটা হতো প্রথম উমরা। আর এটা হতো দ্বিতীয় উমরা।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমাদ ও হিজাযীদের মতে, এ ধরনের মহিলা উমরার সাথে হজ্জের নিয়ত করে 'কিরান' করবে। (লামিউদ্ দারারী ২ঃ২১০)

শায়েখ ইবনে কাইউম (রহ.) তাঁর الهدى গ্রন্থে বলেন, হযরত আয়েশার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উলামায়ে কেরামের মাঝে যে সমস্ত বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে (১) তিনি তামাত্তু হজ্জ করেন, নাকি হজ্জে ইফরাদ? (২) যদি তামাত্তু হজ্জ করেন, তবে (ক) তিনি তার উমরা ভঙ্গ করত ইফরাদ শুরু করেন নাকি (খ) উমরার সাথে হজ্জ করে 'কারেন' হয়ে যান? (৩) যে উমরা তিনি তানঈম হয়ে আদায় করতে আসেন, তা ওয়াজিব ছিল কিনা?

ফোকাহায়ে কেরাম হযরত আয়েশার ঘটনার ভিত্তিতে একটি মাসআলায় মতবিরোধ করেন। আর তা হলো, কোন মহিলা যদি শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে অতঃপর তার হায়েজ এসে যাওয়ায় সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তওয়াফ করতে না পারে, তবে সে কি উমরার ইহরাম ভঙ্গ করতঃ হজ্জে ইফরাদের ইহরাম বাঁধবে? নাকি উমরার সাথে হজ্জের নিয়ত করে হজ্জে কিরান আদায় করে নেবে?

প্রথম অভিমতটি কুফী ফকীহদের। তন্মধ্যে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শাগরেদবৃন্দ উল্লেখযোগ্য। আর দ্বিতীয় অভিমতটি হিজাযী ফকীহদের। এদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.) উল্লেখযোগ্য। ইমাম আহমাদ ও তার অনুসারীদের অভিমতও তাই।

অতঃপর শায়েখ ইবনে কাইউম (রহ.) বলেন, আসল কথা হলো, হযরত আয়েশা (রযি.) প্রথমে উমরার নিয়ত করত ইহরাম বাঁধেন। জমহুরও এ কথা স্বীকার করেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয় অন্য বিষয়ে যে, তিনি উমরা ভঙ্গ করেন, না কি হজ্জের সাথে উমরা করেন? প্রথমাংশের প্রবক্তা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) আর দ্বিতীয়াংশের প্রবক্তা আইম্মায়ে ছালাছা। ইমাম আবু হানীফা বলেন, হজ্জে কিরান আদায় করতে উমরা ও হজ্জের কাজ পৃথক পৃথকভাবে করতে হয়। কিন্তু হযরত আয়েশা (রযি.) যখন হজ্জের সময়ের পূর্বে উমরার কার্যাবলী পালন করতে ব্যর্থ হন, তখন বাধ্য হয়ে তিনি উমরা ভঙ্গ করেন এবং নতুন করে শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধেন। পক্ষান্তরে আইম্মায়ে ছালাছা বলেন, উমরার কার্যাবলী হজ্জের কার্যাবলীর অন্তর্গত হয়ে যায়। ফলে যখন হজ্জের পূর্বে উমরার কার্যাবলী পালন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, তখন তাঁর উমরার ইহরাম বাকী থাকা সত্ত্বেও হজ্জের ইহরাম বাঁধা জায়েয হয়েছে।

হানাফীগণ তাদের অভিমতের স্বপক্ষে বিভিন্নমুখী দলীল পেশ করেন—

www.e-ilm.weebly.com

(১) রসূল (স.) হযরত আয়েশাকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, دَعِىْ عُمْرَتَكِ অর্থাৎ, তুমি উমরা ভেঙ্গে ফেল।

(২) রসূল (স.) বলেন, اِمْتَشِطِىْ وَانْقُضِىْ رَأْسَكِ অর্থাৎ, তুমি মাথার কাপড় খোল এবং চুল আঁচড়াও।

(৩) রসূল (স.) আরও বলেন, هٰذِهٖ عُمْرَتُكِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ অর্থাৎ, এ উমরা তোমার পূর্ববর্তী অনাদায়ী উমরাই।

(৪) হযরত আয়েশা (রযি.) বলেন, اِعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ অর্থাৎ, আপনারা উমরা করবেন, আর আমি করব না?

(৫) হযরত আয়েশা (রযি.) বলেন, أَ تَنْطَلِقُوْنَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ অর্থাৎ, আপনারা হজ্জ-উমরা উভয় করতে যাবেন আর আমি শুধু হজ্জ করতে যাব? এতদ্ব্যতীত বহু বর্ণনা রয়েছে, যা প্রমাণ করে হযরত আয়েশা (রযি.) উমরা ভেঙ্গে ফেলেন। আর এ ব্যাপারেও বহু বর্ণনা রয়েছে যে, তানঈম থেকে তার আদায়কৃত উমরাটা ছিল ঐ উমরারই পুনঃ আদায়, যা তিনি ইতঃপূর্বে হায়েজগত কারণে ভেঙ্গে ফেলেন।

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, প্রাচীন ও বর্তমান জামানায় উরওয়ার হাদীসের উপর আমল নেই। তবে আল্লামা ইবনে আব্দুল বার বলেন, ইমাম মালেক (রহ.)-এর এ কথার উদ্দেশ্য হল, উমরা ভঙ্গ করত তা হজ্জে পরিণত করার প্রচলন নেই। তবে হজ্জ ভঙ্গ করত তা উমরাতে পরিণত করার আমল রয়েছে। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাই এরূপ করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে এসে এর বৈধতা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে।

উমরার দ্বারা হজ্জ বাতিল সংক্রান্ত মতভেদ

বিদায় হজ্জে কতক সাহাবা উমরা, কতক হজ্জ ও কতক উভয়ের নিয়ত করেন। মারওয়ায় সায়ী শেষে রসূল (স.) নির্দেশ জারী করেন যে, যাদের কাছে হাদী (কুরবানীর পশু) নেই তারা যেন ইহরাম ভেঙ্গে হালাল হয়ে যায়। আর যাদের কাছে হাদী আছে, তারা ইহরাম বাকী রাখবে। যাদের শুধু উমরার নিয়ত ছিল, তওয়াফ-সায়ী শেষে হালাল হওয়ার ব্যাপারে তাদের মনে কোনই দ্বিধা বা সন্দেহ থাকে না, কিন্তু যাদের নিয়ত ছিল শুধু হজ বা হজ ও উমরা উভয় পালনের এবং হাদীও ছিল না, তাদের (হালাল হওয়ার ব্যাপারে) সন্দেহ জাগে। কারণ, শুধু হজ্জ বা হজ্জ ও উমরা উভয় পালনের ক্ষেত্রে নহরের (জন্তু কুরবানী) পূর্বে হালাল হওয়া যায় না। অথচ রসূল (স.) তাদেরকে জোর দিয়ে হালাল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মনে সংশয় থাকা সত্ত্বেও কেউ মাথা মুণ্ডিয়ে আবার কেউ চুল কেটে হালাল হয়ে যায়।

www.e-ilm.weebly.com

সাহাবাদের উক্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের উপর ভিত্তি করে ইমামদের মধ্যেও এ মাসআলা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যে, فَسْخُ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ বিধানটি কেবল সাহাবাদের জন্যই ছিল, নাকি সর্বদা সকল মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর?

ইমাম আহমাদ ও তাঁর অনুসারীগণ (যেমন, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাইউম প্রমুখ) আলোচ্য হুকুমটি عَامٌ বলে দাবী করেন। পক্ষান্তরে আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও অন্যান্য ফকীহগণের মতে, এ হুকুমটি কেবল সাহাবাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর বর্ণনা উভয় রকমই এসেছে।

فَقَدْ حَلَّ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস হালাল হন অর্থাৎ, তিনি তওয়াফ করে সায়ী ও মস্তক মুণ্ডনের পূর্বে ইহরাম থেকে হালাল হন। আর এ ব্যাপারে এটাই হলো ইবনে আব্বাসের (রযি.) প্রসিদ্ধ মাজহাব।

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَ بَعْدُ ঃ অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রযি.) আরাফায় অবস্থানের পরে এবং পূর্বে উভয় অবস্থায় হালাল হওয়াকে জায়েয বলে মনে করতেন। ইবনে আব্বাসের এ অভিমত জমহুর উলামায়ে কেরাম গ্রহণ করেন নি। কারণ, তাদের মতে, হজ্জ পালনেচ্ছুক ব্যক্তি শুধু তওয়াফে কুদুম (আগমনোত্তর তওয়াফ) দ্বারা হালাল হতে পারে না; বরং আরাফায় অবস্থান, কঙ্কর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন এবং তওয়াফে জিয়ারতের পরেই কেবল হালাল হতে পারে। ইবনে আব্বাস (রযি.) কর্তৃক আল্লাহর উক্তি ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ দ্বারা দলীল পেশ সঙ্গত নয়। কারণ, আয়াতের অর্থ হলো, কুরবানীর পশু হারামে (জবেহের নির্ধারিত এলাকা) জবেহ করতে হবে, হারাম স্থল ব্যতীত অন্যত্র নয়। যদি আয়াত দ্বারা ইহরাম থেকে হালাল হওয়া উদ্দেশ্য হতো, তবে অবশ্যই বাইতুল্লাহ তওয়াফের পূর্বে হারামে হাদী পৌঁছতেই ইহরাম থেকে হালাল হওয়া জায়েয হত। অথচ কেউ তা জায়েয বলেননা। তাই এ থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতের সাথে ইহরাম এর কোনই সম্পর্ক নেই।

অনুরূপভাবে বিদায় হজ্জে সাহাবাদের হালাল হওয়ার নির্দেশ সংক্রান্ত হাদীস দ্বারাও ইবনে আব্বাস (রযি.)-এর দলীল পেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, যারা হজ্জের ইহরাম বাঁধেন তারাও যে হালাল হয়ে যান এ ব্যাপারে আলোচ্য হাদীসে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ।আল্লামা নববী সংকলিত মুসলিমের ব্যাখ্যাংশ।

فَمَا يَمْنَعُكَ (ইহরাম খুলতে আপনার অন্তরায় কি অর্থাৎ, আপনি কেন ইহরাম খুলেন না?) ঃ কেননা, অধিকাংশ বর্ণনা মতে প্রকাশ যে, রসূল (স.) 'কারেন' ছিলেন। অর্থাৎ, একই ইহরামে প্রথমে উমরা ও পরে হজ্জ আদায় করেন।

فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِى (হাদী নহর তথা কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হতে পারি না) ঃ এ হাদীসাংশ থেকে জানা গেল—

www.e-ilm.weebly.com

(১) যারা নিজেদের সাথে কুরবানীর পশু আনে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত উমরা থেকে হালাল হতে পারে না, যতক্ষণ তারা হজ্জের ইহরাম বাঁধবে এবং হজ্জের কার্যাবলী পূর্ণ সম্পাদন করবে।

(২) যতক্ষণ কুরবানীর পশু জবেহ করবে না, ততক্ষণ ইহরাম থেকে হালাল হতে পারবে না।

إِنَّ فَرِيْضَةَ اللّٰهِ عَلٰى عِبَادِهٖ أَدْرَكَتْ أَبِىْ شَيْخًا كَبِيْرًا (বান্দার প্রতি আল্লাহর আরোপিত দায়িত্বের সম্মুখীন আমার পিতা অতিশয় বয়োবৃদ্ধ অবস্থায় হয়েছেন) ঃ অর্থাৎ, আমার পিতা বৃদ্ধাবস্থায় মুসলমান হন। অর্থশালী হওয়ায় তার উপর হজ্জ ফরজ হয়েছে। অথবা তিনি মুসলমান হওয়ার পর ধনী হন, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তিনি হজ্জব্রত পালন করেননি। বর্তমানে আমার পিতা হজ্জ আদায় করতে (বৃদ্ধ হেতু) সক্ষম নন।

لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَسْتَوِىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ (তিনি বাহনে সোজা হয়ে বসতে অক্ষম) ঃ মোল্লা আলী কারী[১] (রহ.) বলেন, এ বাক্যাংশ প্রমাণ করে যে, পাথেয় থাকা এবং যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত হওয়া হজ্জ ওয়াজিবের জন্য শর্ত। আর শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা হলো ওয়াজিব হজ্জ আদায়ের জন্য শর্ত।

فَهَلْ يُقْضٰى أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ (তার পক্ষ থেকে আমার হজ্জ পালনের দ্বারা তার হজ্জ আদায় হবে কি? জওয়াবে নবীজী বলেন, হ্যাঁ!) ঃ অর্থাৎ, (পিতার পক্ষ থেকে) তোমার আদায়কৃত হজ্জ তোমার পিতার জন্য যথেষ্ট হবে। এ হাদীস থেকে نِيَابَةً عَنِ الْعَاجِزِ তথা অক্ষমের পক্ষ হতে 'বদল হজ্জের' বৈধতা প্রমাণিত হয়।

'মুয়াত্তা' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, যদি পুরুষ বা মহিলা বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয় এবং হজ্জ করতে না পারে, তবে তাদের পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করায় কোন ক্ষতি নেই। ইমাম আবু হানীফা ও হানাফী ফকীহদের সাধারণ মতামত এটাই। হানাফীগণ আরও বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ করতে দৈহিকভাবে সামর্থ্য রাখে, তবে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা জায়েয নেই। অবশ্য যদি অন্ধত্ব, খোঁড়া ইত্যাদি নিরাময় সম্ভাবনাহীন অপারগতা থাকে, তবে তার পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা জায়েয। কিন্তু যদি নিরাময় সম্ভাব্য ওজর হয়, যেমন অসুস্থতা ইত্যাদি, তবে তা যদি মৃত্যু নাগাদ অব্যাহত থাকে তাহলে জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।

আল্লামা আইনী বলেন, একদল উলামায়ে কেরামের মতে, এ হাদীসোক্ত হুকুম (বিধান) আবুল খছআমিয়ার জন্য মাত্র। অন্যের ক্ষেত্রে এ হুকুম বলবৎ করা জায়েয হবে না। কারণ, হজ্জ ফরজ হতে সামর্থ্য থাকা শর্ত। আর খছআমিয়ার পিতার

টীকা ঃ ১. হযরত মোল্লা আলী কারী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১০১৪ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

সামর্থ ছিল না। ফলে তার উপর হজ্জ ফরজ ছিল না। সুতরাং রসূল (স.) যখন তার উপর হজ্জ ফরজ না হওয়া সত্ত্বেও তার মেয়েকে হজ্জ আদায় করতে বলেছেন, তখন এটা কেবল ঐ মহিলার ক্ষেত্রেই সীমিত হবে। অন্যের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর করা যাবে না।

একটি মাসআলা ঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, পুরো সম্পদ থেকে বদলী হজ্জ ওয়াজিব। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে, যদি মৃত ব্যক্তি ওসিয়ত করে যায়, তবে কেবল সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে জায়েয।

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের ফরজ হজ্জ আদায় না করলেও অন্যের পক্ষ হতে সে বদলী হজ্জ আদায় করতে পারে। কারণ, প্রথমত হাদীসটি শর্তমুক্ত। দ্বিতীয়ত রসূল (স.) ঐ মহিলাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন নি যে, 'তুমি হজ্জ করেছ কিনা?' হযরত ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (রহ.)-এর মাজহাব এটাই। আর এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ (রহ.)-এরও মত এটা। তবে হানাফীদের মতে এরূপ কাজ মাকরূহ।* (বজলুল মাজহুদ)

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাক (রহ.) বলেন, নিজে হজ্জ করা ব্যতিরেকে অন্যের পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করা জায়েয নয়। তদুপরি যদি কেউ এমনটি করে, তবে তা বদলী হজ্জকারীর নিজের হজ্জ বলে গণ্য হবে (যার পক্ষ থেকে করেছে তার নয়)।

আল্লামা তীবী বলেন, এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, মহিলা পুরুষের পক্ষ হতে বদলী হজ্জ করতে পারে। তবে কারো কারো মতে, এটা জায়েয নেই। কারণ, মহিলা ইহরামের সময় এমন কাপড় পরিধান করে, যা পুরুষ পরিধান করে না, ফলে পুরুষের পক্ষ থেকে মহিলা প্রতিনিধি হলে হজ্জ আদায় হবে না।

أَقْبَلَ النَّبِيُّ عَامَ الْفَتْحِ (নবীজী মক্কা বিজয়ের বছর আগমন করেন) ঃ মক্কা বিজয়ের এ হাদীস বিদায় হজ্জের অধ্যায়ে উল্লেখের উপর সৃষ্ট প্রশ্নের উত্তর লামিউদ্ দারারীর গ্রন্থকার এভাবে প্রদান করেন যে, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি হয়েছে যে, বিদায় হজ্জে রসূল (স.) কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন কিনা? কারো মতে প্রবেশ করেন, আর কারো মতে প্রবেশ করেননি। ইমাম বুখারী (রহ.) আলোচ্য হাদীস এখানে উল্লেখ করে বলতে চান যে, বিদায় হজ্জে রসূল (স.) কাবা গৃহে প্রবেশ করেন। কারণ, মক্কা বিজয়ের সফর বাইতুল্লাহ জেয়ারতের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং জিহাদ ও যুদ্ধের জন্য ছিল। রসূল (স.) মক্কা বিজয় করতে এসে যখন কাবা শরীফে প্রবেশ করেন, তখন বিদায় হজ্জের সফরে যা মূলত বাইতুল্লাহ জেয়ারতের উদ্দেশ্যেই ছিল) অবশ্যই তিনি কাবা শরীফে প্রবেশ করে থাকবেন।

টীকা ঃ *এ মাকরূহ তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার নিজের উপর হজ্জ ফরজ। অথচ সে নিজের ফরজ হজ্জ আদায় না করে অন্যের পক্ষ থেকে 'বদলী হজ্জ' আদায় করে। কিন্তু যদি বদলী হজ্জকারী এমন হন, যার উপর তার নিজের হজ্জ ফরজ নয়। তবে তার বদলী হজ্জ করা মাকরূহ হবে না। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

لَا نَدْرِىْ مَا حَجَّةُ الْوِدَاعِ (জানি না, 'বিদায় হজ্জ'-এর মর্মার্থ কি অর্থাৎ, এ নামে তার নামকরণ কেন হল?) ঃ বিদায় হজ্জের নাম 'বিদায় হজ্জ' কেন হল? হতে পারে রসূল (স.)-এর সেদিনের উক্তি ঃ لِتَاخُذُوْا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّىْ لَا أَدْرِىْ لَعَلِّىْ لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِىْ هٰذِهٖ অর্থাৎ, তোমরা রীতিমত হজ্জ বিধান পালন করো। আমি জানি না, এ হজ্জের পর আর কোন হজ্জ করতে পারব কিনা (অর্থাৎ, হতে পারে এটাই আমার বিদায় হজ্জ) হতেই এ নাম রাখা হয়েছে।

হাফেজ ইবনে কাইউম বলেন, রসূল (স.) মীনা প্রাঙ্গণের ভাষণে মানুষদেরকে বিদায় জানান বিধায় এ হজ্জের নাম বিদায় হজ্জ হয়েছে।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, রসূল (স.) হজ্জের সময় ও তার পরবর্তীতে মানুষদেরকে বিদায় জানাচ্ছিলেন বিধায় এর নাম হয়েছে 'বিদায় হজ্জ'।

আলোচ্য হাদীসে 'বিদায় হজ্জ সম্পর্কে না জানার' যে উক্তি বিধৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ—

(১) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, সর্বোত্তম বাখ্যা হলো, এখানে لا نـدرى-এর "لا" টা অতিরিক্ত (زائدة), কারণ, এটা বিবেকসম্মত নয় যে, নামকরণহেতু জানা ব্যতিরেকেই লোকে 'বিদায় হজ্জ' বলে তার নামকরণ করবে।

(২) এ ব্যাখ্যারও অবকাশ রয়েছে যে, "لا" টা অতিরিক্ত নয়; বরং অর্থহীন। উদ্দেশ্য হল, সাধারণ জনগণ তার নামকরণ রহস্য জানে না; কিন্তু অন্যদের অনুসরণ করত তারাও এ নাম বলে।

(৩) বুখারীর পার্শ্বটিকায় এসেছে, আমরা বিদায় হজ্জের নামকরণ সম্পর্কে অবহিত ছিলাম। কারণ, দীর্ঘ সাহচর্য হেতু আমাদের ধারণাও হয়নি যে, রসূল (স.) কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু এর অল্পদিনের ব্যবধানে তাঁর ইন্তেকাল হলে আমরা বুঝতে পারলাম, এ হজ্জকে বিদায় হজ্জ কেন বলে?

لَا تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (তোমরা একে অপরের গর্দান উড়িয়ে আমার অবর্তমানে কুফরীতে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ, কাফের হয়ে যাবে না) ঃ উলামায়ে কেরাম كُفَّارًا-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন॥

(১) কেবল জান, মাল, ইজ্জত-আব্রুর জন্যই যারা একে অন্যের গর্দান উড়ানো, রক্তপাত এবং অনর্থ-গোলযোগ করাকে হালাল মনে করে, তাদের ব্যাপারেই এ নিষেধাজ্ঞা। অতএব যারা এরূপ করাকে হালাল বলে মনে করে কেবল তাদের বেলায় আলোচ্য কুফুরের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

(২) কুফর দ্বারা 'ইসলাম' নেয়ামতকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য।

(৩) এ জাতীয় কাজ মুসলমানদেরকে ক্রমে কুফরের পর্যায়ে উপনীত করে, তা ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) কুফর দ্বারা উদ্দেশ্য অস্ত্রসজ্জিত হওয়া। যেমন, কেউ অস্ত্রসজ্জিত হলে বলা হয়, كَفَرَ الرَّجُلُ بِسِلَاحَةٍ অর্থাৎ, হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, আমার ইন্তেকালের পর তোমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে হাতিয়ার তুলবে না।

(৫) কারো মতে উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেনতেন কারণে একে অপরকে কাফের বলবে না।

(৬) আল্লামা কিরমানী বলেন, এ উক্তিটি তার প্রকাশ্য অর্থেই ব্যবহৃত। অর্থাৎ, এটা মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে চরম সতর্কতা ও অগ্রীম নিষেধাজ্ঞা।

(৭) যেহেতু খারেজীদের নিকট কবীরা গুনাহ্ কুফর পর্যায়ের। তাই তারা কুফরের অর্থ করে خَارِجٌ عَنِ الْمِلَّةِ তথা ইসলাম থেকে বহিষ্কার।

(৮) আল্লামা তীবী ও কস্তলানী বলেন, হাদীসের সারকথা হলো, মুসলমানদের গর্দান উড়ানোর ক্ষেত্রে তোমাদের কাজ যেন কাফেরদের কাজের মত না হয়।

শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) লামআত গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো-(১) অবিচার-অনাচার থেকে নিষেধাজ্ঞা এবং (২) জান, মাল ও ইজ্জত সংরক্ষণে সীমাতিরিক্ততা ও অতিরঞ্জন হতে নিষেধাজ্ঞা।

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى (আবু ইসহাক বলেন, মক্কায় আরেকটি হজ্জ করেন) ঃ অর্থাৎ, মদীনায় হিজরতের পূর্বেও রসূল (স.) মক্কায় থাকতে হজ্জ আদায় করেছেন। তবে তা ফরজ ছিল না। এক বর্ণনায় এসেছে, وَهُوَ بِمَكَّةَ الْحَجَّ قَطُّ إِنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ অর্থাৎ, রসূল (স.) মক্কায় অবস্থানকালে কখনও হজ্জ ছাড়েননি। (কস্তলানী)

اَلزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ (কাল ঘুরে তার আপন অবস্থায় ফিরে এসেছে) ঃ জাহেলী যুগে আরবদের প্রথা ছিল, তারা নিজেদের স্বার্থে মাস আগে-পিছে করে দিত। মুহাররম মাসে যদি তারা কোন গোত্রের সাথে যুদ্ধ করতে চাইত, তবে সে বছরের মুহাররমকে সফর মাসে পিছিয়ে দিত। এরূপভাবে তারা মুহাররমকে প্রতি বছর এক মাস থেকে অন্য মাসে পরিবর্তন করে দিত। যার ফলে মুহাররম মাস বছরের ১২ মাসের প্রতি মাসে চক্রাকারে পরিবর্তিত হত। এভাবে চলতে চলতে বিদায় হজ্জের বছর ঠিক ঐ স্থানে ফিরে আসে, যেখানে তা আসমান-জমিন সৃষ্টির সময় অর্থাৎ, প্রথমে ছিল। এটাই হল কুরআনে বর্ণিত إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ (অর্থাৎ, এই মাস পিছিয়ে দেয়ার প্রবণতা কেবল কুফরীর মাত্রা বৃদ্ধি করে) এর মধ্যকার نَسِيءٌ-এর মর্মার্থ। বস্তুত এ বিষয়কে সামনে রেখেই রসূল (স.)-এর উক্তি ধ্বনিত হয়েছে ঃ আজ জামানা (কাল) ঘুরে ফিরে পুনরায় তার স্বস্থান ও মূল অবস্থায় ফিরে এসেছে, যে অবস্থায় ও স্থানে তা আসমান-জমিন সৃষ্টি করার সময় ছিল।

www.e-ilm.weebly.com

اَلسَّنَةُ إِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (বার মাসে এক বছর) ঃ আল্লামা কস্তলানী (রহ.) তার কিতাবে উল্লেখ করেন—

قَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا رَأَيْتَ الْعَرَبَ السَّادَاتِ قَدْ تَرَكُوا الْعَادَاتِ وَحَرَّمُوا الْغَارَاتِ قَالُوا مُحَرَّمُ - وَإِذَا ضَعُفَتْ أَبْدَانُهُمْ وَأَصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ قَالُوا صَفَرُ - وَإِذَا زَهَتِ الْبَاتِيْنُ وَظَهَرَتِ الرَّيَاحِيْنُ قَالُوا رَبِيْعَانِ ـ وَإِذَا قَلَّتِ الثِّمَارُ وَجَمَدَ الْمَاءُ قَالُوا جَمَادِيَانِ - وَإِذَا هَاجَتِ الرِّيَاحُ وَجَرَتِ الْأَنْهَارُ وَتَرَجَّبَتِ الْأَشْجَارُ قَالُوا رَجَبُ - وَإِذَا بَانَتِ الْفَضَائِلُ وَتَشَعَّبَتْ الْقَبَائِلُ قَالُوا شَعْبَانُ - وَإِذَا حَمِيَ الْفَضَاءُ وَطَغِيَ جَمْرُ الْفَضَاءِ قَالُوا رَمَضَانُ - وَإِذَا قَلَّ السَّحَابُ وَكَثُرَ الذُّبَابُ وَشَالَتِ الْأَذْنَابُ قَالُوا شَوَّالُ - وَإِذَا قَعَدَ التُّجَّارُ عَنِ الْأَسْفَارِ قَالُوا ذُوالْقَعْدَةِ وَإِذَا قَصَدُوا الْحَجَّ مِنْ كُلِّ فَجٍّ وَاظْهَرُوا الْحَجَّ وَالثَّجَّ قَالُوا ذُوالْحِجَّةِ ـ

অর্থ ঃ জনৈক মুহাক্কিক (গবেষক) আরবী মাসের নামকরণের উৎস ও পটভূমির বর্ণনা এভাবে প্রদান করেন যে, আরব নেতৃবৃন্দ বছরের যে সময় তাদের পুরাতন স্বভাব পরিহার এবং যুদ্ধ হারাম ঘোষণা করে তখন বলে 'মুহাররম (হারামকৃত)। যখন তাদের শরীর দুর্বল এবং বর্ণ হলুদ হয়ে যায় তখন বলে 'সফর' (হলদে)। যখন বৃক্ষরাজি ফলবান হয় এবং বিভিন্ন রকম ফুল ফোটে, তখন বলে 'রবীয়ান' (رَبِيْعَانِ) [তথা দু'বসন্ত]। যখন ফল-মূল স্বল্প হয়ে যায় এবং মাটিতে পানি জমে থাকে তখন বলে "جَمَادِيَانِ" । যখন বায়ু চলে, নদী বহে এবং গাছ-গাছালি থেকে থেকে কেঁপে ওঠে তখন বলে 'রজব'। যখন বংশ বিচ্ছিন্ন ও গোত্র বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয় তখন বলে 'শা'বান'। যখন আবহাওয়া গরম হয় এবং তার তীব্রতা বৃদ্ধি পায় তখন বলে 'রমাযান'। যখন মেঘ কম হয়, মাছি বেশি হয় এবং (পশু-প্রাণী) লেজ বারংবার (তা প্রতিহত করতে) উঁচু করে তখন বলে 'শাওয়াল'। যখন ব্যবসায়িরা তাদের সফর মুলতবী করে বসে বসে সময় কাটায় তখন বলে 'জিলকদ' আর যখন দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন হজ্জ পালনের ইচ্ছায় আগমন করে এবং উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পড়ে এবং কুরবানী করে তখন বলে 'জিলহজ্জ'। (পরবর্তীতে তাদের এ উক্তি অনুযায়ী আরবী মাসের প্রচলিত নামগুলো চূড়ান্তরূপে গৃহীত হয়।)

وَ رَجَبُ مُضَرَ ঃ অন্যান্য আরবদের তুলনায় মুযার গোত্র রজব মাসের সম্মানের প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখত বিধায় তাদের প্রতি রজবের সম্বন্ধ প্রদান করা হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ مَكَانٍ أُنْزِلَتْ (উমর বলেন, আমার ভাল করে জানা আছে, কোথায় তা অবতীর্ণ হয়।) ঃ এ উক্তির দ্বারা হযরত উমরের উদ্দেশ্য এ কথা জানানো যে, আমরা ঐ দিনটা ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করেছি। শুধু তা-ই নয়; বরং যে স্থানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় আমরা সে স্থানকেও সম্মানের পাত্র বানিয়েছি। জুমুআর দিন আরাফাতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাই জুমুআও আমাদের জন্য ঈদ এবং আরাফার দিনও আমাদের জন্য ঈদ। সেজন্য অপর এক বর্ণনায় এসেছে, أُنْزِلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ يَوْمِ جُمُعَةٍ وَيَوْمِ عَرَفَةَ অর্থাৎ, দু'ঈদের দিনে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (১) জুমুআর দিন ও (২) আরাফার দিন। এ থেকে জানা যায় যে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ন্যায় খেলা-ধুলা, নাচ-গান, আনন্দ-স্ফূর্তি ইত্যাদি করা ইসলামী সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্মত নয়।

أَخْلُفُ بَعْدَ أَصْحَابِي (আমার সাথীরা মদীনায় যাওয়ার পর আমি মক্কায় পড়ে রব?) ঃ আবু উমর বলেন, হতে পারে হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রযি.) রসূল (স.)-এর উক্তি أَنَّكَ أَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً তথা তুমি এখনও অনেক ব্যয় করবে-শ্রবণ করলে তার এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, এ অসুখে তার ইন্তেকাল হবে না (কারণ, হুযূরের উক্তিতে تُنْفِقُ শব্দ এসেছে, যা ভবিষ্যৎ কাল বুঝায়)। সেহেতু তিনি জিজ্ঞাসা করেন যে, أَخْلُفُ بَعْدَ أَصْحَابِي অর্থাৎ, আমার মুহাজির ভায়েরা আপনার সাথে মদীনায় ফিরে যাবার পর আমি মক্কাতেই থেকে যাব? জওয়াবে রসূল (স.) বলেন, ...إِنَّكَ أَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلَ অর্থাৎ, অবশ্যই তুমি সুদীর্ঘ জীবন পেয়ে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করবে।

আল্লামা কুরতুবী বলেন, হযরত সাদের এ প্রশ্ন أَخْلُفُ بَعْدَ أَصْحَابِي মূলত, মৃত্যু পর্যন্ত মক্কায় থেকে যাবার আশঙ্কায় পয়দা হয়। কেননা তখন হিজরত থেকে তার সম্পর্ক ছিন্ন হবার আশঙ্কা ছিল। সেজন্য রসূল (স.) জওয়াবে বলেন, না, এমনটি হবে না; বরং তুমি দীর্ঘায়ু হবে।

وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ ঃ تُخْلَفُ দ্বারা উদ্দেশ্য দীর্ঘ জীবন। অর্থাৎ, তোমার জীবন দীর্ঘ হবে এবং মক্কায় তোমার ইন্তেকাল হবে না। আর বাস্তবেও ঠিক এমনটি হয়। এ সময় থেকে নিয়ে ইরাক বিজয় পর্যন্ত অর্থাৎ, দীর্ঘ ৪০ বছর পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকেন। মুসলমানরা তার থেকে উপকৃত হয় আর কাফের ও মুনাফিকরা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ (কিন্তু আফসোস, সা'দ বিন খাওলার জন্য) ঃ সাদ বিন খাওলার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করেন না। মক্কাতেই তার ইন্তেকাল হয়। তাই আফসোসের কারণ হলো, হিজরত করতে তার ব্যর্থ হওয়া। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, তিনি প্রথমে মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হন। অতঃপর

www.e-ilm.weebly.com

মক্কায় আসেন। মক্কা বিজয়ের বছর মক্কাতেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে আফসোসের কারণ হলো, যে স্থান থেকে তিনি হিজরত করেন, অবশেষে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হওয়া। হযরত সাদ বিন খাওলার আশা ছিল, মক্কাতে যেন তার মৃত্যু না হয়, বরং মক্কা ব্যতীত অন্যত্র হোক। কিন্তু তার এ আশা পূরণ হয় না। সেজন্যই রসূল (স.) তাঁর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

بَابُ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهِيَ غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ

তাবুক যুদ্ধ বা উসরা (ভীষণ কষ্টাত্মক) যুদ্ধ

تَبُوكَ ঃ মদীনা হতে ২৪ ক্রোশ দূরে সিরিয়ার একটি স্থানের নাম তাবুক।

جَيْشُ الْعُسْرَةِ (বিপদক্লিষ্ট বাহিনী) ঃ তাবুক যুদ্ধকে جيش العسرة বলার কারণ হলো, এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী অত্যন্ত কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হয়। রসদ ও পরিবহন ব্যবস্থায় ঘাটতি ছিল। অপরদিকে তীব্র গরম আবহাওয়া এবং সফর ছিল বেশ দূরের। আরবে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। ফল পাকার সময় ছিল নিকটবর্তী। শত্রুদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ চতুর্মুখী সংকটময় অবস্থায় মুসলিম বাহিনী শত্রুর মোকাবেলা করে বলে তাদেরকে جَيْشُ الْعُسْرَةِ বা 'বিপদক্লিষ্ট বাহিনী' নামে নামকরণ করা হয়।

তাবুক যুদ্ধের পটভূমি ঃ আরব খ্রীস্টানরা রোম সম্রাট হিরাকলার নিকট পত্র লিখে যে, আরবে যিনি নবুওয়াতের দাবী করেছিলেন তিনি মারা গেছেন। তাঁর অনুচররা দুর্ভিক্ষের শিকার। তাদের সহায়-সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে। আরবের উপর বিজয় অর্জনের এটাই মোক্ষম সময়। এ সংবাদ অবগত হয়েই রোম সম্রাট কয়সার ৪০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রেরণ করে। রসূল (স.) এ খবর পেয়ে ৩ হাজার ইসলামী ফৌজ নিয়ে মদীনা হতে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধ সর্বসম্মতিক্রমে ৯ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের পূর্ববর্তী মাস রজবে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে প্রশ্ন আরোপিত হয় যে, যদি সর্বসম্মতিক্রমে বিদায় হজ্জের পূর্বে তাবুক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে ইমাম বুখারী কেন তা বিদায় হজ্জের পরে উল্লেখ করলেন?

আল্লামা কস্তলানী প্রমুখ জওয়াব দিয়েছেন যে, এটা লিপিকারের (كاتب এর) ভুল মাত্র। অথবা বলা হবে, ইমাম বুখারী অগ্র-পশ্চাতের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম অনুসরণ করেননি।

মুহাদ্দিসে কাবীর মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া (রহ.) তাঁর লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে বলেন, আমার মতে কারণ হলো, ইমাম বুখারী স্বেচ্ছায় এ কাজটি করেছেন। এর দ্বারা তিনি এ দিকে ইঙ্গিত করতে চান যে, মক্কা বিজয়ের পর যে প্রতিনিধি দলের আগমন ধারা শুরু হয়েছিল, তা বিদায় হজ্জের শেষ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চালু থাকে। আর মক্কা বিজয়ের পূর্বে অথবা বিদায় হজ্জের পরে যে ফৌজ প্রেরিত হয়, তা ছিল খুব নগণ্য। অবশ্য তাবুকের ঘটনাটি একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত ঘটনা। তাই তাকে আগে-পিছে আনায় কোন ক্ষতি নেই।

www.e-ilm.weebly.com

خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِيْنَيْنِ (এ এক জোড়া উট নাও) ঃ এক দড়িতে বাঁধা দু'উটের একটাকে অপরটার 'করীন' বলে। কারণ, এতে একটা অপরটার সাথে মিলিত থাকে। যেমন, قَرَنْتُ الْبَعِيْرَيْنِ বাক্যটি তখন বলা হয়, যখন একটি রশিতে দু'টি উট বাঁধা বা একত্রিত করা হয়। সম্ভবত রসূল (স.) خُذْ هٰذَيْنِ الْبَعِيْرَيْنِ বাক্যটি মোট তিনবার বলেছেন। কিন্তু সংক্ষিপ্তহেতু বর্ণনাকারী দু'বার উল্লেখ করেছেন।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, 'আশয়ারীদের আগমন' অধ্যায়ে রসূল (স.) কর্তৃক পাঁচটি উট প্রদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ এখানে উল্লেখ হয়েছে ছয়টির কথা। উত্তর হলো, দু'হাদীস দু'ঘটনা সংশ্লিষ্ট। একটি আশয়ারীদের মদীনায় আগমনকালে, আর দ্বিতীয়টি তাবুক যুদ্ধের সময়। ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক দু'শিরোনাম আনয়ন মূলত এদিকেই ইঙ্গিত করে। আবার এটাও বলা যেতে পারে যে, রসূল (স.) প্রথমে পাঁচটার নির্দেশ দেন, অতঃপর আরও একটি বৃদ্ধি করে দেন।

أَلَا تَرْضٰى أَنْ تَكُوْنَ مِنِّىْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى (মূসার পক্ষ হতে হারুন অধিষ্ঠিত স্থলে তুমি আমার পক্ষ থেকে বরিত হতে চাও না?) ঃ তাবুক যুদ্ধে গমনকালে রসূল (স.) হযরত আলীকে নবী-পরিবারের জন্য তাঁর খলীফা হিসেবে নিযুক্ত করেন। এতে মুনাফিকরা এ অপপ্রচার চালায় যে, নিজ জামাতার কষ্ট লাঘব করতে তিনি তাঁকে রেখে গেছেন। কেননা, সফরটি ছিল অত্যন্ত কষ্টের। হযরত আলী তা শুনে যুদ্ধ-বস্ত্র পরিধান করত রসূল (স.)-এর সকাশে উপস্থিত হন। রসূল (স.) তখন 'যরফ' নামক স্থানে ছিলেন। হযরত আলী (রযি.) নবীজীকে বলেন, আল্লাহর রসূল, মুনাফিকরা এরকম এরকম বলছে। রসূল (স.) বলেন, তারা মিথ্যাবাদী। আমি পরিবার-পরিজন রেখে এসেছি বলেই তোমাকে আমার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেছি। তুমি আমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের মাঝে আমার পক্ষ হতে দায়িত্ব পালন করে যাও। এরপর রসূল (স.) বলেন, "মূসার (আ.) পক্ষ হতে হারুন (আ.) অধিষ্ঠিত স্থানে আমার পক্ষ থেকে তুমি বরিত হতে চাও না?

রসূল (স.)-এর পরে হযরত আলী (রযি.)-এর খলীফা হওয়ার উপর রাফেজীরা এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে। কিন্তু তাদের এ প্রমাণ কতিপয় কারণে প্রত্যাখ্যাত।

(১) রসূল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় হযরত আলীকে পারিবারিক প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন মাত্র। এর দ্বারা তাঁর ইন্তেকালের পর সকল উম্মতের প্রতিনিধি (খলীফা) হওয়া মোটেও আবশ্যক হয় না।

(২) যে হারুন (আঃ)-এর সাথে হযরত আলী (রযি.)-কে তুলনা দেয়া হয়, তিনি তো হযরত মূসার পরে খলীফা ছিলেন না। কারণ, হযরত হারুন (আ.) মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের প্রায় ৪০ বছর পূর্বে ইন্তেকাল করেন।

www.e-ilm.weebly.com

(৩) যদি প্রতিনিধিত্বটা সর্বাত্মক হতো, তবে হযরত আলীকে নামাযের ইমামতির ক্ষেত্রেও রসূল (স.) দায়িত্ব প্রদান করতেন। অথচ ইমামতির জন্য রসূল (স.) হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমকে নিযুক্ত করেন। এ থেকে জানা যায় যে, হযরত আলীর প্রতিনিধির দায়িত্বটা ব্যাপকভিত্তিক ছিল না; বরং শুধু পারিবারিক প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র।

بَابُ حَدِيْثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

কা'ব বিন মালেকের কাহিনী

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ الْمُسْلِمِيْنَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ (নবীজী মুসলমানদেরকে আমাদের তিন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে নিষেধ করেন) ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যারা ফাসেক এবং শরীয়ত মেনে চলে না, তাদের সাথে সালাম-কালাম বর্জন করা এবং তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করা জায়েয। অনুরূপভাবে এটাও জানা যায় যে, যার বাহ্যিক দিকটা শরীয়তসম্মত এবং প্রশ্নাতীত কিন্তু ভিতর দিকটা পরিশুদ্ধ নয়, তার সাথে সালাম-কালাম বর্জন করা ওয়াজিব নয়; বরং জায়েযও নয়। এক হাদীসে এসেছে, فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللّٰهِ অর্থাৎ, তুমি তাদের বাইরের দিক দেখ। আর ভিতর দিক আল্লাহর উপর ছেড়ে দাও।

যেহেতু মুনাফিকরা ঠাণ্ডা অজুহাত পেশ করে, তাই তারা অপরাধীদের অন্তর্গত ছিল না; বরং অপারগদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বস্তুত এ কারণেই তাদের সাথে কথা বন্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি।

আল্লামা সিন্ধী বলেন, তওবার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের পর্যালোচনা ও বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, ন্যূনতম আন্তরিক অনুশোচনার দ্বারাই তওবা হয়ে যায়। আর একবার যথানিয়মে তওবা হলে তা প্রত্যাখ্যাত হয় না। আল্লাহ পাক বলেন, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ অর্থাৎ, অপরাধীদের তওবা কবুল করা আল্লাহর প্রতি অবধারিত। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উক্ত তিন সাহাবা ((১) মুরারা বিন রবীয়া (২) কা'ব বিন মালেক ও (৩) হেলাল বিন উমাইয়া) হতে ন্যূনতম অনুশোচনা পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাদের তওবা কেন গৃহীত হলো না? এবং ৫০ দিন পর্যন্ত ব্যাপারটি মূলতবী (স্থগিত) থাকল! উত্তর হলো, ন্যূনতম অনুশোচনার দ্বারা তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণ লোকদের অবস্থা। আর আলোচ্য ঘটনাটি ছিল বিশেষ ব্যক্তি বা সাহাবা সংশ্লিষ্ট। তাই বিশেষ ব্যক্তিদের অবস্থাকে সাধারণ লোকদের অবস্থার সাথে তুলনা করা ঠিক হবে না। অথবা এ জওয়াব দেয়া হবে যে, তওবার নির্ধারিত শর্তাবলী পাওয়া যাওয়ার সময় তাঁদের তওবা কবুল হয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতরণের অপেক্ষা ছিল মাত্র। এটা (তওবা কবুলের উপর) একটি অতিরিক্ত বিষয়।

www.e-ilm.weebly.com

উলামায়ে কেরাম বলেন, চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে খাঁটি তওবা অর্জিত হয়। (১) আন্তরিক অনুশোচনা (২) মৌখিক ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তেগফার) (৩) পুনর্বার গুনাহ্ না করার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প এবং (৪) খারাপ ও অসৎ প্রকৃতির লোকদের সংস্পর্শ বর্জন।

بَابُ نُزُوْلِ النَّبِيِّ الْحِجْرَ

হিজরে মহানবীর (স.) অবতরণ

الْحِجْر ঃ সিরিয়া ও মদীনার কুরা উপত্যকার নিকটবর্তী একটি স্থানের নাম, যেখানে হযরত সালেহ্ (আ.)-এর কওম-“কওমে সামুদ” বাস করত।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لِاَصْحَابِ الْحِجْرِ لَا تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ

(নবীজী হিজর এলাকা অতিক্রমকারী সাহাবাদের সতর্ক করে বলেন ঃ তোমরা এ শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের এলাকায় অবস্থান করবে না এবং সেখান থেকে কোনরূপ ফায়দা হাসিলও করবে না) ঃ এখানে ‘হিজরবাসী’ দ্বারা তথাকার অবস্থানরত লোকজন উদ্দেশ্য নয়; বরং রসূল (স.)-এর ঐ সকল সাহাবী উদ্দেশ্য, যারা তাঁর সাথে হিজর নামক স্থান অতিক্রম করছিলেন। হিজর এলাকা অতিক্রম করার সামান্য সম্পর্কের কারণে তাঁদেরকে হিজরের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়।

এ অধ্যায়ের উভয় হাদীস প্রমাণ করে যে, এখানে প্রবেশ (دُخُوْل) দ্বারা অবতরণ (نُزُوْل) উদ্দেশ্য নয়; বরং তাদের বাড়ি-ঘর, বসতিতে অবস্থান গ্রহণ, বিশ্রাম নেয়া, তথাকার কূপ হতে পানি পান, প্রাণীদের পান করানো ইত্যাদি উপকার গ্রহণ উদ্দেশ্য। অন্যথা প্রয়োজনে সেখান থেকে অতিবাহিত হওয়া, অবতরণ করা জায়েয। আম্বিয়া পর্বের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে গমনকালে রসূল (স.) এ নির্দেশ দেন। অতএব শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ إِلٰى كِسْرٰى وَقَيْصَرَ

কিসরা ও কায়সারের প্রতি মহানবীর (স.) পত্র

إِلٰى كِسْرٰى (কিসরার প্রতি) ঃ এ সেই কিসরা (ইরান সম্রাট), যে হতভাগা রসূল (স.)-এর পত্র মুবারক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে। তার নাম ছিল পারভেজ বিন হারমুজ বিন নওশেরওঁয়া।

اَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ (তারাও একদিন এভাবে টুকরো টুকরো হবে) ঃ রসূল (স.)-এর এ বদদোয়া এভাবে কার্যকর হয় যে, আল্লাহ্ পাক পারভেজের পুত্র শেরওয়াহকে তার উপর ক্ষমতাশালী করেন। আর শেরওয়াহ তাকে পেট চিরে অতি নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

اَيَّامَ الْجَمَلِ (জঙ্গে জামালের সময়) ঃ ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী ও হযরত আয়েশার মধ্যে বসরায় অনুষ্ঠিত যুদ্ধকেই জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রযুদ্ধ বলে। এ যুদ্ধে

www.e-ilm.weebly.com

হযরত আলীর বিপক্ষ বাহিনীতে হযরত আয়েশা (রযি.) উটের পিঠে সওয়ার হয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন বলেই এ যুদ্ধের নাম হয় 'জঙ্গে জামাল'।

ফাতহুল বারীতে আছে, হযরত আলী[১] (রযি.)-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামকারিণী হযরত আয়েশা[২] (রযি.) ও তাঁর অনুগত বাহিনীর উদ্দেশ্য নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দখল ছিল না; বরং উসমান হত্যাকারীদের কিসাসের দাবীতেই তারা এ দুঃখজনক যুদ্ধে লিপ্ত হন। কিন্তু হযরত আলী (রযি.) এ অপেক্ষায় থাকেন যে, উসমানের পরিবার কিসাসের মোকাদ্দামা আগে দায়ের করুক, তারপর তিনি কিসাস আদায় করে দেবেন। এ মতের বিভিন্নতা থেকেই ক্রমে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে যুদ্ধই সংঘটিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, সাহাবাদের মধ্যে যত বাদানুবাদ বা সংঘর্ষ হয়েছে তার সবই ছিল ইজতেহাদভিত্তিক। যেমন এ জঙ্গে জামালের পিছনে এ ইজতেহাদ কাজ করে যে, হযরত আয়েশা (রযি.) ও তাঁর অনুসারীদের দাবী ছিল, উসমান হত্যাকারীদের থেকে এখনই কিসাস নেয়া হোক। আর হযরত আলী (রযি.) চান, উসমানের পরিবারের পক্ষ থেকে আগে মোকাদ্দামা পেশ হোক, তারপর আইন অনুযায়ী কিসাস নেয়া হবে। দৃষ্টিকোণগত এ মতপার্থক্যহেতু উভয় পক্ষের মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যার পরিণতিতে সংঘটিত হয় জঙ্গে জামাল। মোটকথা, সাহাবাদের সকল সংঘর্ষ মূলত এ ধরনের ইজতেহাদী ভুলের কারণে হওয়ায় তারা বিচার বা জবাবদিহিতার সম্মুখীন হবেন না।

'জঙ্গে জামাল' সাহাবাদের ভুল বুঝাবুঝির ফল ছিল বিধায় পরিশেষে হযরত আলী (রযি.) হযরত আয়েশা ও তাঁর অনুসারীদের সাথে সমঝোতা করে নেন। খোদ হযরত আয়েশাও নিজের বুদ্ধিগত ভুলের খেসারত দেন। যেহেতু এ যুদ্ধ কোন শরয়ী যুদ্ধ ছিল না, সেহেতু এখানে ইসলামী জেহাদের হুকুম কার্যকর হবে না। বস্তুত এ কারণেই হযরত আলী (রযি.) বিরোধী পক্ষের কারো মাল-সম্পদ দখল করেননি এবং কাউকে গোলামও বানাননি।

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً (সে জাতি কখনও সফলকাম হতে পারে না, যারা নারীকে নেতৃত্বের আসনে বসায়) ঃ জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে, নেতৃত্ব, শাসন, বিচার ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোন মহিলার দায়িত্বে ন্যস্ত করা জায়েয নেই। তাদের দলীল হলো—

(১) রসূল (স.)-এর মন্তব্য ঃ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً অর্থাৎ, সে জাতি সফলকাম হতে পারে না যারা তাদের সর্বময় কর্তৃত্ব নারীর হাতে অর্পণ করে অর্থাৎ, নারীর নেতৃত্বে চলে।

টীকা ঃ ১. হযরত আলী (রযি.), মৃত্যু ঃ ৪০ হিজরী।
২. হযরত আয়েশা (রযি.), মৃত্যু ঃ ৫৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(২) প্রকৃতিগতভাবেই নারীরা পুরুষ অপেক্ষা জ্ঞান ও ধর্মীয় দিক দিয়ে অসম্পূর্ণ হয়। তাই এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তাদের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া কোনভাবেই উচিত নয়।

(৩) খয়রুল কুরূন বা দীর্ঘ সোনালী যুগে শাসনভার কোন মহিলার হাতে অর্পণ করার কোন নজীর নেই। অবশ্য কতিপয় মালেকী মাযহাবালম্বী হতে এবং ইমাম মালেক (রহ.)-এর এক বর্ণনায় নারী নেতৃত্বের বৈধতার কথা বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) ও নারী নেতৃত্ব জায়েয বলে মনে করেন।

ইমাম আবু হানীফা হতে বর্ণিত আছে যে, কোন নারীকে ঐ বিভাগের প্রধান বানানো যেতে পারে, যে বিভাগে শরীয়ত নারীদের সাক্ষ্যকে গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। হযরত তবরীরও অভিমত এটা। (বুখারীর পার্শ্বটিকা)

بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ

মহানবীর (স.) অন্তিম পীড়া

'মাওয়াহেবে লাদুনিয়া' গ্রন্থে আছে, সূরা নসর অবতীর্ণ হলে রসূল (স.) সর্বপ্রথম ইন্তেকালের আভাস পান। কোনো বর্ণনা মোতাবেক اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ আয়াতের দ্বারা। কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় ؛ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى (অর্থাৎ অতীত অপেক্ষা ভবিষ্যৎই আপনার জন্য মঙ্গলজনক।) আয়াতের দ্বারা, আর কোন বর্ণনা হতে বুঝে আসে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) কর্তৃক একই রমযানে দুইবার রসূল (স.)-কে পূর্ণ কুরআন শোনানোর দ্বারা রসূল (স.) মৃত্যুর প্রাথমিক আভাস পান।

অন্তিম পীড়ার সূচনা ঃ হযরত মায়মুনা (রযি.)-এর কামরায় অবস্থানকালে রসূল (স.) সর্বপ্রথম মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হন। এরপর তিনি এক জানাযার সাথে সাথে 'জান্নাতুল বাকী' নামক গোরস্থানে যান। এতে মাথা ব্যথা আরও বেড়ে যায়। অতঃপর তিনি হযরত আয়েশা (রযি.)-এর কামরায় আসেন এবং অসুস্থতা পূর্বের থেকে আরও বৃদ্ধি পায়।

অসুস্থকাল এবং ইন্তেকাল ঃ ইবনে সা'দ উমর বিন আলী বিন আবু তালেব হতে বর্ণনা করেন যে, রসূল (স.) ১১ তম হিজরীর ২৮ শে সফর বুধবারে পীড়িত হন এবং ১৩ দিন পীড়িত থাকার পর ১১ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার দিন ইন্তেকাল করেন। জমহুরের অভিমত এটাই। অন্তিম পীড়ার শেষ ৭ দিন রসূল (স.) হযরত আয়েশার (রযি.) কামরায় অবস্থান করেন।

গোসল দান ঃ দালায়েলুন নবুওয়াত গ্রন্থে আছে, রসূল (স.)-কে গোসল দানের সময় সাহাবাগণ এ সংশয়ে পড়েন যে, রসূল (স.)-এর পরিহিত বস্ত্র অপসারণ করা হবে, নাকি অপসারণ ব্যতিকেই গোসল কার্য সমাধা করা হবে। বিভিন্ন মতামত আসে। ইত্যবসরে সেখানে অবস্থানরত সবাই ক্ষণিকের জন্য অলৌকিকভাবে তন্দ্রাভিভূত হন। সকলের মাঝে তন্দ্রা নেমে আসে। এ অবস্থায়

www.e-ilm.weebly.com

উপস্থিত সবাই অলৌকিকভাবে একটি আওয়াজ শুনতে পান যে, "রসূলকে তার বস্ত্রসহ গোসল দাও।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

রসূল (স.)-কে তিন ধরনের পানি দ্বারা গোসল দেয়া হয়। প্রথমে সাধারণ পানি দ্বারা। দ্বিতীয় বার কূলবৃক্ষের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা। তৃতীয়বার কর্পূর মিশ্রিত পানি দ্বারা।

কাফন-দান ঃ রসূল (স.)-কে তিন কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়। তন্মধ্যে পাগড়ী ছিল না।

জানাযা নামায ঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, রসূল (স.)-এর জানাযায় কেউ ইমামতি করেননি। হযরত আলী (রযি.) বলেন, রসূল (স.) সকলের ইমাম ছিলেন। এখনও তিনি ইমাম। কারণ, তিনি হলেন হায়াতুন্নবী বা জীবন্ত নবী। (তাই জামাতবদ্ধভাবে রসূল (স.)-এর জানাযা নামায অনুষ্ঠিত হয় না; বরং এক এক করে সাহাবাগণ যার যার মত জানাযা নামায আদায় করেন।)

দাফন ঃ এ প্রসঙ্গে দ্বিমুখী বর্ণনা থাকায় উলামায়ে কেরাম বর্ণনাসমূহের মাঝে সমতা বিধান করে বলেন, মঙ্গল ও বুধবারের মধ্যবর্তী রাত্রে রসূল (স.)-কে সমাহিত (দাফন) করা হয়।

মৃত্যুত্তর প্রতিক্রিয়া ঃ এ ধুলায়-ধূসর পৃথিবী থেকে রসূল (স.) ইন্তেকাল করলে বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত খেই হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। আল্লামা কস্তলানী লিখেন, হযরত উসমান (রযি.) মূক-নির্বাক হয়ে যান, কোন কথা বলতে পারেন না। হযরত আলী (রযি.)-এর সারা শরীর অবশ ও অসাড় হয়ে যায়, নড়াচড়ার শক্তি পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (রযি.) হার্টফেল করেন। হযরত উমর (রযি.) নাঙ্গা তলোয়ার হাতে নিয়ে ঘোষণা করতে থাকেন, নবীজীর ইন্তেকালের কথা কেউ উচ্চারণ করলে তার রক্ষা নেই। রসূল (স.)-এর দাফনের পর হযরত বেলাল (রযি.) আজান দেয়া ছেড়ে দেন।

اِيْتُونِىْ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا (আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের জন্য একটি ওসিয়তনামা লিখে দেব) ঃ كتاب-এর উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মতান্তর রয়েছে। এক পক্ষের মতে, এর দ্বারা রসূল (স.) শরয়ী বিধানাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা এবং কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলী সুসংহত করতে চেয়েছিলেন। যাতে মতবিরোধ-মতানৈক্য সব দূর হয়ে যায়।

আরেক পক্ষের মতে, এর দ্বারা রসূল (স.) খলীফাদের ধারাবাহিকতা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিতে চেয়েছিলেন। যাতে সাহাবাদের মধ্যে ভবিষ্যতে এ

টীকা ঃ লেখক কিতাবে তিন কাপড়ের মধ্যে পাগড়ী থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ আসাহহুস সিয়ার, সীরাতে মুস্তফা, তিরমিযী শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থে পাগড়ী না থাকার উল্লেখ এসেছে। তাই অনুবাদ এ সমস্ত গ্রন্থের তথ্যানুযায়ী করা হয়েছে। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাপারে কোনরূপ মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়। মুসলিমের এক বর্ণনায় এ প্রসঙ্গে এসেছে ঃ

اَنَّهُ قَالَ فِىْ مَرَضِهِ وَهُوَ عِنْدَ عَائِشَةَ اِدَّعِىْ لِىْ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتّٰى أَكْتُبَ كِتَابًا فَاِنِّىْ أَخَافُ أَنْ يَتَمَنّٰى مُتَمَنٍّ وَتَقُوْلُ قَائِلٌ وَيَابَى اللّٰهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلَّا أَبَابَكْرٍ ـ

অর্থাৎ, রসূল (স.) অন্তিম অসুস্থাবস্থায় হযরত আয়েশার গৃহে থাকাকালে একদা তাঁকে বলেন, তোমার পিতা ও ভাইকে ডাক। আমি উইল করে যাব। কারণ, আমার আশঙ্কা হয়, কোন (খেলাফত লাভের) আশাবাদী (খলীফা হওয়ার) আশা করবে অথবা কেউ অন্যায়ভাবে খেলাফত দাবী করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও মুসলমানগণ আবু বকর ছাড়া অন্য কারো খেলাফত (সর্বসম্মতিক্রমে) মেনে নিবে না।

فَتَنَازَعُوا (অতঃপর সাহাবাগণ বাদানুবাদ করলেন) ঃ কেউ বলেন, উইল করে নেয়াই ভাল। কারণ, এতে তার আদেশও পালন হবে এবং জরুরী বিষয়ের ব্যাখ্যাও সামনে আসবে। আবার কারো কারো বিশেষত হযরত উমর (রযি.)-এর অভিমত ছিল, "اِيْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ" এ আদেশটা আবশ্যিক নয়; বরং কল্যাণার্থে পরামর্শ মাত্র। তাই তাঁরা মৃত্যুর সায়হ্নে এ ভীষণ নাজুক অবস্থায় রসূল (স.)-কে কষ্টের উপর কষ্ট দেয়া সমীচীন মনে করেননি। কেননা, তাদের সামনে কুরআনের আয়াত مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ অর্থাৎ আমরা কিতাবে কোন বিষয় উল্লেখ করতে বাদ দিই নি এবং অপর আয়াত تِبْيَانًا لِكُلِّ شَىْءٍ তথা প্রত্যেক বিষয় খুলে খুলে প্রকাশ করেছি— বিদ্যমান ছিল। ফলে তাঁরা অতিরিক্ত আর কোন পথ-নির্দেশিকা বা অসিয়ত লিখিয়ে নেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

أَهَجَرَ اِسْتَفْهِمُوْهُ ঃ রসূল (স.) কি সত্যই আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? আপনারা তাঁর কাছে একটু জিজ্ঞাসা করুন তো!

আল্লামা আইনী (রহ.) আল্লামা কাজী আয়াজের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে বলেন, هَجَرَ-এর অর্থ হলো أَفْحَشَ তথা তিনি প্রলাপ বকছেন। যখন কেউ আবোল-তাবোল বকে তখন বলা হয় هَجَرَ الرَّجُلُ অর্থাৎ লোকটি প্রলাপ বকছে। তিনি আরও বলেন, এ ধরনের অবাঞ্ছিত বিষয়ের সম্বন্ধ রসূল (স.)-এর দিকে দেয়া ঠিক নয়। কারণ, এ জাতীয় বাক্য রসূল (স.) থেকে প্রকাশ হতে পারে না। কারণ সুস্থ-অসুস্থ সকল অবস্থায় তিনি সতর্ক ও নিষ্পাপ ছিলেন। প্রলাপ বকা তাঁর সমুচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী। কারণ আল্লাহ পাক বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى অর্থাৎ, রসূল অবাঞ্ছিত ও উদ্ভট কথা বলেন না। অনুরূপ রসূল (স.) বলেন, اِنِّى لَا أَقُوْلُ فِى

www.e-ilm.weebly.com

الْغَضَبِ وَالرِّضَا إِلاَّ حَقًّا। অর্থাৎ, প্রসন্ন-অপ্রসন্ন উভয় অবস্থায় আমি বাস্তব ছাড়া বলি না। তাই যারা اهجر। বলেন, তারা নব মুসলিম ছিলেন। রসূল (স.)-এর সমুচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে তারা জ্ঞাত ছিলেন না। এবং তারা এটাও জানতেন না যে, এ ধরনের কথা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থি। তারা নবীজীকে সাধারণ মানুষের মত মনে করেন এবং ধারণা করেন যে, এহেন কঠিন অবস্থায় মানুষ মাত্রই একটু প্রলাপ বকে থাকে। সে জন্যই তারা পরবর্তীতে বলেন, اِسْتَفْهِمُوْهُ। অর্থাৎ প্লিজ, আপনারা তাঁকে একটু জিজ্ঞাসা করুন! কেননা, তারা নবীজীর কথার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননা। ফলে এ বিষয়ে তাদের মধ্যে মিশ্র বাদানুবাদ হয়। এতে রসূল (স.) لاَيَنْبَغِى عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ অর্থাৎ, নবীজীর সামনে বাদানুবাদ করা শোভনীয় নয় — উক্তি দ্বারা তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

فَذَهَبُوا يَرُدُّوْنَ عَنْهُ ঃ অর্থাৎ, তারা নবীজীর সকাশে বারবার একথা (উইল লিখব না থাকবে — তা জিজ্ঞাসা করুন) বলতে লাগল। এ বাক্যাংশটি তাঁদের বাদানুবাদের একাংশ। তাই রসূল (স.) রাগতস্বরে বলেন, তোমরা যাও তো, তোমরা যা বলছ তা থেকে আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি তা অনেক ভাল।

وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ اَوْ قَالَ فَنَسِيْتُهَا (তিনি তৃতীয়টি না বলে চুপ রইলেন। অথবা বলেন ঃ আমি তা ভুলে গেছি) ঃ কথিত আছে, এখানে সন্দেহ পোষণকারী ইবনে আব্বাস (রযি.)। আর ভুলকারী হযরত সাঈদ বিন যুবাইর। فَنَسِيْتُهَا বর্ণনা হতে سَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ বর্ণনাটি অগ্রগণ্য।

কস্তলানী, দাউদী ও ইবনুত্‌তীন বলেন, তৃতীয় বিষয় হলো, কুরআনের ব্যাপারে অসিয়ত। মাহলাব ও ইবনে বাত্তাল বলেন, তা হলো উসামা সৈন্যদলের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা। কাজী আয়াজ বলেন, তা হলো, রসূল (স.)-এর উক্তি اَلصَّلاَةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ তোমরা নামায ও দাস-দাসীদের প্রতি খেয়াল রেখ। আর কতিপয়ের মতে, তা হলো নবীজীর উক্তি ঃ لاَتَتَّخِذُوا قَبْرِىْ وَثْنًا يُعْبَدُ অর্থাৎ, তোমরা আমার কবরকে মূর্তি বানিয়ে তার পূজা করবে না।

قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ فَكَانَ يَقُوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ (উবায়দুল্লাহ বলেন, ইবনে আব্বাস বলতেন ঃ মুছিবত, চরম মুছিবত!) ঃ আর ইলম পর্বে আছে فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكَانَ يَقُوْلُ অর্থাৎ ইবনে আব্বাস এ কথা বলতে বলতে উঠে চলে যান।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফাতহুল বারীতে বলেন, বাহ্যিক ভাষ্য হতে অনুমিত হয় যে, তদানীন্তন সময় ইবনে আব্বাস (রযি.) বাদানুবাদকারীদের মধ্যে

www.e-ilm.weebly.com

উপস্থিত ছিলেন। যখন আর উইল পত্র লেখা হলো না, তখন তিনি إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ বলতে বলতে বাইরে বেরিয়ে আসেন। অথচ মূলত ব্যাপারটি এমন নয়; বরং ইবনে আব্বাস (রযি.) পরবর্তীতে তাঁর ছাত্রদের সামনে পুরো ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে এ উক্তিটি করেন। বস্তুত তিনি এর দ্বারা তৎকালীন সৃষ্ট ফেতনার উপর চরম দুঃখ ও ব্যথা প্রকাশ করেন। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হলো, যখন সাহাবাদের মতভেদের কারণে হযরত আলী ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়, তখন তারা শুধু কিতাবুল্লাহকে যথেষ্ট মনে করার উপর আফসোস করেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) যখন উবায়দুল্লাহকে এ হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তিনি স্বস্থান হতে إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ বলতে বলতে উঠে চলে যান। আবু নুয়াইমের বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। উবায়দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে এ কথা বলতে শুনেছি। তা ছাড়া এটা অতি স্পষ্ট যে, উবায়দুল্লাহের এ উক্তি তার প্রকাশ্য অর্থে ব্যবহৃত নয়। কারণ উবায়দুল্লাহ তাবেয়ী মাত্র। আলোচ্য ঘটনাটি তার অনুপস্থিতিতেই সংঘটিত হয়। কারণ, তিনি রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের বহু পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাই এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি পরে কোন এক সময় ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে এ ঘটনাটি শ্রবণ করে থাকবেন।

কোন্ পক্ষের রায় সঠিক ছিল ? হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা কস্তলানী এবং হযরত শায়খুল হিন্দের[১] (রহ.) উক্তি মতে জানা যায় যে, হযরত উমর প্রমুখের রায় সঠিক ছিল। হাফেজ ইবনে হাজার, ফতহুল বারীতে বলেন, উইল পত্র লেখা না লেখার ব্যাপারে হযরত উমরের রায়ই সঠিক ছিল। কারণ হলো, এক হাদীসের ভাষ্য মতে প্রকাশ যে, রসূল (স.) আবু বকরের খলীফা হওয়ার বিষয়টি লিখে দিতে চেয়েছিলেন। আর আবু বকরের খেলাফতের ব্যাপারে সবাই একমত ছিলেন বিধায় তার পুনরুল্লেখের আদৌ প্রয়োজন ছিল না। তদুপরি রসূল (স.) প্রথমে লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও পরবর্তীতে না লেখাটাই ভাল মনে করেন। যদি লিখে দেয়াটা আল্লাহর পক্ষ হতে অনিবার্যই হত তবে, রসূল (স.) এক ব্যক্তির কথায় কখনও তা বাদ দিতেন না।

আর আল্লামা কস্তলানী বলেন, ইবনে আব্বাসের উক্তি উমরের (রযি.) উক্তির বিরোধী নয়। কারণ, নিঃসন্দেহে উমর (রযি.) ইবনে আব্বাস থেকে অধিক জ্ঞানী ছিলেন। উমর (রযি.) বুঝেন যে, كِتَابٌ তথা নির্দেশনা লেখার দ্বারা নবীজীর উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনি-বিধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করা এবং এ ব্যাপারে সকল মতভেদ দূর করা। অথচ এটা ইতঃপূর্বে কুরআনের আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং এটাও জানা গেছে যে, কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছুই

টীকা ঃ ১. শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৩৩৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

হোক না কেন, সরাসরি (نَصًّا) বা ইঙ্গিতবহভাবে (دَلَالَةً) তার বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান আছে। তাই রসূল (স.)-এর কষ্ট লাঘব ও গবেষকদের (মুজতাহিদ) সম্ভাবনাময় (গবেষণাজনিত) মর্যাদা অর্জনের পথ খোলা রাখতে উমর (রযি.) লেখালেখি না করাকেই সঠিক বলে মনে করেন। নবীজীর না লেখানো ও তার অস্বীকৃতিই হযরত উমর (রযি.)-এর রায় সঠিক হওয়ার এক বড় প্রমাণ। কেননা, রসূল (স.) এ ঘটনার পরেও ৪ দিন জীবিত ছিলেন, অথচ এ ব্যাপারে পুনঃ কোন নির্দেশ প্রদান করেন নি। রসূল (স.)-এর এ নীরবতাই প্রমাণ করে যে, তিনি উমরের মতের সাথে একমত পোষণ করেন।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (রহ.) তার 'তারাজিমে' বলেন, কাগজ-কলম আনতে রসূল (স.) কর্তৃক আদেশ দান সংক্রান্ত হাদীসের সকল সূত্রে ব্যাপক তদন্ত চালিয়ে চূড়ান্ত যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি তা হলো, ইবনে আব্বাসের إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ উক্তিটি সম্পূর্ণ সংশয় ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে ছিল। কারণ, বিশুদ্ধ বর্ণমামতে প্রকাশ যে, প্রধান প্রধান সাহাবী যেমন, হযরত আবু বকর (রযি.), হযরত আলী (রযি.) ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আর তারা নবীজীর আদেশের এ অর্থ বুঝেন যে, রসূল (স.)-এর কাগজ-কলম আনতে বলার উদ্দেশ্য ছিল কুরআনে বর্ণিত বিষয় পালনের প্রতি জোর তাকিদ প্রদান এবং তারই দৃঢ়তা ও সুসংহতকরণ। যদি অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকত তবে অবশ্যই তিনি তাদের দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ঐ নির্দেশ প্রদান করতেন। কেননা, এর পরে আরো কয়েকদিন তিনি জীবিত ছিলেন। তদুপরি বর্ণিত হয়েছে যে, রসূল (স.) হযরত আলী (রযি.)-কে কাগজ-কলম আনতে বলেন। কিন্তু এরই মধ্যে নবীজীর ইন্তেকালের আশঙ্কায় হযরত আলী (রযি.) বলেন, (খাতা-কলমের দরকার নেই) আপনি বলুন, আমি মনে রাখব। অতঃপর রসূল (স.) আলীকে (রযি.) (১) সদকা উসূল (২) আরব উপদ্বীপ হতে কাফেরদের বহিষ্কার ও (৩) প্রতিনিধিদলের বা অন্যান্য উদ্দেশ্যে আগত ব্যক্তিদের আগমনের অনুমতি প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

তাই এর পরে ইবনে আব্বাসের (রযি.) 'সন্দেহ পোষণ' দ্বারা দলীল পেশ এবং বিশিষ্ট সাহাবাগণের ব্যাপারে ধৃষ্টতামূলক উক্তির আর কোনই অবকাশ থাকে না। কারণ ইবনে আব্বাস (রযি.) তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন, অর্থাৎ পূর্ণ বালেগ ছিলেন না। তাই প্রধান ও প্রবীণ সাহাবাগণ যা বুঝেছেন এবং করেছেন, সেটাই চূড়ান্ত ও সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল বলে মেনে নেয়া উচিত। (লামিউদ্ দারারী ১ : ৫৯)

হাদীসে কিরতাসের উপর অভিযোগ : এখানে ইরশাদুল কারী প্রণেতা প্রথমে শিয়াচক্রের তিনটি অভিযোগ ও পরে তার জওয়াব উল্লেখ করেছেন। পাঠক সমীপে তা সংক্ষিপ্তাকারে পেশ করা হলো–

www.e-ilm.weebly.com

(১) اهجر এটা হযরত উমর (রযি.)-এর উক্তি। هَجَرَ অর্থ প্রলাপ বকা ও বাজে কথা বলা (ফাউল টক করা)। রসূল (স.)-এর প্রতি এ জাতীয় উক্তি সম্বন্ধ করা মারাত্মক ধৃষ্টতা।

(২) রসূল (স.) এমন এক ওসিয়তনামা (উইল পত্র) রচনা করতে চেয়েছিলেন, যার পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর ফাসাদ বা বিপথগামিতার আশঙ্কা থাকত না। এতে অন্তরায় সৃষ্টি করা নিঃসন্দেহে রসূল (স.)-এর অবাধ্যতা এবং মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

(৩) হযরত উমর (রযি.) حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট বলে হাদীসের প্রয়োজনীয়তাকেই প্রকারান্তরে অস্বীকার করেছেন।

প্রথম অভিযোগের জওয়াব ঃ প্রথম কথা হলো, أَهَجَرَ হযরত উমর (রযি.)-এর উক্তি নয়। হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) ফতহুল বারী ও শাহ্ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী[১] (রহ.) 'তুহফায়ে ইছনায়ে আশারিয়া' গ্রন্থে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ যদি উক্তিটি হযরত উমরের বলে মেনেও নেয়া হয়, তথাপি আপত্তির কিছু নেই। কারণ হলো, এর অর্থ শুধু প্রলাপ বা বাজে বকা নয়; বরং পৃথক অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এজন্য দেখা যেতে পারে, ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা, মাজমায়ে বাহরুল আনওয়ার (হাদীস অভিধান) ২য় খণ্ড ৪৭৫ পৃষ্ঠা। পবিত্র কুরআন থেকেও উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। আল্লাহ্ পাক বলেন, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا অর্থাৎ আপনি সৌজন্যতার সাথে তাদের থেকে পৃথক বা তাদেরকে পরিহার করে চলুন। ব্যাপক গবেষণা ও বিশ্লেষণ হতে জানা যায় যে, هَجْرٌ শব্দটির প্রকৃত অর্থই হচ্ছে, 'পৃথক হওয়া' প্রলাপ বকার অর্থে শব্দটি কেবল এ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে, এতে বিবেকের পৃথকতা হয় (অর্থাৎ বিবেক বা স্বাভাবিক জ্ঞান অন্তর্হিত হয়ে যায়)। এখানে হাদীসে কিরতাসেও এ 'পৃথকতা' অর্থটি অধিক প্রয়োগযোগ্য। কারণ, 'প্রলাপ বকা' বিবেক বিরোধী কথার ক্ষেত্রেই কেবল বলা যেতে পারে। কিন্তু হেদায়েতনামা লেখানোর জন্য 'কাগজ আন' বলায় আমরা বিবেক বিরোধী কিছু খুঁজে পাই না।

(২) বর্ণনায় هَجَرَ শব্দের পর اِسْتَفْهِمُوْهُ শব্দও এসেছে, যদি هَجَرَ -এর অর্থ 'প্রলাপ বকা' নেয়া হয় তবে اِسْتَفْهِمُوْهُ-এর সাথে তার সম্পর্ক বজায় থাকে না। কারণ, যে প্রলাপ বকছে, তার কাছে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ বিবেক বিরোধী। পক্ষান্তরে যদি পৃথকতা অর্থ নেয়া হয়, তবে চমৎকার সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। কারণ, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এসে তিনি উইলপত্র রচনার কথা বললে সাহাবাদের শরীরে

টীকা ঃ ১. হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১২৩৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

বিদ্যুৎ খেলে যায়। তাঁরা আঁৎকে উঠে বলেন, "أَهْجَر অর্থাৎ তাহলে রসূল (স.) কি আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক হয়ে যাচ্ছেন? সত্যি করে একটু জিজ্ঞাসা করুন তো!" তাই যে সাহাবীই একথা বলুন না কেন, তিনি পূর্ণ মহব্বত ও নবীজীর বিদায়ের আশঙ্কায় তা বলেছেন।

তৃতীয়তঃ যদি هَجْر অর্থ প্রলাপ বকাই নেয়া হয় তবুও কোন ক্ষতি নেই। কারণ, এটা নেতিবাচক জিজ্ঞাসা মাত্র। আর এটা তাদের উক্তি, যারা উইল লিখিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্য হলো, তোমরা এ ব্যাপারে কালক্ষেপণ করছ কেন? আল্লাহ মাফ করুন, রসূল (স.) কি প্রলাপ বকছেন বলে তোমরা মনে করছ? অর্থাৎ, রসূল প্রলাপ বকছেন না, তারপরেও তোমরা (লিখতে) দেরী করছ কেন?

দ্বিতীয় অভিযোগের জওয়াব ঃ এ উইল পত্র না লেখাতে রসূল (স.)-এর প্রতি যেমন অবাধ্যতা প্রদর্শন করা হয়নি, তেমনি জাতিরও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি। কারণ, এটা কোন আবশ্যিক নির্দেশ ছিল না; বরং বিশেষ পরামর্শ ছিল মাত্র। আর মৃত্যু যন্ত্রণার অবস্থায় এ আদেশ পালনে ব্রতী হওয়া থেকে রসূল (স.)-কে কষ্ট হতে দূর রাখাই ছিল শ্রেয়তর। আর উইল করে যাওয়া যে জরুরী ছিল না, তার প্রমাণ নিম্নরূপ—

(১) কোন ব্যক্তি বিশেষের ভয়ে দ্বীনের একটি জরুরী কর্তব্য বর্জন করা একজন নবীর জন্য জায়েয নয়।

(২) যদি উইলপত্র রচনা করাকে দ্বীনের জরুরী বিষয় সাব্যস্ত করা হয়, তবে এর দ্বারা কুরআনের আয়াত اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ الخ ও রসূল (স.)-এর উক্তি ঃ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ ভুল বলে প্রমাণিত হয়।

(৩) যদি উইল রচনা একান্ত জরুরীই হতো, তবে এর পরে আরও ৪দিন জীবিত থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি লেখালেন না?

(৪) যদি এমন জরুরী কাজ করতে হযরত উমর (রযি.) বাধা দিয়ে থাকেন, তবে আবু বকর, আলী ও অন্যান্য সাহাবাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল তা লিখিয়ে নেয়া। অথচ কেউই সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেননি।

তৃতীয় অভিযোগের জওয়াব ঃ হযরত উমর (রযি.) حَسْبُنَا كِتَابُ اللّٰهِ বলে হাদীসের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন নি; বরং চরম কষ্টের অবস্থা হতে রসূল (স.)-কে একটু পরিত্রাণ দেয়াই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। ফলে তিনি উইল রচনার কাজে বাধা দেন। যেমন, হযরত আলীও (রযি.) এমন নাজুক অবস্থায় নবীজীর কষ্ট লাঘব করতে লেখার ব্যবস্থা পরিহার করেন। অথচ রসূল (স.) তাঁকেও (আলী) কাগজ-কলম আনতে বলেছিলেন। মুসনাদে আহমাদে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আলী (রযি.) বলেন ঃ

www.e-ilm.weebly.com

أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَا لَا تَضِلُّ بِهِ أُمَّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ فَخَشِيتُ أَنْ تَفُوتَنِي نَفْسُهُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي قَالَ أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

অর্থাৎ, রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর যাতে তাঁর উম্মত বিপথগামী না হয়ে যায়, তার জন্য কিছু জরুরী বিষয় লিখতে রসূল (স.) আমাকে কাগজ আনতে নির্দেশ দেন। আলী (রযি.) বলেন, ইত্যবসরেই আমি তাঁর ইন্তেকালের আশঙ্কা করে বললাম (আপনি মুখে বলুন) ঃ আমি শুনেই মনে রাখব। আলী (রযি.) বলেন, রসূল (স.) নামায, যাকাত, দাস-দাসীদের ব্যাপারে ওসিয়ত করেন।

اَللّٰهُمَّ فِى الرَّفِيقِ الْأَعْلٰى (আল্লাহ, সর্বোচ্চ বন্ধুর মিলন চাই!) ঃ সর্বোচ্চ বন্ধু দ্বারা উদ্দেশ্য 'আল্লাহ পাক'। আর এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ওকীদী বলেন, দুধমাতা হালিমার (রযি.) কাছে অবস্থানরত অবস্থায় রসূল (স.)-এর সর্বপ্রথম কথা (বুলি) ছিল "আল্লাহু আকবার"। আর ইন্তেকালের সময় সর্বশেষে উচ্চারণ করেন, الرَّفِيقُ الْأَعْلٰى তথা সর্বোচ্চ বন্ধু (আল্লাহ্)।

اِنَّهُ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَا قِنَتِي ঃ রসূল (স.) আমার চিবুকের নীচ ও বক্ষমূলের মাঝে অর্থাৎ গলদেশে (মাথা রেখে) ছিলেন।

وَبَيْنَ رَجُلٍ اٰخَرَ (অপর এক ব্যক্তির মাঝে) ঃ হযরত আয়েশা (রযি.) এ দ্বিতীয় ব্যক্তির (হযরত আলীর) নাম উল্লেখ না করাটা বিদ্বেষহেতু ছিল না; বরং আসল কারণ হলো, যেরূপভাবে হযরত আব্বাস (রযি.) এক সাইডে সর্বক্ষণ দায়িত্বরত ছিলেন, তদ্রূপ অপর সাইডে হযরত আলী (রযি.) সর্বক্ষণ ছিলেন না। বরং কখনও হযরত আলী আর কখনও হযরত উসামা (রযি.) ছিলেন।

لَا يَجْمَعُ اللّٰهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْنِ (আল্লাহ আপনার ক্ষেত্রে দু'মৃত্যু একত্রিত করবেন না) ঃ দু'মৃত্যু নির্ণয়ে একাধিক মত রয়েছে।

(১) দাউদী বলেন, দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য কবরের মৃত্যু, যা প্রশ্নোত্তরের জন্য জীবিত করার পর পুনরায় হবে। অর্থাৎ অন্যান্য লোকদের মত আপনার দ্বিতীয়বার মৃত্যু হবে না।

(২) দ্বিতীয় মৃত্যু দ্বারা উদ্দেশ্য কঠোরতা ও কষ্ট। অর্থাৎ মৃত্যুর এ কষ্টের পর পুনরায় আপনি কষ্টের সম্মুখীন হবেন না।

(৩) দ্বিতীয় মৃত্যুর দ্বারা উদ্দেশ্য শরীয়ত। অর্থাৎ আল্লাহ আপনার মৃত্যু ও আপনার শরীয়তের মৃত্যু একত্রিত করবেন না। সুতরাং যদিও আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু আপনার শরীয়তের মৃত্যু হবে না। বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল তবিয়তে থাকবে।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) হযরত উমর (রযি.) অত্যন্ত আবেগের সাথে বলছিলেন যে, যেরূপভাবে হযরত মূসা (আ.) ৪০ দিনের জন্য তার জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তূর পর্বতে চলে যান এবং ৪০ দিন পর পুনরায় ফিরে আসেন। ঠিক তেমনি রসূল (স.)ও ৪০ দিন পর ফিরে আসবেন এবং মুনাফিকদের শাস্তি দেবেন। যেহেতু তাঁর এ মন্তব্য দু'মৃত্যুকে আবশ্যক করে, তাই আবু বকর (রযি.) স্বীয় উক্তি দ্বারা উমরের এ মন্তব্যকে খণ্ডন করে বলেন, হে রসূল! আল্লাহ্ অন্যের ক্ষেত্রে দু'মৃত্যু একত্রিত করলেও আপনার ক্ষেত্রে এমনটি করবেন না। অন্যদের দু'বার মৃত্যু প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে ঃ

(১) كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ অর্থাৎ তারা সংখ্যায় হাজার হাজার থাকা সত্ত্বেও (মৃত্যুভয়ে) স্বীয় আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল।

(২) كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি জনপদ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ স্থলে প্রদত্ত ৪টি জওয়াবের মধ্যে এটিই সবচেয়ে ভাল জওয়াব।

لَاتَلُدُّنِى (তোমরা আমাকে টিকা খাওয়াবে না) ঃ প্রত্যেক ঐ ঔষধ যা মুখের সাইড বা কোণ্ দিয়ে সেবন করানো হয়, তাকে আরবীতে 'লাদুদ' (টিকা) বলে। বর্ণনায় এসেছে, রসূল (স.)-কে সুগন্ধযুক্ত (ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত) কাষ্ঠ এবং যয়তুন মিশ্রিত করে খাওয়ানো হয়। রসূল (স.) চিকিৎসা গ্রহণের অস্বীকৃতির কারণ হলো, সাহাবাদের তখনকার চিকিৎসা ব্যবস্থা রসূল (স.)-এর রোগ অনুযায়ী ছিল না। কারণ, তাঁরা ধারণা করেন যে, রসূল (স.) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। অথচ তাঁর এ রোগ ছিল না। তবকাতে ইবনে সাদে এসেছে, রসূল (স.) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। রোগের তীব্রতায় তিনি মূর্ছা গেলে আমরা (সাহাবাগণ) তাঁকে টিকা খাওয়াই। জ্ঞান ফিরে এলে রসূল (স.) বলেন, তোমাদের ধারণা আল্লাহ্ আমাকে নিউমোনিয়াগ্রস্ত করেছেন। এটা ঠিক নয়; আল্লাহ্ আমাকে ঐ কঠিন রোগে আক্রান্ত করবেন না।

لَايَبْقَى اَحَدٌ فِى الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ ঃ অর্থাৎ ঘরের সবাইকে টিকা খাওয়াও। কেউ যেন বাকী না থাকে। রসূল (স.) সাহাবাদেরকে নিষেধ করেন যে, তারা যেন তাঁকে টিকা না খাওয়ায়। কিন্তু সাহাবগণ তাঁর মর্জির বিপরীত কাজ করায় রসূল (স.) শাস্তি স্বরূপ সবাইকে টিকা খাওয়ানোর এ নির্দেশ দেন।

فَكَيْفَ أَوْصٰى إِلٰى عَلِيٍّ (তাহলে রসূল (স.) কখন আলীকে তাঁর ওসী [অভিভাবক] নিযুক্ত করেন?) ঃ আল্লামা কুরতুবী বলেন, শিয়াচক্র এ অপপ্রচার চালায় যে রসূল (স.) হযরত আলীর জন্য খেলাফতের অসিয়ত করেন, কিন্তু একদল সাহাবা ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম এহেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত অপপ্রচার চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

www.e-ilm.weebly.com

সীরাতে হালাবী গ্রন্থে খোদ হযরত আলী (রযি.) হতে বর্ণিত আছে যে ঃ

لَوْكَانَ عِنْدِىْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ عَهْدٌ فِىْ ذٰلِكَ، مَا تَرَكْتُ الْقِتَالَ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَوْلَمْ اَجِدْ اِلاَّ بُرْدَتِىْ هٰذِهِ مَا تَرَكْتُ اَخَا بَنِىْ تَمِيْمٍ وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَنْوِبَانِ عَلٰى مِنْبَرِهِ ﷺ وَلَقَاتَلْتُهُمَا بِيَدِىْ، وَالنَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَمُتْ فَجَاءَةً بَلْ مَكَثَ اَيَّامًا وَلَيَالِىْ، يَأْتِيْهِ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤَذِّنُهُ بِالصَّلٰوةِ فَيَاْمُرُ اَبَابَكْرٍ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ وَهُوَ يَرٰى مَكَانِىْ بِهِ، وَلَمَّا مَاتَ اِخْتَرْنَا لِدُنْيَانَا مِنْ رَضِيَّهِ ﷺ لِدِيْنِنَا فَبَايَعْنَاهُ (حَاشِيَه بُخَارِى ص ٣٨٣

যদি এ ব্যাপারে (অর্থাৎ, নবীজীর পরেই আমার খলিফা হওয়ার ব্যাপারে) নবীজীর পক্ষ থেকে আমার কাছে কোন দলীল (ইঙ্গিত বা অসিয়ত) থাকত, তাহলে আমি এর জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতাম। যদি আমি এ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা (যাকাত সংক্রান্ত) ছাড়া অন্য কিছু পেতাম তবে আবু বকর ও উমর বিন খাত্তাবকে রসূল (স.)-এর মিম্বারে আরোহণ করতে দিতাম না এবং তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতাম। শুধু তা-ই নয়, নবী (স.) তখনও ইন্তেকাল করেননি, তবে শয্যাগত; একদিন মুয়াজ্জিন হুযূরের কাছে এসে নামাযের ব্যাপারে অবহিত করেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রসূল (স.)ও জানতেন আমার উপস্থিতির কথা। তথাপি তিনি ইমামতির জন্য আমাকে স্মরণ করেন না; বরং হযরত আবু বকরকে ইমামতিত্বের নির্দেশ দেন। তাই রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পর রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দানের জন্য আমরা তাঁকেই নির্বাচন করি, যার দ্বীনসহ সার্বিক ব্যাপারে রসূল (স.) পূর্ণ সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁরই হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি।

اَوْصٰى بِكِتَابِ اللّٰهِ ঃ অর্থাৎ, রসূল (স.) কুরআন অনুযায়ী চলার অসিয়ত করেছেন। এর মধ্যে অসিয়ত পালনও অন্তর্ভুক্ত। পূর্বের হাদীসে অসিয়তের কথা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আর এখানে 'অসিয়ত করেছেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সমাধান হলো, (১) এখানে অসিয়ত অর্থ নির্দেশ। অর্থাৎ, কুরআন অনুযায়ী চলার নির্দেশ দিয়েছেন (২) অসিয়ত মাত্রই অস্বীকার করা হয়নি; বরং ধন-সম্পদের অসিয়ত অস্বীকার করা হয়েছে মাত্র। আর কুরআনের ব্যাপারে অসিয়ত যথারীতি সাবেত রয়েছে। (৩) অস্বীকার করা হয়েছে নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট অসিয়তকে আর সাবেত করা হয়েছে কুরআনের অসিয়তকে।

اِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ (আমরা সে মৃত্যুর খবর জিবরাঈলকে শুনাচ্ছি) ঃ এটা সমবেদনা প্রকাশ মাত্র। অন্যথা হযরত জিবরাঈল (আ.) পূর্ব হতেই নবীজীর ইন্তেকাল সম্পর্কে অবগত ছিলেন।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ بَعْثِ النَّبِيِّ ﷺ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

রসূল (স.) কর্তৃক উসামাকে (যুদ্ধের জন্য) প্রেরণ

রসূল (স.) রোম যুদ্ধের জন্য হযরত উসামাকে সেনাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন। সংক্ষেপে ঘটনাটি হলো ঃ ১১তম হিজরীর সফর মাসের ৪ দিন বাকী থাকতে রসূল (স.) সাহাবাদেরকে রোম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় দিন হযরত উসামাকে ডেকে বলেন, আমি তোমাকে এ বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করলাম। তোমার পিতার নিহত স্থল উবনাতে যাও এবং তাদের প্রতি আক্রমণ কর।

বুধবারে রসূল (স.)-এর জ্বর ও মাথাব্যথা শুরু হয়। এর পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে ইসলামী ঝাণ্ডা হযরত উসামাকে দিয়ে বলেন, যাও; আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে পড়।

বিশিষ্ট মুহাজির ও আনসার সাহাবার সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম বাহিনী·মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে যরফ নামক স্থানে এসে সমবেত হন। আল্লামা ওয়াকেদী, ইবনে সা'দ, ইবনে ইসহাক এ সারিয়ায় আবু বকরের (রযি.) উপস্থিতির কথাও বর্ণনা করেন। তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) হযরত আবু বকরের অন্তর্ভুক্তির কথা অস্বীকার করেন। আল্লামা যারকানী বলেন, এ দু'অভিমতের মধ্যে মূলত কোনই বিরোধ নেই। কারণ প্রথমে রসূল (স.) হযরত আবু বকরকেও অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন। কিন্তু রসূল (স.)-এর অবস্থা ক্রমে অবনতি হওয়ায় হযরত আবু বকরকে ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। ফলে তাঁর পক্ষে আর সারিয়ায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

হযরত উসামাকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় মুসলিম বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন গুন শুরু হয়। বয়সের স্বল্পতা অথবা গোলাম হওয়া ছিল এর নেপথ্য কারণ। রসূল (স.) বিষয়টি উপলব্ধি করে এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন এবং তাদের এহেন মনোভাব ও আচরণের প্রতি তীব্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। কারণ, এটা অতি সুস্পষ্ট যে, যদি অল্প বয়সের কারণেই তারা এমনটি করে থাকে (তখন হযরত উসামার বয়স ছিল ২০ বছর আর কারো মতে ১৮ বছর), তবে এ অভিযোগ তার পিতার নেতৃত্বের উপরও আরোপিত হয়।

এ থেকে জানা যায় যে, আপত্তি বা গুঞ্জন বয়সের স্বল্পতার কারণে ছিল না; বরং গোলাম হওয়ার কারণেই ছিল। অথচ ইসলাম গোলাম ও আযাদের মধ্যকার পার্থক্য দূরীভূত করেছে। তাই তাদের এ গুঞ্জন প্রমাণ করে এখনও পর্যন্ত

www.e-ilm.weebly.com

বংশ-গৌরব-প্রবৃত্তি তাদের মধ্যে রয়ে গেছে। রসূল (স.) এতে অত্যন্ত মর্মাহত ও রাগান্বিত হন। কেননা আসলে দেখার বিষয় হলো যোগ্যতা ও দক্ষতা। আর তা উসামা ও যায়েদ (রযি.) উভয়ের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় মওজুদ ছিলো।

মাওয়াহেবে লাদুনিয়া গ্রন্থে আছে, ১১তম হিজরীর ১০ই রবিউল আওয়াল শনিবারে মহানবী (স.) এ ভাষণ দেন। আর মুসলিম শরীফে হযরত জুনদুবের বর্ণনা হতে জানা যায় যে, ভাষণ দানের ঘটনাটি ইন্তেকালের ৫ দিন পূর্বে ঘটে।

যাই হোক, এর পরের দিন রবিবারে হযরত উসামা (রযি.) ফৌজ নিয়ে রওনা হলেও তখন রসূল (স.) বেহুঁশ ছিলেন। এ দিনই ঔষধ খাওয়ানোর ঘটনা ঘটে। রসূল (স.) উসামাকে দেখেন, কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। শুধু বারবার হাত আসমানের দিকে উঠান এবং হযরত উসামার উপর রাখেন। সৈন্যদেরকে যারফ নামক স্থানে সমবেত করে অসুস্থ নবীর খোঁজ-খবর নিতে পরদিন রবিবারে তিনি মদীনা আসেন। হযরত উসামা (রযি.) রসূল (স.)-এর খোঁজ-খবর নিয়ে ফৌজের কাছে চলে যান। কিন্তু সোমবার দিন প্রত্যুষে আবার নবীজীকে দেখতে আসেন। তখন রসূল (স.) অচেতন ছিলেন। চেতনা ফিরে পেয়ে তিনি হযরত উসামাকে দোয়া দিয়ে বিদায় দেন এবং রওনা করার নির্দেশ দেন।

হযরত উসামা (রযি.) সৈন্য অবস্থানে ফিরে যান এবং সবাইকে কোচ (মার্চ) করার নির্দেশ দেন। সৈন্যরা যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাকে। ইত্যবসরে হযরত উসামার মাতা উম্মে আইমনের দূত এসে নবীজীর আশংকাজনক অবস্থার সংবাদ দেয়। সকলে তৎক্ষণাৎ মদীনায় ফিরে এসে দেখেন যে, রসূল (স.)-এর মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইছে এবং তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়।

হযরত উসামা বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা আপাততঃ স্থগিত হয়ে যায়। অতঃপর হযরত আবু বকর (রযি.) খলীফা হলে তিনি সাহাবাদের প্রবল আপত্তি ও বিরোধিতা সত্ত্বেও উসামা বাহিনীকে পুনরায় প্রেরণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

মাগাযীর সংক্ষিপ্ত তালিকা

ক্রমিক নং	যুদ্ধের নাম	মুসলিম শক্তি	বিপক্ষ শক্তি	সন/মাস
১	ওদ্দান (আবওয়া)	২০০	--	২ হিজরী, সফর
২	বাওয়াত	২০০	১০০	২ হিঃ রবিউল আ.
৩	উশায়রা	২০০	কুরাইশ এক কাফেলা	২ হিঃ জুমা. উলা
৪	বদরুল উলা	২০০	--	২ হিঃ জুমা উখরা
৫	বদর	৩১৫ (প্র. ৩১৩)	৯৫৭ (অশ্বারোহী ২৫০)	২ হিঃ রমযান
৬	বনূ কায়নুকা	মদীনার সকল	বনূ কায়নুকার ইহুদীরা	২ হিঃ শাঃ প্রথমার্ধে
৭	বনূ সুলাইম	মুসলিম পুরুষ	বনূ সুলাইম ও বনূ গাতফান	২ হিঃ শাঃ শেষার্ধে
৮	সাভীক	২০০	২০০ কুরাইশী অশ্বারোহী	৩ হিঃ জিলহজ্জ
৯	যী-আমর	...	বনূ সা'লাবা ও বনূ মাহারিব	৩ হিঃ মহররম
১০	বাহরান	৪৫০	বনূ সুলাইম	৩ হিঃ রবিঃ আঃ
১১	উহুদ	৩০০	৩০০০	৩ হিঃ শাওয়াল
১২	হামরাউল আসাদ	৭০০	৩০০০ (প্রায়)	৪ হিঃ রঃ আঃ
১৩	বনূ নযীর	৬৩০	বনূ নযীর (ইহুদী)	৪ হিঃ শাবান
১৪	যাতুর-রিকা	মদীনার সকল মুসলমান	বনূ মাহারিব ও বনূ সা'লাবা	৪ হিঃ রঃ আঃ
১৫	বদরে সুগরা	৪০০	২০০ কুরাইশী	৫ হিঃ রঃ আঃ
১৬	দু-মাতুল-জানদাল	১০০০ (প্রায়)	দুমাতুল জানদাল গোত্র	৫ হিঃ শাবান
১৭	বনূ মুস্তালিক	১০০০	বনূ মুস্তালিক	৫ হিঃ শাওয়াল
১৮	খন্দক	১০০০	বনূ কুরাইযা	৫ হিঃ জিলকদ
১৯	বনূ কুরাইযা	৩০০০	৭০০ (বনূ কুরাইযা)	৬ হিঃ জু. উলা
২০	বনূ লাহয়ান	---	বনূ লাহয়ান	৬ হিঃ জু. উলা
২১	যী-কারাদ	৩০০০ (প্রায়)	বনূ গাতফান	৬ হিঃ জিলকদ
২২	হুদায়বিয়া	১৬০০	কুরাইশ	৭ হিঃ মুহাররম
২৩	খয়বার	১৬০০	খয়বারের ইহুদী ফ্রন্ট	৭ হিঃ জিলহজ্জ
২৪	উমরাতুল কাযা	১৪০০	কুরাইশ	৮ হিঃ রমযান
২৫	মক্কা বিজয়	১০,০০০	কুরাইশ ও বনূ বকর	৮ হিঃ শাওয়াল
২৬	হুনাইন	১২,০০০	হাওয়াযিন ও সাকীফ	৮ হিঃ শাওয়াল
২৭	তায়েফ	১২,০০০	সাকীফ ও কিছু সংখ্যক হাওয়াযিন	৯ হিঃ রজব
২৮	তাবুক	৩০,০০০	বিপুল রোমান সেনাবাহিনী	

www.e-ilm.weebly.com

সারিয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকা

ক্রমিক নং	সারিয়ার নাম	সন/মাস
১	সারিয়াহ-এ হামযা (রযি.)	১ম হিজরী
২	সারিয়াহ-এ উবায়দা (রযি.)	১ম হিজরী
৩	সারিয়াহ-এ আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশ	২য় হিজরী
৪	সারিয়াহ-এ উমাইর	২য় হিজরী
৫	সারিয়াহ-এ সালেম	২য় হিজরী
৬	সারিয়াহ-এ মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা	৩য় হিজরী
৭	সারিয়াহ-এ যায়েদ ইবনে হারেসাহ	৩য় হিজরী
৮	সারিয়াহ-এ আবু সালামা	৪র্থ হিজরী
৯	সারিয়াহ-এ আব্দুল্লাহ ইবনে উনায়িস	৪র্থ হিজরী
১০	সারিয়াহ-এ মুনযির	৪র্থ হিজরী
১১	সারিয়াহ-এ মারসাদ	৪র্থ হিজরী
১২	সারিয়াহ-এ মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিমা	৬ষ্ঠ হিজরী
১৩	সারিয়াহ-এ আক্কাশা	৬ষ্ঠ হিজরী
১৪	সারিয়াহ মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা	৬ষ্ঠ হিজরী
১৫	সারিয়াহ-এ যায়েদ ইবনে হারেসা	৬ষ্ঠ হিজরী
১৬	সারিয়াহ-এ আব্দুর রহমান ইবনে আউফ	৬ষ্ঠ হিজরী
১৭	সারিয়াহ-এ আলী	৬ষ্ঠ হিজরী
১৮	সারিয়াহ-এ যায়েদ ইবনে হারেসা	৬ষ্ঠ হিজরী
১৯	সারিয়াহ-এ আব্দুল্লাহ ইবনে আতীক	৬ষ্ঠ হিজরী
২০	সারিয়াহ-এ আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা	৬ষ্ঠ হিজরী
২১	সারিয়াহ-এ কুরস ইবনে জাবের	৬ষ্ঠ হিজরী
২২	সারিয়াহ-এ আমর আয-যামরী	৬ষ্ঠ হিজরী
২৩	সারিয়াহ-এ আবু বকর	৭ম হিজরী
২৪	সারিয়াহ-এ বিশর ইবনে সা'দ	৭ম হিজরী
২৫	সারিয়াহ-এ গালিব ইবনে আব্দুল্লাহ	৭ম হিজরী
২৬	সারিয়াহ-এ বশীর	৭ম হিজরী
২৭	সারিয়াহ-এ আহযাম	৭ম হিজরী
২৮	সারিয়াহ-এ গালিব	৮ম হিজরী

www.e-ilm.weebly.com

ক্রমিক নং	সারিয়ার নাম	সন/মাস
২৯	সারিয়াহ্-এ গালিব	৮ম হিজরী
৩০	সারিয়াহ্-এ শুজা	৮ম হিজরী
৩১	সারিয়াহ্-এ কাব	৮ম হিজরী
৩২	সারিয়াহ্-এ আমর ইবনুল আস	৮ম হিজরী
৩৩	সারিয়াহ্-এ আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ	৮ম হিজরী
৩৪	সারিয়াহ্-এ আবু কাতাদা	৮ম হিজরী
৩৫	সারিয়াহ্-এ খালিদ (গুমায়সা)	৮ম হিজরী
৩৬	সারিয়াহ্-এ তোফাইল ইবনে আমর দাওসী	৮ম হিজরী
৩৭	সারিয়াহ্-এ কাতবা (রা.)	৮ম হিজরী
৩৮	সারিয়াহ্-এ আলকমা	৯ম হিজরী
৩৯	সারিয়াহ্-এ আলী	৯ম হিজরী
৪০	সারিয়াহ্-এ আক্কাশা	৯ম হিজরী
৪১	সারিয়াহ্-এ খালিদ ইবনে ওলীদ	১০ম হিজরী
৪২	সারিয়াহ্-এ আলী	১০ম হিজরী
৪৩	সারিয়াহ্-এ উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)	১১শ হিজরী

* মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) লিখিত "সীরাতে খাতিমুন আম্বিয়া" নামক গ্রন্থ হতে অনুবাদক কর্তৃক সংগৃহীত।

www.e-ilm.weebly.com

كِتَابُ التَّفْسِيْرِ

তাফসীর পর্ব

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, اَلتَّفْسِيْرِ শব্দটি اَلْفَسْرُ হতে بَابِ تَفْعِيْل এর মাসদার। অর্থ, ব্যাখ্যা করা, বর্ণনা করা, সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। আবার কারো মতে, এটা سَفْرٌ শব্দের পরিবর্তিত রূপ। যেমন, جَبْذٌ ও جَذْبٌ শব্দ দু'টি একে অপরের পরিবর্তিত রূপ। অর্থ একই 'টানা', 'আকর্ষণ করা'। যখন কারো চেহারা ও মুখোশ খুলে যায় বা উন্মুক্ত হয় তখন আরবীতে বলে سَفَرَ আর প্রভাত উদ্ভাসিত হলে তখন বলে اَسْفَرَ الصُّبْحُ। এ বিশ্লেষণ অনুপাতে تَفْسِيْر-এর আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় اَلتَّكْشِيْفُ বা খুলে যাওয়া, উন্মোচিত হওয়া, প্রকাশ পাওয়া। আর পরিভাষায় تَفْسِيْر-এর সংজ্ঞা হলো, هُوَ التَّكْشِيْفُ عَنْ مَدْلُوْلَاتِ نَظْمِ الْقُرْاٰنِ অর্থাৎ, কুরআনের শব্দগত অন্তর্নিহিত অর্থ উন্মোচিত হওয়া।

(আইনী, কিরমানী)

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, আল্লাহ পাক বলেন, اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ কেবল তোমাদের বোঝার জন্য আমি আরবীতে কুরআন রচনা করেছি। তাই কুরআন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবনের জন্য আরবী ভাষা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া জরুরী। আরবী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন ব্যতিরেকে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় দুঃসাধ্য।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) বলেন, নাহুবিদ তথা ব্যাকরণবিদগণ সর্বপ্রথম কুরআনের ক্ষেত্রে অবদান রাখেন। কুরআনের অর্থের উপর রিসার্চ চালিয়ে অর্থসমৃদ্ধ এক অতুলনীয় তাফসীর উপহার দেন ইমাম ফাররা[১] (রহ.)। অনুরূপভাবে আল্লামা যুজাজেরও একটি তাফসীর রয়েছে। ইবনে জরীর তবারী (রহ.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে নাহুবিদদের উক্তি অধিকহারে উল্লেখ করায় তা এক অসাধারণ তাফসীর গ্রন্থে পরিণত হয়েছে।

তাফসীর ও তা'বীলের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের রায় বিভিন্ন। হযরত আবু উবায়দা সহ অনেক আলেমের মতে উভয় একই অর্থবহ। আল্লামা কস্তলানী (রহ.) আবুল আব্বাস আল-ইজদী হতে উল্লেখ করেন যে, রেওয়ায়েত ও জ্ঞানের মাধুরীর সমন্বয়ে মর্মার্থ বর্ণনার নাম 'তা'বীল'।

তাফসীর রচনায় ইমাম বুখারীর অনুসৃত নীতি ঃ খাতিমুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) ফয়জুল বারী গ্রন্থে লিখেন, ইমাম বুখারীর তাফসীর পরবর্তী উলামায়ে কেরাম প্রণীত তাফসীরের অনুরূপ (অর্থাৎ জটিলতার পর্দা উন্মোচন এবং অন্তর্নিহিত মাসআলা বর্ণনা বিষয়ক) নয়; বরং এর চেয়েও

টীকা ঃ ১. হযরত ইয়াহইয়া বিন জিয়াদ আল ফাররা (রহ.), মৃত্যু ঃ ২০৭ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

গুরুত্বপূর্ণ। কোন শব্দের ব্যাখ্যা করা, কোন ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করা, আয়াত বা সূরার বৈশিষ্ট্য বিধৃত করা, সূরা সমাপ্তির পর আনুষঙ্গিক বিষয় তুলে ধরা এবং এমন হাদীস উল্লেখ করা, যাতে কুরআনের শব্দ রয়েছে এবং তার দ্বারা কুরআনের অর্থ পরিষ্কার হয়-এ সবই ইমাম বুখারীর কাছে তাফসীর হিসেবে গণ্য। তাফসীরের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারীর এ নীতি অবলম্বনের কারণ হলো, তাফসীর পর্ব বিন্যাসের সময় তার সামনে আবু উবায়দা মা'মার বিন মুসান্নার 'মাজাযুল কুরআন' ছিল। একক শব্দাবলীর ব্যাখ্যা ও অন্যান্য ব্যাখ্যেয় উক্তি তিনি এ গ্রন্থ হতেই মূলতঃ উদ্ধৃত করেন। বস্তুত এ কারণেই মাজাযুল কুরআনে সুবিন্যস্ততা ও বিন্যাসগত যে ঘাটতি রয়ে গেছে তা ইমাম বুখারী প্রণীত তাফসীরেও সমহারে পরিলক্ষিত। সূরা-ধারাবাহিকতা, দুর্বল উক্তি উল্লেখ, এক মূলধাতু হতে অন্য মূলধাতু এবং এক সূরা হতে অন্য সূরায় অকস্মাৎ স্থানান্তরে ইমাম বুখারীর তাফসীর আবু উবায়দার মাজাযুল কুরানের ন্যায় হওয়ায় বহু প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। বিশেষত যারা এ রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞাত তাদের জন্য এ তাফসীর বুঝা অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

(লামিউদ্ দারারী)

الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اِسْمَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ঃ অর্থাৎ, رَحْمَةٌ মাসদার হতে এ শব্দ দু'টি নির্গত। অর্থ, অন্তর নরম ও বিগলিত হওয়া। আল্লাহর ক্ষেত্রে এ অর্থ গ্রহণ সম্ভব নয় বিধায় এখানে বাক্যদ্বয়ের উদ্দেশ্য হলো, اِنْعَامُهٗ عَلٰى عِبَادِهٖ অর্থাৎ বান্দার প্রতি আল্লাহর অপার অনুগ্রহ বা اِرَادَةُ الْخَيْرِ لِخَلْقِهٖ সৃষ্টির কল্যাণ কামনা। তিরমিযী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আউফ (রযি.) হতে বর্ণিত আছে, اَنَّهٗ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اِسْمًا مِنْ اِسْمِيْ অর্থাৎ, তিনি নবীকে (স.) বলতে শুনেছেন যে, আল্লাহ পাক বলেন, আমিই রহমান (পরম করুণার আধার)। আত্মীয়তা বন্ধন সৃষ্টি করতঃ বড় মায়া করে আমার নামে তার নাম রেখেছি। এ হাদীস প্রমাণ করে যে, উল্লিখিত শব্দদ্বয় অপর কোন শব্দ (رَحْمَتْ) হতে নির্গত। আল্লামা কুরতুবীও বলেন, এ দু'শব্দ মুসতাক হওয়ার ব্যাপারে উপরের হাদীসটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। সুতরাং এখানে কোন রকম বিরোধিতা বা ভিন্ন মন্তব্য করা অর্থহীন। কারো মতে اَلرَّحْمٰنُ শব্দটি একটি اِسْمِ عَلَمْ (নামবাচক বিশেষ্য)। কারণ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى আয়াতোক্ত اَلرَّحْمٰن শব্দটি কোন مَوْصُوْف-এর تَابِع হওয়া ছাড়াই পতিত হয়েছে। এ অভিমতের উত্তর হলো, কোন مَوْصُوْف-এর تَابِع হয়ে না আসাটা এ কথার উপর প্রমাণ করে না যে, সেটা صِفَتْ নয়।

আল্লামা মুবাররাদ (রহ.) اَلرَّحْمٰن-কে ইবরানী শব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ তথ্যও সঠিক নয়। কারণ, ইবরানী ভাষায় শব্দটা ব্যবহৃত হয় ঠিকই, কিন্তু তা خاء-এর সাথে (اَلرَّخْمٰن)

www.e-ilm.weebly.com

শব্দ দু'টি একই অর্থবহ নাকি ভিন্ন ভিন্ন অর্থবিশিষ্ট তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, উভয়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে مُبَالَغَة রয়েছে। কারো মতে, رَحْمٰن টা দুনিয়ার দিক দিয়ে আর رَحِيْم টা আখেরাতের দিক থেকে অধিক অর্থবহ ও প্রযোজ্য। সেজন্য বলা হয়, رَحْمٰنُ الدُّنْيَا وَرَحِيْمُ الْاٰخِرَة আবার কারো মতে رَحْمٰن টা رَحِيْم অপেক্ষা বেশি مُبَالَغه সম্পন্ন। কারণ, সকল বড় বড় এবং মৌলিক নেয়ামতকে বলা হয় رَحْمٰن আর ছোট ছোট ও তৃণপর্যায়ের নেয়ামতকে বলে رَحِيْم আর কোন কোন বিশ্লেষকের মতে আল্লাহর অনুগ্রহ দু'প্রকার। (১) যা মানুষ অনায়াসে লাভ বা অর্জন করে। এতে তাকে কোন প্রকার কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় না। এ জাতীয় নেয়ামত সমস্ত মাখলুক সমভাবে লাভ করে থাকে। যেমন, বাতাস, পানি প্রভৃতি। (২) যা কষ্ট সাপেক্ষে মানুষ লাভ করে যেমন, খাদ্য, রুজি, ফসল, শস্য, আত্মিক উৎকর্ষ প্রভৃতি। অতএব আল্লাহর যে صِفَت-এর মাধ্যমে মানুষ প্রথম প্রকার নেয়ামত লাভ করে, আল্লাহর সে সিফাতী নাম হল رَحْمٰن আর যে صِفَت-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় প্রকার নেয়ামত লাভ করে, আল্লাহর সে সিফাতী নাম হলো رَحِيْم

ইবনে জারীর বলেন, আল্লাহ পাক ছাড়াও অন্যের জন্য رَحْمٰن সিফাত ব্যবহার করা হয়। যেমন, ভণ্ড মুসায়লামাকে তার অনুসারীরা رَحْمٰنُ الْيَمَامَة (ইয়ামামার করুণাময়) বলত। তাই এ জাতীয় বিভ্রাট দূরীভূত করতে رَحْمٰن-এর সাথে رَحِيْم সিফাতকেও সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কেননা, আল্লাহ ব্যতীত কেউই এ দু'গুণে (একত্রে) গুণান্বিত হতে পারে না।

জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন গ্রন্থে এক সূক্ষ্ম তথ্য উল্লিখিত হয়েছে যে, মুসায়লামাকে যে رَحْمٰنُ الْيَمَامَة বলা হতো, তা اَلِف সহ (رَحْمَان) লেখা হতো। শাব্দিক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে আল্লাহর গুণবাচক নাম (رَحْمٰن) সর্বদা اَلِف ব্যতিরেকেই লেখার প্রচলন চলে আসছে।

اَلرَّحِيْمُ وَالرَّاحِمُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ঃ আল্লামা কস্তলানী বলেন, এ অভিন্ন অর্থ মূল অর্থ হিসেবে মাত্র। অন্যথা فَعِيْل এটা مُبَالَغَة-এর সীগা যা فَاعِل থেকে অধিক অর্থবহ। আর কখনও فَعِيْل টা صِفَت مُشَبَّه-এর জন্যও ব্যবহৃত হয়। তখন তার অর্থের মধ্যেও অতিরিক্ততা থাকে। কারণ صِفَتِ مُشَبَّه স্থায়িত্বের অর্থ প্রদান করে। পক্ষান্তরে فَاعِل শুধু তাৎক্ষণিকের অর্থ দেয়।

অবশ্য এ উদ্দেশ্যও হতে পারে যে, এখানে فَعِيْلٌ টা مَفْعُوْلٌ-এর অর্থে নয়; বরং فَاعِل-এর অর্থে ব্যবহৃত। তাই فَعِيْلٌ অর্থ مَفْعُوْل থেকে সতর্ক করতে উল্লিখিত ভাষ্যের আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ফাতিহাতুল কিতাব সম্পর্কে আলোকপাত

مَا جَاءَ فِىْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ঃ اَلْفَاتِحَةُ মূলতঃ اَلْعَافِيَةُ-এর মতই একটি মাসদার। যার দ্বারা কোন কিছুর উদ্বোধন করা হয় তাকে اَلْفَاتِحَةُ বলে। এখানে মাসদার বলে مَفْعُوْل উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। تَاء বর্ণটি মূল শব্দকে صِفَت হতে اِسْم-এ পরিণত করতে সম্পৃক্ত হয়েছে। اَلْكِتَابُ শব্দের প্রতি শব্দটি সম্বন্ধিত হয়েছে مِنْ بَعْضِيَّة (মিনে বা'জিয়া)-এর মাধ্যমে। কারণ, বস্তুর প্রথমাংশ তার একাংশই হয়। অতঃপর তাকে (اَلْفَاتِحَة) কুরআনের সর্বপ্রথম সূরার নাম হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কারণ এটাই কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা। (কস্তলানী)

وَسُمِّيَتْ أُمَّ الْكِتَابِ لِأَنَّهُ يُبْدَأُ بِكِتَابَتِهَا فِى الْمَصَاحِفِ وَيُبْدَأُ بِقِرَاأَتِهَا فِى الصَّلَاةِ (ফাতিহার অপর নাম 'উম্মুল কিতাব'। কারণ, কুরআনের রচনা ও নামাযের সূচনা তার দ্বারাই সূচিত হয়) ঃ অভিধানে اُمّ অর্থ সূচনা, শুরু। (ফতহুল বারী)

আর কোন কোন বিশ্লেষক সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কিতাব' নামকরণের কারণ সম্পর্কে বলেন, অভিধানে اُمّ অর্থ সার, নির্যাস। যেহেতু সূরা ফাতিহা কুরআনিক সকল উদ্দেশ্যের সংক্ষিপ্ত সার বা নির্যাস স্বরূপ, তাই এ নামে তার নামকরণ হয়। আর সে সার বা নির্যাস হলো তিনটি বিষয়। (১) আল্লাহর প্রশংসা, যা সূরার শুরুতেই ঝংকৃত হয়েছে। (২) আল্লাহর ইবাদত, যার বিবরণ সূরার মাঝখানে বিধৃত হয়েছে। ও (৩) উপদেশ-সাবধান, যা সূরার শেষে বর্ণিত হয়েছে। আর কেউ কেউ আল্লাহর সত্তা, বৈশিষ্ট্য ও কার্যাবলীকে কুরআনিক উদ্দেশ্যের সার-নির্যাস অভিহিত করেছেন। কারণ জগতে যা কিছু আছে, সবই এর কোন না কোন পর্যায়ের অন্তর্গত। আবার কেউ কেউ আদিকাল (مَبْدَء), ইহকাল (مَعَاش) ও পরকালকে (مَعَادْ) কুরানিক মৌলিক আলোচ্য বিষয় স্থির করেছেন।

মোটকথা কুরআনিক সকল বিষয়বস্তুর সার-নির্যাস এ সূরায় অন্তর্নিহিত থাকায় তাকে উম্মুল কিতাব নামে ভূষিত করা হয়েছে। (ফাতহুল বারী, আইনী, কস্তলানী)

'ইতকান' গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) সূরা ফাতিহার ২৫টি নাম উল্লেখ করেছেন।

اَلدِّيْنُ ঃ দ্বীনের প্রকৃত অর্থ প্রতিদান। 'হিসাব' দ্বীনের প্রকৃত অর্থ নয়; বরং এটা তার لَازِمِى مَعْنَى তথা একটা আবশ্যিক অর্থ মাত্র। কেননা সূত্র হলো لِأَنَّ الْحِسَابَ لَا يَكُوْنُ إِلَّا الْجَزَاءَ وَالْجَزَاءُ لَا يُمْكِنُ بِدُوْنِ الْمُحَاسَبَةِ অর্থাৎ,

www.e-ilm.weebly.com

প্রতিদান নিরূপণের জন্যই হিসাব, আর হিসাব গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রতিদান নিরূপণ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অর্থে 'দ্বীন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন-রীতি, আমল (কর্ম), হুকুম (আদেশাজ্ঞা), অবস্থা, সত্য, আনুগত্য, ক্রোধ, মিল্লাত (জাতি), শরীয়ত, তাকওয়া, রাজনীতি প্রভৃতি। (আইনী, লামিউদ্ দারারী)

بِالْحِسَابِ : এর দ্বারা সূরা ইনফিতারের আয়াত كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّيْنِ (অর্থাৎ কখনও নয়; বরং তোমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে)-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

مَدِيْنِيْنَ مُحَاسَبِيْنَ : এর দ্বারা সূরা ওয়াকিয়ার আয়াত فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ (অর্থাৎ যদি তোমরা মনে করে থাক যে, তোমাদের হিসাব নেয়া হবে না...) -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে, ইমাম বুখারী (রহ.) সূরা ফাতিহার তাফসীর করতে গিয়ে সূরা ইনফিতার ও সূরা ওকিয়ার আয়াত কেন উল্লেখ করলেন? কারণ হলো, ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর নীতি অনুযায়ী ন্যূনতম সম্পর্ক হেতু এ দু'সূরার আয়াত এখানে উল্লেখ করেছেন। (আইনী, লামিউদ্ দারারী)

هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِى الْقُرْاٰنِ (এটা কুরআনের এক সর্বোচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট সূরা)

এ সূরার এহেন মর্যাদার একটি কারণ হলো, তার মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে কুরআনের সামগ্রিক বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। এ সূরার মর্যাদা ও স্থান অন্যান্য সূরা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِى : সূরা মাউনের মত সূরা ফাতিহাও সাত আয়াত বিশিষ্ট। এ দু'সূরা ব্যতীত কুরানের আর কোন সূরা সাত আয়াতবিশিষ্ট নয়। সূরা ফাতিহাকে 'মাছানী' বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে। (১) তা সময় অতিক্রান্তের সাথে সাথে বারবার পড়া হয়। ফলে তার পাঠে যেমনি বিরতি হয় না, তেমনি শেষও হয় না। (২) প্রতি রাকাতে পাঠ করা হয় (৩) এতে আল্লাহর প্রশংসা স্থান পেয়েছে এবং আল্লাহ পাকের মহান গুণাবলীর বিবরণ রয়েছে। (৪) এ উম্মতের জন্য এটা আল্লাহর পক্ষ হতে সারপ্রাইজ (অযাচিত বিশেষ দান); ইতঃপূর্বে অন্য কোন উম্মতের ভাগ্যে তা জোটেনি। (কস্তলানী)

وَالْقُرْاٰنُ الْأَعْظَمُ الَّذِىْ أُوْتِيْتُهُ (ঐ মর্যাদাসিক্ত কুরআন, যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে) : এখানে এ প্রশ্ন করার সুযোগ নেই যে, اَلسَّبْعُ-اَلْقُرْاٰنُ-কে الْمَثَانِى- এর উপর عطف করাটা তা عَطْفُ الشَّئِ عَلٰى نَفْسِهٖ হওয়ায় নাজায়েয হয়েছে। কারণ, এটা ذِكْرُالشَّئِ بِوَصْفَيْنِ তথা একটি বিষয়কে তার দু'বৈশিষ্ট্যের সাথে উল্লেখ করার অন্তর্গত; যার একটি وَصْف বা গুণকে مَعْطُوف عَلَيْهِ আর দ্বিতীয় وَصْف-কে مَعْطُوف অভিহিত করা হয়। উহ্য ভাষ্য হল : اٰتَيْنَاكَ مَا يُقَالُ

www.e-ilm.weebly.com

لَهُ السَّبْعُ الْمَثَانِى وَالْقُرَانُ الْعَظِيْمُ অর্থাৎ, হে রসূল! আমি আপনাকে سَبْعُ مَثَانِى ও اَلْقُرَانُ الْعَظِيْمُ নামে ভূষিত একটি সূরা দান করেছি। আল্লামা কিরমানী বলেন, নাহুবিদদের মতে এখানে আগত وَاوْ টি جَمْعٌ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ-এর জন্য ব্যবহৃত।

আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, এটা হলো عطف العام على الخاص অর্থাৎ ব্যাপকার্থবহ বিষয়কে সীমিত অর্থবহের পরে উল্লেখকরণ। আল্লামা খত্তাবী বলেন, এখানে وَاوْ টি عَاطِفَة (সংযুক্তকারী) নয় যে, তা দু' বাক্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার কারণ হবে; বরং وَاوْ এখানে تَخْصِيْص-এর জন্য এসেছে। যেমন কুরআনের আয়াত فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ অর্থাৎ জান্নাতদ্বয়ের ফলমূল, খেজুর বৃক্ষ ও ডালিম রয়েছে। এর মধ্যে وَاوْ টা تَخْصِيْص-এর জন্য এসেছে। আল্লামা আইনী বলেন, খাত্তাবীর উক্তি নাহুবিদদের পরিপন্থী। কারণ, এটা হলো عَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ আর وَاوْ টা عَطْفُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ বা عَطْفُ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ কে তার عَطْف হতে বহিষ্কার করে না।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীর (স.) আহ্বানে সাড়া দেয়া ওয়াজিব। ব্যতিক্রম করলে মানুষ গোনাহগার হয়। সাথে সাথে এটাও জানা যায় যে, এ সাড়া দানে নামায ভাঙ্গে না।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ (বিরাগভাজন ও ভ্রান্তদের পথ নয়) ঃ সূরা ফাতিহাতে দোয়ার তিনটি পন্থা উল্লিখিত হয়েছে। ঈমানদারদের পন্থা (২) ইহুদীদের পন্থা ও (৩) খ্রীস্টানদের পন্থা। এ সূরায় মুসলমানদেরকে ঈমানদারদের পন্থায় পরিচালনা আর ইহুদী-খ্রীস্টানদের পন্থায় পরিচালনা না করার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারণ ঈমানদারদের পথ সত, ইলম ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে অবশিষ্ট দু'দলের আদর্শ ও পথ ভ্রান্তিপূর্ণ। ইহুদীদের পথ ভ্রান্ত হওয়ার কারণ হলো, তারা সত্যকে জেনে-বুঝে বর্জন করেছে। তদনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়ে তোলেনি। ফলে তারা আল্লাহর বিরাগভাজন হয়েছে। আর খ্রীস্টানদের পথভ্রান্ত হবার কারণ হলো, তারা সত্যের ছোঁয়া পায়নি এবং ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। তাদের সত্যজ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কারণ হলো, তারা রসূল (স.)-এর অনুসরণ করত না। ফলে তারা বিপথগামী হয়েছে। (কস্তলানী ইবনে কাসীরের[১] সূত্রে)

سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ

সূরা বাকারা

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ঃ আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে সমস্ত বস্তুর নাম এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়ার জ্ঞান দান করেছেন। পবিত্র কুরআনের

টীকা ঃ আল্লামা ইবনে কাসীর (রহ.), মৃত্যু ঃ ৭৭৪ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

কোথাও সুস্পষ্টভাবে বা ইঙ্গিতে পাওয়া যায় না যে, হযরত আদমকে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা কোন একাকী অবস্থায় এ শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাই হতে পারে শিক্ষার্থী আরও ছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য-যোগ্যতা কেবল হযরত আদমের (আ.) মধ্যেই ছিল। ফলে তিনি শিখে নেন। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের মধ্যে এ যোগ্যতা না থাকায় তাঁরা শিখতে পারেননি। অথবা হতে পারে, এ শিক্ষা বাহ্যত শিক্ষা প্রদান ছিল না; বরং সৃষ্টির সময়ে তাঁর প্রকৃতির মধ্যে সমস্ত বস্তু ও বিষয়ের জ্ঞান সংযোগ করে দেয়া হয়। যেমন নবজাতক জন্মের সাথে সাথে মায়ের দুধ পান করা জানে। হাঁসের বাচ্চা সাঁতার কাটা জানে। এ প্রশ্ন উত্থাপন করা ঠিক হবে না যে, আল্লাহ্ যখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তখন ফেরেশতাদের প্রকৃতি পরিবর্তন করে তাদেরও এ সমস্ত বিষয় কি শিক্ষা দিতে পারতেন না? কারণ হলো, যদি বাস্তবে ঘটনাটা এভাবে গড়াত, তবে তারা ফেরেশতা থাকতো না; বরং মানুষ হয়ে যেতেন। (মা'আরেফুল কুরআন)

فَيُؤْذَنُ لِى (অনন্তর আমাকে অনুমতি দেয়া হবে) ঃ শাফায়াতে কুবরার বিবরণ এ পর্যন্ত শেষ। এর পরে আগত অতিরিক্ত বিষয়ে শাফায়াতে সুগরা (হাল্কা সুপারিশ) বর্ণিত হয়েছে। (কিরমানী)

আল্লামা তীবী বলেন, হতে পারে ঈমানদারদের দু'টি দল হবে। একটি দল হাশরের ময়দানে এসে আটকে যাবে আর অপর দলকে কোন রকম আত্মসমর্থন কিংবা অবস্থানের সুযোগ না দিয়েই জাহান্নামের দিকে হাঁকানো হবে। আর এ উভয় দল রসূল (স.)-এর সুপারিশ প্রার্থনা করবে। তাই রসূল (স.) প্রথমে হাশরে আটকে পড়াদের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে তাদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যবস্থা করবেন। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ঈমানদারদের ব্যাপারে সুপারিশ করে এক এক দল করে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাতে থাকবেন।

فَيَحُدُّ لِى حَدًّا الخ (অতঃপর তিনি আমার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা [পরিমাণ] নির্ধারণ করে দেবেন) ঃ এ অংশটি পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাকে প্রমাণিত করে। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَسِيْلَتِىْ اِلَيْكَ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আপনার প্রতি আমার উসিলা স্বরূপ মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি মুহুর্মুহু দরুদ, অজস্র বরকত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

مَا بَقِىَ فِى النَّارِ اِلَّا مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْاٰنُ (কুরআন যাকে আটকে রাখবে কেবল সেই জাহান্নামে থাকবে) ঃ এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, পূর্বের হাদীস থেকে অনুমিত হয় যে, শাফায়াত প্রার্থনা হাশরের ময়দানের বিপদ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ছিল, জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য নয়। কারণ, তখন জওয়াবে বলা হবে, এটা হলো শাফায়াতে কুবরার ঘটনা।

www.e-ilm.weebly.com

يُوَلُّوْنَكُمْ يَسُوْمُوْنَكُمْ ঃ লেখক يَسُوْمُوْنَكُمْ-এর ব্যাখ্যা করেছেন يُوَلُّوْنَ-এর দ্বারা। এটা اَلْوَلِى (لَامْ টা সাকিনযুক্ত) মাসদার হতে নিষ্পন্ন। অর্থ, নিকটবর্তী হওয়া, সমীপে হওয়া। আয়াতের অর্থ হবে, তারা তোমাদের নিকটবর্তী করবে।

اَلْوِلَايَةُ مَفْتُوحَةٌ مَصْدَرُ الْوَلَاءِ ঃ এটা আবু উবায়দার উক্তি। তিনি এটা সূরা কাহাফের আয়াত هُنَالِكَ الْوِلَايَةُ لِلّٰهِ الْحَقِّ-এর ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) يَسُوْمُوْنَكُمْ-এর ব্যাখ্যা يُوَلُّوْنَكُمْ করে সমর্থন স্বরূপ উল্লিখিত উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ যদিও اَلْوِلَايَةُ টা اَلرُّبُوْبِيَّةُ তথা প্রতিপালন এবং اَلْوَلَايَةُ টা اَلْاِمَارَةُ তথা রাষ্ট্র এর জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এ ধাতুগত প্রত্যেক শব্দের মধ্যে নিকট ও সমীপের অর্থ রয়েছে। (আইনী, লামিউদ্ দারারী)

وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى ঃ مَنٌّ-এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (১) সুমিষ্ট আঠা (ঘাম) (২) শরবত (৩) মধু (৪) তুরুঞ্জীন (রস)। অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারদের মতে مَنٌّ-এর অর্থ ডুমুর। চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থাদিতে আছে যে, مَنٌّ হলো, মধুর মত গাঢ় আসমান থেকে পতিত শিশির কণার ন্যায় এক ধরনের সুস্বাদু বস্তুর নাম। বিভিন্ন গ্রন্থে مَنٌّ ও تَرَنْجَبِيْن-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ اَلْمَنُّ شَيْءٌ كَالطَّلِّ فِيْهِ حَلَاوَةٌ يَسْقُطُ عَلَى الشَّجَرِ অর্থাৎ মান্না হলো মিষ্টি জাতীয় এক ধরনের রস, যা বৃক্ষের উপর পতিত হয়।

وَالتَّرَنْجَبِيْنُ طَلٌّ يَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ وَهُوَ نَدًى تَشْبِيْهٌ بِالْعَسَلِ الْجَامِدِ

অর্থাৎ আর তুরুঞ্জীন হলো, আসমান থেকে পতিত গাঢ় মধুর ন্যায় এক ধরনের রস। তাওরাত গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে এসেছে, রাতে মরুপ্রান্তর বা অরণ্যে বরফের কুচির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার সাদা বস্তু মাটিতে পড়ত। প্রত্যুষে লোকজন গিয়ে তা কুড়িয়ে ঘরে এনে পিড়িতে পিষত এবং তাওয়ায় ছেঁকে ফুলকা রুটি বানাত। যেহেতু বনী ইসরাঈলরা জানত না যে, এটা কি জিনিস অপরদিকে মূসা (আ.) তাদের বলেন যে, এটা হল রুটি খাওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন। তাই তারা এর নাম রাখে مَنٌّ (আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহ)।

اَلسَّلْوٰى ঃ এটা এক ধরনের বটের পাখীর নাম। কেউ তাকে বটপাখীও বলেন। এটা সীনা উপদ্বীপের এক বিশেষ পাখী। প্রচুর পরিমাণে এ পাখী সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। তারা খুব নীচু দিয়ে উড়ে। দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সহজেই তাদের শিকার করা যায়। এ পাখীর গোশত চর্বিযুক্ত হয়। জমা করে রাখলে অল্প সময়েই নষ্ট হয়ে যায়। (মা'আরেফুল কুরআন)

اَلْمَنُّ صَمْغَةٌ ঃ মান্না হলো আঠার ন্যায়। যেরূপভাবে আঠা গাছের ডালে ডালে জমে থাকে, তেমনি মান্নাও জমে থাকে। এ ব্যাখ্যা প্রদানের কারণ হলো,

www.e-ilm.weebly.com

مَنٌّ হুবহু صَمْغَةٌ (আঠা) নয়। কারণ, আঠা গাছের ডালে ডালে জমে থাকে। পক্ষান্তরে مَنٌّ জমাট অবস্থায় আসমান থেকে বৃক্ষে পড়ে। (লামিউদ্ দারারী)

اَلْكَمَاةُ مِنَ الْمَنِّ ঃ كَمَأَةٌ অর্থ ব্যাঙয়ের ছাতা (ছত্রাক উদ্ভিদ)। আল্লামা খাত্তাবী প্রমুখ এ হাদীস এখানে উল্লেখের উপর প্রশ্নারোপ করে বলেন, এ জাতীয় উদ্ভিদ আল্লাহ্ কর্তৃক অবতারিত مَنٌّ নয়, তথাপি তা এখানে উল্লেখের হেতু কি? উলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের জবাব তথা হাদীসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যেরূপভাবে مَنٌّ আসমান থেকে অবতীর্ণ হতো এবং বনী ইসরাঈলরা তা বিনা কষ্টে অর্জন করত, অনুরূপভাবে ব্যাঙয়ের ছাতা (ছত্রাক) উদ্ভিদও বিনা চাষ ও বিনা কষ্টে হস্তগত হয়। আবার কেউ কেউ তার বাহ্যিক অর্থ নিয়ে এ জওয়াব দেন যে, এ উদ্ভিদও বনী ইসরাঈলদের প্রতি অবতীর্ণ আরেকটি মান্না। ইবনে উয়ায়নার বর্ণনায় এটাই প্রমাণিত হয়। ফলে উভয় ব্যাখ্যানুপাতে مَنٌّ এর সাথে اَلْكَمْلَةُ-এর উল্লেখের মধ্যকার সম্পর্ক পরিষ্কার। (লামিউদ্ দারারী)

مَاءُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (তার পানি চোখের প্রতিষেধক) ঃ ইমাম নববী (রহ.) বলেন, কথিত আছে, চোখ লাফালাফি রোগের জন্য ছত্রাকের রস (নিংড়ানো পানি) অব্যর্থ প্রতিষেধক। আর অন্যান্য রোগে বিভিন্ন উপকরণের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করলে সুচিকিৎসা পাওয়া যায়। তবে সঠিক কথা হলো, সাধারণভাবে এ উদ্ভিদের রসেই নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে। ইমাম সাহেব আরো বলেন, মুহাদ্দিস শায়েখ সালেহ্ বিন আবদুদ দেমাস্কীর দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গিয়েছিল। চোখে উল্লিখিত নিংড়ানো পানি (রস) প্রয়োগ করায় তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে।

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا (আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে) ঃ এখানে مَا শব্দটি شَرْطِيَّةٌ جَازِمَةٌ। অভিধানে نَسْخٌ অর্থ ঃ اَلتَّبْدِيْلُ বা পরিবর্তন করা। আর পরিভাষায় نَسْخ বলে ঃ

بَيَانُ انْتِهَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُطْلَقِ الَّذِىْ تَقَرَّرَ فِىْ اَوْهَامِنَا اِسْتِمْرَارُهُ بِطَرِيْقِ التَّرَاخِىْ ـ

অর্থাৎ, ঐ মুতলাক শরয়ী হুকুমের পরিসমাপ্তি বর্ণনা করা, যা বিলম্ব হেতু আমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত ও সুদৃঢ় হয়ে গেছে। অতএব نَسْخ আমাদের বিচারে পরিবর্তন কিন্তু শরীয়ত প্রবর্তকের ক্ষেত্রে শুধু (নতুন) বর্ণনা বা প্রকাশ মাত্র।

প্রকাশ থাকে যে, এ আয়াতে نَسْخ-এর সমস্ত প্রকারের বর্ণনা এসে গেছে। চাই তা পাঠ ও বিধানগত হোক। যেমন, বর্ণিত আছে, সূরা আহযাব সূরা বাকারার

www.e-ilm.weebly.com

বরাবর ছিল। অতঃপর তার অধিক অংশ পাঠ্য ও বিধান থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অথবা শুধু পাঠ মানসুখ হবে, হুকুম মানসুখ হবে না। যেমন اٰيَةُ الرَّجْمِ। অথবা শুধু হুকুম মানসুখ হবে, পাঠ বাকী থাকবে।

نُنْسِهَا ঃ এ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। (১) নুন বর্ণে যবর যোগে (نَنْسَهَا) এ সময় শব্দটি نَسَأٌ মাসদার হতে নিষ্পন্ন হবে। অর্থ হবে বিলম্ব, লেট। (২) নুন বর্ণ পেশ যোগে (نُنْسِهَا) এ সময় শব্দটি اِنْسَاءٌ বা نِسْيَانٌ মাসদার হতে নির্গত হবে। অর্থ হবে, ভুলিয়ে দেয়া বা ভোলা।

اٰيَةٌ ঃ এ শব্দটির মধ্যে একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। (১) اٰيَةٌ অর্থ হবে নিদর্শন ও মোজেজা। যদি প্রকৃত এ অর্থই হয় তবে কোন প্রশ্নের অবকাশ থাকে না। কারণ, কুরআন ও রসূল (স.)-এর সত্যতার উপর একটার উপর আরেকটা নিদর্শন-প্রমাণ আজও আসছে। আর ওহী অবতরণকালে মোজেজার কোন কমতি ছিল না। (২) আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য লিখিত বা গ্রন্থেয় আয়াত। এটা দু'ভাবে হতে পারে। (ক) পূর্ববর্তী কিতাবের আয়াত (খ) কুরআন শরীফের আয়াত। আবু মুসলিম ইস্পাহানী অবলম্বিত প্রথম অবস্থায় কোন প্রশ্ন আরোপিত হয় না। কারণ, পূর্ববর্তী কিতাবের আয়াত কুরআনের আয়াত দ্বারা রহিত হওয়া একটা প্রকাশ্য ও সাধারণ ব্যাপার। (৩) আর যদি কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য হয়, তবে এ কথার প্রবক্তা একজনও নন যে, এ পরিবর্তন (نَسْخ) আকীদা, সামষ্টিক চরিত্র, পূর্ববর্তী ঘটনা-কাহিনী এবং অদৃশ্য সংবাদের ক্ষেত্রে সাধিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য বিধানগত ব্যাপারেও এ সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থাতেও কোন প্রশ্ন আসার কারণ নেই। কেননা, বিধানাবলী হলো চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের (ব্যবস্থাপত্র) ন্যায়। যেরূপভাবে রোগীর অবস্থার পরিবর্তন, আবহাওয়ার পরিবর্তন এবং রোগের পার্থক্যভেদে প্রেসক্রিপশন পরিবর্তন করা হয়, শরয়ী হুকুমেরও অবস্থা ঠিক অনুরূপ। খাদ্য-চর্বন, চিরা ও ফাঁড়ার জন্য আল্লাহ মানুষকে দাঁত ও মাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু দুগ্ধ পানকালীন সময়ে দাঁত ওঠার পূর্বে তাকে নরম ও হাল্কা খাদ্য খেতে হয়। এর অর্থ এই নয় যে, মানুষের জন্য দাঁত হবে না। যে সকল বিধান পরে অবতীর্ণ হয় তার অবস্থাও ঠিক এরূপ। তাই ভাল করে বুঝা দরকার যে, পরিবর্তন বা রহিতকরণ যাই হোক না কেন, তা মানুষের জ্ঞানের বিচারে মাত্র। অন্যথা আল্লাহর জ্ঞানে সকল হুকুমই প্রাচীনকাল হতে সুনির্ধারিত। সেজন্য نَسْخ-এর কথা শুনে ঘাবড়ে যাবার এবং মহল বিশেষের ন্যায় তা অস্বীকার করার কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ, نَسْخ-এর শরয়ী অর্থই হলো, কোন মুতলাক বা শর্তহীন বিধানকে (বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) স্রেফ সীমিত ও শর্তযুক্ত করে দেয়া।

www.e-ilm.weebly.com

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম نَسْخ-এর সমার্থ নিরূপণে মতভেদ করেছেন। যেহেতু نَسْخ-এর পারিভাষিক অর্থ হলো, হুকুম চেঞ্জ বা বিধান পরিবর্তন। সেহেতু পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের মতে (১) কোন হুকুম পূর্ণাঙ্গরূপে পরিবর্তন (২) আংশিক পরিবর্তন (৩) সীমাবদ্ধ করা (৪) শর্তারোপ (৫) ইস্তেসনা করা॥এ সবকিছুই نَسْخ-এর অন্তর্ভুক্ত। সেজন্য তাদের মতে মানসুখ (রহিত) আয়াতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ (৫০০)।

পক্ষান্তরে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম শুধু ঐ পরিবর্তনকে نَسْخ বলেন, পূর্বের হুকুমের সাথে যার কোনভাবেই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সংজ্ঞানুপাতে এটাই স্বাভাবিক যে, তাদের পরিভাষা অনুযায়ী মানসুখ আয়াতের সংখ্যা অনেক কমে যাবে। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) মাত্র একুশ আয়াতকে আর হযরত শাহ্ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) মাত্র পাঁচটি আয়াতকে মানসুখ বলে অভিহিত করেছেন।

(মুফতী শফী প্রণীত মা'আরেফুল কুরআন)

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى (তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থানরূপে মনোনীত কর) ঃ এ আয়াতে তওয়াফের পরে মাকামে ইব্রাহীমে দু'রাকাত নামায পড়ার হুকুম দেয়া হয়েছে। তওয়াফের পর এ দু'রাকাত নামায আদায় শাফেয়ী ও হানাবেলাদের মতে সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর আহনাফ ও মালেকীদের মতে ওয়াজিব। এ আয়াত তাদের (আহনাফ ও মালেকীদের) দলীল। কারণ আয়াতোক্ত أمر এবং বহু হাদীস ওয়াজিবের উপর সরাসরি প্রমাণ বহন করে।

(মাজহারী)

মাকামে ইব্রাহীম দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত হযরত ইব্রাহীম নখয়ীর উক্তি অনুযায়ী পূর্ণ হারাম শরীফ অথবা ইবনে ইয়ামানের উক্তি অনুযায়ী মসজিদে হারাম মাত্র। অথবা কারো মতানুযায়ী আরাফা, মুযদালিফাহ প্রভৃতি হজ্জের অবস্থান স্থল। এ সকল অবস্থায় مِنْ শব্দটি تَبْعِيْضِيَّه তথা অংশ বিশেষের জন্য হবে (অর্থাৎ মাকামে ইব্রাহীমের সর্বত্র নয় বরং যে কোন অংশে নামায পড়)। অথবা এর দ্বারা ঐ পাথর উদ্দেশ্য, যার উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কা'বা শরীফ নির্মাণ করেন। এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। কারণ হযরত জাবের (রযি.)-এর হাদীস এ অভিমতকেই সমর্থন করে। হযরত জাবেরের (রযি.) হাদীসে এসেছে ঃ

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ عَمَدَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

অর্থাৎ রসূল (স.) তওয়াফ সেরে মাকামে ইব্রাহীমে গিয়ে তার পশ্চাতে (অর্থাৎ মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে) দু'রাকাত নামায আদায় করেন এবং وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ.... আয়াতটি তেলাওয়াত করেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে مِنْ শব্দটি اِبْتِدَائِيَّة

www.e-ilm.weebly.com

হবে (অর্থাৎ মাকামে ইব্রাহীমের সন্নিকটবর্তী স্থানকে তোমরা নামাযের জন্য মনোনীত কর তথা সেখানে নামায পড়)।

اَلْقَوَاعِدُ أَسَاسُهَا : قَوَاعِدُ শব্দটি قَاعِدَةٌ ও قَاعِد-এর جَمْع বা বহুবচন। قَاعِدَة অর্থ ভিত্তি, বুনিয়াদ। আর قَاعِدٌ অর্থ, বিধবা ও মহিলা। এ দু'শব্দের বহুবচন একই; পার্থক্য শুধু একবচনে।

إِنَّ قَوْمَكَ بَنَوا الْكَعْبَةَ : (তোমার গোত্র কা'বা নির্মাণ করেছে) ঃ এখানে গোত্র বা জাতি দ্বারা উদ্দেশ্য 'কুরাইশগণ'। হযরত খাদিজার (রযি.) সাথে রসূল (স.)-এর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরবর্তী সময়ে কুরাইশরা কা'বা গৃহ সংস্কার করে। তখন রসূল (স.)-এর বয়স মোবারক ছিল ৩৫ বছর।

কা'বা শরীফের নামকরণ ঃ আল্লামা আইনী বলেন, প্রত্যেক উন্নীত ও উঁচু বস্তুকে কা'বা বলে। যেহেতু বায়তুল হারাম খুব উঁচু ও উন্নীত তাই এ শব্দমূল থেকে কা'বা করে তার নাম রাখা হয়েছে। কারো মতে, তা চতুষ্কোণ বিশিষ্ট হওয়ায় কা'বা নামে তার নামকরণ করা হয়েছে।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) "তারীখে মক্কা" গ্রন্থে লিখেন যে, কা'বা গৃহ মোট দশবার নির্মিত হয়। (১) ফেরেশতাগণ কর্তৃক (২) হযরত আদম (আ.) কর্তৃক (৩) আদম-সন্তানগণ কর্তৃক (৪) ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক (৫) আমালেকা গোত্র কর্তৃক (৬) বনূ যুরহুম কর্তৃক (৭) কুসাই বিন কেলাব কর্তৃক (৮) নবীজীর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে কুরাইশগণ কর্তৃক (৯) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.) কর্তৃক ও (১০) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সাকাফী কর্তৃক।

সীরাতে হালাবী গ্রন্থে আছে, সঠিক কথা হলো, মৌলিকভাবে তিনবার কা'বা শরীফ নির্মিত হয়। (১) হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক (২) কুরাইশগণ কর্তৃক। আর এ দু'নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল দু'হাজার পঁচাত্তর বছর। (৩) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর কর্তৃক। কুরাইশ ও ইবনে যুবাইরের নির্মাণকালের মধ্যে ব্যবধান ছিল বিরাশি বছর।

উক্ত গ্রন্থে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতা, আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানগণ কর্তৃক কা'বা শরীফ নির্মাণের ব্যাপারটি সঠিক নয়। আর যুরহুম, আমালেকা ও কুসাই বিন কিলাবের নির্মাণটা ছিল সংস্কার ও উন্নয়নমূলক মাত্র।

হযরত ইমাম মালেক (রহ.)-এর যুগে কতিপয় বাদশাহ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নির্মিত কা'বা ভেঙ্গে দিয়ে তা নতুন করে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের নির্মিত ডিজাইনে (নমুনায়) নির্মাণ করতে চাইলে ইমাম মালেক (রহ.) এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন এবং বলেন, এরূপ করলে মানুষ অদূর ভবিষ্যতে তাকে খেলনা বানিয়ে নিবে। (অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী তার ভাঙ্গা-গড়া চলতে থাকবে)

بَابُ : سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ـ

[নির্বোধদের প্রশ্ন উত্থাপনের মোটেই দেরী নেই যে, পূর্ববর্তী কেবলা থেকে তারা (মুসলমানরা) কেন মুখ ফিরিয়ে নিল?]

www.e-ilm.weebly.com

কেবলা পরিবর্তন প্রসঙ্গ

এ অধ্যায়ে কয়েকটি বিষয় আলোচ্যতব্য। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তা তুলে ধরা হলো ঃ (১) কোন্ মসজিদ ও কোন্ নামাযে কেবলা পরিবর্তন হয় ঃ

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এ ব্যাপারে বর্ণনাসমূহ বিভিন্নমুখী। যথা॥

ইবনে সাদ 'তবকাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রসূল (স.) মসজিদে নববীতে মুসলমানদের নিয়ে জোহরের দু'রাকাত নামায আদায়ের পর মসজিদে হারামের দিকে মুখ করার নির্দেশ আসে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম নামাযরত অবস্থায় মসজিদে হারামের দিকে ঘুরে যান এবং রসূল (স.) নিজেও ঘুরে দাঁড়ান।

অপর হাদীসে এসেছে, রসূল (স.) বনূ সালামা গোত্রে গিয়ে উম্মে বিশরের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি রসূল (স.)-এর জন্য খানার ব্যবস্থা করেন। জোহরের সময় হয়ে গেলে রসূল (স.) সাহাবাদের নিয়ে দু'রাকাত নামায আদায়ের পর কা'বার দিকে ঘুরার নির্দেশ আসে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম কা'বার দিকে ঘুরে যান, আর রসূল (স.)ও কিবলার দিকে মুখ করেন। বস্তুত এ কারণেই বনূ সালমার মসজিদটির নাম হয় মসজিদুল কেবলাতাইন।*

আল্লামা সুয়ূতী থেকে বর্ণিত আছে, বনু সালমার ঘটনায় রসূল (স.) ইমাম ছিলেন না এবং তিনি নামাযের মধ্যে ঘুরেননি।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, শায়েখ মুহাম্মাদ হাসান মক্কী (রহ.) তাঁর শায়েখের এক আলোচনা (تقرير) থেকে উদ্ধৃত করেন যে, নামাযের মধ্যখানে রসূল (স.) কর্তৃক কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত যে ঘটনা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভুয়া ও অনভিপ্রেত; বরং পরিবর্তন নামাযের পূর্বেই হয়, এরপর রসূল (স.) বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে নামায পড়েন। শায়েখ সুয়ূতীর পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি শায়েখ মুহাম্মাদ হাসানের বক্তব্যকে সমর্থন করে।

হযরত বারা বিন আযেব (রযি.) থেকে (বুখারী প্রথম খণ্ডের ১০ম পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে, وَانَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ অর্থাৎ রসূল সর্বপ্রথম কা'বামুখী হয়ে আসরের নামায আদায় করেন।

এ সমস্ত বর্ণনার মাঝে সমতা বিধান করতে গিয়ে ইবনে হাজার বলেন, বিশর বিন বারা (রযি.) ইন্তেকাল করলে রসূল (স.) বনূ সালমার মসজিদে সর্বপ্রথম যে নামায পড়েন, তা ছিল জোহরের নামায। এরপর মসজিদে নববীতে এসে কাবামুখী হয়ে সর্বপ্রথম আসরের নামায পড়েন।

হযরত শায়েখ মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার মতে সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো, রসূল (স.) কা'বামুখী হয়ে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ যে নামায পড়েন, তা ছিল আসরের নামায। আর জোহরের নামায উভয় কেবলার দিকে দু'রাকাত করে

টীকা ঃ *ইবনে সাদ বলেন, ওয়াকেদী বলেছেন ঃ هٰذه اثبت عندنا অর্থাৎ আমাদের কাছে ঘটনাটি এভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

পড়েন। এ ব্যাখ্যাটা অন্যান্য বাখ্যাকারদের পূর্ববর্তী বক্তব্যকে সমর্থন করে, যারা দাবী করেন যে, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা নামাযের মধ্যে ঘটে। আর শায়েখ মুহাম্মাদ হাসান (রহ.) তাঁর শায়েখ থেকে যে ভাষ্য তুলে ধরেছেন আল্লামা সুয়ূতীর বক্তব্য তাকে সমর্থন করে। কিন্তু ইবনে সা'দ, ওয়াকেদী প্রমুখ থেকে বর্ণিত বিষয়ের তা পরিপন্থী হয়। (লামিউদ্ দারারী ১ ঃ ৩৩১)

(২) কেবলা পরিবর্তনের সময়কাল ঃ এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। যথা ঃ (১) কোনো বর্ণনায় সন্দেহের সাথে এসেছে, হিজরতের ১৬ মাস পরে (২) কোন বর্ণনায় দৃঢ়তার সাথে এসেছে হিজরতের ১৬ মাস পরে (৩) আবার কোন বর্ণনায় দৃঢ়তার সাথে হিজরতের ১৭ মাস পরে ঘটনাটি ঘটে বলে উল্লিখিত হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, যারা দৃঢ়তার সাথে ১৬ মাস পরে বলেন, তারা মদীনায় আগমন ও পরিবর্তনের দু'মাসকে এক মাস গণ্য করে অবশিষ্ট দিনগুলোকে গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন। আর যারা ১৭ মাস বলেছেন, তারা উভয় মাসকে পূর্ণ এক একমাস হিসেবে গণ্য করেছেন। আর যারা সন্দেহের সাথে বর্ণনা করেছেন, তারা দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের শিকার হয়েছেন। কারণ, মদীনায় নবীজীর আগমন সর্বসম্মতিক্রমে রবিউল আওয়াল মাসে হয়। আর বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী কেবলা পরিবর্তনের বিধান আসে দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে। এটাই জমহুরে (সর্ববাদী) উলামার অভিমত।

(৩) মক্কী জীবনে রসূল (স.)-এর কেবলা ঃ এ প্রসঙ্গেও মতবিরোধ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাসের (রযি.) উক্তি হলো, প্রথম থেকেই বায়তুল মুকাদ্দাস কেবলা ছিল, যা হিজরতের পরেও ১৬/১৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকে। মক্কী জীবনে রসূল (স.)-এর রীতি ছিল যে, তিনি হাজরে আসওয়াদ এবং রুকনে ইয়ামানীর মধ্যখানে নামায পড়তেন। যাতে বাইতুল্লাহও সম্মুখপানে থাকে এবং বাইতুল মুকাদ্দাস কেবলাও ঠিক থাকে। (ইবনে কাছীর)

বুখারী ২য় খণ্ডের ৬৪৪ পৃষ্ঠার পার্শ্বটিকায় আছে যে, এ উক্তিটি অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, তখন দুইবার 'নস্খ' মানা লাগে না।

পক্ষান্তরে অন্যান্য হযরত বলেন, নবীজীর প্রাথমিক কেবলা বাইতুল্লাহ ছিল। যতদিন তিনি মক্কায় থাকেন ততদিন বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়তেন। তাফসীরে কুরতুবীতে এ অভিমতকে দু'উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতম আখ্যা দেয়া হয়েছে।

(৪) একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ এখানে এ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না যে, মাত্র এক ব্যক্তির সাক্ষ্যেই মসজিদের লোকজন কিভাবে কেবলা থেকে ঘুরে গেল? অথচ তাদের কাছে বর্তমান কেবলাটি অকাট্যই ছিল। কারণ, ইমাম আবু বকর জাচ্ছাছ (রহ.) কেবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত একাধিক হাদীস উল্লেখ করে লিখেন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে এগুলো অত্যন্ত সহীহ ও প্রসিদ্ধ হাদীস। মুহাদ্দিসগণ

www.e-ilm.weebly.com

এ সমস্ত হাদীসকে গ্রহণ করেছেন। ফলে তা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। তথাপি কুবাবাসীদেরকে যেহেতু কেবলা পরিবর্তনের খবর আকস্মিকভাবে এক ব্যক্তি প্রদান করেছিল আর তা প্রসিদ্ধি বা ব্যাপক প্রচার হয় পরবর্তীতে, তাই আহনাফ এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, এ خَبَرِ وَاحِد স্রেফ خَبَرِ وَاحِد ছিল না; বরং তার সাথে খবরের সত্যতার অনেক পূর্ব আলামত বা সুদৃঢ় নিদর্শন ছিল। রসূল (স.)-এর আগ্রহ, আশা, দোয়া, আল্লাহর বাণী— قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ। অর্থাৎ আকাশপানে তোমার বারবার দৃষ্টিপাত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রভৃতি সুদৃঢ় নমুনা-নিদর্শন থেকে অনেক পূর্ব হতেই সাহাবাদের অন্তরে এ প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, কেবলা পরিবর্তনের হুকুম অত্যাসন্ন। সুতরাং (خَبَرِ وَاحِد) এ একক খবর যেহেতু স্রেফ এক ব্যক্তির খবরই ছিল না; বরং তার সাথে উপরোক্ত সুদৃঢ় নিদর্শনও ছিল, তাই এ ধরনের خَبَرِ وَاحِد এর দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়, যার দ্বারা نَسْخ বা রহিত করা জায়েয।

(৫) কেবলা পরিবর্তনের মধ্যে বহুবিধ কল্যাণ ও তাৎপর্য রয়েছে ঃ হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেন, নামায ইসলামের সবচে প্রসিদ্ধ ও নিকটতম شِعَارْ বা প্রতীক এবং নৈকট্য লাভের প্রধান উপায়। আর ধর্মীয় প্রতীকের প্রতি যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শন অপরিহার্য। তাই শরীয়তের দাবী হলো, নামাযী ব্যক্তি তার নামায আদায়ে এক সুনির্ধারিত দিক তথা কেবলামুখী হবে। এ একক কেন্দ্রিকতার ফলে নামাযীর মধ্যে স্থিরচিত্ততা, একাগ্রতা, বিনয়তা এবং পূর্ণ মনোনিবেশ ইত্যাদি অবস্থা সৃষ্টি হয়। আর এটাই হলো নামাযের মূল প্রাণ বা আত্মা।

'মা'আরেফুল কুরআন' প্রণেতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) বলেন, যদিও আল্লাহ পাকের স্বত্তা দিকমুক্ত, কিন্তু সমগ্র দুনিয়ায় অবস্থিত মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা ও ধর্মীয় ঐক্যের বাস্তব চিত্র তথা মহড়া প্রদর্শন করাই হলো একক কেবলা নির্ধারণের মৌলিক উদ্দেশ্য। অনন্তর রসূল (স.)-এর একান্ত ইচ্ছা ও আশাকে বাস্তবরূপ দিতে কা'বা শরীফকে কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র কেবলা হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হয়।

(৬) কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশকালীন অবস্থা ঃ কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ সাহাবাদের নামাযরত অবস্থাতেই আসে। সাহাবাগণ তখন জোহরের দু'রাকাত শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠছিলেন। আর এ ঘটনা বনূ সালামা গোত্রস্থ মসজিদে ঘটে। রসূল (স.) বিশর বিন বারারার ইন্তেকালহেতু তথায় গিয়েছিলেন। অবশ্য বারা বিন আযেবের বর্ণনা (বুখারী প্রথম খণ্ডের ঈমান পর্বে উল্লেখিত) হতে জানা যায় যে, ঠিক নামাযের অভ্যন্তরে নয়; বরং নামাযের বাইরে

www.e-ilm.weebly.com

থাকাকালে এ হুকুম আসে। এর জওয়াবে বলা হবে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কা'বার দিকে আদায় কত পূর্ণাঙ্গ নামায 'আসরের' অভ্যন্তরে এ হুকুম আসেনি; বরং তার আগে আসে।

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا ঃ এ আয়াতে কয়েকটি সম্ভাবনামূলক বিষয় রয়েছে।

(১) جَعْل শব্দটি একটি مَفْعُوْل-এর দিকে مُتَعَدِّى হবে তথা তা এক مَفْعُوْل দ্বারাই পূর্ণাঙ্গ হবে। এ অবস্থায় اَلَّتِى (اِسْم مَوْصُول) টা তার صِلَه-এর সাথে মিলে اَلْقِبْلَة-এর صِفَت হবে। আর اَلْقِبْلَة টা একটি উহ্য مُضَاف-এর مُضَافُ اِلَيْه হবে। ইবারত হবে ঃ مَا جَعَلْنَا تَحْوِيْلَ الْقِبْلَةِ الَّتِى كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ অর্থাৎ, একটি তথ্য প্রকাশ্যভাবে অবগত হতে আমি আপনার ইতঃপূর্বের কেবলাকে পরিবর্তন করেছি। সুতরাং এখানে قبلة দ্বারা উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাস।

(২) جَعْل টা দুই مَفْعُوْل-এর দিকে مُتَعَدِّى হবে বা তা পূর্ণ হবে দু' مَفْعُوْل-এর দ্বারা। আর দ্বিতীয় مَفْعُوْل টি উহ্য থাকবে। ইবারত হবে ঃ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا مَنْسُوْخَةً اِلَّا لِنَعْلَمَ অর্থাৎ একটি তথ্য জানতে আমি আপনার গৃহীত ইতঃপূর্বের কেবলা বাতিল করেছি।

(৩) এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, اَلْقِبْلَة শব্দটি প্রথম مَفْعُوْل হবে। অর্থ হবে 'দিক'। আর اَلَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا হবে তার দ্বিতীয় مَفْعُول তখন (اِسْم اَلَّتِىْ مَوْصُول) দ্বারা উদ্দেশ্য হবে বাইতুল মুকাদ্দাস। ইবারত হবে ঃ اِنَّ أَصْلَ أَمْرِكَ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَمَا جَعَلْنَا قِبْلَتَكَ فِىْ سَابِقِ الزَّمَانِ بَيْتَ الْمُقَدَّسِ اِلَّا لِنَعْلَمَ অর্থাৎ, আপনারপ্রতি প্রকৃত নির্দেশ হলো কেবলামুখী হওয়া। অতীতে বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমি আপনার কেবলা নির্ধারণ করেছিলাম একটি বিষয় জানতে।

(৪) এ আয়াতের তাফসীর وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ اِلَّا أَنَّ الْجِهَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْهِجْرَةِ اِلَى الْكَعْبَةِ অর্থাৎ আমি ঐ কা'বাকেই আবার আপনার কেবলা বানিয়েছি, যার উপর আপনি হিজরতের পূর্বে ছিলেন। এভাবে করার দ্বারা نَسْخ দু'দফায় হয়েছে মানা লাগে। এতদ্ব্যতীত এ ব্যাখ্যা কুরআনের আয়াত سَيَقُوْلُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا এর বাচনভঙ্গিরও বিরোধী। কারণ, এখানে اَلَّتِى (اِسْم مَوْصُول) দ্বারা বাইতুল মুকাদ্দাসই উদ্দেশ্য; অন্য কিছু নয়। (তাফসীরে মাজহারী)

www.e-ilm.weebly.com

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ ঃ এ আয়াতটি দু'কেবলা বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিতবহ। এ থেকে বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক সুপ্রতিভাত হয়।

قَدْ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ (গতকাল কুরআনের কিছু অংশ অবতীর্ণ হয়েছে) ঃ এখানে রূপকভাবে গতকালের কিছু অংশের উপর اللَّيْلَةَ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আর قُرْآنٌ শব্দটি নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট। কারণ, এখানে কুরআন দ্বারা কুরআনের কিছু অংশ উদ্দেশ্য। আর তা হলো قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, ইমাম বুখারী (রহ.) একাধিক অধ্যায়ে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রত্যেক অধ্যায়ে একই হাদীস উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য এ তথ্য জানানো যে, উপরোল্লিখিত সকল আয়াতই কেবলা পরিবর্তন বা রূপান্তর সংক্রান্ত ঘটনায় অবতারিত।

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ ঃ অর্থাৎ সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। দেউ-দেবতার কোন নিদর্শন নয়। সাফা অর্থ স্বচ্ছ-নির্মল। আর মারওয়া অর্থ সাদা কোমল পাথর। পূর্বে 'সাফা' এবং 'মারওয়া' মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দু'টি পাহাড় ছিল। বর্তমানে সাধারণ মাঠের মত পড়ে আছে। 'সাফা' হারাম শরীফের ডানে আর মারওয়া বাম পার্শ্বে অবস্থিত। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ১৫৪০ গজ।

شَعَائِر ঃ এটা شَعِيْرَةٌ-এর جَمْع বা বহুবচন। অর্থ, আলামত, নিদর্শন, সনাক্তি, চিহ্ন, ইউনিফর্ম (প্রতীক)। অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন বা প্রতীক। আর পরিভাষায় হজ্জের আহকাম উদ্দেশ্য। জাহেলী যুগে এ দু'পাহাড়ের মাথায় এক একটি দেবতার মূর্তি স্থাপিত ছিল। তাই সাফা-মারওয়ার সম্পর্ক পূর্বে যদিও খাঁটি একত্ববাদ ও তাওহীদবাদীদের (অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম, ইসমাঈল ও হাজেরা) দিকেই ছিল, তথাপি মুসলমানদের এ দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে গমনাগমনে শিরকের আশঙ্কা জাগে। ফলে আয়াত অবতরণের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ-সংশয়ের অবসান ঘটানো হয়। (মা'আরেফুল কুরআন)

কাজী সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.) তাঁর তাফসীরে মাজহারীতে বলেন, এ আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট হলো, সাফা পাহাড়ে 'আসাফ' ও মারওয়া পাহাড়ে 'নায়েলা' নামের দু'টি মূর্তি ছিল। জাহেলী যুগে লোকজন পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে তাওয়াফ করত এবং তার দ্বারা উপকৃত হতো।...অতঃপর যখন ইসলাম এসে মূর্তি চূর্ণ করল তখন মুসলমানরা সাফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ী করতে দ্বিধাবোধ করতে থাকে। অনুরূপভাবে ইসলামের পূর্বে আনসাররা মানাতের উপাসনা করত এবং তার উলূ দিত। তারাও সাফা ও মারওয়ার মাঝে তওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করত। অতঃপর তাঁরা রসূল (স.)-এর কাছে তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেন ঃ সাফা-মারওয়ার মাঝে তওয়াফ

www.e-ilm.weebly.com

করতে আমাদের বিবেকে বাঁধে। অনন্তর এ উভয় গ্রুপের সংশয় নিরসনকল্পে অবতীর্ণ হয় আলোচ্য আয়াত।

কাজী সাহেবের এ ব্যাখ্যা হতে হযরত আয়েশা ও হযরত আনাস বিন মালেক (রযি.)-এর উভয় বর্ণনার মাঝে চমৎকার সমাধান বের হয়ে আসে। কারণ, তারা বলেন, এ আয়াত আনসার ও গায়রে আনসার উভয়ের ব্যাপারে অবতারিত।

প্রকাশ থাকে যে, দৌড়ানোকে সায়ী বলে। সাফা ও মারওয়ার মাঝে প্রায় ৪৪০ গজ দৌড়িয়ে চলতে হয় বলে একে সায়ী বলা হয়।

'সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ানো' হানাফীদের মতে ওয়াজিব। ইমাম আহমাদের মতে সুন্নাত। আর শাফেয়ী ও মালেকীদের মতে ফরজ। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন, এ আয়াত 'সায়ী' মুবাহ হওয়ার প্রতি প্রমাণ বহন করে। সাথে সাথে রসূল (স.) ও সাহাবাদের আমল থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিধায় তা সুন্নতই হবে।

পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও মালেকীগণ রসূল (স.)-এর উক্তি ঃ اِسْعَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْىَ অর্থাৎ, 'তোমরা সায়ী কর। কারণ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি এ বিধান প্রদান করেছেন।' —এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

আর আহনাফ বলেন, আল্লাহর বাণী ঃ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ এ জাতীয় ভাষ্যের ব্যবহার কেবল মুবাহের জন্যই হয়। যার দ্বারা ফরজ হওয়াটা বাতিল হয়। তথাপি আমরা মুবাহ না বলে ওয়াজিব বলার কারণ হলো রসূল (স.) নিজে ও সাহাবীগণ এ কাজটি সর্বদা করেছেন। কারো সম্পর্কে জানা যায় না যে, তিনি তা বর্জন করেছেন। আর যেহেতু কোন বিধান ফরজ হতে অকাট্য দলীলের প্রয়োজন, যা এ প্রসঙ্গে অবর্তমান, তাই আমরা ফরজ বলি না। শুধু ওয়াজিব বলি।

আহনাফ শাফেয়ীদের পেশকৃত দলীলের জওয়াব দেন যে, كُتِبَ عَلَيْكُمْ শব্দটি যেরূপভাবে 'ফরজ' সাব্যস্ত করতে ব্যবহৃত হয়, তেমনি মুস্তাহাবের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন কুরআনের এক আয়াতে এসেছে ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি ওসিয়তের বিধান দেয়া হলো, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে।

অতএব এ হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। তদুপরি এটা একটি خَبَرِ وَاحِد মাত্র। আর خَبَرِ وَاحِد জাতীয় হাদীস দ্বারা হানাফীদের মতে ফরজ সাব্যস্ত হয় না।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ঃ অর্থাৎ, তোমাদের প্রতি হত্যার বদলা গ্রহণের বিধান প্রদত্ত হলো। এ বদলা গ্রহণে সমতার (বরাবরের) দিকেও

www.e-ilm.weebly.com

লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সমতার ক্ষেত্র নির্ধারণে ইমামদের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, হত্যা পন্থার ক্ষেত্রে সমতা-রীতি প্রযোজ্য হবে। সুতরাং যদি কেউ কাউকে পানিতে ডুবিয়ে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করে, তবে হত্যাকারীকেও ঠিক অনুরূপ শাস্তি দিয়ে হত্যা করতে হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফার মতে, সমতার প্রশ্ন কেবল রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর তা বিশেষ তরবারী দ্বারাই সম্পন্ন হবে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে ঃ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ অর্থাৎ, রক্তপণ (কিসাস) কেবল তলোয়ারের দ্বারাই হতে পারে।

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (স্বাধীনের বদলায় স্বাধীন আর গোলামের বদলায় গোলাম) ঃ আরবের দু'টি গোত্রের (আউস ও খাযরাজ) ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তাদের এক গোত্র অপর গোত্রের উপর নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও আভিজাত্যের কারণে শক্তি প্রয়োগ করত। দুর্বল প্রতিপক্ষের মহিলাদেরকে বিনা মোহরে জোরপূর্বক বিবাহ করে নিত। এতে যদি কোন দুর্বল (সাধারণ) ব্যক্তি কোন অভিজাত ব্যক্তিকে হত্যা করত, তবে তারা মহিলার বদলে পুরুষ, গোলামের বদলে আজাদ আর একজনের বদলে দু'জনকে হত্যা করত। তাই আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয় যে, বদলা গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রেণী ও সমতার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। (আইনী)

আহনাফের মতে, নিহতের বদলে নিহতকারীকে হত্যা করা হবে। চাই নিহত ব্যক্তি আজাদ হোক বা গোলাম, মহিলা হোক বা পুরুষ।

কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও মালেকের মতে, গোলামের বদলে আজাদ ও মহিলার বদলে পুরুষকে হত্যা করা জায়েয নেই। তারা এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।

আহনাফ বলেন, যদি গোলাম স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে অথবা স্বাধীন ব্যক্তি গোলামকে হত্যা করে আর কিসাস ওয়াজিব না হয়, অনুরূপ যদি কোন মহিলা পুরুষকে অথবা পুরুষ মহিলাকে হত্যা করে আর কিসাস ওয়াজিব না হয়, তবে কিসাসের দ্বারই রুদ্ধ হয়ে যাবে।

আহনাফ তাদের দাবীর স্বপক্ষে নিম্নোক্ত দলীল প্রদান করেন—

(১) আল্লাহর বাণী ঃ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ শব্দের ব্যাপকতার দিক লক্ষ্য করত তারা এ আয়াত দ্বারা দলীল দেন।

(২) রসূলের বাণী ঃ اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاءُهُمْ অর্থাৎ, রক্তের বদলা প্রশ্নে সকল মুসলমান বরাবর।

(৩) আল্লাহর অপর বাণী ঃ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى তোমাদের জন্য হত্যায় কিসাসের বিধান দেয়া হল। কারণ, এখানে اَلْقَتْلٰى বলতে ঐ নিহত

www.e-ilm.weebly.com

ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য, যাদেরকে স্বেচ্ছায় এবং অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি কারো ভুল বা অসতর্কতার শিকার হয়ে নিহত হয়, তবে এখানে নিহতকারীর উপর কোন কিসাস আসবে না; বরং এ ক্ষেত্রে দিয়াত তথা রক্তপণ ওয়াজিব হবে। কারণ, আল্লাহ বলেন, وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভুল বা অনিচ্ছাকৃত কাউকে হত্যা করে (তবে তার কিসাস নেই)।

(৪) আহনাফের দলীলে আকলী হলো, তারা বলেন, ন্যায় ও ইনসাফের দাবী এটাই যে, কিসাস হিসেবে কেবল হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে; অন্য কাউকে নয়।

আহনাফ শাফেয়ীদের প্রদত্ত আয়াতের জওয়াবে বলেন যে, সূরা বাকারার ঐ আয়াত সূরা মায়িদার এ আয়াত ঃ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ এর দ্বারা বাতিল।

দ্বিতীয় জওয়াব হলো, আলোচ্য আয়াত এ বিষয়ে প্রমাণ করে যে, আযাদ ব্যক্তিকে গোলামের বদলে আর গোলামকে আযাদের (স্বাধীনের) বদলে হত্যা করা হবে না। অনুরূপভাবে আয়াত এটাও প্রমাণ করে যে, মহিলার বদলে পুরুষ আর পুরুষের বদলে মহিলাকে হত্যা করা হবে না। কারণ এ ব্যাপারে আয়াত নিশ্চুপ। আর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতে দলীল হিসেবে مَفْهُوْم مُخَالِف তথা বিপরীত অর্থ মোটেই ধর্তব্য নয়। অনুরূপভাবে যারা বিপরীত অর্থ ধর্তব্য করেন, তাদের মতেও এ আয়াতের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ, তাদের মতে বিপরীত অর্থ কেবল তখনই ধর্তব্য হবে, যখন تَخْصِيْص-এর জন্য হুকুমের খাস হওয়ার থেকে অন্য আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অথচ এখানে বিপরীত অর্থ নিলে অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। আর তা হলো, এক নফস তথা ব্যক্তির উপর অন্য নফসের দীর্ঘায়ুতা। (মাজহারী[১])

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ (তোমাদের প্রতি রোযার বিধান দেয়া হল) ঃ রোযা ফরজের এ আয়াত দ্বিতীয় হিজরীর শা'বান মাসে অবতীর্ণ হয়।

তাফসীরে আহমাদীতে[২] আছে, রমযানের রোযা ফরযের বিধান একবারেই অবতীর্ণ হয়। লেখক বলেন, বছরে রোযা মাত্র একদিন ফরজ ছিল। আর তা হলো আশুরার দিন (১০ই মহররম)। অতঃপর প্রতি আরবী মাসের أَيَّامِ بِيْض এর তিন

টিকা ঃ (১) তাফসীরে মাজহারী ঃ আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানীপথী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। তিনি ১১৪৩ হিজরীতে জন্ম এবং ১২২৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(২) তাফসীরে আহমাদী ঃ আল্লামা শায়েখ আহমাদ মোল্লা জিউন (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। তিনি ১১৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

www.e-ilm.weebly.com

দিন (১৩, ১৪,১৫ তারিখ)। অতঃপর أَيَّامِ بِيض এর রোযা ফরযের বিধান বাতিল করে রমযানের রোযা ফরয করা হয়। তাও রোযাদারের ইখতিয়ারের সাথে। চাইলে সে রোযা রাখতেও পারে আবার না রেখে ফিদিয়াও (বিনিময়) দিতে পারে। আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে বলেন, وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ অর্থাৎ, যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তারা ফিদিয়া দিবে তথা একজন ফকীরকে দু'বেলা খানা খাওয়াবে। অতঃপর আল্লাহ খানা খাওয়ানোর তুলনায় রোযা রাখাকে কল্যাণকর বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ইরশাদ করেন ঃ وَأَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোযা রাখাই তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর। অতঃপর পূর্ব প্রদত্ত ইখতিয়ারকে বাতিল করে রাতসহ দিনে রোযা রাখার বিধান প্রবর্তন করেন। তখন মানুষ সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর হতে ইশার নামায পর্যন্ত ইফতার করতো। আর ইশার পর হতে আগামী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকত। অতঃপর আল্লাহর বাণী ঃ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ تَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَكُمْ (অর্থাৎ, আল্লাহ জানেন, তোমরা নিজেদের আত্মাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না) এর দ্বারা রাতের রোযা বাতিল হয়ে যায় এবং সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার স্থায়ী বিধান চূড়ান্ত রূপ পায়।

كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ (যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি) ঃ (১) জমহুরে উলামার মতে, পদ্ধতি, সময় ইত্যাদি সর্ব পর্যায়ে এ সাদৃশ্য প্রযোজ্য নয়; বরং শুধু 'ফরজের' ক্ষেত্রে এ সাদৃশ্য প্রযোজ্য।

(৩) কারো মতে এ তুলনা দিনের সংখ্যার ক্ষেত্রে। যেমন এক বর্ণনায় আছে যে, খ্রীস্টানদের উপর রমযানের রোযা ফরয করা হলে তা প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে পড়ে। এতে তারা রমযানকে বসন্তের মাসে বদল করে নেয় এবং এ বদলের কাফফারা (দণ্ড) স্বরূপ অতিরিক্ত ১০টি রোযা বৃদ্ধি করে নেয়। কারো মতে, তাদের পশু-প্রাণী রোগ কবলিত হওয়ার কারণে তারা এ দশ রোযা বৃদ্ধি করে নেয়।

كَانَ عَاشُوْرَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ (রমযানের পূর্বে আশুরার রোযা রাখা হত) ঃ এ হাদীস থেকে ফকীহগণ এবং আহনাফ প্রমাণ পেশ করেন যে, রমযানের রোযা ফরজ হবার পূর্বে আশুরার রোযা ফরজ ছিল।

পক্ষান্তরে শাফেয়ী ও হানাবেলারা বলেন, আশুরার রোযা ফরজ ছিল না। আর তা রমযানের রোযার দ্বারা রহিতও হয়নি। তাদের দলীল হলো ঃ

قَالَ مُعَاوِيَةُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هٰذَا يَوْمُ عَاشُوْرَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ ـ

www.e-ilm.weebly.com

অর্থাৎ, হযরত মুয়াবিয়া (রযি.) বলেন, আমি নবীকে (স.) বলতে শুনেছি যে, এটা আশুরার দিন। এ দিনের রোযা তোমাদের প্রতি ফরজ করা হয়নি।

আল্লামা ইবনে হুমাম এর জওয়াবে বলেন, মুয়াবিয়ার এ হাদীসটি আশুরার রোযা ফরজের পরিপন্থী নয়। কারণ, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর মুসলমান হন। ফলে যদি তিনি ইসলাম গ্রহণের পর এ হাদীসটি শুনে থাকেন, তবে নিশ্চিত যে, তিনি তা শুনেছেন হিজরতের নবম বা দশম বছর। অথচ এর বহু পূর্বে তথা হিজরতের দ্বিতীয় বছরে রমযানের রোযার দ্বারা আশুরার রোযার 'ফরয' বিধান বাতিল বা রহিত হয়ে যায়।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ঃ আল্লামা বগভী (রহ.) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পরিলক্ষিত। অধিকাংশের মত, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে রোযা রাখা এবং রোযার বদলে ফিদিয়া প্রদানের মধ্যে বান্দার ইখতিয়ার ছিল। পরবর্তীতে এ অধিকার কুরআনের আয়াত ঃ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-এর দ্বারা রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অপর একদল বলেন, এ আয়াত রহিত হয়নি; বরং তা আজও বহাল তবিয়তে রয়েছে। তাদের দাবী উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ঃ

(১) যারা যুবক বয়সে রোযা রাখার সামর্থ্য রাখত, কিন্তু এখন বৃদ্ধজনিত কারণে অপারগ হয়ে পড়েছে, তারা এক একটি রোযার বদলে একজন করে গরীবকে দু'বেলা আহার করাবে। তবে কুরআনের বাকভঙ্গি এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে না।

(২) কোন কোন আলেম 'গরীবের আহার প্রদান' দ্বারা সদকায়ে ফিতর উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ, যারা ফিদিয়া দিতে সামর্থ্য রাখে, তারা একজন গরীবকে দু'বেলা আহারের পরিমাণ সদকা প্রদান করবে। শরীয়ত এর পরিমাণ নির্ধারণ করেছে অর্ধ 'সা' (১,৫৭৫ গ্রাম) *গম বা এক 'সা' (৩,১৫০ গ্রাম) যব। (আল্লামা সুয়ূতী لايطيقون-এর لام-কে 'পরিমাণ নির্দেশক' মেনে এ ব্যাখ্যা করেন।) এ ব্যাখ্যাও সন্তোষজনক বা প্রশ্নাতীত নয়। কারণ তা প্রকাশ্য ভাষ্যের বিরোধী।

(৩) আবার কারো মতে, إِفْعَال-এর হামজাটা سَلْب তথা অপসারণের জন্য এসেছে (অর্থাৎ, يُطِيْقُوْن শব্দটা بَاب إِفْعَال থেকে ব্যবহৃত হওয়ায় তার মধ্যে 'শক্তি-সামর্থ্যের' যে ধাতুগত অর্থ ছিল, তা অপসারিত হয়ে এখন তা অক্ষম

---

*এ হিসাবটা দিনার অনুযায়ী প্রদত্ত। পক্ষান্তরে যদি দেহরাম অনুযায়ী হিসাব করা হয়, তবে অর্ধ সা সমান ১,৫৯২ গ্রাম হবে, আর মুদ অনুযায়ী হবে (অর্ধ সা) ১,৬৩৬ গ্রাম। যেহেতু এ শেষোক্ত অঙ্কটা পরিমাপে বেশি হয়, তাই এ পরিমাণ প্রদানকেই উলামায়ে কেরাম শ্রেয় বলে উল্লেখ করেছেন। আর বাংলা পরিমাপ হিসেবে অর্ধ সা হয় ১ সের সাড়ে বার ছটাক। ॥অনুবাদক

www.e-ilm.weebly.com

শক্তিহীনের অর্থবহ হয়েছে)। এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও শাফেয়ীর (রহ.) বিশুদ্ধতম উক্তি মোতাবেক অতিশয় বৃদ্ধের উপর রোযার বদলে ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব। এখন যদি এ আয়াত রহিত মেনে নেয়া হয় (যেমন, অধিকাংশের মতে) তবে এর দ্বারা ফিদিয়া ওয়াজিবের উপর প্রমাণ পেশ কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর কাজী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) তাঁর তাফসীরে মাজহারীতে প্রদান করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক সময়ে আয়াতের হুকুমটা প্রকাশ্য ভাষ্যের (عِبَارَةُ النَّصِّ) দ্বারা সামর্থ্যবানদের ক্ষেত্রে আর ভাষ্যের অন্তর্নিহিত অর্থের (دَلَالَةُ النَّصِّ) দ্বারা প্রথমেই সামর্থ্যহীনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। কারণ আল্লাহ পাক যখন অনুগ্রহপূর্বক সামর্থ্যবানদের ইখতিয়ার দিলেন তখন তা সামর্থ্যহীনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত ও কাম্য। অতঃপর যখন কুরআনের আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ অবতীর্ণ হয়, তখন বর্তমানে যারা রোযা রাখায় সক্ষম, তাদের বেলায় ফিদিয়ার হুকুমটি রহিত হয়ে যায় এবং রহিত হয় তাদের ক্ষেত্রেও যারা ভবিষ্যতে রোযা রাখতে সক্ষম। আর তারা হলো (১) অসুস্থ ও (২) মুসাফিরগণ। দালালাতে নসের দ্বারা সাব্যস্ত ফিদিয়া প্রদান জায়েজের হুকুম কেবল বলবৎ থাকে তাদের জন্য, যারা বর্তমান ও ভবিষ্যতে রোযা রাখতে সক্ষম নয়। কারণ, তারা আল্লাহর নির্দেশ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ-এর অন্তর্গত নয়। সুতরাং عِبَارَةُ النَّصِّ-এর দ্বারা কোন হুকুমের বাতিল (রহিত) হওয়াটা دَلَالَةُ النَّصِّ-র দ্বারা সাব্যস্তকৃত হুকুম রহিত হওয়াকে দাবী করে না।

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ঃ 'তাকওয়া' আত্মার ঐ বিশেষ অবস্থার নাম, যার দ্বারা আত্মা (নফস্) মানুষের আভ্যন্তরীণ, শারীরিক, আত্মিক ও চারিত্রিক অনিষ্ট থেকে মুক্ত ও পূত-পবিত্র এবং নিরাপদ থাকতে পারে।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (অসুস্থ ও মুসাফির-পর্যটকগণ রমযান বাদে অন্য সময়ে রোযা রাখবে) ঃ কোন্ ধরনের অসুস্থতাহেতু রোযা না রাখা জায়েয, এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম থেকে তিন ধরনের অভিমত রয়েছে। (১) রোগ যেমনই হোক এবং মুসাফিরও যেমন হোক সবার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি বা সুযোগ রয়েছে। এটা মুতলাক শব্দের সীমিত অর্থ। হযরত হাসান ও ইবনে সিরীনের অভিমত এটাই। বর্ণিত আছে যে, রমযান মাসে একদল লোক ইবনে সীরীনের[১] কাছে এসে দেখেন যে, তিনি আহার করছেন। তারা এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি বলেন, আঙ্গুলে খুব ব্যথা।

টিকা ঃ ১. হযরত ইবনে সিরীন (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(২) কেবল ঐ অসুস্থ ও মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, যারা রোযা রাখলে কষ্ট বৃদ্ধির আশঙ্কা করে। এটা মুতলাক শব্দের সর্বোচ্চ ও ব্যাপক অর্থ। হয়তর আছমের (রযি.) অভিমত এটাই।

(৩) কেবলমাত্র ঐ রোগীর জন্য রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, যার রোযা রাখলে আত্মার ক্ষতি অথবা রোগ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তি। কেননা, যদি এ অবস্থায় সে রোযা রাখে তবে জ্বর বৃদ্ধি পাবার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। অধিকাংশ ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত এটাই।

[قوله] إِنَّ وِسَادَتَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ و إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْقَفَا (তোমার বালিশ তো তবে চওড়া এবং তোমার ঘাড়ও চওড়া বেশ)

যেহেতু আয়াতোক্ত الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْخَيْطُ الْأَسْوَدُ-এর দ্বারা প্রভাত প্রকাশকালীন সময়ের সাদা সুতা (রেখা) ও কালো সুতা (রেখা) উদ্দেশ্য; আদী বিন হাতেম যা বোঝেন তা নয়, তাই রসূল (স.) বলেন যে, যদি ঐ দু' সুতা তোমার বালিশের নীচে হতে পারত, তবে তো তোমার বালিশের চেয়ে অন্য কোন বস্তু চওড়া ও লম্বা হতো না; বরং সে বালিশই সবচে বেশি চওড়া ও লম্বা হত। অনুরূপভাবে তোমার ঘাড়ও। কারণ, যে বালিশ বেশি চওড়া হবে, তার জন্য উপযোগী ঘাড়ও নিশ্চয় অনেক চওড়া হবে। এ থেকে জানা যায় যে, আয়াতে যে দু'সুতার কথা উল্লেখ হয়েছে, তা বালিশের নীচে রাখার যোগ্য (সম্ভাব্য) নয়। অথচ আদী বিন হাতেম আয়াতের বাহ্যিক অর্থ হতে তা যোগ্য বলে বুঝেন। (বরং এ দু'সুতা দ্বারা আয়াতে প্রভাতকালীন সময়ের (পূর্বাকাশে প্রকাশমান) সাদা ও কালো রেখার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।)

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَجْرِ (অতঃপর আল্লাহ পরে مِنَ الْفَجْرِ শব্দটুকু অবতীর্ণ করেন)

بَيَاضُ النَّهَارِ (দিনের সাদা রেখা) ও سَوَادُ اللَّيْلِ (রাতের কালো রেখা) এর অর্থে خَيْطُ الْأَبْيَضِ এবং خَيْطُ الْأَسْوَدِ -র ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও তা প্রকাশ্য অর্থবহ ছিল বিধায় এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হবে না যে, উপরোক্ত বর্ণনা হতে জানা যায় যে, مِنَ الْفَجْرِ-এর অবতরণ পরবর্তীতে হয়। যা تَاخِيْرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ তথা "প্রয়োজনের পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যা প্রদান"-এর অন্তর্গত হওয়ায় নাজায়েয! কারণ, এটা প্রকৃতার্থে ব্যাখ্যা প্রদান হেতু অবতারিত নয়; বরং এ দু'শব্দের অর্থ প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যখন কোন কোন (স্বল্পবুঝসম্পন্ন) লোকের কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়, তখন কেবল তাদের বুঝের স্বল্পতার প্রতি লক্ষ্য করতঃ পরবর্তীতে সতর্কতামূলক مِنَ الْفَجْرِ শব্দটুকুর অবতরণ হয় (যাতে এ বিষয়ে আর কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।)

www.e-ilm.weebly.com

قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ (এক ব্যক্তি তার রায় অনুযায়ী যা ইচ্ছা বলেছেন) ঃ হযরত ইমরান বিন হুসাইন কর্তৃক এ মন্তব্যের কারণ হলো, সাহাবাদের (রযি.) সাধারণ নীতি ছিল যে, যখন তাঁরা রসূল (স.)-কে কোন কথা বলতে শুনতেন অথবা কোন কাজ করতে দেখতেন, সঙ্গে সঙ্গে সে অনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হতেন এবং তার উপর দৃঢ় অবিচল থাকতেন। তাই যখন হযরত ইমরান (রযি.) হযরত উমর ও উসমানকে (রযি.) নিষেধ করতে শুনেন, তখন তাঁদের সমালোচনায় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। হযরত উমর কিসের থেকে নিষেধ করতেন তা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। কতিপয় বর্ণনা হতে জানা যায় যে, হযরত উমর (রযি.) فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ তথা উমরা আদায়ের মাধ্যমে হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা থেকে নিষেধ করতেন। এখানে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই। হাফেজ ইবনে হাজার তাঁর উক্তি দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ হযরত উমর (রযি.) উমরা আদায়কল্পে হজ্জের ইহরাম থেকে হালাল হতে মানুষকে নিষেধ করার ব্যাপারে প্রদত্ত জওয়াবের সারকথা হলো ঃ আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে হজ্জ পরিপূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করায় খোদ কুরানের আয়াতই এহেন হালাল হওয়া থেকে বাধা দানের প্রতি ইঙ্গিতবহ। সুতরাং হজ্জ সমাধা হওয়া নাগাদ ইহরাম চলতে থাকবে। তাই হযরত উমর (রযি.)ও হজ্ব সমাধা নাগাদ ইহরাম দীর্ঘ করার নির্দেশ দেন। তদুপরি রসূল (স.)-এর সুন্নাতও এ ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। কারণ, তিনি যথাস্থানে হাদী (কুরবানী জন্তু) পৌঁছানো পর্যন্ত হালাল হননি। তবে এর সঠিক জওয়াব রসূল (স.) নিজেই দিয়েছেন যে, আমার সাথে হাদী না থাকলে আমি হালাল হয়ে যেতাম। সুতরাং এ উক্তি প্রমাণ করে যে, যাদের সাথে হাদী থাকে না, তাদের জন্য হালাল হওয়া জায়েয। আর এ প্রসঙ্গে হযরত উমর (রযি.) হতে আগত সকল তথ্য ও রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে ফলাফল এটাই বের হয় যে, তিনি মূলত মানুষের মাঝে فَسْخُ الْحَجِّ اِلَى الْعُمْرَةِ -এর প্রতি যে সীমাহীন ঝোঁক ও প্রবণতা দেখেন, তা (সাময়িকভাবে) বন্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন মাত্র।

আল্লামা কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো, হযরত উমর (রযি.) উমরার জন্য হজ্ব ভঙ্গ করতে নিষেধ করতেন। আর এ জন্য তিনি মানুষের প্রতি লাঠিচার্জও করতেন। হজ্জ ভঙ্গের বিষয়টি কেবল সেই বছরের জন্যই ছিল— এ বক্তব্যের প্রবক্তা হিসেবেই ইমাম মুসলিম (রহ.) আলোচ্য হাদীসটি এখানে বর্ণনা করেছেন।

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে বলেন, হযরত উমর (রযি.)-এর বক্তব্যের সারকথা হলো, শরীয়তের দলীল হয়ত কুরআন নতুবা হাদীস। আর উভয়টাই হজ্জ ভঙ্গের বিরোধী। আর হজ্জ ভঙ্গ করা জায়েয হওয়া এবং

www.e-ilm.weebly.com

তা নবীজীর নির্দেশ মতে সাহাবাদের থেকে বাস্তবায়িত হওয়াটা ছিল একটি বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে। আর তা সে বছরের জন্যই একটি সাময়িক বিধান ছিল মাত্র। ফলে এর কার্যকারিতা পরে আর বহাল থাকবে না। হযরত আবু মূসা (রযি.) হজ্জ ভঙ্গ জায়েযের ফতোয়া দিলে হযরত উমর (রযি.) তা খণ্ডন ও প্রত্যাখ্যান করেন।

আর কতিপয় বর্ণনা মতে প্রকাশ যে, হযরত উমর (রযি.) হজ্জের মাসসমূহে একেবারেই উমরা আদায় করতে নিষেধ করতেন। যেমন, আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, বাস্তব কথা হলো, হযরত উমর (রযি.) হজ্জের মাসে বহুল প্রচলিত তামাত্তু ও সেই বছরেই অপর হজ্জ পালন করতে নিষেধ করতেন। আর এ নিষেধাজ্ঞাটা বিশেষ জোরালো ছিল না; বরং তা হজ্জে ইফরাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য ছিল মাত্র। অতঃপর কোন প্রকার কারাহাত ছাড়াই 'তামাত্তু' জায়েয হবার ব্যাপারে ইজমা হয়ে গেছে। তবে أَفْضَل তথা অত্যুত্তম নিরূপণে মতভেদ রয়েছে।

আইনী গ্রন্থে আছে, হযরত উমর (রযি.) কর্তৃক তামাত্তু পালনকে অপছন্দ করার হেতু হলো, তিনি মনে করেন যে, যদি ব্যাপকভাবে এ সুযোগ দেয়া হয়, তবে মানুষ স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, এরপর মাথা বেয়ে পানি ঝরা অবস্থায় হজ্জের কার্য শুরু করবে। তিনি চান হাজীদেরকে সম্ভাব্য সকল প্রকার تَرَفُّث (স্ত্রীমিলন ইত্যাদি) হতে বিরত রাখতে। তাই তিনি স্ত্রীদের সাথে মিলিত হওয়ার সম্ভাব্য সম্ভাবনাকে মাকরূহ প্রতিপন্ন করেছেন, যাতে মানুষের মন এদিকে ধাবিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

আল্লামা সিন্ধী (রহ.) আরেকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যার সারকথা হলো, হযরত উমর (রযি.)-এর মতে এভাবে উমরা আদায় করা কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী। তিনি বলেন, হযরত উমর (রযি.) وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (যা اِتِمُّوا আয়াতে বর্ণিত)-এর অর্থের ব্যাপারে মনে করেন যে, এখানে হজ্জ ও উমরা প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন সফরে আদায় করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফলে তিনি এ নিজ অভিমত ও দাবীর সমর্থনে এ আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন এবং হাদীসও এভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন যে, হাদীসে يَوْمِ نَحْر পর্যন্ত ইহরাম বাকী রাখতে বলা হয়েছে। অথচ তামাত্তু করতে গেলে এর পূর্বেই হালাল হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব এদিক দিয়ে তামাত্তুটা হাদীসের পরিপন্থী হলো। আর তিনি সাহাবাগণ কর্তৃক তামাত্তু পালনের জবাবে বলেন, এটা কেবল রসূল (স.)-এর সম্মানার্থে তাঁর সাথে সে বছর যারা ছিলেন কেবল তাঁদের সাথে খাস। নতুবা ঐরূপ না করাই ছিল আসল। যেমন তা আলোচ্য আয়াতের দাবীও বটে। يَوْمُ النَّحْرِ বা কুরবানীর দিন পর্যন্ত ইহরাম বাকী রাখার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থা এটাই। আর

www.e-ilm.weebly.com

হযরত উসমান (রযি.) কেবল হযরত উমর (রযি.)-এর অনুকরণার্থে নিষেধ করতেন। আল্লামা বগভী (রহ.) বলেন, হযরত উসমান (রযি.) পরবর্তীতে তাঁর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। (লামিউদ্ দারারী ২য় খণ্ড পৃ. ১৯০, ৯১ ও ৯৪)

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ (সবাই যে স্থান হয়ে ফেরে তোমরাও সে স্থান হয়ে ফের)

জমহুরের মতে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কারণ, তারা অন্যান্য আরবদের ন্যায় আরাফায় গিয়ে অবস্থান করত না; বরং নিজেদেরকে আল্লাহর অতি প্রিয় ও নিকটতম মনে করে মুজদালিফায় থেকে যেত। হারামের সীমানার (বাউন্ডারীর) বাইরে যেত না। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে বলেন যে, যেরূপভাবে অন্যান্য লোক আরাফা হয়ে ফেরে, তদ্রূপ তোমরাও আরাফা হয়ে ফিরবে।

আর কেউ কেউ আলোচ্য আয়াতের এ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন যে, আরাফা হতে ফিরে তোমরা মুজদালিফা হয়ে মিনায় যাও, যেখানে অন্যান্য লোকেরাও যায়। এ ব্যাখ্যানুপাতে সম্বোধনটা হবে সকল মুসলমানের প্রতি।

এ অধ্যায়ে দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, একটি হযরত আয়েশা (রযি.) থেকে। এ হাদীস হতে জানা যায় যে, আয়াতে উল্লিখিত প্রত্যাবর্তন বলতে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন উদ্দেশ্য। আর দ্বিতীয় হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত। যা এসেছেই মূলত "মুজদালিফা হতে প্রত্যাবর্তন" বুঝাতে। আল্লামা কিরমানী (রহ.) দ্বৈতমুখী এ বর্ণনার জওয়াবে বলেন, হযরত আয়েশার বর্ণনায় উদ্ধৃত মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্য কুরাইশ ব্যতীত অন্যান্য লোক। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এর বর্ণনায় কেবল কুরাইশগণই উদ্দেশ্য।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى إِذَا اسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا خَفِيفَةً ঃ

সূরা ইউসুফের আয়াতে উল্লিখিত قَدْ كُذِبُوا শব্দটি দু'ভাবে পড়া যেতে পারে। (১) তাশদীদবিহীন (অর্থাৎ, كُذِبُوا) আর এটাই প্রসিদ্ধ কিরাত। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ কিরাতই অবলম্বন করেছেন। (২) তাশদীদযুক্ত (অর্থাৎ, كُذِّبُوا) হযরত আয়েশা (রযি.) এ কিরাত অবলম্বন করেছেন।

প্রথম কিরাত অনুপাতে আয়াতের উদ্দেশ্য হবে, যখন পূর্ববর্তী উম্মাতদের অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি তাদের গ্রাস করল না, তখন নবীগণ কাফেরদের প্রতি আজাব আসার ব্যাপারে নিজের ধারণা ও পক্ষ হতে যে চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেন, সে সময়ের মধ্যে তাদের প্রতি আজাব আগমন ও সত্যের বিজয় প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যান এবং এতে তাঁদের প্রবল ধারণা জন্মে যে, খোদায়ী শাস্তির সময়সীমা বেঁধে দেয়ার ব্যাপারে আমাদের যুক্তি ও ধারণায় বিরাট ভুল

www.e-ilm.weebly.com

হয়েছে।ঠিক এমতাবস্থায় তাঁরা আমার (আল্লাহর) পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে। ফলে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী কাফেরদের প্রতি শাস্তি নেমে আসে এবং এভাবে সত্যের বিজয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

মা'আরেফুল কুরআন প্রণেতা বলেন, এ অর্থ গ্রহণ করলে কোন প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না। আয়াতের এ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। এটাই সর্বশেষ বিশ্লেষণধর্মী তথ্য। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে ظَنُّوْا أَنَّهُمْ كُذِبُوْا-এর ضَمِيْر টা اَلرُّسُل-এর দিকে ফিরবে। আর كِذْب এর অর্থ হবে 'ধারণা ভুল হওয়া'।

প্রকাশ থাকে যে, 'ধারণা ভুল' হওয়া এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রম। আর নবীগণ হতে ইজতেহাদী ভুল প্রকাশ পেতে পারে। অবশ্য আম্বিয়া ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে প্রভেদ হলো, নবীগণকে আল্লাহ্ ভুলের উপর অটল-অবিচল রাখেন না; তাঁদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে প্রকৃত ব্যাপারটি জানিয়ে দেন। তবে অন্যান্য মুজতাহিদদের বেলায় এমনটি হয় না। হুদায়বিয়া সন্ধির ঘটনা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। রসূল (স.) যে স্বপ্ন দেখেন তা নিশ্চিত ও বাস্তব ছিল। কিন্তু তার জন্য তিনি নিজের ধারণা মোতাবেক যে সময়সীমা নির্ধারণ করেন, তাতে ভুল হয়ে যায়। তবে এ ভ্রান্তির অবসানও (আল্লাহর পক্ষ হতে) তাৎক্ষণিক হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কিরাত অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে, নবীগণ ধারণা করে যে সময় বেঁধে দেন, নির্দিষ্ট সে সময়ে আজাব না আসায় তাঁদের এ আশঙ্কা হয় যে, বর্তমানে যারা মুসলমান আছে এবার তারাও আমাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে যে, "আমরা যা বলেছি তা কার্যকর হয়নি"। নবীদের এহেন নিরাশ অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করে দেখান। অস্বীকারকারীদের প্রতি আজাব আসে আর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। আর এভাবেই বিশ্বাসীদের সফলতা ও বিজয়ের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। (মা'আরেফুল কুরআন)

ذَهَبَ بِهَا هُنَالِكَ : অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) সূরা বাকারার আয়াত অবলম্বন করেছেন। উদ্দেশ্য হলো তিনি সূরা ইউসুফের উপরোক্ত আয়াতের যে মতলব বুঝেছেন, হুবহু এ মতলব সূরা বাকারার এ আয়াত : حَتّٰى الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ হতে বুঝেছেন। কারণ, যেরূপভাবে সেখানে নিরাশ ও ব্যর্থ-মনোরথ হওয়ার পর নবীগণ আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেছেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। ঠিক তদ্রূপ এখানেও চরম নিরাশ অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য লাভের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কেননা, مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ-এর মধ্যে জিজ্ঞাসাটা মূলত নিরাশা ও চরম উদ্বেগ প্রকাশ করতেই আগত।

قَالَتْ عَائِشَةُ مَعَاذَ اللّٰهِ : এ মন্তব্য হতে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রযি.) হযরত আব্বাসের উক্তি (অর্থাৎ, قَدْ كُذِبُوْا-এর মধ্যে تَخْفِيْف-এর

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাপারে) অস্বীকার করেছেন। অথচ তাশদীদবিহীন কিরাতও পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক (مُتَوَاتِرَة) ভাবে প্রমাণিত। আর উসূলে তাফসীরের প্রসিদ্ধ কিতাব 'ইতকান' গ্রন্থে এসেছে যে, মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত কিরাত অস্বীকার করা জায়েয নেই; বরং তা কুফরীর একটি উল্লেখযোগ্য কারণও বটে। তাহলে এমতাবস্থায় হযরত আয়েশা কর্তৃক ইবনে আব্বাসের কথা অস্বীকার করা কিভাবে জায়েয হলো?

এ প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর রয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো ঃ

(১) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রযি.) মুতাওয়াতির কেরাত অস্বীকার করেননি; বরং ইবনে আব্বাস (রযি.) আয়াতের যে ব্যাখ্যা পেশ করেন, তা অস্বীকার করেছেন মাত্র। (বুখারী পার্শ্বটিকা ৬৮০ পৃষ্ঠা)

(২) হতে পারে তাশদীদ বিহীন কিরাত অন্যদের কাছে মুত্তাওয়াতির হলেও হযরত আয়েশা (রযি.)-এর কাছে মুতাওয়াতির ছিল না। আর বাস্তবে এমনটি হতেও পারে। —ইতকান।

(৩) হতে পারে تَخْفِيْف (তাশদীদবিহীন)-এর কিরাত মুতাওয়াতির হওয়ার সংবাদ হযরত আয়েশা পর্যন্ত পৌছেনি। (অর্থাৎ, তিনি এটা জানতেন না।)
—বুখারীর পার্শ্বটিকা ৬৮০ পৃষ্ঠা।

(৪) তাশদীদবিহীন কিরাত অস্বীকারের পিছনে হযরত আয়েশার এ জবাব ছিল যে, এটা মেনে নিলে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দেয়। আর তা হলো, এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ হয়, রসূলগণের প্রবল ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা আল্লাহর তরফ হতে মিথ্যা প্রতিপন্ন হবেন। অথচ এ উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না। তাই এ সমস্যা এড়াতে তিনি এ ব্যাখ্যা করেন, যা বক্ষমান হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।

(৫) প্রকৃতপক্ষে تَخْفِيْف-এর কিরাতটা মুতাওয়াতির নয়; বরং উভয় কিরাতই সমানভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত। হযরত নাফে ইবনে কাসীর, হযরত আবু আমর এবং হযরত ইবনে আমের (রহ.) এর কিরাত হলো তাশদীদযুক্ত। আর হযরত আছেম, হামজা ও কাসায়ী (রহ.)-এর কিরাত হলো তাশদীদ বিহীন।
(বুখারীর পার্শ্বটিকা ৬৪৯ পৃষ্ঠা)

বিস্তারিত এ আলোচনা-পর্যালোচনা এবং মতামতের ভিত্তিতে সর্বশেষ যে তথ্য বের হয় তা হলো, আলোচ্য বিষয়ে হযরত আয়েশার প্রতি বিশেষ কোন অভিযোগ উত্থাপন করা যায় না।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ঃ এ অধ্যায়ে দু'টি আয়াত রয়েছে। প্রথম আয়াত হলো, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا অর্থাৎ, তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে, তখন ঐ

www.e-ilm.weebly.com

স্ত্রীদের ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষা (ধৈর্যধারণ) করা কর্তব্য (অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে)।

দ্বিতীয় আয়াত ঃ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা যেন স্ত্রীদের ঘর থেকে বের না করে এক বছর পর্যন্ত ভরণ-পোষণের ওসিয়ত করে যায়। অতঃপর যদি স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় চলে যায়, তবে তাতে তোমাদের উপর কোন পাপ নেই।

এ দু'আয়াতে মোট তিনটি বিষয় বিবৃত হয়েছে। (১) যে স্ত্রীর স্বামী মারা গেছে, তার ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। (২) ইদ্দত পালন অবস্থায় স্বামীর গৃহে অবস্থান করা ওয়াজিব ও (৩) ইদ্দত পালনের পর আরও সাত মাস বিশ দিন তথা পূর্ণ এক বছরের জন্য স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদান করতে স্বামীর ওসিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

জমহুরের মতে, জাহেলী যুগে মহিলাদের ইদ্দত পালনকালীন সময় ছিল এক বছরকাল। অতঃপর এ অবস্থাতেই ওসিয়াতের আয়াত অবতীর্ণ হয়। যার দরুন ইসলামের প্রাথমিক সময়েও ইদ্দতের সময় এক বছরকাল থাকে। অতঃপর تَرَبُّص-এর আয়াত অবতীর্ণ হলে ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন নির্ধারিত হয়। আর বাকী দিনগুলো তথা ৭ মাস ২০ দিন রহিত হয়ে যায়। ভরণ-পোষণের ব্যাপারে বিধান হলো, বিধবা মহিলার ভরণ-পোষণ প্রদান সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে سُكْنَه তথা অবস্থানের জন্য গৃহের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। যেমন, ইমাম নববী (রহ.) বলেন, لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا وُجُوْبُ السُّكْنٰى অর্থাৎ. বিধবা মহিলার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে ভরণ-পোষণ নেই। তবে আমাদের মাজহাব মতে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তার জন্য سُكْنٰى-এর ব্যবস্থা করা ওয়াজিব।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে রয়েছে, حَوْل-এর আয়াত تَرَبُّص-এর আয়াত দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তবে মৃত্যুজনিত পালনীয় ইদ্দতের অধীনে سُكْنٰى রয়ে গেছে; ভরণ-পোষণ নয়। অতঃপর যখন ইদ্দতের ক্ষেত্রে ৪ মাস ১০ দিনের আয়াত দ্বারা এক বছর কাল আয়াত রহিত হয়ে গেছে তখন سُكْنٰى ও রহিত হয়েছে।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, বিধবা মহিলা ইদ্দত পালনের জন্য স্বামীর মাল হতে ভরণ-পোষণের খরচা এবং বাসস্থানও পাবে না। চাই স্ত্রী গর্ভবতী হোক বা গর্ভমুক্ত। কারণ, স্বামী যখন মারা যান, তখন সম্পদের মালিক হন তার ওয়ারিশগণ। তাই এ ওয়ারিশদের মাল হতে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান ওয়াজিব হবে না।

www.e-ilm.weebly.com

শরহে বেকায়া[১] গ্রন্থে আছে ঃ اِنَّهَا تَعْتَدُّ فِىْ مَنْزِلِهَا وَقْتَ الْمَوْتِ অর্থাৎ, স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রী যে গৃহে বসবাস করত, সেখানে অবস্থান করত ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। (উমদাতুর রেআয়াহ[২])

যেহেতু ইদ্দত পালনকালে স্বামীর ওয়ারিশদের উপর তার ভরণ-পোষণ প্রদান ওয়াজিব নয় তাই সে তার জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে স্বামীগৃহ তথা ইদ্দত পালন গৃহ থেকে বের হতে পারে। তবে রাত যাপন অবশ্যই ইদ্দত পালন গৃহে করতে হবে। (শরহে বেকায়া)

হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.)-এর ছাত্র হযরত আতা[৩] ও মুজাহিদ[৪] (রহ.) বলেন, تَرَبُّص-এর আয়াত দ্বারা حَوْل-এর আয়াত প্রত্যাহার বা রহিত হয়নি। কেননা, এ আয়াত এক বছরকাল ইদ্দত পালন ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণবহ। যেমনটি জমহুর ধারণা করেন। সুতরাং تَرَبُّص-এর আয়াত দ্বারা حَوْل-এর আয়াত রহিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, حَوْل -র আয়াত শুধু এ কথা বুঝায় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর মৃত্যুর পর এক বছর পর্যন্ত তার ঘরে থাকতে চায়, তবে সে থাকতে পারে। তাকে সেখান হতে বের করে দেয়া হবে না।

(আল্লামা কস্তলানী কর্তৃক ইবনে কাছীর থেকে বর্ণিত)

আর হযরত আতা (রহ.)-এর বক্তব্যের সারমর্ম হলো, কুরআনের আয়াত غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَاِنْ خَرَجْنَ এটা দ্বিতীয় বিষয় অর্থাৎ, ইদ্দতের সময় এবং ওসিয়তের সময়ের মধ্যে বাসস্থান ওয়াজিবের বিষয়টি বাতিল বা রহিতকারী। যেমন, লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে, হযরত আতার মন্তব্যের সারমর্ম হলো, ওসিয়তের সময়সীমার মধ্যে স্ত্রীর জন্য ইখতিয়ার সাব্যস্ত হওয়ার দ্বারা স্বামী-পরিবারে ইদ্দত পালনের বাধ্যবাধকতা প্রথমে বাতিল হয়েছে। অতঃপর স্বামীর প্রতি স্ত্রীর জন্য ওসিয়ত এবং ইদ্দতের সময়সীমার মধ্যে স্বামী-পরিবারের উপর স্ত্রীর জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়েছে।

আর হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেন, কুরআনের আয়াত فَاِنْ خَرَجْنَ ইদ্দতের গোটা সময়টা স্বামীর গৃহে স্ত্রীর অবস্থানের ইখতিয়ার সম্পর্কীয়। ওসিয়তের সময়ের

টীকা ঃ ১. শরহে বেকায়া ঃ হযরত উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ (ছদরে শরীয়া আসগার) (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। মৃত্যু ঃ ৭৫০ হিঃ

২. উমদাতুর রেআয়াহ ঃ আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌ (রহ.) কৃর্তক প্রণীত। এটা শরহে বেকায়ার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা গ্রন্থ। ১৩০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩. হযরত আতা (রহ.), মৃত্যু ঃ ১১৪ হিজরী।

৪. হযরত মুজাহিদ (রহ.), মৃত্যু ঃ ১০৩ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ। তবে স্বাভাবিক এটাই যে, এ ক্ষেত্রেও তিনি ইখতিয়ারের প্রবক্তা, যদিও স্পষ্ট করে তিনি কিছু বলেননি। অতএব তাঁদের (আতা ও মুজাহিদ) শায়েখ ইবনে আব্বাস (রযি.)-এর মাজহাব বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের বক্তব্যের মাঝে মিল আছে বলে জানা গেল।

قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاثُ ঃ অর্থাৎ, মিরাসের আয়াতের দ্বারা ওসিয়াত ওয়াজিবের বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে। আর এটাই হলো আয়াতোক্ত তৃতীয় প্রসঙ্গ। সুতরাং স্ত্রী যেখানে ইচ্ছা ইদ্দত পালন করুক। তার জন্য বাসস্থানের কোন দায়-দায়িত্ব স্বামী পক্ষের নেই। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড পৃ. ১৮০-৮১)

فَذَكَرْتُ حَدِيْثَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ فِيْ شَانِ سَبِيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ ঃ এ হাদীসের আলোচ্য বিষয় হলো সুবাইয়ার প্রথম স্বামী সা'দ বিন খাওলার মৃত্যুর কয়েকদিন পর সুবাইয়ার গর্ভপাত হয়। এরপর আবুস্ সানাবীল তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। সুবাইয়া এ ব্যাপারে রসূল (স.)-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলে রসূল (স.) অনুমতি দেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, গর্ভবতী বিধবা মহিলার ইদ্দত হলো গর্ভপাত নাগাদ।

وَلٰكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ ঃ আব্দুল্লাহ বিন উতবার চাচা হলেন হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.)। আর এ উক্তিকারী হলেন হযরত আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা[১]। উদ্দেশ্য হলো, বিধবা মহিলার ইদ্দত ৪ মাস দশ দিন বলে আবুস সানাবিলের যে উক্তি সুবাইয়ার হাদীসে এসেছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.) তার প্রবক্তা নন; বরং তিনি أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ তথা বিধবার নির্ধারিত ইদ্দত ও গর্ভপাতের সময়ের মধ্যে যেটা বেশী দীর্ঘ হয় ইদ্দত হিসেবে তারই প্রবক্তা তিনি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উতবার চাচা ইবনে মাসউদ (রযি.) থেকে যদিও বিধবার ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন জানা যায় না তথাপি যখন হযরত আব্দুল্লাহ তা বর্ণনা করেন, তখন প্রমাণিত হয় যে, তা ইবনে মাসউদেরও উক্তি। কারণ, হযরত আব্দুল্লাহ তাঁরই ছাত্র।

তাই হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, হযরত ইবনে মাসউদ থেকে প্রসিদ্ধ আছে যে, ইবনে আবী লায়লা যা বর্ণনা করেছেন, তিনি তার বিপরীত বলতেন। অতঃপর হাফেজ সাহেব সমতা বিধান করতে গিয়ে বলেন, হতে পারে হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.) প্রথমে اَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ-এর পক্ষে ছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে অভিমত পরিবর্তন করেন। অথবা হতে পারে হযরত ইবনে মাসউদের অভিমত বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী হতে ভুল সংঘটিত হয়েছে। (ফতহুল বারী, আইনী, লামিউদ্ দারারী)

টিকা ঃ ১. হযরত ইবনে আবী লায়লা (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৪৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

فَقُلْتُ إِنِّى لَجَرِئٌ إِنْ كَذَبْتُ (আমি মিথ্যা বললেও এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি) ঃ যেহেতু ইবনে আবী লায়লার উক্তি এ দিকে ইঙ্গিত করে যে, ইবনে সিরীন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উতবা হতে যা বর্ণনা করেন-তা সঠিক নয়। সেজন্য তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

اَتَجْعَلُوْنَ عَلَيْهَا التَّغْلِيْظَ (তোমরা তার উপর অধিক বোঝা চাপিয়ে দিবে?) ঃ تَغْلِيْظ-এর অর্থ হলো, যদি ৪ মাস ১০ দিনের মধ্যে গর্ভপাত না হয়, তবে ইদ্দতকাল তার থেকে বেশি দিন নির্ধারণ করা।

وَلَا تَجْعَلُوْنَ لَهَا الرُّخْصَةَ (তোমরা তাকে মুক্তি দিবে না?) ঃ অর্থাৎ, যদি বিধবার নির্ধারিত ইদ্দত (৪ মাস ১০ দিন) হতে কম সময়ে যদি গর্ভবতী বিধবা মহিলার গর্ভপাত হয় তবে তোমরা ইদ্দত শেষ হবার স্বপক্ষে মত দিবে না?

لَنَزَلَتْ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرٰى بَعْدَ الطُّوْلٰى ঃ অর্থাৎ, সূরা বাকারার আয়াত, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا এটা সূরা তালাকের আয়াত ঃ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ-এর পূর্বে অবতীর্ণ হয়। তাই সূরা তালাকের আয়াতটা সূরা বাকারার এ আয়াতকে খাস তথা সীমিত অর্থবহ করেছে। অতএব বাকারার আয়াত প্রযোজ্য হবে গর্ভহীনদের ক্ষেত্রে আর তালাকের আয়াতটা প্রযোজ্য হবে গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে। এ ব্যাখ্যানুপাতে তাদের উক্তি খণ্ডন হয়ে যায়, যাদের ধারণা, ইবনে মাসঊদের মাজহাব হলো, যদি কোন গর্ভবতী মহিলার স্বামী মারা গিয়ে থাকে, তবে তার ইদ্দত হবে أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ (কস্তলানী প্রভৃতি)

বর্ণিত আছে, গর্ভবতী স্ত্রী রেখে স্বামী মারা গেলে হযরত আলী ও ইবনে আব্বাসের মতে ঐ স্ত্রীর ইদ্দতকাল হলো أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ। যদি সুবাইয়াতুল আসলামিয়ার হাদীস না থাকত, তবে আলোচ্য দু'আয়াতের মধ্যে সমন্বয় সাধনকল্পে এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হত। এ প্রসঙ্গে জমহুরের সর্ববাদী মাজহাব হলো, এ ধরনের মহিলার ইদ্দতকাল 'গর্ভপাত' পর্যন্ত। অর্থাৎ, গর্ভপাত হলেই তার ইদ্দত শেষ হয়ে যাবে।

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ أَىْ مُطِيْعِيْنَ (বিনীতভাবে তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও)ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, শিরোনামে قَانِتِيْنَ-এর ব্যাখ্যা লেখক مُطِيْعِيْنَ দ্বারা করেছেন। আর শিরোনামের অধীনে আগত বর্ণনায় فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ শব্দ এসেছে। যার দ্বারা হাদীসের সাথে শিরোনামের মিল সুস্পষ্ট হয় না।

www.e-ilm.weebly.com

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এ প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, আনুগত্যের চূড়ান্ত স্তর হলো, প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে বিরত থাকা, যা একাগ্রতার পরিপন্থী হয়। আর 'কথা' ঠিক এ ধরনেরই। সেহেতু 'নীরবতা অবলম্বন' আবশ্যক সাব্যস্তকারী বর্ণনা এখানে উল্লেখ করা সংগত হয়েছে এবং হাদীসের সাথে শিরোনামের প্রয়োজনীয় মিলও রয়েছে।

كُرْسِيُّهٗ عِلْمُهٗ ঃ অর্থাৎ, সিংহাসন বলে রূপকভাবে 'ইলম' উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে কোন সিংহাসনও নেই, আবার কেউ উপবিষ্টও নেই।

فَبُهِتَ ذَهَبَتْ حُجَّتُهٗ (সে 'থ' বনে গেল অর্থাৎ, তার দলীল ব্যর্থ হয়ে গেল) ঃ এ ব্যাখ্যায় এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলোচ্য শব্দটি তার প্রসিদ্ধ অর্থ হতভম্ব বা 'থ' অর্থে এখানে ব্যবহৃত নয়।

'জুমাল' গ্রন্থ প্রণেতা বলেন, "بُهِتَ" ফে'লটি ঐ সমস্ত فِعْل-এর অন্তর্গত, যা বাহ্যত مَجْهُوْل হলেও অর্থ দেয় مَعْرُوْف-এর। যা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পরবর্তী উক্তি অর্থাৎ, "اَلَّذِىْ كَفَرَ" শব্দটি بُهِتَ এর فَاعِل (কর্তা); نَائِب فَاعِل নয়। বস্তুত এ কারণেই জালালাইনের গ্রন্থকার এর ব্যাখ্যা تَحَيَّرَ এবং دُهِشَ (তথা হতভম্ব, থ) দ্বারা করেছেন।

فَاَمَرَنَا بِالسُّكُوْتِ (আমাদেরকে নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হল) ঃ এ ব্যাপারে ফোকাহায়ে কেরাম একমত যে, নামাযের মধ্যে কথা বলা হারাম জানা সত্ত্বেও কথা বললে নামায নষ্ট হয়ে যায়। অবশ্য তা নামায সংশোধন জাতীয় না হয়। আর যদি নামায সংশোধন জাতীয় হয়, তবুও প্রসিদ্ধ চার ইমামের মতে নামায ভেঙ্গে যাবে। তবে ইমাম আওযায়ী ও কতিপয় মালেকীর মতে নামায সংশোধন জাতীয় কথা বলা জায়েয। ইমাম আবু হানীফার মতে ভুলে কেউ কথা বললে তারও নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে এ রকম কথা ক্ষমাযোগ্য, যা হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, অথবা অসতর্কতাবশত হয়। অথবা নব মুসলিম হওয়ার দরুন এ সম্পর্কে (অর্থাৎ, নামাযের মধ্যে কথা বলা হারাম সম্পর্কে) না জেনে বলে ফেলে। (আইনী, কিরমানী)

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ ঃ এ শিরোনাম ডবল নয়। কারণ, প্রথম শিরোনামের দ্বারা উদ্দেশ্য; বিধবা স্ত্রীর ইদ্দত প্রভৃতি বর্ণনা করা। আর এ শিরোনামের উদ্দেশ্য হলো ঐ তথ্য প্রকাশ করা যে, যদি কোন আয়াতের তেলাওয়াত (পাঠ) রহিত না হয় (যদিও হুকুম রহিত হয়) তবে তাও কুরআনে অন্যান্য আয়াতের মত যথারীতি লেখা হয়।

نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ اِبْرَاهِيْمَ ঃ (ইব্রাহীমের তুলনায় সন্দেহ পোষণের অধিক হকদার আমরা) ঃ অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম

www.e-ilm.weebly.com

(আ.) যদি সংশয়গ্রস্ত হন, তবে তাঁর থেকে সংশয়ের অধিক হকদার আমি ছিলাম। অথচ তোমাদের ভাল করে জানা আছে যে, এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুতরাং ইব্রাহীমেরও (আ.) কোন সন্দেহ হয়নি। রসূল (স.) এ উক্তির মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আ.) কর্তৃক সন্দেহ পোষণের ব্যাপারটি নাকচ করে উল্টো তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِى (তবে কেবল আমার মনের সান্ত্বনার জন্য) ঃ হযরত ইব্রাহীমের এ উক্তিটি মূলতঃ নিশ্চিত জানা বিষয় চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে দিব্য-প্রত্যয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করার জন্য ছিল। কারণ, অধিক প্রমাণ অন্তরকে যেমন বেশি আশ্বস্ত করে তেমনি অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসও বৃদ্ধি করে।

فَغَضِبَ عُمَرُ رض (উমর রাগান্বিত হলেন) ঃ যেহেতু এ জিজ্ঞাসার দ্বারা হযরত উমর (রযি.)-এর উদ্দেশ্য ছিল এ আয়াতের ব্যাপারে তাদের অভিমত ও মন্তব্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। কিন্তু তাদের জওয়াব থেকে তিনি তা জানতে ব্যর্থ হন। ফলে তিনি রেগে যান।

ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِى الْخَمْرِ (অতঃপর নবীজী মাদক ব্যবসা হারাম করেন) ঃ আল্লামা আইনী বলেন, উলামায়ে কেরাম লিখেন যে, সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বহু পূর্বে মদ হারাম বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়। আর এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই যে, মদ হারামের সাথে সাথে তার ব্যবসাও হারাম হয়। তথাপি আবার এখানে তা উল্লেখের কারণ কি? উত্তর হলো, হতে পারে মদ হারাম ঘোষণার সময় তার ব্যবসা হারামের বিধান আসে নাই; বরং পরবর্তীতে আসে। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, মাদক ব্যবসার নিষেধাজ্ঞা বর্ণনার জন্য গুরুত্বারোপ হিসেবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা হতে পারে, হাদীসটি বর্ণনার সময় প্রথমে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল না তাদের অবগতির জন্য পুনরায় উল্লেখ করা হয়।

পরপর ৪টি সুদ বিষয়ক অধ্যায় অর্থাৎ, (١) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ (٢) بَابُ قَوْلِهِ تَعَالٰى يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰو (٣) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا (٤) وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ এ সকল শিরোনামে একই হাদীস উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (রহ.) এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, হাদীসে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সকল সুদ বিষয়ক আয়াত উদ্দেশ্য।

اِنْ تُبْدُوا مَا فِى أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوْهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْاٰيَةُ الَّتِى بَعْدَهَا ঃ এখানে পরবর্তী আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য কুরআনের অপর আয়াত لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الخ আর نَسْخٌ (রহিতকরণ) দ্বারা পরিভাষাগত نَسْخٌ উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তা আহকামের মধ্যে হয়। অথচ এখানে বিষয়টি আহকাম সংক্রান্ত

www.e-ilm.weebly.com

নয়। তাই এখানে نَسْخ দ্বারা تَخْفِيف (সহজ, হাল্কা করা) উদ্দেশ্য। মর্মার্থ হলো, হিসাব নেয়া হলেও ধর-পাকড় (সাজা) হবে না। (লামিউদ্ দারারী)

সূরা আলে ইমরান

مِنْهُ اٰيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ (কতক আয়াত সহজেই বোধগম্য আর কতক আয়াত সহজে বোধগম্য নয়) ঃ مُحْكَم শব্দটি হয়ত إِحْكَامٌ মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ ভিত্তি সুসংহত করা। অথবা ঐ مُحْكَم থেকে নির্গত, যার অর্থ مَمْنُوْع তথা নিষিদ্ধ। কারণ, مُحْكَم-এর মধ্যে এক 'সম্ভাবনা' চূড়ান্তরূপে স্থির হওয়ার পর অপর সকল সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায়। উল্লিখিত শব্দমূল থেকেই "حَاكِم" শব্দের উৎপত্তি। কেননা, তিনি অন্যায়-অবিচার প্রতিহত ও তা নিষিদ্ধ করেন। حِكْمَت বলা হয়, যা অপ্রয়োজনীয় মন্তব্য ও কথা হতে বিরত রাখে (অর্থাৎ, যে কথা বা বিষয় অপ্রয়োজনীয়তা- মুক্ত তাই হিকমত)।

مُتَشَابِهٌ ঃ সাদৃশ্যপূর্ণ বা এক ধরনের বিষয়কে مُتَشَابِهٌ বলে। আবার দু'টি বস্তুর পরস্পরের মধ্যে মিল থাকলেও مُتَشَابِهٌ বলা হয়।

উসূলীনদের পরিভাষায় مُحْكَم ঐ শব্দকে বলে, যার অপর কোন অর্থে ব্যবহৃত কিংবা তা কখনও রহিত বা বাতিলের সম্ভাবনা থাকে না। আর এর বিপরীত অবস্থার নাম مُتَشَابِه । কারো মতে, যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট অথবা তা তা'বীলের মাধ্যমে জানা যেতে পারে তাকে مُحْكَم বলে। আর مُتَشَابِه হলো এর বিপরীত। অর্থাৎ, غَيْرُ مُشْتَبِهِ الْمُرَاد-কে مُحْكَم আর مُشْتَبَهُ الْمُرَاد-কে مُتَشَابِه বলে।

ইতকান গ্রন্থে আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) مُحْكَمَات ও مُتَشَابِه-এর সংজ্ঞায় ১৭টি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন।

مُتَشَابِه দুই প্রকার ঃ যথা ঃ (১) যার অর্থ অভিধান থেকেও জানা সম্ভব নয় এবং যিনি তা বলেছেন তাঁর উদ্দেশ্যও জানা যায় না। যেমন কুরআনের اٰيَاتٌ مُقَطَّعَات সমূহ।

(২) ঐ শব্দাবলী, অভিধানের সাহায্যে যার অর্থ জানা যায়, কিন্তু বক্তার উদ্দেশ্য জানা বা নির্ধারণ করা বড়ই দুরূহ হয়। যেমন, اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى অর্থাৎ, দয়াময় প্রভু আরশে সমাসীন হয়েছেন, يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপরে।

www.e-ilm.weebly.com

মুতাযিলা ও শাফেয়ীদের মতে اٰيَةُ مُتَشَابِهَاتٌ-এর ব্যাখ্যা গভীর প্রজ্ঞাবান বা জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ জানেন। তাই তারা اِلَّا اللّٰهُ বলে থামেন না (وَقْف করেন না); বরং اَلرَّاسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ পর্যন্ত পড়ে তবেই থামেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ সুন্নী এবং পূর্ববর্তী হানাফীগণ اِلَّا اللّٰهُ বলে থামেন এবং তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, আয়াতে মুতাশাবেহ্-এর ব্যাখ্যা তথা উদ্দেশ্য আল্লাহ্ পাক ছাড়া আর কেউ জানে না।

মূলতঃ পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম কুরআনের বাহ্যিক অর্থকে কোনরূপ ধরন-প্রকৃতির গভীর বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান ছাড়াই মেনে নিতেন এবং এর উল্লিখিত দু'প্রকারের মধ্য হতে কোন ব্যাখ্যার পিছনে পড়তেন না। কিন্তু ভ্রান্তপন্থীরা যখন ঐ সকল শব্দের প্রকৃত শাব্দিক অর্থ নিয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে দ্বীনের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করতে শুরু করে, তখন পরবর্তী হানাফী আলেমগণ আল্লাহর সিফাত বিষয়ক আয়াতের মধ্যে তা'বীল ও রূপকতার দ্বার উন্মোচন করেন। যাতে এর দ্বারা কোমলমতি সাধারণ লোকজন আশ্বস্ত ও তাদের ঈমান ক্ষতির সম্মুখীন না হয়। সুতরাং পরবর্তী হানাফীগণ যেরূপভাবে اٰيَةِ صِفَاتٌ-এর মধ্যে তা'বীলের পথ বের করেছেন, তেমনি اٰيَةِ مُقَطَّعَاتٌ-এর মধ্যেও তা'বীল করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

مُقَطَّعَاتٌ জাতীয় আয়াত দু'প্রকার। (১) তার অর্থ অজ্ঞাত। (২) অর্থ জ্ঞাত। এ অর্থ জ্ঞাত হওয়া না হওয়া বাস্তবিক কোন বিরোধ নয়; বরং শাব্দিক বিরোধ মাত্র। কারণ যারা অর্থ জ্ঞাত হওয়াকে অস্বীকার করেন, তাদের উদ্দেশ্য অকাট্যতাকে অস্বীকার করা মাত্র। আর যারা বর্ণনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্য সম্ভাব্য অর্থ মাত্র। যারা اٰيَةُ مُقَطَّعَاتٌ-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করার প্রয়াস পেয়েছেন, তারেদ মধ্যেও মতবিরোধ পরিলক্ষিত।

(১) কারো কারো মতে اٰيَةُ مُقَطَّعَاتٌ গুলো মূলত সংশ্লিষ্ট সূরারই সংক্ষিপ্ত নাম। আর এভাবে সংক্ষিপ্ত করে নাম রাখার নিয়ম আরবে বহুল প্রচলিত।

(২) কারো মতে এগুলো আল্লাহর নামের অংশবিশেষ। বরকতস্বরূপ সূরার শুরুতে সংযোজন করা হয়েছে।

(৩) কেউ বলেন, এ সমস্ত শব্দ 'শর্ট হ্যান্ডের' (সাংবাদিকদের সাংকেতিক লেখা) মত। সুতরাং এ সমস্ত বর্ণ দ্বারা যৌগিক শব্দ ও বাক্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, (الٓمٓ-এর মধ্যে) اِلِفْ দ্বারা উদ্দেশ্য اَللّٰهُ - لَامْ দ্বারা উদ্দেশ্য لُطْف আর مِيْم দ্বারা উদ্দেশ্য مُلْك অর্থাৎ, (সারমর্ম হলো) আল্লাহর এ বিশাল রাজত্বের সকল নেয়ামত একমাত্র তাঁরই দয়া ও মেহেরবানীর ফল।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) কারো মতে, এগুলো খোদ কুরআনের নাম।

(৫) কুতরুব বলেন, এক কথা ও প্রসঙ্গ শেষ করত অন্য প্রসঙ্গ শুরু করার পূর্বে তার প্রতি সতর্ক করতে আরবদের ভাষণ ও কথার মধ্যে এ সমস্ত অক্ষর ব্যবহৃত হয়। যেমন, রেডিওতে প্রোগ্রাম শুরুর প্রাক্কালে প্রথমে সাংকেতিক মিউজিক বাজানো হয়। (যার দ্বারা জানা যায় যে, এখনই কোন প্রোগ্রাম বা অনুষ্ঠান শুরু হতে যাচ্ছে।)

(৬) কেউ বলেন, আরবী শব্দের সংখ্যা মান হিসেবে এ সমস্ত বর্ণের মধ্যে বিভিন্ন কওম ও জাতির ইতিহাস এবং তাদের উত্থান-পতনের বর্ণনা নিহিত রয়েছে। যেমন, বর্ণিত আছে যে, এক ইহুদী নবীজীর সকাশে এলে রসূল (স.) তার সম্মুখে الم। পড়লে ইহুদী মন্তব্য করে যে, যে ধর্মের মোট সময়সীমা ৭১ বছর, আমরা তা কিভাবে গ্রহণ করতে পারি। এরপর রসূল (স.) আরো مُقَطَّعَاتْ উল্লেখ করলে সে বলে, এখন তো ব্যাপারটি আমাদের দ্বিধায় ফেলে দিল।

পবিত্র কুরআনে আয়াতে মুতাশাবিহাত অন্তর্ভুক্তির তাৎপর্য

পবিত্র কুরআনে এ শ্রেণীর আয়াত অন্তর্ভুক্ত করার রহস্য দু'টি। (১) উলামায়ে কেরামের ইন্টারভিউ গ্রহণ। আর তা এভাবে যে, আল্লাহ পাক তাঁদের থেকে এ পরীক্ষা নিতে চান যে, তাঁরা প্রবৃত্তির বিরোধিতা এবং বিবেকের হাতিয়ার নিক্ষেপ করে সর্বান্তকরণে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়ার পন্থা অবলম্বন করেন। (২) ইসলাম-বিরোধীদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা তুলে ধরা এবং তাদের প্রতি এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া যে, তোমাদের এবং আমাদের শব্দ সম্ভার ও বাক্য-গঠন ধাতু মূলতঃ এক (অর্থাৎ, ২৮/২৯ বর্ণ*) হওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমাদের মত বাণী উপস্থাপন করতে সম্পূর্ণ অপারগ। (মা'আরেফুল কুরআন)

مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ঃ উদ্দেশ্য হলো, ভূমিষ্টকালীন প্রত্যেক নবজাতকের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শয়তান তার (নবজাতক) পার্শ্বদেশে আক্রমণ করে। কিন্তু হযরত মরিয়াম (আ.) ও তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.) নিজ নিজ মায়ের দোয়ার বরকতে শয়তানের এ অশুভ আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকেন।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ إِلاَّ عِبَادَ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এর দ্বারা জানা যায় যে, যারা তাদের (মারিয়াম ও ঈসা) গুণে গুণান্বিত হবে তারাও এ শয়তানী ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে।

তাফসীরে মাজহারীতে আছে, এক বিশুদ্ধ বর্ণনামতে প্রকাশ, রসূল (স.) হযরত ফাতেমাকে বিবাহ দানকালীন সময়ে যেরূপভাবে এ দোয়া করেন ঃ اَللّٰهُمَّ

টীকা ঃ *আরবী মূলবর্ণ ২৮টি। আলিফ পৃথক কোন বর্ণ নয়। তথাপি আমাদের দেশে আলিফকে একটি আলাদা বর্ণ হিসেবে গণ্য করায় আরবী বর্ণ ২৯টি বলা হয়। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ অর্থাৎ, আল্লাহ, ফাতেমা ও তার সন্তান-সন্ততিকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করো। তেমনিভাবে হযরত আলী (রযি.)-এর ব্যাপারেও রসূল (স.) এ দোয়া করেন। উল্লিখিত এ দু'ব্যাখ্যা অনুপাতে হযরত মারিয়াম ও তাঁর পুত্রের ক্ষেত্রে হাদীসোক্ত حَصْر বা সীমাবদ্ধটা حصرحقيقى হবে না; বরং حَصَر اضافِى হবে। (অর্থাৎ, এটা কেবল তাঁদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, অন্যের বেলায়ও হতে পারে।)

لَقَدْ اعطى بِهَا مَا لَمْ يُعْطِه ঃ অর্থাৎ, যে মূল্যে তুমি এ পণ্য ক্রয় করতে চাচ্ছ, ইতঃপূর্বে এর থেকেও বেশি মূল্যে অন্যান্য লোক আমার থেকে এ পণ্য খরিদ করতে চেয়েছিল।

اِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ ঃ অর্থাৎ, দু'মহিলা মোজা সেলাই করত।

وَقَدْ اُنْفِذَ بَاشْفَا فِىْ كَفِّهَا ঃ অর্থাৎ, দ্বিতীয় মহিলা প্রথমজনের হাতে সুই ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِىْ مِنْهَا شَيْئًا ঃ (আমি তার নিকটতম ছিলাম তথাপি তিনি আমাকে বায়রুহা বাগিচা হতে অংশ দেননি) ঃ ওয়াকফ (উইল) দান পর্বে এর বিপরীত এভাবে এসেছে যে, وَكَانَا اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّى অর্থাৎ, তারা আমার তুলনায় তার প্রিয়পাত্র ছিল।

وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا ঃ এটা কেবলমাত্র এ হিসাবে বলা হয়েছে যে, হযরত আনাস (রযি.) আবু তালহার (রযি.) পরিবার-পরিজনের অন্তর্গত ছিলেন। কারণ, হযরত আবু তালহা হযরত আনাসের মাতাকে বিবাহ করায় সম্পর্কে আনাস (রযি.) আবু তালহার সৎ ছেলে হন। এ দিক দিয়ে আনাস (রযি.) আবু তালহার (রযি.) কাছে হাসসান বিন সাবেত ও হযরত উবাই বিন কাবের থেকে বেশি নিকটতম ছিলেন। আর যে বর্ণনায় وَكَانَ أَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنِّى এসেছে, সেটা বংশের দিক দিয়ে নিকটতম হিসেবে বলা হয়েছে। অতঃপর হযরত আনাস (রযি.)-এর উক্তি ঃ "তিনি আমাকে কিছু দেননি।" এর দ্বারা তিনি হযরত আবু তালহার (রযি.) প্রতি না দেয়ার অভিযোগ করেননি। কারণ, এর উদ্দেশ্য হলো, যদিও প্রতিপালন ও আবু তালহার পরিবারবর্গের অন্তর্গত থাকায় আমি তার নিকটতম ছিলাম, কিন্তু বংশগত দিক দিয়ে তারা দু'জন ছিল আমার চেয়ে আরও বেশি নিকটতম। তাই আবু তালহা আমাকে না দিয়ে তাদেরকে দেন। (লামিউদ্ দারারী)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ঃ لِلنَّاسِ শব্দটি কার সাথে সংশ্লিষ্ট (مُتَعَلِّق)? এ বিষয়ে দুই ধরনের মতামত রয়েছে। (১) خَيْر-এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

www.e-ilm.weebly.com

উদ্দেশ্য হলো, মানুষদের কল্যাণ সাধনে তোমরা সর্বোত্তম লোক। কেননা তোমরা মানুষদেরকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করতঃ তাদেরকে ইসলামে অটল-অবিচল রাখ। ফলে তোমাদের উসিলায় তারা (কাফেররা) ইহ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের পরম সৌভাগ্য অর্জন করায় তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রযি.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে। (২) لِلنَّاسِ টা أُخْرِجَتْ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট (مُتَعَلِّق)। উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ পাক মানুষদের জন্য উম্মতে মুহাম্মাদীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ কোন উম্মত আর সৃষ্টি করেননি। (বগভী[১])

আল্লামা তবরানী[২] (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রযি.) বলেন, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى لَقَالَ أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ فَكُنَّا كُلُّنَا وَلٰكِنْ قَالَ كُنْتُمْ فَهِىَ خَاصَّةٌ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَمَنْ صَنَعَ مِثْلَ صَنِيْعِهِمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক চাইলে বলতে পারতেন, "أَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ" তখন উম্মাতে মুহাম্মাদীর সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত। কিন্তু তিনি বলেছেন, "كُنْتُمْ" তাই এর থেকে অনুমিত হয় যে, এ আয়াতের মধ্যে উম্মত মাত্রই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং নবী করীম (স.)-এর সম্মানিত সাহাবাগণ এবং যারা এ পুণ্যাত্মা সাহাবীদের পূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে, তারাই কেবল এর অন্তর্গত। (লামিউদ্ দারারী)

وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ أُخْرَاكُمْ ঃ أُخْرَا শব্দটি اٰخَرُ-এর مُؤَنَّث বা স্ত্রীলিঙ্গ। অর্থাৎ, ইমাম বুখারী বলেন ঃ أُخْرَاكُمْ-এর মধ্যস্থ أُخْرَا শব্দটি اٰخِر) خاء শব্দটি যের যোগে اِسْم فَاعِل-এর (اٰخَرُ) اِسْم تَفْضِيْل শব্দে যবর যোগে خاء ; مُؤَنَّث-এর مُؤَنَّث নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার, আল্লামা আইনী প্রমুখ ইমাম বুখারীর এ উক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে মাসাবিহ্ প্রণেতা তার জওয়াবে বলেন, ইমাম বুখারীর দৃষ্টিভঙ্গি তাদের সমালোচনা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। কারণ, আয়াতে تَاخِيْر وُجُوْدِى তথা পশ্চাৎ অবস্থান উদ্দেশ্য। যদি এখানে خَاء শব্দে যবর যোগে তাকে اِسْم تَفْضِيْل-এর مُؤَنَّث ধরা হয় তবে তা প্রত্যাশিত অর্থ দিবে না। কারণ, সমাজে এ অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া হয় না; বরং সমাজে এ শব্দটি وَصْف بِالْمُغَائَرَة তথা বিপরীত ভূষণ অর্থই প্রদান করে থাকে। যেমন, বলা হয় مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَبِرَجُلٍ اٰخَر সমাজে এর অর্থ হলো, مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ وَبِرَجُلٍ مُغَائِرٍ لِلْأَوَّلِ অর্থাৎ, আমি এক

টীকা ঃ ১. আল্লামা বগভী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৫১৬ হিজরী।
২. আল্লামা তবরানী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৩৬০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

সুদর্শন ব্যক্তি ও তার ব্যতিক্রম (অর্থাৎ, কুদর্শন) আরেক ব্যক্তির নিকট থেকে অতিক্রম করেছি।

ইমাম বুখারী (রহ.) মূলতঃ تَاخِيْرِ وُجُوْدِىْ-এর অর্থ বুঝানোর প্রতি ইঙ্গিত করতে "هُوَ تَانِيْثُ أُخْرَاكُمْ" বলেছেন। এর দ্বারা তিনি এটা প্রমাণ করতে চাননি যে, أُخْرى টা প্রকৃতই (اِسْمِ فَاعِلْ)-এর مُؤَنَّث । আর আরবী ভাষায় শব্দটি উল্লিখিত অর্থে অহরহ ব্যবহৃত হয়। উপরন্তু শব্দ বিশ্লেষকদের মতে এটাই তার আসল অর্থ। (কস্তলানী)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ فَتْحًا أَوْ شَهَادَةً ঃ আল্লাহর বাণী هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ এটা সূরা তওবার আয়াত হওয়ায় হযরত ইবনে আব্বাসের উপরোক্ত মন্তব্য এখানে উল্লেখ করায় ব্যাখ্যাকারগণ ইমাম বুখারীর প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কোন কোন হযরত এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন, إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ-এর মধ্যে এক حُسْنَى অর্থাৎ, মুসলমানদের শাহাদাত বরণ ঘটনা উহুদ যুদ্ধে সংঘটিত হওয়ায় ইবনে আব্বাসের উক্ত মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) এ জওয়াবকে প্রায় অসম্ভব বলে অভিহিত করেছেন।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে উল্লিখিত প্রশ্নের আরেক জওয়াব দেয়া হয়েছে যে, ইমাম বুখারী (রহ.) পূর্বে যে কথা বলেছেন যে أُخْرَا টা اٰخِرٌ (যের যোগে) اِسْمِ فَاعِلْ-এর مُؤَنَّث ; اٰخَر (যবর যোগে) اِسْمِ تَفْضِيْل-এর مُؤَنَّث নয়। এখন ইমাম বুখারী হযরত ইবনে আব্বাসের আলোচ্য উক্তি এনে নিজ দাবীর স্বপক্ষে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ-এর মধ্যে যেরূপ حُسْنَى টা اِسْمِ تَفْضِيْل-এর সীগা। আর তার দাবী হলো, শাহাদাত ও বিজয়ের ফযীলত অন্য যে কোন বস্তুর তুলনায় বেশী। অথচ এখানে অন্য বস্তুর উপর তাদের ফযীলত বর্ণনা করা মোটেও উদ্দেশ্য নয়; বরং খোদ এ দু'বস্তুই (শাহাদাত ও বিজয়) যে ভাল ও কল্যাণকর, তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য মাত্র। ঠিক তদ্রূপ أُخْرى-এর মধ্যেও اِسْمِ تَفْضِيْل-এর এ অর্থ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় যে, রসূল (স.) অন্যান্য লোকদের তুলনায় পশ্চাতে ছিলেন; বরং শুধু এটুকু বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, রসূল (স.) পিছন হতে তোমাদের আহ্বান করেন। অতএব এ ব্যাখ্যা ও সুদীর্ঘ আলোচনা হতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, ইমাম বুখারী (রহ.) কর্তৃক ইবনে আব্বাসের এ উক্তি এখানে উল্লেখ করাটা অসঙ্গত হয়নি; বরং উল্লেখের চমৎকার যৌক্তিকতা রয়েছে।

www.e-ilm.weebly.com

أَجَابُوا اِسْتَجَابُوا أَجَابُوا ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) اِسْتَجَابُوا-এর ব্যাখ্যা أَجَابُوا দ্বারা করেছেন। লামিউদ্ দারারী গ্রন্থ প্রণেতা এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, এখানে سِيْن বর্ণটি চাহিদা প্রদানের জন্য নয়; যা সাধারণত بَابِ اِسْتِفْعَال-এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; বরং এখানে اِسْتِفْعَال টা اِفْعَال-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আদিষ্ট বিষয় পালনের প্রতি তাদের আন্তরিক চাহিদা ছিল বুঝাতেই أَجَابُوا না বলে اِسْتَجَابُوا বলা হয়েছে। কেমন যেন আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর আহ্বানে তাদের সাড়া দান ছিল তাদের আন্তরিক কামনা ও চাহিদারই বহিঃপ্রকাশ।

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا لَكُمْ وَلِهٰذِهِ ঃ হযরত ইবনে আব্বাসের বক্তব্যের সার কথা হলো, মেনে নিলাম মুসলমানও নিজের কৃতকর্মের উপর খুশি হয় এবং অবদান না রেখেই ইহুদীদের মত ধন্যবাদ পাবার আশা করে। কিন্তু তারপরেও ব্যাপার দুটো এক রকম নয়। কারণ, ইহুদীদের কাছে কোন ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা তাদের কিতাবে যা নেই তার খবর দেয়, আর যা আছে তা গোপন করে। সুতরাং ইহুদীরা সত্য গোপনের মত জঘন্য কাজ করত এবং এভাবে ভুয়া তথ্য দিয়ে ধন্যবাদ পাবার আশাও করত। ফলে তাদের প্রতি শাস্তির হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। মুসলমানদের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের কৃতিত্ব ও খুশির মূলে কোন না কোন ভিত্তি অবশ্যই থাকে। কারণ, মুসলমান ভাল কাজ করে তবেই তার উপর খুশি হয়। অতএব উভয়ের মাঝে সুস্পষ্ট ব্যবধান রয়েছে। তবে কোন মুসলমান যদি ইহুদীর ন্যায় হারাম বা অন্যায় কার্য করত ফের প্রশংসা লাভ করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে জবাবদিহি করতে হবে। ইবনে কাছীর বলেন, এ হাদীসে কেয়ামত পর্যন্ত উলামাদের জন্য এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, তাঁরা সর্বদা তাদের জাতীয় নীতি অনুসরণ ও অবলম্বন করবে (বিধর্মীদের নীতি নয়)।

ثُمَّ أَوْتَرَ ঃ আল্লামা আইনী বলেন, رَكْعَتَيْنِ তথা দু'রাকাতকে ছয় বার উল্লেখের পর রসূল (স.) কর্তৃক ثُمَّ أَوْتَرَ অর্থাৎ, অতঃপর 'বেতের পড়' বলাটা এটাই প্রমাণ করে যে, রসূল (স.) ১৩ রাকাত বেতের পড়েছেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় সুস্পষ্ট এ তথ্যই (১৩ রাকাত বেতের) বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম তহাবী (রহ.) বলেন, এ জাতীয় সকল হাদীসের অর্থ জমা করলে এ তথ্যই বের হয় যে, রসূল (স.)-এর বেতেরের নামায ছিল মূলত তিন রাকাতই। (আর বাকী নামায নফল বা তাহাজ্জুদ ছিল)।

www.e-ilm.weebly.com

সূরা নিসা

إِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (আল্লাহ বিন্দু-বিসর্গ পরিমাণও অবিচার করবেন না) ঃ এ শিরোনামের সাথে হাদীসের মিল সম্বন্ধে আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, হাদীসের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন মু'মিন ও কাফের বান্দাদের মধ্যে বড়ই ন্যায়নুগ ফায়সালা করবেন। বিন্দু পরিমাণও তাঁর থেকে অবিচার হবে না। এ মর্মার্থের দ্বারা উভয়ের মধ্যেকার সুন্দর মিল ও সম্পর্কের ব্যাপারটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, হাদীসের সাথে শিরোনামের সম্পর্ক بَرٌّ وَفَاجِرٌ-এর দৃষ্টিকোণ থেকে, আর তা এভাবে যে, যদি স্বল্প ঈমান ধর্তব্য না করা হয়, তবে অবশ্যই অবিচার করা হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, এখানে بَرٌّ টা নাকেরা তথা অনির্দিষ্ট। যা প্রত্যেক ন্যূনতম মুসলমানকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যদি তা অন্তর্ভুক্ত না মানা হয়, তবে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, بَرٌّ-এর কোন কোন সদস্য তার কাজের প্রতিদান পায়নি। আর এটাই অবিচার। অথচ বাস্তব কথা হলো আল্লাহ্ কারো ক্ষেত্রে এক চুল পরিমাণও অবিচার করবেন না। (ন্যায়-অন্যায় উভয়ের প্রতিফল যথাযথভাবে প্রদান করবেন)।

غُبَّرَاتُ أَهْلِ الْكِتَابِ ঃ غُبَّرَاتٌ টা غَابِرٌ-এর جَمْع হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আবার غَابِر-এর جَمْعُ الْجَمْع হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থ, অবশিষ্ট আহলে কিতাব। কতিপয় ইহুদি ও খ্রীস্টান এমন ছিল যারা ক্রুসের পূজা করত না। তারা আল্লাহর ইবাদতের দাবীদার ছিল। তবে এ ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসও পোষণ করত যে, তারা যে ঈসা ও উযাইরের (আ.) পূজা করে তাঁরা আল্লাহর পুত্র। একদিকে এ ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করলেও অপরদিকে যেহেতু তারা আল্লাহর ইবাদতও করত। তাই অন্যান্য কাফেরদের ন্যায় তারাও আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে প্রথমে মুসলমানদের সাথে রাখা হয়। অতঃপর তারা পয়গম্বার পূজারী প্রমাণিত হলে তাদেরকে প্রতিমা পূজারীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا

অর্থাৎ, আহলে কিতাবীদের কাফের ও মুশরিকরা জাহান্নামে যাবে। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। এটা পূর্বোক্ত বিষয়টি সমর্থন করে। অবশ্য যারা তাদের প্রকৃত ও মূল দ্বীনের উপর অটল-অবিচল ছিল, তারা الَّذِيْنَ كَفَرُوْا-এর আওতাভুক্ত হবে না।
(ফাতহুল বারী, লামিউদ্ দারারী)

قَالَ عُمَرُ اَلْجِبْتُ السِّحْرُ وَالطَّاغُوْتُ الشَّيْطَانُ ঃ جِبْت এবং طَاغُوْت-এর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতামত বিভিন্ন। তবে আল্লামা তবারী

www.e-ilm.weebly.com

(রহ.) বলেন, جِبْت ও طَاغُوْت দ্বারা উদ্দেশ্য প্রত্যেক ঐ জাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু, আল্লাহ ব্যতীত যাঁর আরাধনা-উপাসনা করা হয়। চাই তা প্রতিমা হোক বা জিন-শয়তান কিংবা মানবরূপী শয়তান হোক। সুতরাং সকল জাদুকর ও জ্যোতিষীও এর অন্তর্গত হবে। (লামিউদ্ দারারী)

ذُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَمْرِ : أُولُوْ টা যেরূপভাবে-ذُوْ-এর جَمع অনুরূপ (اِسْم مَوْصُوْل) اَلَّذِى-এরও جَمع । এ দ্বৈতমুখী ব্যবহারের কারণে ইমাম বুখারী (রহ.) أُولُوْ-এর ব্যাখ্যা ذُوْ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এখানে أُولُوْ টা ذُوْ-এর جَمع، اَلَّذِى-এর নয়। আর ذُو الْأَمْرِ দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীন ও তাঁদের পদাঙ্ক অনুগামী লোক উদ্দেশ্য।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا (স্বেচ্ছায় কোন মুমিনকে কেউ হত্যা করলে) : লেখকের উক্তি وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ-এর দ্বারা জানা যায় যে, স্বেচ্ছায় হত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অথচ অসংখ্য বর্ণনায় এসেছে যে, لَا يَبْقَى فِى النَّارِ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِه مِثْقَالُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ অর্থাৎ,, বিন্দু পরিমাণ ঈমান যার অন্তরে থাকবে সেও জাহান্নামে চিরকাল থেকে যাবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতেরও অভিমত হলো, মুমিন অপরাধীরা জাহান্নামী হবে না। বস্তুত এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেন, আয়াতে خُلُوْد বা অনন্তকাল দ্বারা উদ্দেশ্য দীর্ঘ অবস্থান। আবার কারো মতে, এ বিধান কেবল সে ব্যক্তির জন্য, যে তওবা করেনি। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তওবাকারীর প্রতি ক্ষমাশীল। আবার কারো মতে, এ শাস্তি শুধু ঐ ব্যক্তির জন্য, যে তা হালাল মনে করে। (কারণ তখন সে আর মুসলমান থাকে না। ফলে তার চির জাহান্নামী হওয়াটাই স্বাভাবিক। (বুখারীর পার্শ্বটিকা)

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِىْ أَنْفُسِهِمْ : এখানে ফেরেশতা বলতে হযরত আজরাঈল ও তাঁর সহকর্মী বাহিনী উদ্দেশ্য। আর তাঁরা হলেন ৬ জন। ৩ জন মু'মিনদের আর বাকী ৩ জন কাফেরদের জান কবজ করেন। অথবা শুধু হযরত আজরাঈল (আ.) উদ্দেশ্য। বহুবচন (অর্থাৎ, مَلَائِكَة) আনা হয়েছে শুধু সম্মানের খাতিরে। যেমন, আল্লাহ বলেন : إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى অর্থাৎ, আমরা মৃতকে জীবিত করব। অথচ জীবিতকারী একমাত্র আল্লাহ।

আল্লামা আইনী বলেন, এ আয়াত মক্কার কতিপয় এমন লোকদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা মুসলমান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু হিজরত করেন না। অথচ হিজরত করা তাদের উপর ফরযই ছিল। মহানবীর (স.) হিজরতের পর মক্কার আর কারো ইসলাম আনয়ন গ্রহণযোগ্য ছিল না। অবশ্য মক্কা বিজয়ের পর এ নিষেধাজ্ঞা

www.e-ilm.weebly.com

প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। বদর যুদ্ধের দিন এ ধরনের মুসলমান কাফেরদের কাতারে শামিল হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে ফেরেশতারা তাদের প্রতি লক্ষ্য করে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

(কস্তলানী, আইনী)

قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيْهِ ঃ অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের খেলাফতকালে সিরিয়াবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে মদীনাবাসীদের জন্য ফৌজে ভর্তি হওয়া আবশ্যক করা হয়। ভর্তি তালিকায় অন্যদের সাথে আমার নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

فَنَهَانِى عَنْ ذٰلِكَ ঃ হযরত ইকরিমা (রযি.) কর্তৃক আবুল আসওয়াদকে নিষেধ করার কারণ হলো, মুশরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কারণে আল্লাহ্ তাদের (মক্কাস্থ মুসলমানদের) নিন্দা করেন। অথচ তারা অন্তর থেকে মুশরিকদের সমর্থন করতো না। হযরত ইকরিমা (রযি.) উক্ত ঘটনাকে সামনে রেখে আবুল আসওয়াদকে বলেন, তুমিও অন্তর থেকে তাদের (হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের বাহিনীকে) সমর্থন করো না এবং তাদের সাথে শরীক হয়ে ফৌজের সংখ্যা বৃদ্ধি করো না। কারণ, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পথে জিহাদ করতে যাচ্ছে না।

(কস্তলানী)

فَتَقُوْلُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِى فِى حِلٍّ ঃ স্বামী-স্ত্রীর বনাবনি না হওয়া অবস্থায় প্রত্যেক স্ত্রী তার স্বামীকে এ কথা বলতে পারে যে, আমার প্রতি আপনার ভরণ-পোষণ ও বারী বণ্টনের জিম্মাদারী হতে আমি আপনাকে এই শর্তে মুক্তি দিতে পারি যে, বিনিময়ে আমাকে আপনার স্ত্রীত্বে বহাল রাখবেন এবং কখনও তালাক দিবেন না। যেমন, হযরত সাওদা (রযি.) রসূল (স.)-কে এরূপ বলেছিনে এবং তাঁর হক্ব (বারী) হযরত আয়েশার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَسْفَلِ النَّارِ ঃ মুনাফিকদের চরিত্র অত্যন্ত কুটিল ও জঘন্য প্রকৃতির হওয়ায় জাহান্নামের সাত তলার সর্বনিম্ন তলাটি তাদের জন্য নির্ধারিত। কেননা, প্রকাশ্যে তারা নিজেদের মুসলমান বলে জাহির করত অথচ ভিতরে ভিতরে ঠিকই কাফের ছিল। শুধু তা-ই নয় অন্তরে কুফরী আকীদা পোষণ করার পাশাপাশি ইসলাম ও মুসলমানদেরকে সমালোচনার টার্গেট বানাতো। (কস্তলানী)

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, فِى الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ আয়াতের অন্তর্গত مِنْ থেকে কেউ ধারণা করতে পারে যে, মুনাফিকদের অবস্থান জাহান্নামের বাইরে। যেমন৷কারো মতে, هٰذَا اَسْفَلُ مِنْهُ অর্থাৎ, মুনাফিকের এ অবস্থান স্থলটি জাহান্নামের নিম্নস্থলে অবস্থিত। (কেননা এখানে যার থেকে নিম্নে বলা হয়েছে নিশ্চয় ঐ বস্তুর অন্তর্গত নয়।) সে জন্য হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) নিজ উক্তি "أَسْفَلِ النَّارِ" দ্বারা উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে,

www.e-ilm.weebly.com

এখানে مِنْ শব্দটি أَسْفَل (اِسْمِ تَفْضِيْل)-এর صِلَه নয়; বরং তা বর্ণনাজ্ঞাপক (بَيَانِيَّة) মাত্র। সুতরাং হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) উক্ত সংশয় ও ধারণা অপনোদন করতে أَسْفَل مِنَ النَّارِ-এর ব্যাখ্যা أَسْفَل النَّارِ দ্বারা করেছেন।

اِسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِى نَفَقًا ঃ অর্থাৎ, সূরা আনআমের আয়াত, نَفَقًا سَرِبًا فِى الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِايَةٍ-এর মধ্যে نَفَقٌ-এর অর্থ হলো سَرَبٌ অর্থাৎ, গর্ত, সুড়ঙ্গ। এ আয়াত এখানে উল্লেখের কারণ, এটা বর্ণনা করা যে, মুনাফিক শব্দের অভ্যুদয় হয়েছে نَفَقٌ মূলধাতু হতে। যার অর্থ সুড়ঙ্গ। সুতরাং যেরূপভাবে সুড়ঙ্গ বাহ্যিক দিক দিয়ে পার্শ্বস্থ মাটির ন্যায় দেখা গেলেও তার অভ্যন্তরের চিত্র ভিন্ন থাকে, তেমনি মুনাফিকদেরও চরিত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ, তাদের বাইরের রূপ এক আর ভিতরের রূপ আরেক হয়।

আর কারো মতে, مُنَافِقٌ শব্দটি মূলত نَافِقَاء থেকে উৎপন্ন। তা ইঁদুরের ঐ সুড়ঙ্গমুখকে বলে, যা সে ভিতর দিকে থেকে লুকিয়ে রাখে এবং প্রয়োজনের সময় ঐ সুড়ঙ্গমুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। জনশ্রুতি রয়েছে যে, ইঁদুরের দু'টি সুড়ঙ্গমুখ বা গর্ত থাকে। (১) قَاصِعَاء অর্থাৎ, বাইরের ঐ সুড়ঙ্গমুখ যার দ্বারা সে সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। (২) نَافِقَاء অর্থাৎ, ঐ গোপন সুড়ঙ্গ মুখ, যা সে লুকিয়ে রাখে এবং বিপদ দেখা দিলে সুকৌশলে ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করে। ঠিক তদ্রূপ মুনাফিকও ঈমানকে মুসলমানদের সামনে জাহির করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কুফরী আকীদা ও বিশ্বাস লালন করে। তারা এক রাস্তা দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, আর দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যায়। (লামিউদ্ দারারী)

أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى ঃ কারো মতে 'মাত্তা' হলো হযরত ইউনুস (আ.)-এর পিতার নাম। কারো মতে মাতার নাম। (কস্তলানী)

أَنَا (আমি) এ শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা কিরমানী বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত যে কোন বান্দা অথবা রসূলুল্লাহ (স.)। বান্দা উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, কারো এ অধিকার নেই যে, সে নিজেকে হযরত ইউনুস (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ বলবে। চাই সে মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত হোক না কেন। কারণ, ইজতেহাদের স্তর থেকে নবুওয়াতের স্তর অনেক ঊর্ধ্বে। আর রসূল (স.) স্বয়ং উদ্দেশ্য হলে অর্থ হবে, কারো এ অধিকার নেই যে, সে আমাকে (রসূলকে) হযরত ইউনুস (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করবে।

প্রকাশ থাকে যে, রসূল (স.) এ উক্তি হয়ত বিনীত চরিত্রের অভূতপূর্ব প্রকাশ ছিল, অথবা سَيِّدُ الْكُلِّ (দোজাহানের সর্দার) সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার পূর্বে

www.e-ilm.weebly.com

তিনি এ উক্তি করেন। অথবা উদ্দেশ্য ছিল, কেবল নবুওয়াতের বিচারে তাঁকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন না করার ব্যাপারে সাহাবাদের সতর্ক করা, যেহেতু কুরআনের একাধিক আয়াত হতে হযরত ইউনুসের (আ.) মর্যাদা হ্রাসের ধারণা জন্মে। যেমন—(১) আল্লাহ বলেন, وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ অর্থাৎ, রসূল (স.) আপনি মাছ ওয়ালার (ইউনুস) মত হবেন না। (২) অপর আয়াতে বলেন ঃ وَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ অর্থাৎ, ইউনুস (আ.) ধারণা করেন যে, আমি তাকে ধৃত করতে পারব না। (৩) অপর আয়াতে বলেন, إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ অর্থাৎ, যখন তিনি পালিয়ে বোঝাই নৌকায় গিয়ে পৌছেছিলেন। তাই হযরত ইউনুসের (আ.) মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, এমন উক্তি হতে সাহাবাদের বিরত রাখতে রসূল (স.) বিশেষভাবে হযরত ইউনুস (আ.)-এর প্রসঙ্গ বা নাম উল্লেখ করেছেন।

সূরা মায়েদা হলফ বা শপথের হাদীস

فَذَكَرُوْا ঃ অর্থাৎ, যখন হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) হলফের ব্যাপারে বিজ্ঞ আলেমদের কাছে পরামর্শ চাইলেন, তখন তারা এ ব্যাপারে আলোচনায় মিলিত হলেন।

وَذَكَرُوْا ঃ অতঃপর তাঁরা হলফের হাদীস ও তার হুকুম বর্ণনা করলেন।

فَقَالُوْا وَقَالُوْا ঃ অর্থাৎ, তাঁরা বললেন, نَقُوْلُ بِهَا الْقَوَدُ অর্থাৎ, আমাদের অভিমত হলো, হলফের দ্বারা কিসাস নেয়া হোক। কারণ, সাবেক খলীফাগণ হলফের দ্বারা কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

فَقَالُوْا حَقٌّ قَضٰى بِهَا ঃ মাগাযী পর্বে আছে قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ قَبْلَكَ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ অর্থাৎ, তারা বললেন, এটা সঠিক বিধান, কারণ হলফের দ্বারা রসূল (স.) ও আপনার পূর্বের খলীফাগণ কিসাস গ্রহণের ফায়সালা করেছেন।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, আসল ঘটনা হলো, রসূল (স.) কিংবা খলীফাদের কারো থেকে হলফের মাধ্যমে কিসাসের নির্দেশ প্রদান প্রমাণিত নেই। তবে আব্দুল মালিক হলফের দ্বারা কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দিতেন। বস্তুত এ কারণেই উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) এ ব্যাপারে পরামর্শের মুখাপেক্ষী হন।

مَا تَقُوْلُ يَا اَبَا قِلَابَةَ ঃ দিয়াত (রক্তপণ) পর্বে আবু কিলাবার এ উক্তিটুকু অতিরিক্ত এসেছে যে, "আমি বললাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনার পাশে বড় বড় সেনাপতি ও আরবের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট। যদি তাদের মধ্য হতে ৫০

www.e-ilm.weebly.com

ব্যক্তি দেমাস্কের কোন এক বিবাহিত ব্যক্তির ব্যাপারে না দেখে এ সাক্ষ্য দেয় যে, সে ব্যভিচার করেছে, তবে কি আপনি তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করবেন? তিনি জওয়াবে বলেন, 'না'। পুনরায় আমি বললাম, যদি তাদের ৫০ ব্যক্তি হিসসের জনৈক ব্যক্তির ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চোর, তবে আপনি তার হস্ত কর্তন করবেন? জওয়াবে তিনি বলেন, 'না'।"

قُلْتُ مَا عَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِى الْإِسْلَامِ ঃ সারকথা হলো, আবু কিলাবার মতে ইসলামে হত্যা বৈধতার কারণ তিনটি। যেহেতু হলফ গ্রহণ ঐ তিনটার মধ্যে নেই, তাই হলফের মাধ্যমে কিসাস বা কতলের নির্দেশ প্রদান বৈধ হবে না।

فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رض ঃ অর্থাৎ হত্যার কারণ 'তিন' এ সীমাবদ্ধতাকে চ্যালেঞ্জ করে হযরত আম্বাসা হাদীসে উরনাইন পেশ করে বলেন, উরনাইন ঘটনাতে উক্ত তিন কারণের কোন কারণ অনুপস্থিত, তথাপি সেখানে হত্যার ঘটনা ঘটে। ফলে এ থেকে অনুমিত হয় যে, হত্যার কারণ তিন-এ সীমাবদ্ধ নয়।

قُلْتُ إِيَّاىَ حَدَّثَ أَنَسٌ رض ঃ এর দ্বারা হযরত আবু কিলাবার উদ্দেশ্য এ কথা বর্ণনা করা যে, উরনাইনের ঘটনা ঐ তিন কারণের বাইরে নয়।

فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هٰؤُلَاءِ ঃ অর্থাৎ ঐ তিন কারণের কোনটি এ ঘটনায় অনুপস্থিত?

فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ ঃ আম্বাসার এ উক্তি (১) বিস্ময়াভিভূত ও (২) আবু কিলাবার উক্তি সমর্থন জ্ঞাপক। কিন্তু কোন কোন সময় যেহেতু এ শব্দটি নাকচ বা অস্বীকারের জন্যও আসে, তাই আবু কিলাবা তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, হযরত আনাসের যে হাদীস আমি বর্ণনা করলাম, তা বানোয়াট বা ভিত্তিহীন মনে করে আমাকে অপবাদ দিচ্ছেন?

قَالَ حَدَّثَنَا بِهٰذَا أَنَسٌ رض ঃ আর দিয়াত পর্বে বর্ণনাটি এভাবে এসেছে যে, আম্বাসা বলেন, আমি আজকের ন্যায় কখনও শুনিনি। অতঃপর আমি (আবু কিলাবা) বললাম, জনাব আম্বাসা! আপনি আমার হাদীস প্রত্যাখ্যান করেছেন? জওয়াবে তিনি বলেন, না; কিন্তু আপনি হাদীসটি এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে (ব্যাখ্যায়) বর্ণনা করেছেন। আম্বাসার এ উক্তিতে আবু কিলাবার ঐ দাবীর প্রতি সমর্থন রয়েছে যে, হলফ গ্রহণের ভিত্তিতে কিসাসের নির্দেশ প্রদান জায়েয নেই।

(কস্তলানী, লামিউদ্ দারারী)

قَسَامَةٌ ঃ قَسَامَة (قَافْ শব্দে যবর যোগে) শব্দটি হয়ত হলফ অর্থবিশিষ্ট قَسَمٌ থেকে নির্গত। অর্থাৎ قَسَمَ عَلَى الدَّمِ (প্রতিশোধ গ্রহণের হলফ করা)-কে

www.e-ilm.weebly.com

বিশেষভাবে قَسَامَة বলা হয়। অথবা قَسَامَة শব্দটি قِسْمَت থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ বণ্টিত, ভাগ ইত্যাদি। কেননা, বিভিন্ন উক্তির প্রভেদের ভিত্তিতে হলফ করাটা বাদী ও বিবাদীর দায়িত্বে বণ্টিত ও বিভক্ত।

ইমামুল হারামাইন[১] বলেন, অভিধানবেত্তাদের মতে হলফকারী দলের নাম قَسَامَة আর ফোকাহায়ে কেরামের মতে, قَسَامَة হলো হলফ করার নাম।

আল্লামা কাজী আয়াজ বলেন, হলফের হাদীসটি দ্বীনের একটি প্রধান ধারা। জনকল্যাণকর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। জমহুরে উলামায়ে কিরাম হাদীসটি বিশেষভাবে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য গ্রহণের পন্থায় বিভিন্নতা রয়েছে।

(শরহে মুসলিম লিল ইমাম নববী, লামিউদ্ দারারী, তানযীমুল আশতাত)

উলামায়ে কিরামের মতামত ঃ যদি কোন এলাকায় নৃশংস কোন হত্যাকাণ্ড ঘটে বা কারো লাশ উদ্ধার হয় আর ঘাতক অজ্ঞাত থাকে বা তার কোন হদিস না পাওয়া যায় তবে নিহতের পরিবারের কর্তব্য হল, আদালতের শরণাপন্ন হয়ে প্রমাণাদি পেশ করা। যদি তারা উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে হত্যাকারী হতে কিসাস নেয়া হবে। আর যদি তারা প্রমাণ পেশ করতে না পারে, তাহলে আহনাফের মতে যাদের ব্যাপারে বাদী পক্ষের সন্দেহ হয়, তাদের মধ্য হতে (বাদী পক্ষের নির্বাচিত) ৫০ ব্যক্তি এ মর্মে হলফ করবে যে, "আমরা তাকে হত্যা করিনি, আর কে এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাও জানি না।" যদি বিবাদী পক্ষ বাস্তবেই এভাবে হলফ করে অথবা হলফ করতে অস্বীকার করে তবে উভয় অবস্থায় তাদের উপর দিয়াত আদায় করা ওয়াজিব হবে। চাই নিহত স্থলে (হত্যাকারী সনাক্তের) কোন আলামত পাওয়া যাক বা না যাক।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি উদ্ধারকৃত এলাকায় হত্যার আলামত (আর আলামত হলো ইমাম মালেক ও শাফেয়ীর মতে, (১) জনতা প্রত্যক্ষ করতে পারে এমন হত্যার আলামত সেখানে থাকে (২) প্রকাশ্য শত্রুতা থাকার ব্যাপারে বাদীর কাছে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকা (৩) একজন ন্যায়পরায়ণ অথবা একদল সাধারণ লোকের এ মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করা যে, অত্র এলাকাবাসীই তাকে হত্যা করেছে) মওজুদ থাকে, তবে বাদী পক্ষের ৫০ জনের থেকে হলফ নেয়া হবে। যদি তারা হলফ করে তবে বিবাদীদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে। চাই স্বেচ্ছায় এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোক কিংবা দুর্ঘটনাবশত। ইমাম মালেক বলেন, স্বেচ্ছায় হত্যার ক্ষেত্রে হলফের দ্বারাই হত্যার হুকুম দেয়া হবে। ইমাম শাফেয়ীরও এক উক্তি এটা। আর তিনি দুর্ঘটনাবশত (ভ্রমজনিত) হত্যায় দিয়াত ওয়াজিব বলেন। ইমাম আহমাদেরও এক উক্তি এটা।

টীকা ঃ ১. ইমামুল হারামাইন। প্রকৃত নাম ঃ আব্দুল মালিক বিন আব্দির রহমান বিন ইউসুফ (রহ.)। তিনি ৪১৯ হিজরীতে জন্ম এবং ৪৭৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

আর যদি বাদীপক্ষ হলফ না করে, তবে বিবাদীরা হলফ করবে। যদি তারা সত্যই হলফ করে, তবে তাদের উপর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। আর যদি নিহতস্থলে আলামত না পাওয়া যার এবং এলাকাবাসী হলফ করে, তাহলে তখন তাদের মতে আর দিয়াত ওয়াজিব হবে না। (হেদায়া, লামিউদ্ দারারী ৩য় পৃঃ ৩৮৮)

জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস বিশারদদের কাছে এ কথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) قَسَامَة-এর হাদীস অবলম্বন করেন নি, (অর্থাৎ তা অস্বীকার করেছেন)। ইমাম বুখারীও এ মতকে পছন্দ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, ইমাম বুখারী قَسَامَة-কে অস্বীকার করেন নি। অনুরূপভাবে উমর বিন আব্দুল আজিজও অস্বীকার করেননি। বস্তুত এ কারণেই ইমাম বুখারী নিজেই তার কিতাবে قَسَامَة-এর অধ্যায় সংযুক্ত করে তার মধ্যে উমর বিন আব্দুল আজিজের হাদীসসহ আবু কিলাবার হাদীস উল্লেখ করেছেন। তবে বক্ষমান হাদীসটি সর্বোচ্চ এ কথা বুঝায় যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) হলফের ভিত্তিতে হত্যার অস্বীকারকারী ছিলেন, মূলত হলফের অস্বীকারকারী নন। আবু কিলাবার হাদীস থেকে এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ঃ যে সমস্ত ক্ষেত্রে বদলা গ্রহণ সম্ভব, সেখানেই কেবল এ হুকুম প্রযোজ্য। যেমন হাত, পা ইত্যাদি। আর যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে দিয়াত ওয়াজিব হবে। যেমন, হাঁড় ভেঙ্গে দেয়া ইত্যাদি।

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَوَفِّيكَ مُمِيتُكَ ঃ প্রকৃতপক্ষে এটা সূরা আলে-ইমরানের আয়াত। আল্লাহর উক্তি ঃ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي-এর সাথে সঙ্গতি থাকায় এখানে আলোচ্য আয়াতটি পুনঃ উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) مُتَوَفِّيكَ-এর ব্যাখ্যা مُمِيتُكَ দ্বারা করেছেন। অর্থাৎ আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করবেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে আয়াতের মাঝে অগ্র-পশ্চাৎ নীতি সক্রিয়। কারণ, আসমানে উত্থিতের ঘটনা পূর্বের আর মৃত্যুর ঘটনা হলো পরের। উদ্দেশ্য হলো, ইহুদীরা আপনাকে (ঈসা) হত্যার চেষ্টা করলেও বাস্তবে হত্যা করতে পারবে না। কারণ, আপনার স্বাভাবিক মৃত্যু হবে। ইহুদীরা আপনাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে হত্যাকারীদের হাত থেকে রক্ষার্থে আমি আপনাকে তখন নিজের কাছে (ঊর্ধাকাশে) উঠিয়ে নিব।

এখানে مُتَوَفِّيكَ-কে পূর্বে উল্লেখ করে ভবিষ্যতে ঘটমান সকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তবে অধিকাংশ হযরত مُتَوَفِّيكَ-এর অনুবাদ করেছেন "সশরীরে গ্রহণ"। উদ্দেশ্য হলো, আমি আপনাকে ইহুদীদের হাতে ছেড়ে দিব না; বরং আপনাকে সশরীরে নিয়ে যাব। আর তা এভাবে সম্পন্ন হবে যে, সংকটময় মুহূর্তে

www.e-ilm.weebly.com

আমি আপনাকে নিজের কাছে আসমানে উঠিয়ে নিব। (বিস্তারিত দ্রষ্টব্য মা'আরেফুল কুরআন)

জ্ঞাতব্য ঃ মূল ঘটনা হলো, হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর শত্রুদের নির্যাতন বৃদ্ধি পেলে তিনি অত্যন্ত বিচলিত এবং খুব ব্যথিত হন। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁকে নিম্নোক্ত চারটি সুসংবাদ শুনিয়ে আশ্বস্ত করেন যে, إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ। অর্থাৎ (১) আপনি স্বাভাবিক মৃত্যুপ্রাপ্ত হবেন। (২) আপনাকে আমার কাছে সাময়িকের জন্য উঠিয়ে নিব। (৩) কাফেরদের পঙ্কিলতা থেকে আপনাকে নিষ্কলুষ রাখব এবং (৪) আপনার অনুসারীদেরকে কেয়ামতের দিন কাফেরদের উপর মর্যাদা প্রদান করবো।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে শায়েখ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ 'আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে লিখেন, উপরোক্ত চার সুসংবাদকে পরিমার্জিত রূপ, চূড়ান্ত সাহিত্যপূর্ণ ভাষা, আকর্ষণীয় ভঙ্গি এবং ক্রমপর্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বাভাবিক মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন। ফলে চক্রান্তকারীরা তাঁর কেশাগ্র স্পর্শ কিংবা তাঁর নিকট পর্যন্ত পৌঁছতেও সক্ষম হবে না। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ তাঁকে আসমানে উত্তোলন, ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান, আসমানে ইবাদত পালন এবং দীর্ঘদিন আল্লাহ পাকের বন্দেগী করতে সুদীর্ঘ জীবন লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন। তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাকে কাফেরদের নষ্টামি ও পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও আসমানে তুলে নেয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। এ সুসংবাদ সাধারণভাবে ব্যাপকভিত্তিক প্রদত্ত হওয়ায় হযরত ঈসা (আ.)-এর আসমানে উত্থান এবং শেষ জামানায় দুনিয়ায় অবতরণের সমগ্র কাল এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ফলে এটা তাঁর জন্য একটি বিরাট সুসংবাদ যে, তিনি পূর্বে ও পরে সর্বদা কাফেরদের ছত্রছায়া থেকে মুক্ত ও নির্মল-নিষ্কলুষ থাকবেন। মৃত্যু ও আসমানের উত্থান ঘটনাদ্বয় এক একটি বিশেষ ও নির্দিষ্ট (খাস) সময়কেন্দ্রীক হওয়ায় বিষয়টি প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষের বিষয়টি عَامٌ হওয়ায় যেহেতু সকল যুগ এর আওতাধীন তাই তাকে পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যক্তিগত উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের সুসংবাদ প্রদানের পাশাপাশি কাফেরের উপর তাঁর অনুসারীদের উচ্চ মর্যাদার দৃপ্ত ঘোষণাও প্রদান করেছেন। যাতে তাঁর চোখ শীতল হয় এবং অন্তর খুশিতে ভরে যায়। (বাহারে মুহীত্ব হতে উদ্ধৃত)।

(লামিউদ্ দারারী ৩য় পৃ ১৯৮)

إِنَّ أَوَّلَ الْخَلَائِقِ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ (কেয়ামতের দিন সকলের পূর্বে হযরত ইব্রাহীমকে (আ.) বস্ত্রাবৃত করা হবে) ঃ এটা হযরত ইব্রাহীম

www.e-ilm.weebly.com

(আ.)-এর আংশিক বা এক বিশেষ পর্যায়ের মর্যাদা মাত্র। তাই এ থেকে আবশ্যক হয় না যে, ইব্রাহীম (আ.) আমাদের নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর থেকে সর্বদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ, আংশিক মর্যাদা সামগ্রিক মর্যাদাকে ব্যাহত করে না বা তাঁর পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, এক হাদীসে আছে ঃ اِنَّ نَبِيَّنَا ﷺ يَخْرُجُ فِى النَّاسِ مِنْ قَبْرِهِ فِىْ ثِيَابِهِ الَّتِىْ دُفِنَ فِيْهَا অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন দাফনকৃত বস্ত্রেই রসূল (স.) সকলের সামনে কবর হতে আত্মপ্রকাশ করবেন। সুতরাং এ বর্ণনা অনুসারে রসূল (স.)-কে কেয়ামতের ময়দানে কাপড় পরানোর প্রয়োজন পড়বে না।
(মেরকাত)

সূরা আন'আম

হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন, সূরা আনআমের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ সূরার কয়েকটি আয়াত ব্যতিরেকে বাকী সকল আয়াত মক্কায় একসাথেই অবতীর্ণ হয়। সূরাটি অবতরণকালে তার সাথে ৭০ হাজার ফেরেশতা তাসবীহ পড়তে পড়তে আগমন করেন।

তাফসীর শাস্ত্রবিদ হযরত মুজাহিদ, হযরত কালবী, হযরত কাতাদাহ প্রমুখ অনুরূপ মত ব্যক্ত করেন। আবু ইসহাক ইস্ফিরাইনী বলেন, এ সূরায় একত্ববাদের সকল মৌলিক বিধি-বিধান ও নিয়ম-কানুন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (মা'আরেফুল কুরআন)

فِتْنَتُهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ ঃ এ শব্দ দ্বারা কুরআনের আয়াত ঃ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوْا وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ-এর ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে এসেছে, লেখক বলেন ঃ আমার মতে... فِتْنَتُهُمْ-এর পূর্বে مُضَافْ উহ্য রয়েছে। আসলে হবে مَعْذِرَةُ فِتْنَتِهِمْ আর ফেতনা দ্বারা উদ্দেশ্য اِفْتِنَانُهُمْ بِالْاَوْثَانِ وَشِرْكُهُمْ فِى الدُّنْيَا মর্মার্থ হলো, এ সমস্ত লোক অর্থাৎ মুশরিকরা দুনিয়াতে বিভিন্ন প্রতিমা ও নামসর্বস্ব মা'বুদ কর্তৃক ফেতনার শিকার ছিল এবং মনে করত যে তাদের উসিলায় তারা পার পেয়ে যাবে। কিন্তু কেয়ামতের ময়দানে যখন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করবে, তখন তারা চরমভাবে ঘাবড়ে গিয়ে ও ভয়ে নিজেদের নির্দোষ হওয়া প্রকাশ করবে এবং আপন মনে বলে উঠবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ আমাদের প্রভু আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না।"

مَعْرُوْشَاتٌ ঃ এটা প্রত্যেক তৃণগুল্ম বা লতাবিশিষ্ট গাছ, যা মাচার উপর চড়ানো হয় বা তার উপর ভর করে বেড়ে ওঠে এবং বেঁচে থাকে। যেমন, আঙ্গুর, কদু (লাউ), কুমড়া ইত্যাদি গাছ। আর وَغَيْرَ مَعْرُوْشَاتٍ ঐ সমস্ত গাছকে বলে,

www.e-ilm.weebly.com

যা আপন কাণ্ডে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ। যেমন, খেজুর, আম, কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ। কিংবা লতাবিশিষ্ট গাছ, কিন্তু সেগুলো মাটিতেই বিস্তৃত হয় এবং উপরে চড়ানো হয় না। যেমন, খরমুজ, খরবুযা ইত্যাদি।

لَلَبَسْنَا لَشَبَّهْنَا ঃ এর দ্বারা কুরআনের আয়াত وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُوْنَ-এর ব্যাখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, আমি যদি তাদের কাঙ্ক্ষিত মোজেযা প্রদর্শন তথা ফেরেশতা প্রেরণ করি, তবে তাতে তাদের কোন লাভ হবে না। বরং হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, ফেরেশতাদের অবতরণ দু'ভাবে হতে পারে। (১) আসল আকৃতিতে। এ অবস্থায় কোন মানুষ তাদের দেখতে পারবে না। কেননা আসল আকৃতিতে ফেরেশতা দেখার শক্তি কোন মানুষের নেই। ফলে দেখতে না পেয়ে তাদের সাথে ধাক্কা খেয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যাবার আশঙ্কা রয়েছে। (২) মানুষ আকৃতিতে, এ অবস্থায় তাদের যে মূল সন্দেহ, তা দূরীভূত হবে না। কেননা, তারা বলবে, এরা তো আমাদের মত মানুষ বৈ নয়!

مَلَكُوْتٌ مَلَكٌ ঃ এখানে مَلَكُوْت-এর ব্যাখ্যা مَلَك দ্বারা করা হয়েছে। কুরআনের কোন কোন অনুবাদক مَخْلُوْقَات তথা সৃষ্টজীবন আবার কেউ عَجَائِبَات তথা বিস্ময়কর বস্তু দ্বারা مَلَكُوْت-এর অনুবাদ করেছেন।

مِثْلُ رَهَبُوْت خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوْت ঃ অর্থাৎ শব্দমাপে مَلَكُوْت টা رَهَبُوْت ও رَحَمُوْت-এর ন্যায়।

تَرْهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرْحَمَ ঃ এটা উল্লিখিত দৃষ্টান্তের (مِثْل) ব্যাখ্যা। সারমর্ম হলো, দয়া ও কোমলতা প্রদর্শনের চেয়ে ভীতি প্রদর্শন ও শিষ্টাচার (আদব) শিক্ষা দেয়া শ্রেয়। যেমন, 'দ্বীনি শিক্ষা প্রদান, জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য কঠোরতারোপ এবং আদব তথা ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া অতিমাত্রায় স্নেহ ও নরমপন্থা অবলম্বন থেকে অধিক ফলপ্রসূ হয়। হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, اِنَّ مَقَامَ الْخَشْيَةِ أَعْلَى وَأَفْضَلُ مِنْ مَقَامِ الرَّجَاءِ অর্থাৎ আশান্বিত অবস্থা হতে ভীতি ও শংকাগ্রস্ত অবস্থাটা বেশী ভাল এবং উচ্চ পর্যায়ের। (লামিউদ্ দারারী)

مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ (গায়েবের চাবি পাঁচটি) ঃ হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ.) মা'আরেফুল কুরআনে লিখেন, সকল গায়েবী (অদৃশ্য) বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহই একমাত্র জানেন। আল্লাহ্ ছাড়া এ জ্ঞান কারো নেই। গায়েবী জ্ঞান তো দূরের কথা, অনুধাবন ও চাক্ষুষ দর্শনীয় বিষয়াবলীর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানও অর্জিত হয় না আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছাড়া। সেজন্য নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (স.) যাকে প্রভূত জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং যার হাতে পৃথিবীর সকল খাজানার চাবি

www.e-ilm.weebly.com

তুলে দেয়া হয়েছে। তাঁকে পর্যন্ত এ ঘোষণা করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ অর্থাৎ বলুন, আমি আমার নিজের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নই। তবে আল্লাহ যা চান সেটাই হয়। আর যদি বাস্তবেই আমি গায়েব জানতাম, তবে কল্যাণ আর কল্যাণই শুধু অর্জন করতাম, অকল্যাণ কিছুতেই আমাকে স্পর্শ করত না। (আরাফ, আয়াত ঃ ১৮৮)

বস্তুত এ জন্যই রসূল (স.) বিদায় হজ্জের এক পর্যায়ে বলেন, لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ অর্থাৎ ঘটনা পরে যা ঘটল তা যদি পূর্বে হতে আমার জানা থাকত, তবে আমি কখনই হাদী তথা কুরবানীর পশু নিয়ে আসতাম না।

মুহাদ্দিসগণের উক্তি মতে, 'হাদীসে জিবরাঈলের' ঘটনাটি রসূল (স.)-এর শেষ জীবনের একটি ঘটনা। এ হাদীসে কেয়ামত কায়েমের সময় সংক্রান্ত জিবরাইল (আ.)-এর এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূল (স.) বলেন ঃ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কি জিজ্ঞাসাকারী হতে এ ব্যাপারে অধিক অবগত? (অর্থাৎ অবগত নয়)। অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে এসেছে যে, রসূল (স.) বলেন, জিবরাঈল (আ.) প্রস্থান নাগাদ আমি তাকে চিনতে পারিনি। তিনি উঠে চলে যাবার পরে জানতে পারি যে, তিনি জিবরাঈল (আ.) ছিলেন।

ইফকের ঘটনায় দীর্ঘদিন ওহী না আসায় রসূল (স.) অত্যন্ত চিন্তিত ও বিচলিত হন এবং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হন না।

অবশ্য শরয়ী আহকামের ইলম রসূল (স.)-কে পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হয়। আর বিশ্ব সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান আল্লাহ তাকে যতটুকু অবগত করান তিনি ততটুকুই অবগত ছিলেন। তবে আমাদের নবী (স.) এ ব্যাপারেও পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকলের চেয়ে অধিক জ্ঞান লাভ করেন। আল্লাহ তাঁকে এত বিপুল পরিমাণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য দান করেন, যা নিরূপণ করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে মনে রাখতে হবে, কেউ আল্লাহর পক্ষ হতে গায়েবী কতক বিষয় জানলেই তাকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্যজ্ঞানী) বা فُلَانٌ يَعْلَمُ الْغَيْبَ তথা অমুক গায়েব জানে-বলা জায়েয হবে না। কারণ, এ বৈশিষ্ট্য একমাত্র আল্লাহর। তাই হাদীসে এভাবে বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং যদিও আল্লাহর নিকট কোন কিছুই গায়েব নয়, তথাপি তাঁর শানে إِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ তথা আল্লাহ গায়েব জানেন না-এ কথা বলা জায়েয হবে না; বরং চরম ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি হবে। অনুরূপভাবে কারো পক্ষে إِنِّي أَكْرَهُ الرَّحْمَةَ বলাও অত্যন্ত অনুচিত ও গর্হিত হবে। যদিও رَحْمَة অর্থ বৃষ্টি উদ্দেশ্য নেয়া

www.e-ilm.weebly.com

হোক না কেন। عَالِمُ الْغَيْبِ-এর ব্যাপারটিও ঠিক এমন। অর্থাৎ عِلْمِ غَيْبِ সম্পর্কে কিছু অবগত হলেও তাকে عَالِمُ الْغَيْبِ বলা জায়েয় হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য নিছক ধারণা ও অনুমানভিত্তিক নয় এবং ঐ জ্ঞানও নয়, যা বিভিন্ন পূর্বাভাস ও বাহ্যিক অবস্থা ও আলামত হতে লাভ হয়। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, অসংখ্য গায়েবী বিষয়ের মধ্য হতে মাত্র ৫টি কেন উল্লেখ করা হল। উলামায়ে কেরাম এ প্রশ্নের বহুবিধ জওয়াব দিয়েছেন। যথা—

(১) সংখ্যার নির্দিষ্টতা তার আধিক্যকে যেমনি নাকচ করে না তেমনি তার পরিপন্থীও নয়। (কিরমানী)

(২) তৎকালীন সময়ে মানুষ এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, তারা আলোচ্য পাঁচটি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। তাই তাদের এহেন অর্থহীন বিশ্বাস চূর্ণ করতে বিশেষভাবে আলোচ্য এ পাঁচটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

(৩) কোন কোন ভাষ্যমতে প্রকাশ, জনৈক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে এ পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। সেজন্য (জওয়াবেও) আল্লাহ্ পাক উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন।

(৪) সাধারণত মানুষ এ পাঁচ বিষয়ে জানতে আগ্রহী থাকে বিধায় এগুলো উল্লেখ করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহই সংরক্ষণ করেন।

(৫) জ্যোতিষী, হস্তবিশারদ প্রমুখ ভবিষ্যৎ জ্ঞানের দাবীদাররা সাধারণত যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে মানুষদের আগাম অবহিত করত, তা ছিল এ পাঁচটি বিষয়।

(৬) এ পাঁচ বিষয় উল্লেখের দ্বারা সীমিতকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হয়েছে মাত্র। তবে এর মধ্যে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর (اَكْوَانِ غَيْبِيَّة) প্রধান দিকগুলো এসে গেছে। কেননা গায়েবী বিষয় দু'প্রকার। (১) হয়ত আহকাম জাতীয় তথা অদৃশ্য নির্দেশাবলী ও (২) অদৃশ্য ঘটনাবলী। গায়েবী তথা অদৃশ্য ঘটনাবলী হয়ত স্থানবাচক হবে অথবা কালবাচক। কাল আবার তিন প্রকার। (১) অতীত (২) বর্তমান ও (৩) ভবিষ্যৎ। কুরআনের আয়াত ঃ بِاَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ-এর মধ্যে স্থানবাচক গায়েবের প্রসঙ্গ এসেছে, مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا-এর মধ্যে ভবিষ্যৎ কালবাচক, مَافِى الْأَرْحَامِ এর মধ্যে বর্তমানকাল বাচক এবং وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ-এর মধ্যে অতীতকালীন গায়েবী বিষয়ের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনাবলীর মৌলিক দিকগুলোর প্রতি অতি চমৎকারভাবে ইঙ্গিত রয়েছে।

(আল্লামা উসমানী প্রণীত ফাওয়ায়েদুল কুরআন)

www.e-ilm.weebly.com

(৭) গায়েবী বিষয় পাঁচটি বলে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্বকে এ পাঁচটি বিষয় বেষ্টন করে রয়েছে। কুরআনের আয়াত ঃ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْأَرْحَامِ-এর মধ্যে মানুষের দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থার পতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে গর্ভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো ঃ অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষ গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করার দাবী করে থাকে। কিন্তু যখন এ আয়াতে গর্ভের প্রকৃতাবস্থা সম্পর্কে মানুষের ধারণা লাভের দাবী নাকচ করা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে অবগতির সম্ভাবনাও নাকচ হয়ে গেছে। وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ-এর মধ্যে উর্ধজগতের সকল বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তবে বৃষ্টিকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, বৃষ্টির নির্দিষ্ট পূর্বাভাষ রয়েছে, যা দেখে অতি সহজেই বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টির একটি ধারণা লাভ করা যায়। তথাপি এ ধারণা নাকচ করা হয়েছে। কারণ, এ পূর্বাভাষ হতে নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না (অর্থাৎ দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না যে, বৃষ্টি হবেই)। উর্ধজগতের বিষয়ের মধ্যে যার পূর্বাভাস আছে অর্থাৎ, বৃষ্টি, আয়াতে যখন এই বৃষ্টির জ্ঞানকে নাকচ করা হয়েছে তখন স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য জ্ঞানও নাকচ হয়ে গেছে। وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا-এর মধ্যে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু غَدًا শব্দটির একেবারে নিকটবর্তী কাল বুঝায়, তাই নিকটবর্তী-দূরবর্তী সকল কাল অর্থাৎ পুরো ভবিষ্যৎ এর মধ্যে এসে গেছে। সুতরাং মানুষ যখন নিকটবর্তী সময়ের প্রকৃত খবর রাখে না তখন দূরবর্তী সময় ও যুগ সম্পর্কেও যে বে-খবর তা বলাই বাহুল্য। لَاتَدْرِى نَفْسٌ بِاَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ-এর দ্বারা ভূগর্ভস্থ জগতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ স্বদেশে ইন্তেকাল করে। তথাপি যখন সে জানে না যে, তার দাফন কোথায় হবে, তখন ভূগর্ভের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে না জানাটাই স্বাভাবিক। إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ-এর মধ্যে পারলৌকিক সমগ্র বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, কেয়ামত সংঘটনের দিনটা মূলতঃ অনন্ত আখেরাতেরই প্রভাত দিন। সুতরাং যখন মানুষের এই জ্ঞানকে নাকচ করা হয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই পারলৌকিক সকল বিষয়ের জ্ঞানও নাকচ হয়ে গেছে।

(ফাতহুল বারী, আইনী)

এখানে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, কেউ কেউ দাবী করেন যে, উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের মধ্য হতে কোনো কোনো বিষয়ে আমরাও অবগত হতে পারি। কেননা এ উন্নততর বিজ্ঞানের আধুনিক যুগে বহু মেশিন ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবিত ও আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দ্বারা কবে নাগাদ বৃষ্টি হবে, কত পরিমাণ হবে, সব জানা যায়। সেজন্যই তো বাস্তবেও আবহাওয়া অধিদপ্তর সে সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জনগণকে আবহাওয়া বিষয়ক আগাম খবর বা সংকেত দিয়ে থাকেন। তদ্রূপ

www.e-ilm.weebly.com

এক্স-রে (X-ray)-এর সাহায্যে গর্ভস্থ সন্তানের অবস্থান এবং সন্তান ছেলে না মেয়ে তাও জানা যায়। এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর দেয়া যেতে পারে।

(১) আল্লাহ্ পাক যে জ্ঞানের কথা আয়াতে নাকচ করেছেন, তার দ্বারা আংশিক জ্ঞান উদ্দেশ্য নয়; বরং পূর্ণ ও সামগ্রিক জ্ঞান উদ্দেশ্য। হতে পারে কোন মেশিন বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ আংশিক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ কতিপয় মহিলার গর্ভস্থ ভ্রূণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হতে পারে অথবা মাঝে মধ্যে আবহাওয়া ও বৃষ্টির আগাম সংবাদটা অর্জিত হতে পারে। কিন্তু এমন কোন নিশ্চিত সূত্র পাওয়া যায় না যার দ্বারা সকল মহিলার গর্ভ সম্পর্কে অথবা সব সময় আবহাওয়া ও বৃষ্টির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

(২) জ্ঞান দ্বারা ধারণাভিত্তিক জ্ঞান উদ্দেশ্য নয়; বরং অকাট্য বা নিশ্চিত জ্ঞান উদ্দেশ্য। প্রত্যেকেই এটা ভাল করে জানে যে, 'এক্সরে'-এর সাহায্যে যে জ্ঞান অর্জিত হয়, অনুরূপ যন্ত্রপাতি ও মেশিনাদির সাহায্যে সে জ্ঞান লাভ হয়, তা নিশ্চিত নয়; বরং ধারণাভিত্তিক মাত্র। বস্তুত এ কারণেই এক্সের মাধ্যমে যা নির্ণয় করা হয়, অনেক সময় তা ভুল প্রমাণিত হয়। তদ্রূপ আবহাওয়া বা বৃষ্টি সম্পর্কে যে আগাম খবর সংকেত দেয়া হয়, তাও সম্পূর্ণ ধারণা ও অনুমানের উপর ভিত্তি করেই দেয়া হয়। ফলে সঙ্গত কারণেই অনেক সময় তা বাস্তবের বিপরীতও হয়।

(৩) কুরআন গায়রুল্লাহ্ হতে যে জ্ঞান নাকচ করা হয়েছে, তার দ্বারা ঐ জ্ঞান উদ্দেশ্য, যা সরাসরি অর্জিত হয়। সুতরাং যে জ্ঞান প্রক্রিয়া ও যন্ত্র-পাতির মাধ্যমে অর্জিত হয়, তা ইলমে গায়েব নয়।

(৪) তাফসীরে মাজহারীতে আছে, কুরআনিক পরিভাষায় غَيْب দ্বারা ঐ সকল বস্তু উদ্দেশ্য, যা আজও অস্তিত্বে আসেনি বা উদ্ভাবিত হয়নি। তাই যন্ত্রপাতি ও প্রক্রিয়াগতভাবে অর্জিত জ্ঞানকে কুরআনিক ভাষায় ইলমে গায়েব বলা সঙ্গত হবে না।

(৫) মা'আরেফুল কুরআন প্রণেতা মুফতী শফী (রহ.) তাঁর এ অসাধারণ তাফসীর গ্রন্থে লিখেন, এক্সরে যন্ত্র এটা নির্ণয় করতে পারে না যে, গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে। অতএব এ দাবীই সঠিক নয়। (মা'আরেফুল কুরআন)

وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا ঃ حَطِيْم-এর আভিধানিক অর্থ, মচকে যাওয়া, ভাঙ্গা, বিরত রাখা এবং বাদ দেয়া। উদ্দেশ্য হলো, যেহেতু আজকের হাতীমে কা'বার স্থানটুকু মূল কা'বার অন্তর্ভুক্ত না করে বাদ রাখা হয়, সেজন্য তাকে حِجْر (পরিত্যক্ত) বলে।

সূরা আ'রাফ

أَرِنِىْ أَعْطِنِىْ ঃ যেহেতু আয়াতোক্ত أَرِنِىْ শব্দটি দু' مَفْعُول দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, আর এখানে দ্বিতীয় مَفْعُول-এর উল্লেখ নেই, সেজন্য أَرِنِىْ-এর ব্যাখ্যা

www.e-ilm.weebly.com

أَعْطِنِىْ-এর দ্বারা করা হয়েছে। বস্তুত এ কারণেই মুফাসসিরীনে কিরাম এখানে দ্বিতীয় একটি مَفْعُوْل উহ্য মানতে বাধ্য হয়েছেন।

তাফসীরে জালালাইন গ্রন্থে আছে, رَبِّ إِرِنِىْ نَفْسَكَ أَنْظُرْ اِلَيْكَ লামিউদ্ দারারীর টিকাকার বলেন, আমার বিশ্বাস ব্যাখ্যাকারগণ أَرِنِىْ-এর ব্যাখ্যা أَعْطِنِىْ বা مكنى-এর দ্বারা করতে বাধ্য হয়েছেন নিছক رَبِّ أَرِنِىْ أَنْظُرْ اِلَيْكَ-এর মধ্যে جَزَاء ও شَرْط এক হওয়ার অসঙ্গতি দূর করতে। উদ্দেশ্য হলো, প্রভু, আপনাকে স্বচক্ষে দেখার শক্তি আমাকে প্রদান করুন। আর তা এভাবে যে, আপনি সামনে আত্মপ্রকাশ করুন, যাতে আমি আপনাকে সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি।

(কস্তলানী)

لَنْ تَرَانِىْ (কখনও আপনি আমাকে দেখতে পারবেন না) ঃ মুতাযিলা সম্প্রদায় এ আয়াতের ভিত্তিতে দুনিয়া-আখেরাতে প্রভু-দর্শন না হওয়ার উপর প্রমাণ পেশ করে। কারণ, لَنْ বর্ণটি نَفِى تَاكِيْد তথা দৃঢ়তাসূচক নেতিবাচকের অর্থ দেয়। আর তার মধ্যে দুনিয়া-আখেরাত উভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তাদের জওয়াবে বলেন (১) এখানে لَنْ বর্ণটি শুধু দুনিয়াতে আল্লাহকে না দেখার ব্যাপারটি দৃঢ়তার সাথে বর্ণনা করেছে। কারণ বিশুদ্ধ হাদীসে আখেরাতে আল্লাহকে চাক্ষুষভাবে দেখার কথা বর্ণিত হয়েছে। (২) এখানে لَنْ تَوْقِيْت-এর জন্য; تَاكِيْد-এর জন্য নয়। যেমন কুরআনের অপর আয়াত وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا অর্থাৎ কখনও তারা তোমাকে আশ্বাস দিবে না-এর মধ্যে لَنْ টা تَوْقِيْت-এর জন্য এসেছে।

ইবনে মাহদী বলেন, যদি আল্লাহর দর্শন বাস্তবে অসম্ভবই হতো, তবে আল্লাহ্ সম্বন্ধে পূর্ণ অবগতি থাকা সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.) এ ব্যাপারে কেন উদ্যোগী হয়েছিলেন?

দার্শনিকগণ বলেন, আল্লাহ পাক পাহাড়ের স্থিতির সাথে তাঁর দর্শনকে সংশ্লিষ্ট করায় দর্শনের সম্ভাবনা আরও প্রবল হয়েছে। কারণ, পাহাড়ের স্থিতিটা অসম্ভব কিছু নয়।

لَاتُخَيِّرُوْنِىْ مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِيَاءِ (তোমরা আমাকে 'শ্রেষ্ঠ নবী' আখ্যা দিও না) ঃ এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রসূল (স.) নবীকুল শিরোমণি হওয়া সত্ত্বেও কেন তা বলতে তিনি নিষেধ করলেন? উত্তর হলো—

(১) সম্ভবত নবীকুল শিরোমণি সম্পর্কে অবগতি লাভের পূর্বেই তিনি এ মন্তব্য করে থাকবেন।

(২) অথবা তিনি এমন মর্যাদা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, যার দ্বারা অন্যান্য নবীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

www.e-ilm.weebly.com

(৩) নবুওয়াতের দিক বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে নিষেধ করেছেন। (কেননা এক্ষেত্রে সকল নবীই সমান)।

(৪) রসূল (স.) বিনয়সুলভ একথা বলেছেন মাত্র।

(৫) অথবা এমন মর্যাদা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন, যা বিবাদ-বিশৃঙ্খলার উস্কানী দেয়। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ইহুদী হযরত মুহাম্মাদ (স.)-এর উপর তাদের নবী হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলে এক আনসারী মুসলমান এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ ইহুদীকে চপেটাঘাত করে।

وَخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا (মূসা জ্ঞান হারিয়ে ভূপাতিত হলেন) ঃ বর্ণিত আছে, হযরত মূসা (আ.) আরাফাতের দিন বৃহস্পতিবারে মূর্ছা যান এবং কুরবানীর দিন শুক্রবার তাঁকে তাওরাত কিতাব প্রদান করা হয়।

غَامِرٌ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ (কল্যাণে ফার্স্ট) ঃ লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, ইমাম বুখারী (রহ.) غَامِرٌ-এর ব্যাখ্যা سَابِقٌ بِالْخَيْرِ-এর দ্বারা করেছেন। এ ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এখানে ঐ অর্থই উদ্দেশ্য। কারণ, غَامِرٌ-এর অর্থ হলো خَاصَمَ তথা বিবাদ করা; বরং ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, غَامِرٌ-এর অর্থ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ ও আসে। লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এখানে سَابِقٌ بِالْخَيْرِ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে। সেজন্য জনাব টিকাকার তাকরীরে মক্কী হতে উদ্ধৃত করেন যে, লেখক غَامِرٌ-এর তাফসীর سَابِقٌ بِالْخَيْرِ দ্বারা করেছেন। কেননা, غَامِرٌ-এর অর্থ হলো জটিল বিবাদে জড়িয়ে পড়া, আর জটিলতা থেকেই হয় বিবাদের সূত্রপাত। এটাই বাস্তব ও স্বাভাবিক যে, আবু বকর (রযি.)-এর বিবাদ কল্যাণজনক বৈ ছিল না। সে জন্য ইমাম বুখারী (রহ.) বলেছেন, আমার মতে غَامِرٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো سَابِقٌ بِالْخَيْرِ (কল্যাণের অগ্রদূত)।

اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا (তোমরা দ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর) ঃ মুফাসসিরদের মতে 'দ্বার' দ্বারা উদ্দেশ্য বাইতুল মুকাদ্দাসের দ্বার অথবা আরীহার দ্বার। তবে লামিউদ্ দারারীতে তাফসীরে মাদারিক, ইকলীল প্রভৃতি হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হযরত মূসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় বনী ইসরাঈলরা বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেনি। সেজন্য এখানে بَابٌ (দ্বার) দ্বারা উদ্দেশ্য بَابُ الْقَرْيَةِ তথা এলাকার প্রবেশ ফটক অথবা بَابُ الْقُبَّةِ যা কুফা নামক ময়দানে নামায পড়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল।

خُذِ الْعَفْوَ (নম্রতা রীতি বা সহজ পন্থা অবলম্বন করুন) ঃ সকল মুফাসসিরের মতে, প্রত্যেক ঐ কাজকে عَفْوٌ বলে, যা কোন প্রকার কষ্ট-শ্রম ব্যতিরেকে সহজেই হতে পারে। উদ্দেশ্য হলো, ইবাদত, আচার-আচরণ, লেন-দেনের শরয়ী

www.e-ilm.weebly.com

অত্যাবশ্যক কার্যাবলীর সকল ক্ষেত্রে আপনি মানুষদের থেকে ঐ (শিথিল) মান গ্রহণ করে নিন, যা তারা সহজেই করতে পারে। সকল ব্যাপারে সুউচ্চমান দাবী করবেন না। সহজ ও শিথিলপন্থা অবলম্বন করবেন। তাফসীর বিশারদের এক জামাত এর অর্থ 'ক্ষমা'ও করেছেন। অর্থাৎ আপনি পাপী ও অপরাধীদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখুন এবং তাদের ক্ষমা করে দিন।

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ (সৎ কাজ ও ন্যায়ের উপদেশ দিন) ঃ উদ্দেশ্য হলো, যারা আপনার সাথে অন্যায় আচরণ ও জুলুম করে, আপনি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন না; বরং ক্ষমা করে দিবেন। তবে সাথে সাথে তাদেরকে সৎকাজের প্রতি প্রেরণা ও তার উপদেশও দিতে থাকুন।

وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ ঃ উদ্দেশ্য হলো, যারা আপনার ভদ্রোচিত আচরণে প্রভাবিত ও আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে আপনার সাথে মূর্খজনোচিত রূঢ় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয় আপনি তাদের সাথে তাদের অনুরূপ আচরণ করবেন না; বরং কৌশলে তাদেরকে এড়িয়ে চলুন। কেননা মূর্খদের চমৎকার জওয়াব নীরবতা অবলম্বনই।

(মা'আরেফুল কুরআন)

أَمَرَ اللّٰهُ نَبِيَّهٗ أَنْ يَأْخُذَ الْعَفْوَ مِنْ أَخْلَاقِ النَّاسِ ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর নবীকে আদেশ করছেন যে, যদি কেউ আপনার সাথে অন্যায় আচরণ ও খারাপ ব্যবহার করে, তবে আপনি তার থেকে প্রতিশোধ নিবেন না; বরং ক্ষমা করে দিন। বস্তুত এ কারণেই রসূল (স.) তাঁর পুরো জীবদ্দশায় ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো থেকে কোনরূপ প্রতিশোধ নেননি।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, মানুষেরা যে আমল যতটুকুই করুক না কেন, তাই আপনি সাদরে মেনে নিন। অর্থাৎ তাদের সাধারণ আনুগত্য ও বাহ্যিক অনুসরণকেই আন্তরিকভাবে গ্রহণ করুন। সুউচ্চমান, বাস্তবতা ও যথার্থতা খুঁটিয়ে দেখবেন না। অভ্যন্তরীণ (অন্তরের) অবস্থা আল্লাহর জিম্মায় সোপর্দ করুন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহ.) বলেন, إِنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ أَجْمَعُ لِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ অর্থাৎ এ আয়াতে চারিত্রিক মাধুর্যতার সকল দিকের অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে।

সূরা আনফাল

اَلْأَنْفَالُ الْمَغَانِمُ ঃ أَنْفَالٌ শব্দটি نَفْل-এর جَمْع বা বহুবচন। অর্থ, দান, অতিরিক্ত দান। ইমাম বুখারী (রহ.) يُقَالُ نَافِلَةٌ عَطِيَّةٌ বলে এ আভিধানিক অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। نَفْلٌ শব্দের ব্যবহার সাধারণত ঐ দানের অর্থে হয়ে থাকে, যা সরকার বা সেনাপ্রধান গনীমতের অংশ দেয়ার পরে অতিরিক্তভাবে প্রদান করেন। কিন্তু এখানে এ অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়ায় اَلْأَنْفَالُ-এর ব্যাখ্যা

www.e-ilm.weebly.com

اَلْمَغَانِمُ দ্বারা করা হয়েছে। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য। আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে উলামায়ে কেরামের রায় দু'ধরনের। (১) কতিপয়ের মতে এ আয়াতটি কুরআনের অপর আয়াত وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ-এর দ্বারা রহিত। কিন্তু বিশ্লেষক উলামা মহলের দাবী, আয়াতটি পূর্ববৎ কার্যকর রয়েছে। প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) তাঁর ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, বদরে অর্জিত গনীমতের মালের ব্যাপারে সাহাবাদের মধ্যে মতান্তর দেখা দেয়। যে সকল নওজোয়ান সাহাবা যুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন, তারা সমস্ত গনীমতকে নিজেদের হক বলে মনে করেন। প্রবীণ সাহাবাগণ দাবী করেন, নওজোয়ানরা আমাদের বলেই ময়দানে লড়েছে। অতএব গনীমতের হকদার আমরাই। রসূল (স.)-এর বডিগার্ড বাহিনীও গনীমতের দাবী করতে থাকেন। এহেন পরিস্থিতিতে বক্ষমান আয়াত অবতীর্ণ করে বলে দেয়া হয় যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের ফলেই সূচিত হয়েছে; কারো বাহু বল কিংবা কোন খুঁটির জোরে তা হয়নি। অতএব অর্জিত সমস্ত মালের মালিক একমাত্র আল্লাহ। নবী (স.) তাঁর প্রতিনিধি। তাই আল্লাহ পাক রসূল (স.)-কে যেভাবে বন্টনের নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবেই গনীমত বন্টন হবে। যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে। এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য আয়াতটি রহিত হয়নি।

لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ ঃ এ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহর উক্তি يُحْيِيكُمْ-এর মধ্যে পরকালীন জীবন উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রসূল (স.) তোমাদেরকে যে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছেন, তোমরা তা মেনে নাও এবং তাঁর আনুগত্য কর। কেননা, এতেই তোমাদের পারলৌকিক কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতা নিহিত।

لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِى الْقُرْاٰنِ (আমি তোমাকে কুরআনের একটি বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন সূরা শিক্ষা দিব) ঃ এর দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহা। সূরা ফাতিহার এ মর্যাদা সওয়াব হিসেবে। কারণ, এ সূরার মধ্যে মৌলিক কয়েকটি বিষয় রয়েছে। যথা, (১) আল্লাহর প্রশংসা (২) বান্দার গোলামী ও দোয়া এবং (৩) আল্লাহর কাছে বান্দার একান্ত আবেদন ও প্রার্থনা।

اَلسَّبْعُ الْمَثَانِى ঃ اَلسَّبْعُ দ্বারা উদ্দেশ্য সূরা ফাতিহার সাত আয়াত। আর اَلْمَثَانِى শব্দটি تَثْنِيَة মাসদার হতে উদ্গাত। অর্থ, ডবল, পুনঃ, বারংবার। যেহেতু সূরা ফাতিহা নামাযে বারবার (পুনঃ পুন) পড়া হয়, সেহেতু তাকে سَبْعِ مَثَانِى বলা হয়।

আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, اَلسَّبْعُ দ্বারা ৭টি শব্দ উদ্দেশ্য।

www.e-ilm.weebly.com

(৭) ও عَلَيْهِمْ (৬) صِرَاطُ (৫) إِيَّاكَ (৪) رَحِيْمٌ (৩) رَحْمٰنٌ (২) اَللّٰهُ (১) لَا (যা غَيْر এর অর্থে ব্যবহৃত)। যেহেতু এ শব্দাবলী সূরা ফাতিহার মধ্যে ডবল বা একাধিকবার এসেছে। তাই তাকে سَبْعِ مَثَانِىْ বলা হয়।

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا ঃ অর্থাৎ কুরআনের আয়াত ঃ أَغْتَرُّ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ-এর মধ্যে তা'বীল করার থেকে আল্লাহর অপর উক্তি ঃ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا-এর মধ্যে তাবীল করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। কারণ, প্রথম আয়াতে কড়া হুঁশিয়ারী আর কঠোর শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। আর সর্বদা লাভ অর্জনের তুলনায় ক্ষতি হতে বাঁচার দিকটা অগ্রাধিকার পায়।

দ্বিতীয় আয়াতের তা'বীল হলো, এতে যুদ্ধের যে নির্দেশ রয়েছে, তা কেবল প্রতিরোধের শক্তির শর্তে। সুতরাং যখন আমাদের প্রতিরোধের শক্তি নেই, তখন যুদ্ধ করাও আমাদের উপর আবশ্যক নয়। কেননা এমতাবস্থায় যদি যুদ্ধ করা হয়, তবে সমাধানের পরিবর্তে আরো বেশি সমস্যা সৃষ্টি তথা ফিতনার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।

حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ (ফিতনা উচ্ছেদ না হওয়া নাগাদ) ঃ এখানে এ প্রশ্ন করা যাবে না যে, প্রসিদ্ধ নীতি হলো, সব সময় শব্দের ব্যাপকার্থটাই ধর্তব্য হয়; বিশেষ অবতরণ প্রেক্ষাপট নয়। অতএব হযরত ইবনে উমর (রযি.) এ আয়াতকে 'মুশরিকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে' বলে কেন খাস করলেন? কারণ হলো, মূলতঃ এ আয়াতকে তার অবতরণ প্রেক্ষাপটের সাথে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হলো, যে যুদ্ধে হক্ব-না হক্ব নির্ণয়টা জটিল নয়, তার সাথে ঐ যুদ্ধের তুলনা করা যাবে না, যার মধ্যে তা নির্ণয় করা কঠিন ও জটিল হয়। কারণ, আয়াত যে প্রসঙ্গে অবতীর্ণ সেখানে যুদ্ধের কারণ তথা হক্ব-না হক্ব নির্ণয় কোন জটিল বিষয় ছিল না; বরং সকলের কাছে তা সুস্পষ্ট ছিল। সাম্প্রতিক অবস্থা তার বিপরীত। কারণ এখানে এটা নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে না যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.) এবং তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে কে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত? কোন দলের অবস্থান সঠিক? অবশ্য নীতি-আদর্শ ও বাহ্যিক অবস্থা পর্যালোচনার দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের অবস্থানই সঠিক ও বাস্তব ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। যেহেতু এটা একটি সাধারণ ধারণা মাত্র, যার পিছনে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তাই এ ধারণানির্ভর কল্যাণকে নিশ্চিত কল্যাণের সাথে তুলনা করা যাবে না।

(লামিউদ্ দারারী)

সূরা বারাআত (তওবা)

এ সূরার প্রারম্ভে বিসমিল্লাহ না লেখা সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। মূল কিতাবের পার্শ্বটিকায় এসেছে ঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) এ সূরা (কাফেরদের) নিরাপত্তা বাতিল সংক্রান্ত অধ্যাদেশ জারী করতে অবতারিত। আর বিসমিল্লাহটা যেহেতু নিরাপত্তার স্মারক, তাই তা এখানে সংযোজিত হয়নি।

(২) এ সূরাটি প্রথম সূরা বাকারার বরাবর বা প্রায় তৎপরিমাণ আয়াতসহ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তার প্রথমাংশ প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এই প্রথমাংশের সাথে বিসমিল্লাহ থাকায় তাও প্রত্যাহৃত হয়ে যায়।

(৩) এ সূরা সম্পর্কে রসূল (স.) সুনির্দিষ্টভাবে কোন নির্দেশ প্রদান করেননি যে তা কোথায় বা কোন সূরার পরে সংযোজন করা হবে। তথাপি সূরা আনফালের সাথে যেহেতু তার এ দিক দিয়ে সম্পর্ক রয়েছে যে, আনফালের মধ্যে চুক্তির বিবরণ রয়েছে আর তওবার মধ্যে রয়েছে এর বিপরীত দিক তথা চুক্তি ভঙ্গের বিবরণ, তাই এ সূরাকে আনফালের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। (কস্তলানী)

আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন যে, রসূল (স.)-এর সাধারণ নীতি এটাই ছিল যে, কুরআনের কোন আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি নির্দেশ দিতেন যে, এ আয়াত অমুক সূরায় সংযোজন করো। কিন্তু সূরা তওবার আয়াতসমূহের ব্যাপারে তিনি এমন কোন নির্দেশ দেন নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, এটা একটি স্বতন্ত্র সূরা। অপর দিকে পূর্ব হতে এ নিয়মও চলে আসছিল যে, কোন নতুন সূরা অবতীর্ণ হলে পূর্বের সূরা হতে পৃথকতার জন্য 'বিসমিল্লাহ'ও অবতীর্ণ হত। কিন্তু সূরা তাওবাটি 'বিসমিল্লাহ' ছাড়াই অবতীর্ণ হয়। যার থেকে জানা যায় যে, এটা কোন স্বতন্ত্র সূরা নয়। এ উভয়দিক বিবেচনা করে উসমানী প্রতিলিপিতে এ সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ না লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রিন্টে এ সূরা ও আনফালের মধ্যে কৌশলগত একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে দেয়া হয়। যাতে পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে তা পরিচিত না হয়। আবার অন্য সূরার অংশবিশেষ বলেও যেন প্রতিপন্ন না হতে পারে।

وَلِيجَةً ঃ এ শব্দটি কুরআনের আয়াত ঃ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً হতে সংগৃহীত। শব্দটি মূলত وُلُوجٌ ধাতু হতে উৎপন্ন। আর وَلِيجَةٌ টা دَخِيلَةٌ-এর মত। অর্থ ঃ দখলদার, রহস্যবিদ এবং বিশ্বস্ত। এ আয়াত প্রমাণ করে যে, কোন অমুসলিমকে বিশ্বস্ত বন্ধু বানানো জায়েয নেই। যেমন দ্বিতীয় এক আয়াতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا অর্থাৎ, ঈমানদারগণ! মুসলমান ছাড়া কাউকে বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বানিও না। তারা (কাফের-মুশরিক) তোমাদেরকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে ক্ষতি করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করবে না। (মা'আরেফুল কুরআন)

মুসলমানদের দুর্ভাগ্য বর্তমানে তারা আল্লাহর এ নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে চলেছে অতি ন্যাক্কারজনকভাবে। তারা শত্রু-মিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করছে

www.e-ilm.weebly.com

না। নিজেরা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে) শত গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে অবিশ্বাস ও শত্রু জ্ঞান করে অমুসলিমদেরকে অধিষ্ঠিত করছে আন্তরিক বন্ধুর আসনে। (এহেন ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থবাজ ও আদর্শচ্যুত নেতৃস্থানীয় এবং সাধারণ মুসলমানের প্রতি ধিক! শত ধিক!) তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্র ও মুসলমানদের অধঃপতন, দুর্গতি আর অবনতির এটাই প্রধান ও মৌলিক কারণ। (حَفِظَنَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ)

أَهْوَى أَلْقَاهُ فِىْ هُوَّةٍ ঃ এর পূর্বে ইমাম বুখারী (রহ.) সূরা তওবার আয়াত ঃ أَلَمْ يَاْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ এর মধ্যস্থ الْمُؤْتَفِكَاتِ-এর ব্যাখ্যা اِءْتَفَكَتْ اِنْقَلَبَتْ بِهِ الْأَرْضُ (জমিন উল্টে দেয়া) এর দ্বারা করেছেন। অতঃপর ঐ ব্যাখ্যার সমর্থন স্বরূপ সূরা নজমের আয়াতোক্ত আলোচ্য শব্দটি উল্লেখ করে তার অর্থ ব্যক্ত করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, ঐ বিধ্বস্ত বস্তিটি ছিল লূত কওমের, যাদেরকে তাদের মনুষ্যত্ব বিবর্জিত পশুসুলভ অপরাধের কাণে (বসবাসরত এলাকাসহ) আসমানে তুলে উল্টোমুখী করে আবার জমিনে জোরে ছুঁড়ে মারা হয়।

ইমাম বুখারীর এ ব্যাখ্যা (অর্থাৎ أَهْوَى أَلْقَاهُ فِىْ هُوَّةٍ) সম্পর্কে লামিউদ্ দারারীর টিকাকার বলেন, أَهْوَى এর ব্যাখ্যা اِلْقَائُهَا اِلٰى هُوَّةٍ (গর্তে নিক্ষেপ) এর দ্বারা করাটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কারণ কোন স্থানকে যখন উপরে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন তার পূর্ব অবস্থান স্থলটি গর্ত আকার ধারণ করে। অতঃপর যখন উর্দ্ধের ঐ স্থানটি আবার তার পূর্বস্থানে ফেলা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই তা ঐ গর্তেই পড়ে।

اَلْخَوَالِفُ الْخَالِفُ الَّذِىْ خَلَفَنِىْ ঃ এ বাক্যের দ্বারা সূরা তওবার আয়াত رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ এর দিকে ইশারা করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে একবচন শব্দ خَالِف-এর অর্থ الَّذِىْ خَلَفَنِىْ فَقَعَدَ بَعْدِىْ-এর দ্বারা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ দু'ব্যক্তির মধ্য হতে এক ব্যক্তি গৃহ হতে বের হবার পর যে ব্যক্তি গৃহে বসে থাকে, তাকে خَالِف বলে। অতঃপর তিনি এর স্বপক্ষে وَمِنْهُ يَخْلُفُهُ فِى الْغَابِرِيْنَ (اَىِ الْبَاقِيْنَ)-কে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। সুতরাং خَلْفٌ প্রত্যেক ঐ পরিবর্তী ব্যক্তি, যে তার سَلْف তথা পূর্ববর্তী বা অগ্রবর্তী-এর পিছে চলে। এরপর ইমাম বুখারী আরও বলেন—

وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ঃ অর্থাৎ উল্লিখিত উক্তির মধ্যে خَوَالِف শব্দটা مُؤَنَّث বা স্ত্রীবাচক শব্দ خَالِفَة-এর جَمْع বা বহুবচনও হতে পারে। যেমন জালালাইন প্রণেতা বলেন, رَضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ جَمْع خَالِفَةٍ أى

www.e-ilm.weebly.com

جَمْع অর্থাৎ خَوَالِف শব্দটি خَالِفَة-এর جَمْع অর্থাৎ اَلنِّسَاءُ الَّتِىْ تَخَلَّفْنَ فِى الْبُيُوْتِ ঐ সকল মহিলা যারা গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করে।

হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, আয়াতে خَوَالِف দ্বারা উদ্দেশ্য (১) মহিলা (২) অক্ষম পুরুষ ও (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক শ্রেণী। তথাপি مُؤَنَّث-এর বহুবাচনিক শব্দ ব্যবহারের কারণ হলো, গৃহে অবস্থানের ক্ষেত্রে মহিলাদের হার সাধারণত অন্যদের তুলনায় বেশিই হয়।

وَإِنْ كَانَ جَمْعُ الذُّكُوْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يُوْجَدْ ঃ অর্থাৎ যেহেতু আরবী ব্যাকরণ রীতিতে فَاعِل-এর বহুবচন فَوَاعِل আসে না, সেহেতু خَوَالِف টা خَالِف (مُذَكَر) এর جَمْع হবে না। তবে কতক শব্দ এর ব্যতিক্রম রয়েছে।

নাহীস (রহ.) বলেন, خَوَالِف শব্দটি خَالِفَة-এর جَمْع হয়েও رِجَال-এর সিফাত হতে পারে। যেমন বলা হয়, رَجُلٌ خَالِفَةٌ أَىْ لاَ خَيْرَ فِيْهِ অর্থাৎ লোকটির মধ্যে ভাল বলতে কিছু নেই। (লামিউদ্ দারারী)

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِه (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে সম্পর্কচ্ছেদ করা হলো) ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (স.)-এর পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে এ পরিষ্কার জওয়াব তখন দেয়া হয়, যখন তারা ৬ষ্ঠ হিজরীতে পূর্ব সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। আর তা এভাবে যে, রসূল (স.) উমরাতুল কাযা আদায় শেষে প্রত্যাবর্তনের ৫/৬ মাস পর বনূ খোজায়া (নবীজীর মিত্র) গোত্রের উপর এক রাতে গেরিলা আক্রমণ করা হয়। এ আক্রমণে কুরাইশরা বনূ বকরকে অস্ত্র ও সৈন্য যোগান দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। (মা'আরেফুল কুরআন)

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ أَبُوْبَكْرٍ ঃ হযরত আলী (রযি.)-এর একার পক্ষে চুক্তিভঙ্গের (সম্পর্কচ্ছেদ) ঘোষণা জানানো সম্ভব ছিল না বিধায় তিনি হযরত আবু হুরায়রাকে (রযি.) সহকারী হিসেবে সাথে নিয়ে যান। চুক্তি স্থাপন ও চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আরবের লোকেরা স্বীয় লোক ব্যতীত অন্যের কথা বিশ্বাস ও ধর্তব্য করত না। তাই হযরত আবু বকর (রযি.)-এর পশ্চাতে হযরত আলী (রযি.)-কে প্রেরণ করা হয়। (কস্তলানী)

مَرَرْتُ عَلٰى أَبِىْ ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ (রবাজা নামক স্থানে আমি আবু জরকে অতিক্রম করেছি) ঃ হযরত আবু জর (রযি.)-এর রবাজা (মদীনা হতে ৩ মঞ্জিল দূরে অবস্থিত) স্থানে অবস্থানের কারণ হলো, তিনি ইতঃপূর্বে সিরিয়ায় ছিলেন। সেখানে وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এ আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে তাঁর ও হযরত মুয়াবিয়ার (রযি.) মধ্যে তর্ক হয়। এতে তিনি খুব ব্যথিত হয়ে মদীনা চলে আসেন। কিন্তু এখানে এসেও হযরত উসমান (রযি.)-এর সাথে তার মতবিরোধ

www.e-ilm.weebly.com

দেখা দেয়। ফলে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে লোকালয় এলাকা ত্যাগ করে 'রবাজা' নামক নির্জন স্থানে এসে বসবাস শুরু করেন।

فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ (ছাপ দেয়া হবে তাদের ললাটে, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠোপরি) ঃ এ আয়াতে ছাপ দেয়ার জন্য কপাল, দুইপার্শ্ব ও পিঠকে বেছে নেয়ার কারণ হলো কৃপণের কাছে কোন অসহায় সাহায্যপ্রার্থী এলে প্রথমে তার কপালে ঘাম চলে আসে। অতঃপর কৃপণ তার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে মাথা ডানে-বামে ঘুরিয়ে নেয়। এতেও সাহায্য প্রত্যাশী নাছোড় হলে সে তার দিকে অবশেষে পিঠ ফিরিয়ে দেয়।

اَلسَّنَةُ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا (বার মাসে এক বছর) ঃ এটা ইসলামী চান্দ্র মাসের হিসাব। যেহেতু চান্দ্র মাস হিসেব-নিকেশের মুখাপেক্ষী নয়, তাই আল্লাহ পাক মাসের হিসাব চাঁদের আবর্তনের উপর ন্যস্ত করেছেন।

কস্তলানী গ্রন্থে আছে, চান্দ্র বছর ৩৫৫ দিনে হয়। আর সৌর বছর হয় ৩৬৫ দিনে।

প্রাত্যুষিক বিধানাবলী পালন চাঁদের হিসাবের উপর নির্ভর। অবশ্য রোযা নামাযের দৈনন্দিন বিধানাবলী পালন করা আল্লাহ পাক সূর্যের সাথে সংশ্লিষ্ট রেখেছেন। কারণ, তা চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে পালন করতে হয়; কোন হিসাব-গণার প্রয়োজন পড়ে না। (কস্তলানী)

لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَانَا ঃ হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, বাহ্যিক ভাষ্য থেকে বুঝে আসে যে, রসূল (স.) ও আবু বকর (রযি.) নিজ নিজ পা দ্বারা সাওর গুহার প্রবেশ মুখ আড়াল করে রাখেন। যেহেতু বাস্তবে ব্যাপারটি এমন ছিল না, তাই অসঙ্গতি এড়াতে ইবনে হাজার (রহ.) এক অভিনব ব্যাখ্যার আশ্রয় নেন। তিনি বলেন, তাঁরা গৃহের প্রবেশ মুখ পা দ্বারা আড়াল করে রাখেন না; বরং তাদের বস্ত্র দ্বারা তা আড়াল করে রাখা হয়েছিল। তবে লামিউদ্ দারারী গ্রন্থ প্রণেতা এক চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, এখানে উঠানোর দ্বারা উদ্দেশ্য নিজের পায়ের দিকে তাকানো। কেননা, মানুষের সাধারণ অভ্যাস হলো, কোন দুর্গম পাহাড়ী স্থান অতিক্রমের সময় তারা প্রত্যেক কদম রাখার পূর্বে স্থানটি ভাল করে দেখে নেয়। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হলে হাফেজ ইবনে হাজারের ব্যাখ্যা অবলম্বনের আর কোন প্রয়োজন পড়ে না। হাফেজের ব্যাখ্যা থেকে এ ব্যাখ্যা অধিক উপযোগী এবং বাস্তবমুখী। (লামিউদ্ দারারী)

حِيْنَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) ও ইবনে জুবাইরের মধ্যে খলীফার হাতে বাইয়াত গ্রহণ বিষয়ে এ মতভেদ সৃষ্টি হয়। ঘটনার সারকথা হলো, হযরত মুয়াবিয়ার (রযি.) ইন্তেকালের পর হযরত আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর (রযি.) ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করা হতে বিরত থাকেন এবং সবাইকে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণের আহ্বান জানান। এর প্রেক্ষিতে হিজায,

www.e-ilm.weebly.com

মিসর, ইরাক, খোরাসান এবং সিরিয়ার বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর হাতে বাইয়াত হয়। অতঃপর মারওয়ান সিরিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে হযরত ইবনে জুবাইর (রযি.) কর্তৃক নিযুক্ত তথাকার শাসক জাহহাক বিন কয়েসকে হত্যা করে। ফলে খেলাফত আব্দুল মালিকের হাতে চলে আসে। ৬৪ হিজরীতে এ ঘটনা ঘটে। মুহাম্মাদ বিন আলী (যিনি ইবনে হানাফিয়াহ নামে প্রসিদ্ধ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) উভয় হযরত হুসাইনের (রযি.) শাহাদাতের পর মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন। হযরত ইবনে যুবাইর (রযি.) তাঁদেরকে তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু তাঁরা বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন এবং বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত লোক বাইয়াত না হবে ততক্ষণ তাঁরা বাইয়াত হবেন না। একদল লোক তাঁদের অনুসরণ করে বাইয়াত গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এতে ইবনে জুবাইর বিন আওয়াম (রযি.) তাঁদের প্রতি চাপ প্রয়োগ করেন এবং তাঁদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এ সংবাদ তৎকালীন কুফার প্রশাসক মুখতার বিন আবু উবাইদ অবগত হলে তিনি সৈন্য পাঠিয়ে তাঁদের দু'জনকে ইবনে জুবাইরের (রযি.) অবরোধ থেকে উদ্ধার করেন। অতঃপর সৈন্যরা তাদের কাছে ইবনে জুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি চায়। কিন্তু তারা এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং তায়েফে চলে যান। (আইনী, কস্তলানী)

قُلْتُ أَبُوهُ الزُّبَيْرُ ঃ এটা হযরত ইবনে আব্বাসের উক্তি; ইবনে আবী মুলায়কার নয়। আল্লামা আইনী ও কস্তলানী (রহ.) এরূপই উল্লেখ করেছেন। আমি মনে মনে বলছিলাম যে, অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের (যা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে) কারণে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রযি.)ই খেলাফতের প্রকৃত হকদার।

فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْنَادُهُ ঃ এটা বুখারীর শায়েখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদের উক্তি। যেহেতু তাঁর শায়েখ সুফিয়ান বিন উয়ায়না [১] হাদীস عَنْعَنَه ভাবে উল্লেখ করেন; حَدَّثَنَا পন্থায় নয়; সে জন্যে তিনি (বুখারীর শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ) সনদের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বস্তুত এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) এ হাদীসকে ইবনে যুবাইর থেকে অন্য সূত্রে এবং তাঁর আরেক শায়েখ থেকে তৃতীয় সনদে বর্ণনা করেন।

إِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَبَنِىْ أُمَيَّةَ مُحِلِّيْنَ ঃ অর্থাৎ, আল্লাহ পাক ইবনে যুবাইর ও বনূ উমাইয়াকে হারাম শরীফে যুদ্ধের জন্য 'হালালকারী' হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

ফতহুল বারী গ্রন্থে আছে, যদিও বনূ উমাইয়া সর্বপ্রথম হারাম শরীফে আক্রমণ ও যুদ্ধের সূচনা করে এবং ইবনে জুবাইরকে অবরোধ করে রাখে তথাপি ইবনে

www.e-ilm.weebly.com

জুবাইরের প্রতি হালালকারীর সম্বন্ধ এ জন্য প্রদান করা হয় যে, সর্বাগ্রে তাদের পক্ষ হতেই আক্রমণ হয়। শধু তা-ই নয়, ইতিপূর্বে ইবনে জুবাইর (রযি.)ই বনূ হাশেমকে তাঁর হাতে বাইয়াতের জন্য হারাম শরীফে অবরোধ করে রাখেন। প্রকারান্তরে যা হত্যা বৈধতার প্রতিই ইঙ্গিতবহ ছিল। (কস্তলানী) বস্তুত এ কারণেই কেউ কেউ ইবনে যুবাইরকেই হারাম শরীফে 'যুদ্ধ হালালকারী' আখ্যা দিয়েছেন।

فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهٰذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ঃ অর্থাৎ, হযরত ইবনে জুবাইরের পক্ষ হতে লোকজন হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.)-কে তার হাতে বাইয়াতের অনুরোধ করলে তিনি জওয়াবে বলেন, বর্তমানে খেলাফতের ব্যাপারে তাঁর থেকে কে অধিক হক রাখে? (আর তার কারণ নিম্নরূপ ঃ) মোটকথা ইবনে আব্বাসের (রযি.) কথার উদ্দেশ্য হলো, ইবনে জুবাইরই খলীফা হওয়ার বেশী উপযুক্ত।

اَمَّا اَبُوْهُ فَحَوَارِىُّ النَّبِىِّ ﷺ ঃ (তাঁর পিতা নবীজীর সার্বক্ষণিক সাহায্যকারী ছিলেন) ঃ এখান থেকে ইবনে জুবাইরের আসলাফী মহত্ত্ব তথা ঊর্ধ্বতম পুরুষ সংশ্লিষ্ট মহত্ত্বের বিবরণ চলছে।

ثُمَّ عَفِيْفٌ فِى الْإِسْلَامِ (মুসলমান হিসেবে তিনি সৎ নিষ্কলুষ) ঃ এ বাক্য থেকে ইবনে জুবাইরের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের বিবরণ শুরু হয়েছে।

وَاللّٰهِ إِنْ وَصَلُوْنِى وَصَلُوْنِى مِنْ قَرِيْبٍ ঃ আল্লাহর শপথ, যদি বনূ উমাইয়া আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকে তবে নিকটতম আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণেই তা করেছে। ইবনে জুবাইর সম্পর্কে আলোচনার পর বনূ উমাইয়ার অবস্থার বিবরণ দিচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.)। আলোচ্য বাক্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের তুলনায় বনূ উমাইয়ার সাথে হযরত ইবনে আব্বাসের (রযি.) ঘনিষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে।

কস্তলানী উদ্ধৃত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) আরও বলেন, আমি ইবনে যুবাইরের খাতিরে আপন চাচাত ভাই তথা বনূ উমাইয়াদের পক্ষ ত্যাগ করেছি। এ উক্তিতে ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বনূ উমাইয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ইবনে যুবাইরের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে।

আল্লামা কস্তলানী (রহ.) আবু মুহাননাফ আখবারীর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রযি.) তায়েফে অন্তিম অবস্থায় সমবেত সন্তানদের লক্ষ্য করে বলেন, "বৎসগণ! ইবনে জুবাইর মক্কায় খেলাফতের দাবী করে এলে আমিই তার কোমর মজবুত করে মানুষদেরকে তার হাতে বাইয়াত হতে আহ্বান করি এবং শুধু তার জন্যেই আমার চাচাত ভাইদের তথা বনূ উমাইয়ার পক্ষ বর্জন করি। কিন্তু যখন আমি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলাম তখন সে আমার সাথে অকৃতজ্ঞের মত

টীকা ঃ ১. হযরত সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৯৭ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আচরণ করল।" এ বর্ণনা সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে, ইবনে আব্বাসের উদ্দেশ্য হলো বনূ উমাইয়া, ইবনে যুবাইরের গোত্র বনূ আসাদ নয়। (কস্তলানী)

فَاٰثَرَ التُّوَيْتَاتِ ঃ অর্থাৎ, ইবনে যুবাইর বনূ আসাদের উক্ত উপশাখাকে প্রাধান্য দান করল এবং আমার উপর তাদেরকে মর্যাদা দিল। এ কথাটি ইবনে আব্বাস (রযি.) ইবনে যুবাইরের প্রতি কটাক্ষ ও তাকে হেয় করে বলেন। বস্তুত এ কারণেই তিনি ইবনে যুবাইর ও বনূ আসাদকে أَبطنا বলেছেন, যা جَمْعِ قِلَّتْ এরই সীগা।

إِنَّ ابْنَ أَبِى الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِى الْقَدَمِيَّةَ ঃ মর্মার্থ হলো, খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস হেসে-খেলে চলছে। অর্থাৎ মর্যাদার শীর্ষে উন্নীত হয়েছে।

وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ ঃ অর্থাৎ, ইবনে যুবাইর তাঁর লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। এটা একটি বাগধারা। উদ্দেশ্য হলো, ইবনে যুবাইর মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারবে না; বরং ক্রমেই তাঁর অবনতি হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.)-এর উক্তি পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। খলীফা আব্দুল মালিক ক্রমে উন্নতি করতে থাকেন আর ইবনে যুবাইরের দিন দিন অবনতি হতে থাকে। এমনকি আব্দুল মালিক ইবনে যুবাইর (রযি.) এর কর্তৃত্ব হতে ইরাক দখল করে নেন এবং তাঁর ভ্রাতা মুসআবকে হত্যা করেন। এর পর তিনি ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে সৈন পাঠিয়ে তাঁকে শহীদ করে দেন এবং ইসলামী খেলাফত সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে নেন।

فَقُلْتُ لَأُحَاسِبَنَّ نَفْسِىْ لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِىْ بَكْرٍ وَلَا عُمَرَ ঃ অর্থাৎ, হযরত ইবনে যুবাইরের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর সহযোগিতা ও কল্যাণ কামনা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করব না। শুধু তা-ই নয়, হযরত আবু বকর ও উমরের উপর আগত অভিযোগ যেভাবে প্রতিহত করেছি, তার থেকে অধিক হারে ইবনে যুবাইরের বিরুদ্ধে আগত অভিযোগ প্রতিহত করব। কারণ হলো, হযরত আবু বকর ও উমরের (রযি.) ফযীলত ও মর্যাদা সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু হযরত ইবনে যুবাইরের ব্যাপারটি এর বিপরীত। তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা সর্বস্তরে ততটা প্রসিদ্ধ ছিল না। ইবনে যুবাইরের প্রতি এটাই ছিল ইবনে আব্বাসের ন্যায়ানুগ ও ইনসাফমূলক আচরণ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যখন ইবনে যুবাইর হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে ন্যায়ানুগ ও সহানুভূতিমূলক আচরণ করেন না, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

لَأَنْ يَرُبَّنِىْ عَمِّىْ أَحَبُّ إِلَىَّ ঃ অর্থাৎ আমার শাসক বনূ উমাইয়া হওয়া এবং তাদের আনুগত্যে আমার থাকা-এটা আমার কাছে তাদের ব্যতীত অন্যের অনুগত

www.e-ilm.weebly.com

হয়ে থাকার চেয়ে ঢের পছন্দনীয়। কারণ, বনূ উমাইয়া আমার নিকটতম আত্মীয়। ফলে বনূ আসাদের অনুগত হয়ে চলা থেকে বনূ উমাইয়ার অনুগত হয়ে থাকা আমার মতে অনেক ভাল।

فَأَعْطَاهُ ঃ আব্দুল্লাহ বিন উবাই মুনাফিকের কাফনের জন্য রসূল (স.) কর্তৃক তাঁর জামা প্রদানের দু'টি কারণ হতে পারে। (১) বদর যুদ্ধে হযরত আব্বাস (রযি.) [তিনি তখন মুসলমান হননি] বন্দী হলে [তীব্র প্রয়োজনের মুহূর্তে] আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে একটি জামা প্রদান করে। তাই রসূল (স.) তারই প্রতিদানস্বরূপ তাকে নিজের জামা প্রদান করেন, যাতে রসূল (স.)-এর উপর তাঁর কোন ঋণ বা অনুগ্রহ বাকী না থাকে। (২) অথবা হতে পারে রসূল (স.) তাঁর জামাটি ইবনে উবাইকে দেননি; বরং তার পুত্র আব্দুল্লাহকে (যিনি মুসলমান ছিলেন) প্রদান করেছিলেন।

تُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ (আপনার প্রভু নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি তার জানাযা পড়বেন?) ঃ এখানে প্রশ্ন হলো, নিষেধাজ্ঞাটা কোথায়? কারণ, নিষেধাজ্ঞার আয়াত ঃ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ-এ উক্ত ঘটনার পরেই অবতীর্ণ হয়। উত্তর হলো, সম্ভবত হযরত উমর (রযি.) কুরআনের আয়াত ঃ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ অর্থাৎ নবী এবং মুমিনদের উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। অথবা অপর আয়াত ঃ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ অর্থাৎ, আপনি তাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা চাইলেও আল্লাহ কস্মিনকালেও তাদের ক্ষমা করবেন না।' —এর থেকে নিষেধাজ্ঞাটা বুঝেছিলেন।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রযি.) সম্ভবত ইলহামের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে আগাম অবগত হন।

إِنِّىْ خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ (আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে বিধায় আমি তা অবলম্বন করেছি) ঃ কোন কোন মুহাদ্দিস এ হাদীসের সঠিকতার উপর প্রশ্নারোপ করে বলেন, হাদীসটি বিশুদ্ধ ও সংরক্ষিত নয়। মূলতঃ তাদের আপত্তি হলো, প্রথমত سَبْعِيْنَ শব্দটি নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য নয়; বরং আধিক্য ও অতিরিক্ততা বুঝানোর জন্য মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কুরআনের আয়াত اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ হতে ইস্তেগফার করা আর না করা উভয় বরাবর বুঝা যায়; ইখতিয়ার প্রদান বুঝা যায় না। সুতরাং রসূল (স.) আরবের বড় ফসীহ ও সুসাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াত থেকে 'ইখতিয়ার' কিভাবে বুঝলেন? তাদের এ প্রশ্নের জওয়াব হলো, যেহেতু আয়াতের বাহ্যিক অর্থই হলো ইখতিয়ার প্রদান করা এবং وَلَا تُصَلِّ عَلَى

www.e-ilm.weebly.com

أَحَدٍ مِّنْهُمْ পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয়, তাই সঙ্গত কারণেই রসূল (স.) এই আয়াত থেকে ইখতিয়ার বুঝেন। যেহেতু আয়াতের বাহ্যিক শব্দে ইখতিয়ার দেয়া হয় এবং অন্য আয়াতে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আসেনি, কিন্তু আবার অপর দিকে ভিন্নভাবে ইসলামী স্বার্থ অর্জিত হওয়ার এ সম্ভাবনা ছিল যে, তার গোত্রের লোক ও অন্যান্য কাফেররা এতে প্রভাবিত হয়ে মুসলমান হতে পারে, সেজন্য তিনি জানাযা পড়াকেই প্রাধান্য দেন। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, রসূল (স.) বলেন, আমার জামা তাকে আল্লাহর আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে আমি এ কাজ শুধু এ আশায় করেছি যে, হতে পারে আমার এ কাজ বা ব্যবহারে তার গোত্রের অনেক লোক মুসলমান হবে! কোন কোন তাফসীরে রসূল (স.)-এর এ আশার বাস্তবতার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (স.)-এর এ অমায়িক ব্যবহার ও নজিরবিহীন উদারতা দেখে গোত্রের এক হাজার লোক মুসলমান হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে হযরত উমর (রযি.) এটা চিন্তা করেন যে, যখন এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টত প্রতীয়মান যে, ইবনে উবাইয়ের ক্ষমা হবে না, তখন রসূল (স.) কর্তৃক তার জানাযা পড়ে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। আর অর্থহীন কাজ করা নবুওয়াতের মর্যাদার সুস্পষ্ট পরিপন্থী। বস্তুত এটাকেই তিনি 'নিষেধাজ্ঞা' রূপে ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে রসূল (স.) স্পষ্টভাবে জানতেন যে, তাঁর জামা প্রদান ইবনে উবাইয়ের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু তাঁর সামনে অন্যান্যদের ইসলাম আনয়নের সম্ভাবনার দিকটা ছিল খুব উজ্জ্বল। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর কাজটি মোটেই অর্থহীন ছিল না। এ ব্যাখ্যা অনুপাতে রসূল (স.)-এর উপর যেমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না, তেমনি হযরত উমর (রযি.)-এর উক্তির উপরও কোন প্রশ্ন আরোপিত হয় না। (মা'আরেফুল কুরআন)

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ঃ এ অধ্যায়ে উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, আয়াতটি রসূল (স.)-এর চাচা আবু তালিবের ব্যাপারে অবতারিত। কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ ﷺ اِسْتَأْذَنْتُ رَبِّى أَنْ أَسْتَغْفِرَلَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِى فَزُوْرُوا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْاٰخِرَةَ অর্থাৎ, একদা রসূল (স.) তাঁর মাতার কবরের পাশে এসে খুব কাঁদেন। অতঃপর বলেন, আমি আল্লাহর নিকট মায়ের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে তিনি তা না মঞ্জুর করেন। তবে তার কবর জেয়ারতের অনুমতি চাইলে, তা অনুমোদন করেন। ফলে তোমরাও কবর জেয়ারত করবে। কারণ, এতে আখেরাতের কথা স্মরণ হয়।

www.e-ilm.weebly.com

হাদীস থেকে জানা যায় যে, আলোচ্য আয়াতটি রসূল (স.)-এর মাতার প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। কাশশাফ[১] প্রণেতা এ অভিমতকেই বিশুদ্ধতম আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, আবু তালিবের ইন্তেকাল হয় হিজরতের পূর্বে। আর এ আয়াত মদীনায় প্রায় শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। তবে তাফসীর প্রণেতা এ প্রশ্নের জওয়াব দেন যে, হতে পারে রসূল (স.) এ আয়াত অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত আবু তালেবের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর আয়াত অবতীর্ণ হলে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দেন। ফাতহুল গায়েব প্রণেতা হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেন ঃ প্রকৃত ঘটনা ও বাস্তব অবস্থা এটাই। আবু তালেবের ব্যাপারে এ আয়াত অবতরণের উক্তিটিই যথার্থ ও সর্বাধিক সঠিক।

إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ (যুদ্ধ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে) ঃ ইয়ামানের অন্তর্গত শহর 'ইয়ামামায়' নবুওয়াতের দাবীদার মিথ্যুক মুসায়লামার অনুসারী ও অনুগত বাহিনী এবং মুসলমানদের মধ্যে ১১ হিজরীতে এ বিরাট রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। এ সংঘর্ষে ১২০০ মুসলমান শহীদ হন। তন্মধ্যে ৭০০ ছিলেন কারী সাহাবা। আর আহত হন অনেকে।

কুরআন সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মুস্তাদরাক গ্রন্থে এসেছে যে, কুরআন সংকলন তিন দফায় পূর্ণ পায়। (১) রসূল (স.)-এর যুগে (২) হযরত আবু বকর (রযি.) এর যুগে এবং (৩) হযরত উসমান (রযি.)-এর যুগে। রসূলের যুগে ওহী লিখকগণ (সাহাবায়ে কিরাম) কুরআনের আয়াত পশুর চামড়া, হাড়, বৃক্ষের পাতা এবং পাথর খণ্ডে লিপিবদ্ধ করতেন। রাসূলের জীবদ্দশাতেই পূর্ণ কুরআনকে সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থাকারে রূপ দেয়া সম্ভব হয়নি। কারণ, ওহীর আগমন ধারা রসূল (স.)-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত ছিল।

হযরত আবু বকর (রযি.)-এর যুগে সম্পূর্ণ কুরআনকে সুবিন্যস্তভাবে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রযি.) এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। কুরআনের আয়াত ধারাবাহিকভাবে লেখার পূর্বে হযরত যায়েদ (রযি.) সকল আয়াত তার নিজের ও অন্যান্য হাফেজ সাহাবার কাছে সুরক্ষিত আয়াতের সাথে মিল আছে কিনা তা পূর্ণ যাচাই করতেন। কমপক্ষে দু'জনের সাক্ষ্য ব্যতীত তিনি কারো থেকে কোনো আয়াত গ্রহণ করতেন না। সাক্ষী যখন এ স্বীকারোক্তি দিত যে, এ আয়াত নবীজীর সম্মুখেই লেখা হয়, তখন তিনি তা গ্রহণ করতেন। হযরত আবু বকরের (রযি.)-এর যুগে যদিও পূর্ণ কুরআন শরীফ গ্রন্থাকারে সংকলিত হয় কিন্তু তখন সূরাগুলি বিক্ষিপ্ত ছিল, সঠিকভাবে বিন্যস্ত ছিল না। তাই হযরত উসমানের যুগে আরেক দফায় কুরআন সংকলন করা হয়। এ সময়

টিকা ঃ ১. তাফসীরে কাশশাফ ঃ হযরত যারুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন উমর আয-যামখশারী (রহ.) কর্তৃক প্রণীত। মৃত্যু ঃ ৫২৮ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

সূরাগুলো সুবিন্যস্ত করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। হযরত আনাস (রযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, আর্মেনিয়া বিজয়ে সিরিয়ার ইসলামী ফৌজের সাথে এবং আজারবাইযান বিজয়ে ইরাকী ফৌজের সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত হুজায়ফা (রযি.) বিশেষভাবে শরীক ছিলেন। তিনি তথায় সিরীয় ও ইরাকী মুসলমানদের কুরআন পাঠ পদ্ধতি তথা উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিরাট অমিল এবং এর ভিত্তিতে এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর কুরআন তেলাওয়াতকে ভুল ও অশুদ্ধ আখ্যা দিচ্ছে দেখে অত্যন্ত বিচলিত হন এবং হযরত উসমানকে (রযি.) তৃতীয়বারের মত কুরআন সংকলনের পরামর্শ দেন। তিনি এ পরামর্শ গ্রহণ করতঃ (১) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (২) সাঈদ বিন যায়েদ বিন আস (৩) আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর এবং (৪) আব্দুর রহমান বিন হিশামকে (রযি.) সম্পূর্ণ কুরআন সংকলন করার নির্দেশ দেন। তিনি তাদের প্রতি এ নির্দেশও প্রদান করেন যে, যদি তোমাদের এবং যায়েদের লিখন পদ্ধতির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, তার কুরাইশীদের লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ, কুরআন মূলতঃ কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত যায়েদ (রযি.) হযরত হাফসার (রযি.) কাছে রক্ষিত হযরত আবু বকর (রযি.)-এর সময়ে সংকলিত কুরআনের অনুকরণে এ সংকলন কপি প্রস্তুত করেন। এ নতুন সংস্করণ সংকলনে কুরআনের সূরাগুলি ধারাবাহিকভাবে সুবিন্যস্ত ও ঢেলে সাজানো হয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, হযরত আবু বকরের যুগে সংকলিত কুরআন কুরাইশ ছাড়াও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় পড়ার অনুমতি ছিল, কিন্তু এবার সে অনুমতি বাতিল করে সর্বত্র কুরআন একই পন্থায় তেলাওয়াতের বন্দোবস্ত তথা ব্যবস্থা নেয়া হয়। নব সংকলিত পাণ্ডুলিপি রেখে বাকী সকল প্রতিলিপি পূর্ব অনুলিপি পুড়িয়ে ফেলা হয়।* বর্তমানে আমাদের হাতে যে, কুরআন তা মূলতঃ হযরত উসমান (রযি.)-এর বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত সেই অনুলিপিই । (তবে পরবর্তীতে হরকত, নুকতা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সামান্য সংস্কার সাধন হয়েছে মাত্র।)

ফাতহুল বারীতে আছে, হযরত উসমান (রযি.) নতুনভাবে সংকলিত কুরআনের ৭টি কপি বা অনুলিপি প্রস্তুত করতঃ তা (১) মক্কা (২) সিরিয়া (৩) ইয়ামান (৪) বাহরাইন (৫) বসরা এবং (৬) কুফায় প্রেরণ করেন। আর অবশিষ্ট এক কপি মদীনায় সংরক্ষিত থাকে।

لَمْ أَجِدْ هُمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ ঃ অর্থাৎ হযরত খোযাইমা (রযি.) ছাড়া অন্য কারো নিকট এ দু' আয়াত পাইনি। আল্লামা কস্তলানী বলেন, এখানে না পাওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, লিখিতভাবে না পাওয়া। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, 'সংরক্ষিত' পাইনি। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, এ সূক্ষ্ম দিকটা অনেকের কাছে অস্পষ্ট থাকায় তারা ধারণা করে যে, কুরআনের অংশ বিশেষ خبر واحد এর পন্থায় গৃহীত। (বস্তুতঃ এ ধারণা অমূলক।)

www.e-ilm.weebly.com

সূরা ইউনুস

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَنَبَتَ بِالْمَاءِ ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) সূরা ইউনুসের আয়াত إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ-এর মধ্যস্থ– فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ-এর ব্যাখ্যা করেছেন "فَنَبَتَ بِالْمَاءِ" এর দ্বারা।

ইমাম রাজী (রহ.) তাঁর তাফসীরে বলেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হতে পারে। (১) আমি আসমান থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তা থেকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ জন্মে। অতঃপর এ উদ্ভিদ একটা অপরটার সাথে মিলিত ও সম্পৃক্ত হয়। এ উদ্দেশ্য অনুযায়ী –فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِএর মধ্যস্থ بَاء টি سَبَبِيَّه (কারণস্বরূপ) হবে। জমহুর ব্যাখ্যাকারদের মতে এ ব্যাখ্যাটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। (২) দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো, গাছ-পালা (বৃষ্টির) পূর্বেই জন্মে। কিন্তু বৃষ্টি বর্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা চাঙ্গা হয় না। যখন বৃষ্টি হয় তখন চারা নতুন পানি পেয়ে আনন্দে নাচতে থাকে এবং ক্রমে পূর্ণ সজীবতা লাভ করে। এ উদ্দেশ্য অনুযায়ী بَاء টি إِلْصَاق (সম্মিলন)-এর জন্য হবে।

হযরত উসমান (রযি.)-এর সময়ে কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে যে রীতি অবলম্বন করা হয় এবং কুরাইশ ভাষা ব্যতীত অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠের যে অনুমতি বাতিল করা হয় না; বরং তার অনুমতি ও সুযোগকে যথারীতি বাকী রেখেই যে হযরত উসমান (রযি.)-এর তত্ত্বাবধানে কুরআন বিশেষজ্ঞ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত পরিষদ এক চমৎকার পন্থায় কুরআন সংকলন করেন–তা বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। আমরা এখানে উপমহাদেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, বিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত গবেষক হযরত মাওলানা জাস্টিস তকী উসমানী (দা. বা.)-এর অনবদ্য গ্রন্থ 'উলূমুল কুরআন'-এর ছায়া অবলম্বনে মুফতী মুহাম্মাদ উবাইদুল্লাহ (দা. বা.) কর্তৃক বিরচিত বাংলা "কুরআন সংকলনের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ হতে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষ নিম্নে তুলে ধরছি ঃ

টীকা ঃ সম্মানিত লেখক (দা. বা.) এখানে যে তথ্যটি উল্লেখ করেছেন যে, হযরত উসমান (রযি.) এর যুগে কুরআন সংকলনের সময় শুধু কুরাইশ ভাষা রেখে বাকী সকল আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠের অনুমতি বাতিল করা হয়-এ তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ, কুরাইশ ভাষা তথা উচ্চারণ ভঙ্গি ছাড়াও আর যে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষা তথা উচ্চারণ ভঙ্গিতে কুরআন তেলাওয়াতের অনুমতি রসূল (স.), আবু বকর (রযি.) সহ হযরত উসমান (রযি.) এর সংকলন পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলে আসছিল-তা এখনও বলবৎ আছে এবং সুদূর কেয়ামত পর্যন্ত তার অনুমতি বাকী থাকবে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশে এমনকি আমাদের দেশেও প্রসিদ্ধ কেরাত (পাঠরীতি) ছাড়া আরও বিভিন্ন কেরাত তথা পাঠরীতি চালু আছে। অনেক স্থানে এ সমস্ত কেরাত অতীব গুরুত্বের সাথে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

রাসূল (সা.)-এর যুগে কুরআন-সংরক্ষণ

পবিত্র কুরআন একসঙ্গে এক দফায় নাযিল না হয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে অল্প অল্প করে নাযিল হওয়ায় নবী যুগে সম্পূর্ণ কুরআনকে একত্রে গ্রন্থবদ্ধকরণ সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। তাই কুরআনুল করীম তখন ছিল বিভিন্ন খণ্ডাকারে বিক্ষিপ্ত।

প্রধান ও মৌলিক উপায় স্মরণশক্তি ঃ

বস্তুত রসূল (স.)-এর যুগে কুরআনের কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞ ওহী লেখকদের দ্বারা যদিও তা লিপিবদ্ধ করে নেয়া হতো আর এর মাধ্যমে কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও অক্ষর সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষিতও হয়ে যেত, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সেই যুগে কুরআন সংরক্ষণের মূলে এটাই একমাত্র উপায় হিসাবে কার্যকর ছিল না; বরং সেই সঙ্গে কুরআনের প্রধান ও মৌলিক সংরক্ষণ উপায় ছিল তদানীন্তন আরব জাতির নজীরবিহীন ও বিস্ময়কর স্মরণশক্তি।

অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীর তুলনায় একমাত্র কুরআনুল করীমই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয়েছে হাফেযদের স্মরণ-শক্তির উপর। সহী মুসলিম শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لاَ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ ـ

'আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাকে পানিও মিটাতে পারবেন না।' [২৮৯]

উক্ত হাদীসে কুদসীর মর্ম এই যে, দুনিয়ার অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ যেমন তাওরাত, ইঞ্জিল এবং অন্যান্য সহীফাসমূহের (কপিসমূহের) অবস্থা এই যে, পার্থিব আপদ-বিপদ ও প্রতিকূলতার কারণে সেগুলো আজ বিলুপ্ত অথবা বিকৃত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীমকে স্মরণ-শক্তির মণিকোঠায় এভাবে সুরক্ষিত করা হবে যে, তার একটি নুকতা ও হরকতও বিকৃত বা বিলুপ্ত হতে পারবে না। তাই সংরক্ষণ লাভের দিক দিয়ে পবিত্র কুরআন আসমানী গ্রন্থাবলীর মধ্যে এক অতুলনীয় গ্রন্থ। দুনিয়ার অপর কোন গ্রন্থই এ উপায়ে সংরক্ষণ লাভ করতে পারেনি। উপরন্তু সমগ্র মুসলিম জাহান কুরআনুল কারীম মুখস্থ করাকে নেহায়েত সওয়াব ও ফযীলতের কাজ বলে বিশ্বাস করে। যে কারণে তাদের মধ্যে কুরআন মুখস্থ করার রীতি আবহমান কাল থেকেই চলে আসছে। এমনকি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কুরআন যদি আজ দুনিয়া থেকে বিলুপ্তও হয়ে যায়, তবুও হাফেযদের স্মৃতিপটে রক্ষিত কুরআন শরীফ পুনরায় তাকে লিখিতরূপ দান করতে সহজ হবে এবং তা' কিছুমাত্র অসুবিধার ব্যাপার হবে না।

(২৮৯) মুসলিম শরীফ।

www.e-ilm.weebly.com

নবী যুগে কুরআন সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রধানতঃ স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করার একটি প্রকৃষ্ট কুরআনী প্রমাণ এই যে, প্রথমাবস্থায় যখন ওহী নাযিল হতো তখন রসূল (স.) ওহীর শব্দগুলো সাথে সাথে দ্রুত আবৃত্তি করতে থাকতেন, যেন সেগুলো অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সূরা কিয়ামা'র এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَ قُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ۔

'কুরআনকে তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার জন্য আপনি দ্রুত জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয়ই কুরআন একত্র করা ও পাঠ করার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং আমি যখন তা পাঠ করি তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন'।[২৯০]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রসূল (স.)-কে আশ্বাস দিয়েছেন-ওহী নাযিল হওয়া অবস্থায় কুরআনের শব্দগুলি মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে বারবার দ্রুত উচ্চারণ করে পাঠ করার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্ তাআলা নিজেই আপনার মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সৃষ্টি করে দিবেন যে, একবার ওহী নাযিল হওয়ার পর আপনি তা আর ভুলতে পারবেন না। তাই ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথে রসূল (স.)-এর অন্তরে কুরআনুল কারীম দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যেতো। এভাবে রসূল (স.)-এর পবিত্র স্মৃতিপট কুরআনুল কারীমের এমন এক সুরক্ষিত ভাণ্ডারে পরিণত হয় যে, তন্মধ্যে সামান্যতম সংযোগ বিয়োগ কিংবা ভুল-চুকের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সর্বোপরি অধিক সতর্কতার জন্য প্রতিবছর মাহে রমযানে রসূল (স.) হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে পবিত্র কুরআনের দাওর (পারস্পরিক শ্রবণ) করতেন। রসূল (স.) নিজে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শোনাতেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকেও নিজে শুনতেন। ওফাতের বছর রমযান মাসে রসূল (স.) দু'বার হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে শুনিয়েছেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) থেকেও শুনেছেন। এভাবে রসূল (স.) কুরআনের আয়াতসমূহ স্বীয় স্মৃতিপটে সুরক্ষিত করে সাহাবায়ে কেরামকে তেলাওয়াত করে শোনাতেন এবং তাঁদেরকেও পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। ফলে সাহাবায়ে কিরমও কুরআনের যে কোন আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা মুখস্থ করে নিতেন।

রসূল (স.)-এর যুগে কুরআন লিখন

নবী যুগে কুরআন-সংরক্ষনের যে ব্যবস্থার কথা ইতঃপূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কুরআন সংরক্ষণের মূলে তখন সেইটাই যে একমাত্র উপায় ছিল তা নয়; বরং পবিত্র কুরআনের যেমন মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখা হয়েছে,

(২৯০) সূরা কিয়ামাহ ঃ ১৬, ১৭, ১৮

www.e-ilm.weebly.com

নানাভাবে তার চর্চা করা হয়েছে, পারস্পরিক আলোচনা ও তালিম দিয়ে তা' মজবুত করা হয়েছে এবং প্রতিটি আয়াতের বাস্তব অনুসরণ ও ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে ; অনুরূপভাবে রসূল (স.)-এর যুগেই কুরআন সংরক্ষণের জন্য (অতি সতর্কতার নিমিত্ত) যথাসময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে অধিকতর দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

কুরআন সংরক্ষণের এ ব্যবস্থাটি হচ্ছে 'কুরআন-লিখন।' উপরন্তু এখানে আরও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কুরআন-সংরক্ষণের জন্য উল্লিখিত ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে একটিরই উপর একান্তভাবে নির্ভর করা হয়নি। এমনিভাবে একটির উপর নির্ভর করে অন্য সব উপায়ের প্রতি কিছুমাত্র উপেক্ষাও প্রদর্শন করা হয়নি। বরং একই সঙ্গে এবং একই সময় এসব ব্যবস্থা একটি শ্রেণী-পরম্পরা ও নিয়মানুযায়ী কার্যকর করা হয়েছে।

নবুওয়তের শুরুতে যখন কুরআন অবতরণ আরম্ভ হয়, তখনই রসূল (স.) তা' লিপিবদ্ধ করার জন্য লিখন-কার্যে পারদর্শী বহু ওহী লেখক নিযুক্ত করেছেন। রসূল (স.)-এর প্রতি কোন আয়াত বা সূরা নাযিল হওয়ার সাথে সাথে একদিকে যেমন সমবেত লোকদেরকে তিনি তা' পড়ে শুনাতেন, অপরদিকে ওহী লেখকদের দ্বারা তা' সঠিকরূপে লিখিয়েও নিতেন। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ ওহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রযি.) বর্ণনা করেন ঃ

كُنْتُ اَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ اَخَذَتْهُ بُرَحَاءُ شَدِيْدَةٌ وَعِرْقٌ مِثْلَ الْجُمَانِ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَكُنْتُ اُدْخِلُ عَلَيْهِ بِقِطْعَةِ الْكَتِفِ اَوْ كِسْوَةٍ ..... فَاِنْ كَانَ فِيْهِ سَقْطًا اَقَامَهُ ثُمَّ خَرَجَ بِهِ اِلَى النَّاسِ -

'ওহী' লিপিবদ্ধ করার পবিত্র দায়িত্বে আমিও নিয়োজিত ছিলাম। রসূল (স.)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হতো, তখন সর্বশরীরে তাঁর মুক্তার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম পরিদৃষ্ট হতো। এ অবস্থা শেষ হলে পর আমি দুম্বার চওড়া হাড়, অথবা লিখন উপযোগী অন্য কিছু নিয়ে রসূল (স.)-এর খেদমতে হাযিল হতাম। লেখা শেষ হলে রসূল (স.) লিখিত অংশ পড়ে শুনাতে আদেশ করতেন। আমি তা রসূল (স.)-কে পড়ে শুনাতাম। কোন কিছু বাদ পড়ে গেলে রসূল (স.) তৎক্ষণাৎ তা' পূরণ করে দিতেন। এরপর আবার লিখিত অংশটুকু রসূল (স.) নিজে অন্যদের সামনে তেলাওয়াত করে শুনাতেন। [৩১৩]

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত ছাড়া আরও যেসব সাহাবায়ে কেরাম ওহী লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করতেন, তাঁদের সংখ্যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতে চল্লিশ জন বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা ইরাকী (রহ.) তাঁদের সংখ্যা বিয়াল্লিশ জন বর্ণনা করেছেন।

---

(৩১৩) মাজমাউয্ যাওয়াইদ ঃ ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা

www.e-ilm.weebly.com

তিনি লিখেছেন ঃ وَ كِتَابُهُ اِثْنَانِ وَارْبَعُوْنَ ـ

'রসূল (স.)-এর ওহী লেখকদের সংখ্যা ছিল বিয়াল্লিশ জন। [৩১৪]

অতঃপর তিনি এই বিয়াল্লিশ জনের নামও উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এমন কয়েক জনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১। হযরত আবু বকর ২। হযরত উমর ৩। হযরত উসমান ৪। হযরত আলী ৫। হযরত উবাই ইবনে কা'ব ৬। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী সার্‌হ ৭। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম ৮। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস ৯। হযরত আবান ইবনে সাঈদ ইবনে আস ১০। হযরত হানযালা ইবনে রাবী ১১। হযরত মুআইকিব ইবনে আবী ফাতেমা ১২। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আরকাম যুহরী ১৩। হযরত শুরাহ্‌বীল ইবনে হাস্‌না ১৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ১৫। হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা ১৬। হযরত আমর ইবনে আস ১৭। হযরত সাবেত ইবনে কাইস ১৮। হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা ১৯। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ ২০। হযরত মু'আবিয়া ইবনে আবী সুফয়ান ২১। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযিয়াল্লাহ্ আনহুম আজমাঈন।

বস্তুতঃ এত অধিক সংখ্যায় ওহী লেখক নিযুক্ত করার কারণ এই ছিল যে, যদি যথাসময়ে কেউ অনুপস্থিত থেকে যায়, তবে যেন উপস্থিত অপর কেউ এই কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন। আল্লামা ইবনে আবদি-রাব্বিহী লিখেছেন ঃ

اِنَّ حَنْظَلَةَ بْنَ الرَّبِيْعِ كَانَ خَلِيْفَةَ كَاتِبٍ مِنْ كُتَّابِهِ عَلَيْهِ اِذَا غَابَ ـ

'হানযালা ইবনে রাবী (রযি.) রসূল (স.)-এর ওহী লেখকদের নায়েব বা স্থলাভিসিক্তি ছিলেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তিনি তাঁর পক্ষে লিখন কার্য করতেন।" [৩১৫]

উক্ত বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত হান্‌যালার প্রতি নির্দেশ ছিল, অন্য কেউ, উপস্থিত থাকুক না থাকুক, তাকে উপস্থিত থাকতেই হবে, যাতে ওহী লিখন কার্যে নিয়োজিত সাহাবীদের মধ্যে কাউকে পাওয়া না গেলে লিখন কার্যে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

হযরত উসমান (রযি.) বলেন, রসূল (স.)-এর প্রতি কোন আয়াত নাযিল হওয়ার অব্যবহিত পরই তিনি ওহী লিখন কার্যে নিয়োজিত সাহাবীগণকে ডেকে অবতীর্ণ আয়াতটি কোন্ সূরার কোন্ আয়াতের পর সংযোজিত হবে তা বলে দিতেন। অতঃপর ঠিক সেভাবেই তা লিপিবদ্ধ হতো।

হযরত বারা ইবনে আ'যিব (রযি.) বর্ণনা করেন ঃ

لَمَّا اُنْزِلَتْ لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ

اِدْعُوْا فُلاَنًا فَجَاءَ وَمَعَهُ الدَّوَاةُ وَاللَّوْحُ وَالْكَتِفُ فَقَالَ اكْتُبْ ـ

---

(৩১৪) তাদবীনে কুরআন
(৩১৫) তাদবীনে কুরআন

www.e-ilm.weebly.com

যখন لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ আয়াতটি নাযিল হল, তখন তিনি জনৈক ওহী লেখককে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর সেই ওহী লেখক দোয়াত, কলম ও তখ্‌তি নিয়ে উপস্থিত হলে রসূল (স.) তাঁকে লিখতে নির্দেশ দিলেন। [৩১৬]

উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রযি.) বর্ণনা করেন ঃ

كَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُمْلِئُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -

'স্বয়ং হযরত জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-এর সম্মুখে (কুরআনের আয়াতসমূহ) লিখিয়ে দিতেন।" [৩১৭]

হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন ঃ যখন পবিত্র কুরআনের আয়াত وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ অবতীর্ণ হয় তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) রসূল (স.)-কে বলেছেন এই আয়াতটিকে সূরা বাকারার ২৮০ আয়াতের পর লিপিবদ্ধ করিয়ে নিন। [৩১৮]

উক্ত দুই রেওয়ায়েত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত ছিল।

তদানীন্তন আরব দেশে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে কুরআনের আয়াতসমূহ প্রধানত পাথর-শিলা, শুক্‌না চামড়া, খেজুর বৃক্ষের শাখা, বাঁশের টুকরা, গাছের পাতা এবং পশুর হাড়ের উপর লেখা হতো। আবার কেউ কেউ কাগজের টুকরাও ব্যবহার করেছেন বলে জানা যায়।

এভাবে প্রস্তুতকৃত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে কুরআনের একটা নুস্‌খা (কপি) এমনও ছিল, যেটি স্বয়ং রসূল (স.) বিশেষ তত্ত্বাবধানে নিজের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সেটি পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থাকারে না হয়ে সে যুগে প্রচলিত লিখনসামগ্রী পাথর-শিলা, চামড়া প্রভৃতিতে সংরক্ষিত হয়েছিল। নিয়মিত লিখক সাহাবীগণ ছাড়াও অনেকেই ব্যক্তিগত ব্যবহারের সুবিধার জন্য এভাবে কিছু কিছু আয়াত ও সূরা লিখেছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারিক সুবিধার জন্য লিখে রাখার নিয়মটি ইসলামের প্রাথমিক কাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রমাণের জন্য এ রেওয়ায়েতটি প্রণিধানযোগ্য, হযরত উমর (রযি.)-এর বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রযি.) ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়েদ (রযি.) হযরত উমরের পূর্বেই দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। হযরত উমর বোন ও ভগ্নিপতির সেই খবর শুনে রোষভরে যখন সে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন, তখন তাঁদের হাতে কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত সম্বলিত একটি ছহীফা ছিল। তাতে সূরা 'তা'হা'র কয়েকটি আয়াত লিখিত ছিল ; হযরত খাব্বাব বিন আরাত তা পড়তে ছিলেন।

---

(৩১৬) তারীখুল কুরআন ২৫ পৃষ্ঠা
(৩১৭) তাফসীরে খাযেন ঃ ১ম খণ্ড
(৩১৮) তাফসীরে খাযেন ঃ ১ম খণ্ড

www.e-ilm.weebly.com

এতদ্ব্যতীত আরও অন্যান্য রেওয়ায়েতে একথা জানা যায় যে, অনেক সাহাবী ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ কুরআন অথবা আংশিক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। যেমন বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইবনে উমর (রযি.) বলেন ঃ

(١) اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ ـ

কুরআনে করীম সঙ্গে নিয়ে শত্রুদেশে সফর করতে রসূল (স.) নিষেধ করেছেন।" [৩১৯]

অনুরূপ মুজামে তাবারানীর এক রেওয়ায়েতেও উল্লিখিত হয়েছে রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন ঃ

(٢) قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِىْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِى الْمُصْحَفِ تَضَاعَفُ عَلٰى ذَالِكَ اَلْفَىْ دَرَجَةٍ

"যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের নুসখা না দেখে তেলাওয়াত করবে সে এক হাজার সওয়াব পাবে। আর যে দেখে তেলাওয়াত করবে, সে দু হাজার সওয়াব পাবে।" [৩২০]

উক্ত দুই রেওয়ায়েত দ্বারা একথা জানা যায় যে, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রসূল (স.)-এর যুগেই কুরআন শরীফের লিখিত নুস্খা (পাণ্ডুলিপি) বিদ্যমান ছিল। নতুবা 'কুরআন শরীফ দেখে তেলাওয়াত করা' অথবা 'শত্রুর এলাকায় কুরআন সাথে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রখ্যাত আরব কবি হযরত লবীদ (রযি.) সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে প্রকাশ যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর আজীবন কুরআন লিখন কার্যেই নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এভাবে তিনি কুরআনের অনেক নুস্খা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

এমনিভাবে আর এক সাহাবী হযরত নাজিয়া তাফাবী (রযি.)-ও আজীবন কুরআন লিখনের এই কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি নিজের জীবনে কুরআনের অনেক নুসখা প্রস্তুত করে গিয়েছেন বলে বিভিন্ন বর্ণনায় প্রকাশ।

রসূল (স.)-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে হযরত উম্মে সালমা, হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রযি.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরাও বিশেষ যত্ন সহকারে কুরআনুল কারীমের নুসখা ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়েছেন, প্রস্তুতকৃত সেই পাণ্ডুলিপিগুলি দেখে তাঁরা কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

হযরত আয়েশা (রযি.) কুরআন লিখনের কাজ নিজের আযাদ করা গোলাম আবু ইউনুস কর্তৃক সম্পন্ন করেছেন। আর হযরত হাফসা (রযি.)-এর জন্য পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন উমর ইবনে আবু রাফে' (রযি.)।

---

(৩১৯) বুখারী শরীফ ঃ ৪১৯ পৃষ্ঠা, ১ম খণ্ড
(৩২০) মাজমাউদ্-যাওয়ায়েদ ঃ ৭ম খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা

www.e-ilm.weebly.com

সাহাবী হযরত আমর ইবনে হায্ম (রযি.)-কে ইয়ামান প্রদেশের গভর্নর করে পাঠানোর সময় তাঁকে যেমন নীতি-বিধান লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল, তন্মধ্যে একটি নির্দেশ ছিল ঃ

فَلَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِنْسَانٌ

'পাক-পবিত্র না হয়ে এবং অযু না করে কেউ কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। বলা বাহুল্য, কুরআন লিখিত অবস্থায় ছিল বলেই এ হুকুম দেয়া হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রযি.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, জীবনে তিনি মোট চার দফা কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথমবার রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়, এ সময় তিনি কুরআনের কেবল বৃহৎ সূরাগুলি লিখেন। দ্বিতীয়বার ঃ নিজের জানামতে কুরআনের অবতরণ-তরতীব অনুসারে সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করেন। তৃতীয়বার ঃ হযরত আবু বকর (রযি.)-এর খেলাফত যুগে কুরআনের আসল (বর্তমান) তরতীব অনুযায়ী লিখেন। চতুর্থবার ঃ হযরত উসমান (রযি.)-এর খেলাফত যুগে ; সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কুরাইশী ভাষার উপর একত্র করার কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর। হযরত ইবনে মাসউদ (রযি.) কর্তৃক লিখিত সর্বশেষ এই নুসখাটি আজ পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে।

স্যার উইলিয়ম ম্যূর লিখেছেন ঃ 'এই তথ্যের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে বলে স্বীকার করতে হয় যে, রসূল (স.)-এর জীবদ্দশায়ই খণ্ডাকারে লিখিত কুরআনের অনেক পাণ্ডুলিপি সাহাবায়ে কেরামের নিকট সংরক্ষিত ছিল। এইসব পাণ্ডুলিপিতে সম্পূর্ণ কুরআন এবং কোন কোনটায় কুরআনের অধিকাংশ হিস্‌সা লিখিত ছিল।

মোটকথা, রসূল (স.)-এর যুগে পবিত্র কুরআনের সংরক্ষণ ও লিখন-কার্য অত্যন্ত সুচারুরূপে ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যুগে কুরআন গ্রন্থাবদ্ধকরণ

রসূল (স.)-এর যুগে কুরআনুল কারীমের যেসব নুসখা (পাণ্ডুলিপি) প্রস্তুত হয়েছিল, সেগুলি পরিপূর্ণভাবে কিতাবের আকারে না হয়ে চামড়া, হাড়, গাছের পাতা, পাথর ইত্যাদির উপর বিভিন্নভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। কোন সাহাবীর নিকট হয়তো মাত্র একটি সূরাই লিখিত ছিল, অথবা কারও নিকট হয়তো দশটি-পাঁচটি সূরা ছিল, অথবা কারও নিকট হয়তো মাত্র কয়েকটি আয়াত ছিল। অনেকেই আবার আয়াতের সাথে তফসীরও লিখে রেখেছিলেন। যেমন বুখারী শরীফের মশহুর ব্যাখ্যাতা আল্লামা কস্তালানী (রহ.)-এর বরাতে আল্লামা কাত্তানী (রহ.) নকল করেছেন ঃ

قَدْ كَانَ الْقُرْاٰنُ كُلُّهٗ مَكْتُوْبًا فِىْ عَهْدِهٖ ﷺ لٰكِنْ غَيْرُ مَجْمُوْعٍ فِىْ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ـ

www.e-ilm.weebly.com

'রসূল (স.)-এর যুগে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণভাবে লিখিত আকারে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তা' একটি গ্রন্থের আকারে আবদ্ধ ছিল না।" [৩২১]

হযরত আবু বকর (রযি.) উক্ত বিচ্ছিন্ন পাণ্ডুলিপিগুলি একত্র করে সম্পূর্ণ কুরআনকে একটি গ্রন্থের আকারে আবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) হারিস মুহাসিবী থেকে নকল করেন ঃ

وَكَانَ الْقُرْاٰنُ فِيْهَا مُنْتَشِرًا فَجَمَعَهَا جَامِعٌ وَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ ـ

'রসূল (স.)-এর সময় বিক্ষিপ্ত আকারে কুরআনের পাণ্ডুলিপি মওজুদ ছিল। অতঃপর হযরত আবুবকর (রযি.)-এর হুকুমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রযি.) সেগুলিকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করে এক সূতায় গেঁথে দেন।' [৩২২]

কি কারণে হযরত আবুবকর (রযি.) কুরআন গ্রন্থাবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, সে সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রযি.) বর্ণনা করেন, ইয়ামামার যুদ্ধের অব্যবহিত পর হযরত আবুবকর (রযি.) একদিন জরুরী পয়গাম পাঠিয়ে আমাকে তলব করেন। আমি সেখানে পৌঁছে হযরত উমরকেও উপস্থিত পাই। আমাকে দেখে হযরত আবুবকর বললেন, হযরত উমর এসে আমাকে বলছেন যে, 'ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক হাফেযে কুরআন শহীদ হয়ে গেছেন, এমনভাবে যদি বিভিন্ন যুদ্ধে হাফেয সাহাবীগণ শহীদ হতে থাকেন, তবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়, যখন কুরআনের কিছু অংশ বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সেমতে আমার মত এই যে, অনতিবিলম্বে আপনি বিশেষ নির্দেশ প্রদান করে কুরআন শরীফ একত্রে সংকলিত করার ব্যবস্থা করুন।' আমি হযরত উমরকে বলেছি, ' যে কাজ রসূল (স.) করেননি ; সে কাজ আমার পক্ষে করা সমীচীন হবে না।'

হযরত উমর জবাব দিয়েছেন, 'আল্লাহ্‌র কসম, একাজ খুবই উত্তম হবে। একথা তিনি বার বার বলতে থাকায় আমার মনও এ ব্যাপারে সায় দিচ্ছে।"

অতঃপর হযরত আবুবকর (রযি.) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "তুমি তীক্ষ্ণ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যমী যুবক ; তোমার সততা ও সাধুতা সম্পর্কে কারো কোন বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। রসূল (স.)-এর যামানায় তুমি ওহী লিপিবদ্ধ করার কাজ করেছো। সুতরাং তুমিই বিভিন্ন লোকের নিকট থেকে কুরআনের বিক্ষিপ্ত সূরা ও আয়াতসমূহ একত্রিত করে লিখতে শুরু কর।"

হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এঁরা যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার নির্দেশও দিতেন, তবুও আমার পক্ষে তা এতটুকু কঠিন বলে মনে হতো না, যত কঠিন মনে হতে লাগলো পবিত্র কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার কাজটি। আমি নিবেদন করলাম, আপনি কি করে সে কাজ করতে চান, যে কাজ খোদ রসূল (স.) করেননি। হযরত আবুবকর (রযি.) উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, একাজ খুবই উত্তম হবে। বার বার তিনি আমাকে একই কথা

www.e-ilm.weebly.com

বলতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা এ কাজের যথার্থতা সম্পর্কে আমার মনেও প্রত্যয় সৃষ্টি করে দিলেন। এরপর থেকেই আমি খেজুরের ডাল, পাথর, হাড়, চামড়া প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন সূরা ও আয়াত একত্র করতে শুরু করলাম। লোকজনের স্মৃতিতে সংরক্ষিত কুরআনের সাথে যাচাই করে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ সমাপ্ত করলাম।

প্রসঙ্গত এখানে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত কর্তৃক কুরআন একত্রিকরণের ব্যাপারে গৃহীত কার্যক্রমটি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রযি.) নিজেও হাফেযে কুরআন ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের স্মৃতি থেকেই সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করতে সমর্থ ছিলেন। তাছাড়া শত শত হাফেয মওজুদ ছিলেন, তাঁদেরকে এক করেও সমগ্র কুরআন লিপিবদ্ধ করা সহজ ছিল। বিশেষতঃ রসূল (স.)-এর তত্ত্বাবধানে যে পাণ্ডুলিপিখানা প্রস্তুত হয়েছিল, সেটি থেকেও তিনি নকল করে নিতে পারতেন। কিন্তু তা না করে সবগুলি উপকরণ একত্র করেই একাজ সম্পাদন করেন। প্রতিটি আয়াতের ক্ষেত্রেই তিনি নিজের স্মৃতি, লিখিত দলীল, অন্যান্য হাফেযগণের তেলাওয়াত প্রভৃতি সবগুলোর সাথে যাচাই করে সর্বসম্মত বর্ণনার ভিত্তিতেই তাঁর পাণ্ডুলিপি লিপিবদ্ধ করেছেন। রসূল (স.) যেসব লোককে দিয়ে ওহী লিপিবদ্ধ করাতেন, সাধারণ ঘোষণার মাধ্যমে সেসব নুসখা একত্র করার ব্যবস্থা করেন। সেসব লিখিত দলীল সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক হযরত যায়েদের নিকট উপস্থিত করা হয়। সেগুলি যাচাই করার জন্য নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ঃ

(১) সর্বপ্রথম তিনি তাঁর স্মৃতিতে রক্ষিত কুরআনের সাথে সেগুলি যাচাই করতেন।

(২) হযরত উমর (রযি.)-ও হাফেযে কুরআন ছিলেন। হযরত আবুবকর (রযি.) তাঁকেও হযরত যায়েদের সাথে এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁরা যৌথভাবেই লিখিত নুসখাগুলি গ্রহণ করতেন এবং একজনের পর অন্যজন স্ব-স্ব স্মৃতির সঙ্গে যাচাই করতেন।

(৩) এমন কোন লিখিত আয়াত গ্রহণই করা হতো না, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আয়াত সম্পর্কে অন্তত দুইজন বিশ্বস্ত সাক্ষী এ মর্মে সাক্ষ্য না দিতেন যে, এগুলি খোদ রসূল (স.)-এর সামনে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

আল্লামা সুয়ূতী (রহ.) বলেন, এ কথার উপরই সাক্ষ্য নেয়া হতো যে, লিখিত আয়াতগুলি রসূল (স.)-এর ওফাতের বছর তাঁর সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং সেগুলি নাযিলকৃত সাত ক্বেরাত অনুযায়ী বলে তিনি তা' সত্যায়িত করেছেন।

(৪) অতঃপর লিখিত আয়াতগুলি অন্যান্য সাহাবী কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপির সাথে যাচাই করা হতো।

www.e-ilm.weebly.com

ইমাম আবু শামা (রহ.) বলেন, কুরআন লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বনই ছিল উক্ত পদ্ধতির মূল কারণ। শুধু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর না করে ঐগুলি রসূল (স.)-এর সম্মুখে লিপিবদ্ধ আয়াত থেকেই নকল করা হয়েছে।

হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যামানায় কুরআন সংকলনের ব্যাপারে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি উত্তমরূপে অনুধাবন করার পরই হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের এই কথাটির অর্থ পরিষ্কার বুঝে আসবে যে, সূরা বারাআতের শেষ আয়াত لَقَدْ جَاءَكُمْ الخ.. অংশটি শুধু হযরত আবু খুযাইমার নিকট পাওয়া গেছে। এই কথার অর্থ এই নয় যে, আয়াতটি শুধু সাহাবী আবু খুযাইমাই জানতেন অন্য কেউ জানতেন না, কিংবা অন্য কারো স্মৃতিতে ছিল না, অথবা অন্য কারো নিকট লিখিত আকারে ছিল না; বরং এ কথার অর্থ এই যে, খোদ রসূল (স.)-এর তত্ত্বাবধানে লিখিত দলীল হিসাবে এবং উপরোক্ত চার শর্তে উত্তীর্ণ এ অংশটুকু কেবলমাত্র আবু খুযাইমাই পেশ করেছিলেন। অন্যথায় এ আয়াতগুলির কুরআনের অংশ হওয়া বহুল প্রচারিত ও সর্বজনবিদিত বাস্তব ছিল এবং শত শত হাফেযের স্মৃতিতেই লিখিত পূর্ণ কুরআনের নুসখায় উক্ত আয়াতগুলোও অবশ্যই ছিল। কিন্তু হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত অধিকতর সাবধানতার খাতিরে শুধু উপরোক্ত দলীলগুলোর উপরই নির্ভর করা যথেষ্ট মনে করেননি; বরং বিক্ষিপ্তভাবেও লিখিত আয়াতগুলি তিনি সংগ্রহ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাই ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত আয়াতগুলি তৃতীয় পদ্ধতির মাধ্যমেও তাঁর হস্তগত হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তা পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করেননি। এই আয়াতগুলি ছাড়া অন্যান্য আয়াত তো বহু সাহাবীর স্মৃতিপটে সংরক্ষিত থাকা এবং রসূল (স.)-এর যুগে লিখিত পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ থাকা ছাড়াও কয়েকজন সাহাবীর নিকট পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ আকারেও বিদ্যমান ছিল। তাই একেকটি আয়াত কয়েকজন সাহাবী পেশ করেছেন। পক্ষান্তরে সূরা বারআতের উক্ত আয়াতগুলি যদিও বহু সাহাবীর মুখস্থ ছিল এবং পূর্ণ পাণ্ডুলিপিতে লিখিতও ছিল, কিন্তু রসূল (স.)-এর তত্ত্বাবধানে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পৃথকভাবে লিখিত অবস্থায় সে আয়াতগুলি একমাত্র আবু খুযাইমার নিকটেই পাওয়া গেছে। অন্য কারো নিকট তা এ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না।

মোটকথা, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত অসাধারণ সাবধানতার সাথে কুরআনের পরিপূর্ণ নুসখা প্রস্তুত করে ধারাবাহিকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করেন।

কিন্তু প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক করে লিখা হয়েছিল বলে তা অনেকগুলি ছহীফায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখনকার পরিভাষায় এই ছহীফাগুলিকে 'উম্ম' বা মূল পাণ্ডুলিপি বলে আখ্যায়িত করা হত। এই পাণ্ডুলিপিটি নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে তৈরী হয়েছিল ঃ

www.e-ilm.weebly.com

(১) আয়াতগুলি রসূল (স.)-এর নির্দেশিত ধারায় লিপিবদ্ধ করা হলেও সূরাগুলির ধারাবাহিকতা ছিল না। প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক লিখিত হয়েছিল।

(২) এ নুসখায় পূর্ববর্ণিত কুরআনের সাতটি কেরাআতই সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

(৩) এই নুসখা 'হিরী' লিখনপদ্ধতি অনুসারে লেখা হয়েছিল।

(৪) যেসব আয়াতের তেলাওয়াত মনসুখ (রহিত) হয়নি ; বরং প্রচলিত ছিল, কেবল সেসব আয়াতই ধারাবাহিকভাবে এতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

(৫) নুসখাটি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল, যেন (সমস্ত) উম্মতের সবার সম্মতি ও ঐকমত্যে একটি নুসখা তৈরী হয়ে যায়। প্রয়োজনবোধে যেন উম্মতের সবাই এইটি থেকে নিজ নিজ নুসখা শুদ্ধ করে নিতে পারেন।

হযরত আবুবকর (রযি.)-এর উদ্যোগে সংকলিত ঐ নুসখাটি তাঁর নিকটই রক্ষিত হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর এইটি হযরত উমর (রযি.) নিজের হেফাযতে নিয়ে নেন। হযরত উমর (রযি.)-এর শাহাদতের পর তাঁর ওছীয়ত অনুযায়ী নুসখাটি উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফছার নিকট রক্ষিত থাকে। তারপর মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর রাজত্বকালে নুসখাটি হযরত হাফসা থেকে চেয়ে পাঠান, কিন্তু তিনি তা' দিতে অস্বীকার করেন। অতঃপর হযরত হাফসার ইন্তেকালের পর মারওয়ান সেই নুসখাটি পুড়িয়ে ফেলেন। কারণ, তখন হযরত উসমান কর্তৃক সূরার তারতীব অনুসারে লিখনপদ্ধতিসহ সেই কুরআনের সর্বসম্মত নুসখা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং একমাত্র সেই নুসখার অনুসরণ করাই জরুরী ছিল। এমতাবস্থায় পূর্ব নুসখাটি অবশিষ্ট থাকলে সর্বসাধারণ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

হযরত উসমান (রযি.)-এর যুগে কুরআন একত্রীকরণ

হযরত উসমান (রযি.) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার সময় ইসলাম আরবের সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান ও রোমের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিটি নূতন এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করার পর যেসব মুজাহিদ কিংবা বণিকের মাধ্যমে তারা ইসলামের দৌলত লাভ করেন, তাঁদের নিকটই কুরআন শরীফ শিক্ষা করতেন। ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, কুরআন শরীফ সাত হরফ বা সাত কেরাআতে পড়ার অনুমতি হয়েছিল। সাহাবীগণও রসূল (স.)-এর নিকট থেকে বিভিন্ন কেরাআতেই কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষা করেছিলেন, সে কেরাআতেই স্ব-স্ব শাগরেদগণকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন কেরাআত পদ্ধতিও বহু দূরদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব এলাকার লোকেরা এ তথ্য অবগত ছিল যে, কুরআন শরীফ সাত কেরাআত পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি হয়েছে সে সব এলাকায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু দূর-দূরান্তের লোকদের নিকট কুরআনের বিভিন্ন কেরাআত ইত্যাদি সম্পর্কিত পূর্ণ তথ্য ও জ্ঞানের অপ্রতুলতা হেতু কোথাও কোথাও কেরাতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে ঝগড়া-বিবাদ পর্যন্ত সৃষ্টি হতে

www.e-ilm.weebly.com

আরম্ভ করে। অজ্ঞ লোকেরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কেরাআত পদ্ধতিকেই শুদ্ধ এবং অন্যদের কেরাআতকে ভুল বলে চিহ্নিত করতে থাকে।

বিশেষতঃ এই জন্যই অনেক অসুবিধাও সৃষ্টি হয় যে, আরব ছাড়া বহু অনারব দেশেও তখন ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল। এইসব অনারব দেশের অধিবাসীগণের মাতৃভাষা আরবী না হওয়ায় সাধারণতঃ আরবী শব্দ ও অক্ষরের সঠিক উচ্চারণ তাদের দ্বারা সম্ভব হতো না। এমন কি স্বয়ং আরববাসীদেরই মাতৃভাষা আরবী হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন গোত্রের উচ্চারণ বিভিন্নতার দরুন একই ভাষার একই শব্দের বিভিন্ন উচ্চারণের এই তারতম্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। আল্লামা ইবনে কুতাইবা (রহ.) উক্ত উচ্চারণ-তারতম্যের উদাহরণ প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

فَالْهُذَلِيْ يَقْرَءُ عَتّى عِيْنَ وَالْاَسَدِيْ يَقْرَءُ تِعْلَمُوْنَ بِكَسْرٍ وَالتَّمِيْمِيْ يُهْمِلُ وَالْقُرَيْشِيْ لَايُهْمِلُ -

হুযালী গোত্র 'আত্তাহীন', আসাদী গোত্র 'তিলামূন' যের সহযোগে পড়ে থাকেন। অনুরূপ তামীমী গোত্র এহ্মাল করেন। আর কুরাইশীগণ এহ্মাল করেন না।

ফলে ভুল বুঝাবুঝি এবং রসূল (স.) থেকে বহুল সমর্থিত নিঃসন্দেহে বর্ণনা সূত্রে প্রাপ্ত কেরাআত রীতিকে ভুল অভিহিত করার গোনাহ থেকে মানুষকে রক্ষা এবং পারস্পরিক মতবিরোধের আশু একটা নির্ভরযোগ্য সমাধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তখন পর্যন্ত মদীনা শরীফে রক্ষিত হযরত যায়েদ বিন সাবেত কর্তৃক লিখিত নুসখা ব্যতীত অন্য কারো একটি এমন কোন নুসখা ছিল না, যা অভ্রান্ত দলীলরূপে দাঁড় করানো যেতে পারে। কেননা, অন্য যেসব নুসখা ছিল সেগুলি যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল, সুতরাং সেগুলোর লেখন পদ্ধতিতে সবগুলি শুদ্ধ কেরাআত উল্লিখিত থাকতো না। এ সমস্যা সমাধানের একটিমাত্র পন্থা এই ছিল যে, এমন এক লিপি-পদ্ধতির মাধ্যমে কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করে সমগ্র মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে দেয়া, যার মধ্যে সাত কেরাআতেরই তেলাওয়াত সম্ভব হয় এবং কেরাআতের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে সে নুসখা দেখে মীমাংসা করে নেয়া যায়। হযরত উসমান (রযি.) তাঁর খেলাফতের যামানায় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই সম্পাদন করে গেছেন।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার যে পটভূমি হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রযি.) আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান এলাকায় জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি লক্ষ্য করলেন যে, কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে লোকদের মধ্যে নানা ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। সেমতে মদীনায় ফিরে এসেই তিনি সোজা হযরত উসমান (রযি.)-এর দরবারে গিয়ে হাজির

www.e-ilm.weebly.com

হলেন এবং নিবেদন করলেন, আমীরুল মুমেনীন! এই উম্মত আল্লাহ্‌র কিতাবের ব্যাপারে ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় মতভেদের শিকারে পরিণত হওয়ার পূর্বেই আপনি এর একটা সুষ্ঠু প্রতিবিধান ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

হযরত উসমান (রযি.) বিষয়টি খুলে বলতে বললেন। হযরত হুযাইফা বললেন, 'আর্মেনিয়া এলাকায় জিহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করেছি, সিরিয়া এলাকার লোকেরা হযরত উবাই বিন কাবের কেরাআত পদ্ধতি অনুসরণে কুরআন তেলাওয়াত করছে। অপরপক্ষে ইরাকের লোকেরা আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের কেরাআত পদ্ধতি অনুসরণ করছে। যেহেতু সিরিয়ার লোকেরা ইবনে মাসউদের কেরাআত পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এবং ইরাকের লোকদের পক্ষেও উবাই বিন কাবের কেরাআত পদ্ধতি শুনবার সুযোগ হয়নি, ফলে এদের মধ্যে কেরাআতের ব্যাপারে মতভেদ শেষ পর্যন্ত একে অন্যকে কাফের আখ্যায়িত করার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।'

হযরত উসমান (রযি.) নিজেও এরূপ একটা বিপদের আশঙ্কা করছিলেন। খোদ মদীনা শরীফে বিভিন্ন উস্তাদের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত নবীন সাগরেদগণের মধ্যে কেরাআতের বিভিন্নতাকে ভিত্তি করে কখনো কখনো বেশ উত্তপ্ত মতবিরোধ সৃষ্টি হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে এই মতবিরোধের উত্তাপ অনভিজ্ঞ উস্তাদগণের কাতারে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছিল। এমনকি তাঁরাও একে অপরের কেরাআতকে ভুল বলতে শুরু করেছিলেন।

হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রযি.) কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর হযরত উসমান এ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট সাহাবীগণকে একত্র করেন। সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, 'আমি শুনতে পেয়েছি যে, এক শ্রেণীর লোক অন্যদেরকে লক্ষ্য করে বলছে যে, আমাদের কেরাআত তোমাদের চাইতে উত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ। অথচ এ ধরনের মন্তব্য কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে। সুতরাং এ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আপনারা কি পরামর্শ দেন?

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ সম্পর্কে কি চিন্তা করেছেন? হযরত উসমান (রযি.) বলেন, আমার অভিমত হচ্ছে, সকল শুদ্ধ বর্ণনা একত্র করে এমন একটা সর্বসম্মত নুসখা প্রস্তুত করা কর্তব্য যাতে কেরাআত পদ্ধতির মধ্যেও কোন মতভেদের অবকাশ না থাকে। সাহাবাগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমানের এই অভিমত সমর্থন করলেন এবং এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা প্রদান করার অঙ্গীকার করলেন।

এরপর হযরত উসমান (রযি.) সর্বশ্রেণীর লোকদের সমবেত করে এক জরুরী বয়ান দিলেন। তাতে তিনি বললেন, আপনারা মদীনা শরীফে আমার অতি নিকটে বসবাস করেও কুরআন শরীফের ব্যাপারে একে অন্যকে দোষারোপ এবং মতভেদ

(৩২৩) আত্-তিবইয়ান ফী মাবাহিসিল-কুরআন ঃ আল্লামা সালেহ আল জাযায়েরী পৃষ্ঠা ঃ ৪৪

www.e-ilm.weebly.com

করছেন, এতেই বুঝা যায় যে, যারা আমার নিকট থেকে দূরে বহু দূর-দূরান্তের এলাকায় বসবাস করেন, তারা এ ব্যাপারে আরও বেশী মতভেদ এবং ঝগড়া-ফাসাদে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং আসুন আমরা সকলে মিলে কুরআন শরীফের এমন একটা লিপিবদ্ধ নুসখা তৈরী করি, যেটিতে কারো পক্ষে মতভেদ করার কোনই অবকাশ থাকবে না এবং সবার পক্ষে সেটি অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য বলে গণ্য হবে।

এই উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রযি.) উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসার নিকট থেকে হযরত আবুবকর (রযি.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ মাছহাফগুলো চেয়ে আনলেন। এ মাছহাফ সামনে রেখে সূরার তরতীবসহ কুরআনের শুদ্ধতম মাছহাফ তৈরী করার উদ্দেশ্যে কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত চারজন মশহুর সাহাবী হযরত যায়েদ বিন ছাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, হযরত সায়ীদ ইবনুল আ'ছ এবং হযরত আবদুর রহমান বিন হারেছ বিন হিশাম সমন্বয়ে গঠিত এক জামাতের উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। তাঁদের প্রতি নির্দেশ ছিল, হযরত আবুবকর (রযি.) কর্তৃক সংকলিত মাছহাফকেই শুধু এমন একটা সর্বসম্মত লিখন-পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা, যে লিপির সাহায্যে প্রতিটি শুদ্ধ কেরাআত পদ্ধতি অনুযায়ীই তেলাওয়াত করা সম্ভব হয়। দায়িত্বপ্রাপ্ত চারজন সাহাবীর মধ্যে হযরত যায়েদ ছিলেন আনছারী এবং অবশিষ্ট তিনজন কোরাইশ। হযরত উসমান নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে হযরত যায়েদের সাথে অন্য তিনজনের মতবিরোধ দেখা দেয় তবে কুরাইশদের লিপি-পদ্ধতি অনুসরণ করবে। কারণ, কুরআন যাঁর প্রতি নাযিল হয়েছিল, তিনি নিজে কুরাইশী ছিলেন। কুরাইশদের ব্যবহৃত ভাষায়ই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চারজন সাহাবীকে লেখার দায়িত্ব অর্পণ করা হলেও অন্যান্য অনেককেই তাঁদের সাথে সাহায্যকারী হিসাবে যুক্ত করা হয়েছিল। এমনকি ইমাম ইবনে আবী দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা ছিল বারোজন। যাঁদের মধ্যে হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত কাসীর ইবনে আফলাহ, হযরত মারেক ইবনে আবী আমের, হযরত আনাস ইবনে মালেক এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসও শামিল ছিলেন। তাঁরা কুরআন লিপিবদ্ধ করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করেন ঃ

(১) হযরত আবুবকর (রযি.)-এর উদ্যোগে লিখিত যে নুসখাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল, তাতে সূরাগুলি ধারাবাহিকভাবে না সাজিয়ে প্রতিটি সূরা পৃথক পৃথক নুসখায় লিখিত হয়েছিল, তাঁরা সবগুলি সূরাকে ক্রমানুপাতে একই মাছহাফে সাজিয়ে দেন।

(২) আয়াতগুলি এমন এক লিখন-পদ্ধতি অনুসরণে লেখা হয়, যাতে সবগুলি শুদ্ধ কেরাআত পদ্ধতিতেই তা পাঠ করা যায়। এ কারণেই অক্ষরগুলির মধ্যে নুক্তা এবং যের-যবর-পেশ সংযুক্ত হয়নি। এতে বহুল সমর্থিত সবগুলি

www.e-ilm.weebly.com

কেরাআতই তাতে পাঠ করা সহজ হয়, যেমন مَسرهَا লেখার কারণে এটাকে نَنْشُرهَا এবং نَنْشُزهَا উভয়ই পড়া যায়। কেননা, এখানে এ দু'ভাবেই পড়া জায়েয ও দুরুস্ত।

(৩) তখন পর্যন্ত কুরআনের উপরোক্ত ধরনের একটিমাত্র নুসখা মওজুদ ছিল। তাঁরা একাধিক নুসখা তৈরী করেন। সাধারণ বর্ণনামতে হযরত উসমান (রযি.) পাঁচখানা নুসখা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম সিজিস্তানী (রহ.)-এর মতে সাতটি নুসখা তৈরী হয়েছিল। এগুলির মধ্যে একটি মক্কা শরীফে, একটি সিরিয়ায়, একটি ইয়ামানে, একটি বাহরাইনে, একটি বছরায় এবং একটি কুফায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশিষ্ট একটি নুসখা বিশেষ যত্ন সহকারে মদীনা শরীফে সংরক্ষিত হয়েছিল।

(৪) লেখার ব্যাপারে তাঁরা প্রধানতঃ হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যামানায় লিখিত নুসখা অনুসরণের সাথে সাথে অধিকতর সাবধানতাবশতঃ ওই সমস্ত পদ্ধতিও অনুসরণ করেন, হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যামানায় মূল পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় যা অনুসৃত হয়েছিল। রসূল (স.)-এর যামানায় লিখিত যে সমস্ত অনুলিপি সাহাবীগণের নিকট সংরক্ষিত ছিল, সেগুলি পুনরায় একত্র করে মূল অনুলিপিটির সাথে সেসব অনুলিপিও নুতনভাবে যাচাই করে দেয়া হয়। সাহাবীগণের নিকট যেসব অনুলিপি ছিল, তন্মধ্যে সূরা আহযাবের ওই আয়াত مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ শুধুমাত্র হযরত খুযাইমা বিন ছাবেত আনছারীর নুসখায় লিখিত পাওয়া গিয়েছিল। এর অর্থ এই নয় যে, আয়াতটি অন্য কারো স্মরণ ছিল না, কিংবা হযরত আবুবকর (রযি.) কর্তৃক সংকলিত অনুলিপিতেও লিখিত ছিল না। কেননা, হযরত যায়েদ বিন ছাবেত বর্ণনা করেন ঃ

فُقِدَتْ اٰيَةٌ مِنَ الاَحزَابِ حِيْنَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ اَسْمَعُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَءُ بِهَا فَالْتَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَامَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الاَنْصَارِىْ ـ

"মাছহাফ তৈরী করার সময় সূরা আহযাবের সেই আয়াতটি বিচ্ছিন্ন কোন নুসখাতেই পাওয়া যাচ্ছিল না, যেটি আমি রসূল (স.)-কে অনেকবার তেলাওয়াত করতে শুনেছি।

এ বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এ আয়াত হযরত যায়েদসহ অনেক সাহাবীরই স্মরণ ছিল। কিংবা এর দ্বারা এ কথাও বুঝায় না যে, এ আয়াত অন্য কোন লিপিতেও ছিল না৷ বরং হযরত আবুবকর (রযি.) কর্তৃক প্রস্তুত করা নুসখাতেও এ আয়াত লিখিত ছিল। এমনকি সাহাবায়ে কিরামর নিকট ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য লিখিত নুসখাগুলিতেও সে আয়াত মওজুদ ছিল। বস্তুতঃ হযরত যায়েদ এবারও হযরত আবুবকর (রযি.)-এর যুগের মত বিভিন্ন সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে বিক্ষিপ্ত লেখাগুলিকে একত্র যাচাই করতে চেয়েছেন এবং যতক্ষণ

www.e-ilm.weebly.com

পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত লেখাগুলিকে মওজুদ না পেয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মাছহাফে লিপিবদ্ধ করেননি। মোটকথা, অন্যান্য আয়াত বহু সাহাবীর নিকট পৃথকভাবে লিখিত আকারে পাওয়া গেছে, কিন্তু সূরা আহযাবের উক্ত আয়াত পৃথকভাবে লিখিত একমাত্র হযরত খুযাইমার নিকটই পাওয়া গিয়েছে। হাতের কাছে অন্য কারো নিকট পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ-জিহাদ, শিক্ষকতা ও অন্যান্য কারণে অনেক প্রাক্তন সাহাবী বাইরে দূরে অবস্থান করছিলেন। তাঁদের ব্যক্তিগত নুসখাগুলিতে কিংবা তার কোন কোনটিতে উক্ত আয়াত লিখা থাকার বেশী সম্ভাবনা, কিন্তু হাফেযগণের সবার কণ্ঠে এবং মদীনায় উপস্থিত কোন কোন ব্যক্তিগত নুসখায় পাওয়ার পর দূরের মুশকিল তদারকী ও খোঁজাখুঁজির আর কোন জরুরত মাত্রও ছিল না।

(৫) কুরআন পাকের এ সর্বসম্মত মাছহাফ তৈরী হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র উম্মত এই মাছহাফের ব্যাপারে অধিক নিশ্চিত হওয়ার পর আগেকার বিক্ষিপ্ত সকল নুসখা আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়। কেননা, এরপরও ব্যক্তিগত এবং অবিন্যস্তভাবে লিখিত নুসখাগুলি অবশিষ্ট থাকলে সূরার ক্রমানুপাতিক গ্রন্থনা এবং সর্বসম্মত প্রতিটি কেরাআত পাঠোপযোগী লিখন-পদ্ধতির ব্যাপারে ঐকমত্য সৃষ্টি হওয়ার পরও পুনরায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থেকে যেত।

হযরত উসমানের এ কাজটি সমগ্র উম্মত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বসম্মতভাবে এ কাজ সমাপ্ত করার ব্যাপারে তাঁকে সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রযি.) বলেছেন ঃ

لَا تَقُوْلُوْا فِىْ عُثْمَانَ اِلَّا خَيْرًا فَوَاللّٰهِ مَا فَعَلَ الَّذِىْ فَعَلَ فِى الْمَصَاحِفِ اِلَّا عَنْ مَلَامِنَا ـ

"হযরত উসমান (রযি.) সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য করো না। কুরআনের আয়াতসমূহকে একত্রীকরণের বিষয়ে তিনি যা' করেছেন, তা আমাদের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতেই করেছেন।" ৩২৫

হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) কর্তৃক فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ-এর ব্যাখ্যা فَنَبَتَ بِالْمَاءِ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ দ্বারা করার কারণ সম্পর্কে লামিউদ্ দারারী প্রণেতা বলেন, فَاخْتَلَطَ শব্দটির বাহ্যিক দাবী হলো বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বেই গাছ-পালার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা। সেজন্য ইবনে আব্বাস (রযি.) فَنَبَتَ بِالْمَاءِ দ্বারা তার ব্যাখ্যা করেছেন। উদ্দেশ্য হলো, কেমন যেন গাছ-পালা পূর্ব হতেই মওজুদ। তবে বৃষ্টি বর্ষণের ফলে চাঙ্গা এবং সজীবতা লাভ করে। সুতরাং পানি গাছ-পালার সাথে একাত্ম এবং তার অস্তিত্বের সাথে মিশে গেছে।

---

(৩২৪) তারীখুল-কুরআন
(৩২৫) তাদবীনে কুরআন

www.e-ilm.weebly.com

قَدَمَ صِدْقٍ ঃ إِنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য রসূল (স.)। অর্থাৎ তাদের জন্য মুহাম্মাদ (স.) রয়েছেন, যিনি তাদের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। উর্দু অনুবাদকদের অনেকেই قَدَمَ صِدْقٍ-এর অনুবাদ بَلَنْدُ رُتْبَهْ তথা 'সমুচ্চ মর্যাদা' দ্বারা করেছেন।

لَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ ঃ সারকথা হলো, যেরূপভাবে মানুষ কল্যাণ কামনা ও প্রাপ্তিতে তাড়াহুড়ো করে এবং সে অনুযায়ী আল্লাহও (অধিকাংশ) সে কল্যাণ দ্রুত বাস্তবে প্রদান করেন। তদ্রূপ তাদের তড়িঘড়ি অকল্যাণ কামনা অনুযায়ী (যেমন রাগান্বিত হলেই নিজের স্ত্রী পরিজন এবং মাল-সম্পদের ব্যাপারে বদ দোয়া করে) যদি আল্লাহও তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতেন, তবে তারা নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যেত।

لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى مِثْلُهَا حُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ঃ যেহেতু উত্তম কাজের নিজস্ব প্রতিদান নির্ণয়ের উপর বোনাসটা (অতিরিক্ত প্রাপ্তি) নির্ভরশীল, সেহেতু প্রথমে তার প্রতিদান নির্ণয় করা হয়েছে যে, যারা সৎকাজ করেছে, তারা তাদের কৃত আমলের বরাবর প্রতিদান পাবে। শুধু প্রতিদানই নয়; বরং বোনাস হিসেবে কিছু বেশীও পাবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রসূল (স.) নিজেই বলেন, اَلْحُسْنٰى দ্বারা উদ্দেশ্য জান্নাত, আর زِيَادَةٌ (বোনাস) দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর দিদার লাভ।

(মা'আরেফুল কুরআন)

সূরা হুদ

يَثْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ شَكٌّ وَامْتِرَاءٌ فِى الْحَقِّ ঃ লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে আছে, এটা اَلثَّنِى-এর ব্যাখ্যা নয়; বরং তাদের উল্লিখিত কর্মের কারণ মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহর জ্ঞানের অসীম পরিধির ব্যাপারে তাদের সংশয়-সন্দেহের ফলে, তারা এ ধরনের কাজে লিপ্ত হয়।

বাহ্যিক ভাষ্য হতে অনুমিত হয় যে, অত্র আয়াত মুমিন-কাফের উভয়ের ব্যাপারে অবতীর্ণ। মুমিন চরম ভয়ে এ কাজ করে। ফলে এটা তাদের ক্ষেত্রে প্রশংসাসূচক। পক্ষান্তরে কাফের যেহেতু আল্লাহর জ্ঞানে সংশয়-সন্দেহের ভিত্তিতে এ কাজ করে, সেহেতু এটা তাদের ব্যাপারে নিন্দাবাদ।

وَرَجْلَةً يَضْرِبُوْنَ الْبَيْضَ ضَاحِيَةً * ضَرْبًا تَوَاصٰى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّيْنًا ঃ উদ্দেশ্য হলো, বহু পদাতিক লোক এমন রয়েছে, যারা চাশতের সময় এমন কঠোর ও তীব্রভাবে তলোয়ারে আঘাত হানে যে, শক্তিশালী বীর-বাহাদুর পর্যন্ত তাদেরকে (মৃত্যু নিশ্চিত জেনে শেষ) ওসিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়।

وَرَائَكُمْ ظِهْرِيًّا ঃ এর দ্বারা কুরআনের আয়াত أَرَهْطِى أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوْهُ وَرَائَكُمْ ظِهْرِيًّا-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। লেখকের

www.e-ilm.weebly.com

পরবর্তী উক্তি "لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ" এটা পূর্বোক্ত ظِهْرِيًّا -রই ব্যাখ্যা। অর্থ, তারা তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর আদেশকে পশ্চাতে ছুঁড়ে ফেল।

وَالظِّهْرِيُّ هٰهُنَا أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ ঃ এখানে هٰهُنَا দ্বারা উদ্দেশ্য আমাদের কথা বা বক্তব্যে, কুরআনে উল্লিখিত ظِهْرِيٌّ উদ্দেশ্য নয়। (লামিউদ্ দারারী) কারণ, এখানে ظِهْرِيٌّ-এর যে অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে, তা আয়াতে বর্ণিত ظِهْرِيٌّ-এর অর্থ নয়।

مَجْرَاهَا ঃ শব্দটি কয়েকভাবে পড়া যেতে পারে। (১) মীম বর্ণে পেশ যোগে مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا (২) যবর যোগে مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا (৩) মীম বর্ণে পেশ কিন্তু রা বর্ণে ইমালার সাথে مُجْرِيْهَا وَمُرْسِيْهَا (৪) মীম বর্ণে যবর যোগে আর রা বর্ণে ইমালার সাথে مَجْرِمهَا وَمُرْسِيْهَا

طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ (আপনি দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের প্রান্তভাগেও নামায পড়ুন) ঃ এ আয়াতে নামাযের পাঁচ ওয়াক্তের বর্ণনা এসে গেছে। কেননা, দিনের একভাগে ফজর আর অপর ভাগে জোহর ও আসর। আর ও زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ দ্বারা মাগরিব ও ঈশা উদ্দেশ্য।

সূরা ইউসুফ

وَالْمُتَّكَأُ مَا اتَّكَأْتَ عَلَيْهِ ঃ مُتَّكَأ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। (১) 'তা' বর্ণে তাশদীদ যোগে। আর এ কিরাতই মুতাওয়াতির। (২) হামজা ফেলে দিয়ে 'তা' বর্ণে ছাকিন যোগে। এ কিরাতটি নিতান্তই বিরল (شَاذٌ)

ইমাম বুখারী (রহ.) مُتَّكَأً শব্দ প্রসঙ্গে যে বিশদ আলোচনা করেছেন, তার সারকথা লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো, হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে مُتْكَا (হামযা বিলুপ্ত ও تَاء শব্দে সাকীন যোগে) অর্থ الأُتْرُنْجُ। বা কমলা লেবু সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, সে ব্যাপারে ইমাম বুখারীর বক্তব্য হলো, (১) প্রথমত এ কেরাতটি শাজ। (২) দ্বিতীয়ত তার অর্থ 'কমলা লেবু' করা সঠিক নয়। (৩) তৃতীয়ত তাদের সেখানকার নাস্তা কমলা লেবু ছিল না; বরং ছুরি বা চাকু দ্বারা কেটে খেতে হয় এমন কোন খাদ্য বস্তু ছিল। (৪) চতুর্থত যদি মেনে নেয়া হয় যে, কমলা লেবুই ছিল, তখন প্রশ্ন হয়, কমলা লেবু তো এর পরে আনা হয়। তাহলে যখন مُتَّكَأ টা পূর্বে এবং কমলা লেবু পরে আনা হলো, তখন مُتَّكَا-এর অর্থ কমলা লেবু নেয়া কিভাবে শুদ্ধ হলো? অতএব এটা বলাই সঙ্গত যে, مُتَّكَا শব্দটি তাশদীদযোগে হবে। আর অর্থ হবে, কুশন, কুশাসন, তাকিয়াযুক্ত আসন-যার উপর হেলান দিয়ে বসা হয়।

www.e-ilm.weebly.com

কতিপয় ব্যাখ্যাকার ইমাম বুখারীর উক্তি ঃ وَلَيْسَ فِى كَلَامِ الْعَرَبِ الْأُتْرُنْجُ এর কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, আরবী ভাষায় (সাকীন যোগে) শব্দটি কমলা লেবু অর্থে অবশ্যই ব্যবহৃত হয়। শায়েখ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) বলেন, ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে, مُتَّكَأً-এর তাফসীর আরবী ভাষার কোথাও أُتْرُنْج আসেনি।

প্রকাশ থাকে যে, مُتَّكَأً-এর সম্পর্কে যে দুই কেরাত (পাঠরীতি) বর্ণিত হয়েছে যে, (১) 'তা' শব্দে সাকিন যোগে যার অর্থ কমলালেবু এবং স্ত্রীলিঙ্গের কিনারা বা সাইড আর (২) 'তা' শব্দে তাশদীদযোগে, যার অর্থ মজলিস (সভা) খাদ্য এবং সোফাসেট-বস্তুত এতদুভয়ের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। কারণ, ইমাম বুখারী (রহ.) مُتَّكَأً-কে اِتَّكَأَ মাসদার হতে اِسْمِ مَفْعُوْل-এর সীগা আখ্যা দিয়ে বলেন যে, তার অর্থ কমলা লেবু ও স্ত্রীলিঙ্গের কিনারা নয়। আর অন্যান্য ব্যাখ্যাকার যদিও অন্য অর্থ গ্রহণ করেছেন, তথাপি তারা এ অর্থকেও সমর্থন করেন। কারণ তারা مُتَّكَأً-এর অর্থ কমলালেবু তখন নেন, যখন শব্দটি তাশদীদযুক্ত হয় না অর্থাৎ, যখন ثُلَاثِىْ مُجَرَّد থেকে আসে। ফলে কোনই বৈপরীত্য নেই।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, ইবনে আব্বাস, সাঈদ বিন যুবাইর ও মুজাহিদ (রহ.) বলেন, مُتَّكَأً হলো একটি খাদ্যের নাম। আর এ নামে তার নামকরণের কারণ হলো, মানুষ সাধারণত সোফাসেটে আরাম করে বসে এ খাদ্য খায়। তাই রূপকভাবে পরবর্তীতে এ খাদ্যরই নাম হয়ে গেছে مُتَّكَأً

তবে কেউ কেউ বলেন, مُتَّكَأً ঐ খাদ্যের নাম, যা ছুরি বা চাকু দিয়ে কেটে খেতে হয়। যেহেতু মানুষ তা কাটতে তার উপর চাপ প্রয়োগ বা ভর দেয়ার মুখাপেক্ষী হয়, সেহেতু তাকে مُتَّكَأً বলা হয়। বস্তুত এখানে حَالْ (চাপ প্রদান) বলে مَحَلْ (খাদ্যবস্তু) উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.) আল্লামা কিরমানী (রহ.) হতে উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলেন, ইমাম বুখারীর (রহ.) মূল উদ্দেশ্য হলো, একথা বর্ণনা করা যে, কুরআনের আয়াত وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً-এর মধ্যস্থ مُتَّكَأً শব্দটি (بَابِ اِفْعَال) الْاِتِّكَاءُ থেকে اِسْمِ مَفْعُوْل শব্দ যে مُتْكَأً-এর অর্থ الْأُتْرُنْجُ (কমলা লেবু) কিংবা طَرَفُ الْبَظْر (স্ত্রী লিঙ্গের কিনারা) এটা সে مُتْكَأً নয়।

আল্লামা কস্তলানী বলেন, مُتْكَأً শব্দটি তাশদীদবিহীন অবস্থায় তার অর্থ হবে কমলালেবু এবং স্ত্রীলিঙ্গের কিনারা। আর যখন তাশদীদযুক্ত হবে, তখন অর্থ হবে, কুশন, তাকিয়াযুক্ত আসন-যার উপর হেলান দিয়ে ফল-মূল খাওয়া বা পানাহার করা হয়। সুতরাং দু'বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতির কিছুই নেই।

www.e-ilm.weebly.com

অনুরূপভাবে হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.) লামিউদ্ দারারী গ্রন্থে বলেন, লেখক (বুখারী) مُتَّكَا বলে মূলত ঐ অর্থই উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা অন্য মুহাদ্দিসগণ اَلْمُتْك (সাকিন যোগে) এর অর্থ بَظْر থেকে উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন। প্রভেদ শুধু শব্দগত। অর্থাৎ লেখক শব্দটি اِسْم مَفْعُول হিসেবে গ্রহণ করেছেন আর তারা بَظْر-এর পূর্বে مُضَاف উহ্য মেনেছেন। অর্থাৎ مَوْضَع অর্থাৎ وَضْعُ الْبَظْر অর্থাৎ লজ্জাস্থান রাখার স্থান। আর তাই হলো সোফাসেট, কুশন বা তাকিয়াযুক্ত আসন।

মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, مَنْ قَرَأَ مُتَّكَأً قَالَ الطَّعَامُ وَمَنْ قَرَأَ مُتْكًا قَالَ الْأُتْرُنْجُ অর্থাৎ যারা শব্দটি (متكا) তাশদীদ যোগে পড়বে, তারা অর্থ করবে খাদ্যবস্তু আর যারা তাশদীদবিহীন পড়বে, তারা অর্থ করবে কমলালেবু। তিনি আরও বলেন, مُتَّكَا টা কমলালেবু আর স্ত্রীলিঙ্গের কিনারা-এ দু'অর্থে সমভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

উপরোল্লিখিত বিশদ আলোচনা ও উদ্ধৃত বিভিন্ন ভাষ্য হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এ সকল অর্থের পরস্পরের মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই; সকল অর্থের পরিণতি বা উদ্দেশ্য একই।

সূরা রা'দ

مُتَجَاوِرَاتٌ ঃ এর দ্বারা কুরআনের আয়াত وَفِى الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرًا-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো, সন্নিবেশিত ও সম্মিলিত বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত এ ভূপৃষ্ঠ। এ বিভিন্ন অংশ পরস্পর সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রভৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। কোন অংশ ভাল, কোন অংশ লবণাক্ত, কোনটি শক্ত, কোনটা নরম, কোনটা চাষ উপযোগী, কোনটা উপযোগী নয় অর্থাৎ অনুর্বর প্রভৃতি।

كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ (পানির উপর কব্জা করতে দু'হস্ত প্রসারিতের ন্যায়) ঃ এখানে শুধু অর্থ বর্ণনার জন্য বাক্যটি পুনরায় উল্লিখিত হয়েছে। আর পূর্বের উল্লেখটা ছিল তার দ্বারা মুশরিকের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার জন্য।

সূরা ইব্রাহীম

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ঃ হাদীসে পবিত্র বৃক্ষ খেজুর গাছের সাথে মর্দে মুমিনদের একটি দৃষ্টান্ত প্রদান করা হয়েছে। আল্লামা কস্তলানী (রহ.) এ দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, যেরূপভাবে খেজুর গাছের মধ্যে তিনটি মৌলিক বিষয় থাকে, যেমন-(১) মজবুত ও সুউচ্চ কাণ্ড (২) মাটির গভীরে প্রোথিত শিকড় ও (৩) আকাশ পানে ধাবমান শাখা। তদ্রূপ মুসলমানের মধ্যেও তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে। (১) تَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ অর্থাৎ আন্তরিক সত্যায়ন (২) قَوْلٌ بِاللِّسَانِ তথা

www.e-ilm.weebly.com

মৌখিক স্বীকৃতি ও (৩) عَمَلٌ بِالْأَبْدَانِ তথা শারীরিক ইবাদত পালন বা কার্যত কর্মানুষ্ঠান। মা'আরেফুল কুরআন প্রণেতা বলেন, খেজুর গাছের সাথে মুমিনের দৃষ্টান্ত দেয়ার আরেকটি তাৎপর্য হলো, প্রথমতঃ ঈমান হচ্ছে মুমিনের জন্য মজবুত ও অনড় শিকড় স্বরূপ। যা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও শক্ত। ফলে দুনিয়ার বিপদ-বিপর্যয় তাকে টলাতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ মুমিন এতই পূত-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন যে দুনিয়ার ময়লা-নোংরামি থেকে তিনি সব সময় দূরে সরে থাকেন। যেমন, ভূ-পৃষ্ঠের ময়লা-আবর্জনা উচ্চ বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। তৃতীয়তঃ যেরূপভাবে খেজুর গাছের শাখা আকাশের দিকে ক্রমেই উঁচু হতে থাকে তদ্রূপ মুমিনের ঈমানের ফলাফলও তথা সৎকর্মও আকাশের দিকে উত্থিত হয়। চতুর্থতঃ যেরূপভাবে খেজুর সর্বসময়, সর্বাবস্থায়, সব মওসুমে (ঋতুতে) দিনে-রাতে খাওয়া যায়, তদ্রূপ মুমিনের সৎ আমলও তেমনি সর্বসময় সর্বঋতুতে, সর্বাবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা অব্যাহত থাকে এবং খেজুর বৃক্ষের প্রত্যেকটি অংশই যেমন উপকারী, তেমনি মুমিনের প্রত্যেক কথা, কাজ, উঠা-বসা, চলাফেরা এবং এ সবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত হলো তাকে অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ মুমিন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত বিধান ও শিষ্টাচার অনুযায়ী চলতে হবে।

সূরা হিজর

كَمَا أَنْزَلْنَا ঃ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ ঃ এর দ্বারা কুরআনের আয়াত ঃ عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِيْنَ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। مُقْتَسِمِيْنَ অর্থ বণ্টনকারী, ভাগকারী, বিভক্ত প্রভৃতি। আর عِضِيْنَ অর্থ টুকরো-টুকরোকারী, খণ্ড-বিখণ্ডকারী। অর্থাৎ যারা কুরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য রসূল (স.)-এর যুগের ঐ সকল ইহুদী-নাসারা, যারা কুরআনকে ভাগ করে রেখেছিল। পবিত্র কুরআনের যে অংশ তাদের মনঃপূত হতো তা গ্রহণ করতো। আর যে অংশ তাদের মতের অনুকূল হতো না তা মানত না।

তবে আবার কেউ কেউ مُقْتَسِمِيْنَ-এর দ্বারা পূর্ববর্তী যুগের ইহুদী-নাসারা আর কুরআন দ্বারা পূর্ববর্তী কিতাব উদ্দেশ্য নিয়েছেন। অর্থাৎ যারা বিকৃতি সাধনের মাধ্যমে নিজেদের কিতাব টুকরো টুকরো করেছে।

আবার কেউ কেউ এর দ্বারা মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যারা উপহাসভরে কুরআন ভাগ করত। তারা কুরআনের সূরাগুলির নাম শুনে হেসে কুটি কুটি হত আর একে অপরকে বলত, বাকারা বা মায়েদা আমি নিব আর আনকাবুত তুমি নিবে। খোদ কুরআন সম্বন্ধে এবং অভিনব পন্থায় নিজেদের চিন্তা-চেতনাকে তারা ভাগ করত। কেউ পবিত্র কুরআনকে কাব্য বলত, কেউ প্রলাপ বাক্য, কেউ জাদু, কেউ প্রাচীন কালের কাহিনী বলে অভিহিত করত।

টিকা ঃ ১. হযরত মুকাতিল (রহ.), মৃত্যু ঃ ১৫০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

হযরত মুকাতিল[১] (রহ.) বলেন, হজ্জের মওসুমে ওলীদ বিন মুগীরা মক্কায় প্রবেশের বিভিন্ন সড়ক ও রাস্তায় ১৫ জন লোক মোতায়েন করে। যাতে তারা মানুষদেরকে ইসলাম আনয়ন থেকে বিরত রাখে। তারা মক্কার বিভিন্ন রাস্তায় অবস্থান নিয়ে হজ্জে আগত লোকদের এ ব্যাপারে সতর্ক করত। কেউ বলত, এখানে একজন লোক নিজেকে নবী বলে দাবী করতে পারে। সাবধান! তোমরা তার কথায় প্রতারিত হবে না। কেননা, সে জ্যোতিষী বৈ নয়। কেউ বলত, সে একজন বিকারগ্রস্ত লোক। কেউ বলত, সে একজন কবি।

الْمُقْتَسِمِيْنَ الَّذِيْنَ حَلَفُوا (অর্থাৎ যারা হলফ করেছে) ঃ এ ব্যাখ্যা অনুপাতে শব্দটি قَسَمٌ ধাতু থেকে নির্গত হবে; قِسْمَت থেকে নয়। মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত আছে, اَلْمُقْتَسِمُوْنَ هُمْ قَوْمُ صَالِحٍ تَقَاسَمُوْا عَلٰى هَلَاكِهٖ অর্থাৎ হযরত সালেহের (আ.) যে কওম তাঁর প্রাণনাশের হলফ করেছিল, তারাই مُقْتَسِمُوْنَ। তবে জমহুরের মতে শব্দটি اَلْقِسْمَةُ থেকেই গঠিত।

(ফাওয়ায়েদুল কুরআন[২])

সূরা নাহল

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ (তোমরা কুরআন পড়তে আউযুবিল্লাহ পড়বে) ঃ ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, এখানে বক্তব্যটি অগ্র-পশ্চাত পন্থায় এসেছে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে)। কারণ আউযুবিল্লাহ পড়তে হয় কুরআন তেলাওয়াতের পূর্বে; পরবর্তীতে নয়। এটাই জমহরের অভিমত। তাঁরা (জমহুর) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন যে, إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ অর্থাৎ যখন কুরআন তেলাওয়াত করতে ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে আউযুবিল্লাহ পড়ে শুরু করবে।

তবে অনেকে আয়াতকে তার বাহ্যিক অবস্থায় রেখে বলেন, অত্র আয়াতের মর্ম হলো, إِسْتَعِذْ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ অর্থাৎ তেলাওয়াত শেষে আউযুবিল্লাহ পড়। সাহাবা (রযি.), একদল তাবেয়ী (রহ.) এবং ইমাম মালেক ও দাউদ জাহেরীর মাজহাব এটাই। তাদের ব্যাখ্যা হলো, কুরআন-পাঠক তেলাওয়াতের মাধ্যমে বিপুল সওয়াব অর্জন করে। কিন্তু অনেক সময় তার অন্তরে ওয়াসওসাহ (শয়তানী কুমন্ত্রণা) আসে। বস্তুত এ ওয়াসওসাহ দূর করতে তেলাওয়াত শেষে আবার আউযুবিল্লাহ পড়ার তথা শয়তান হতে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে জমহুর তাদের দাবী ও ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করে বলেন, পানাহ চাওয়ার প্রয়োজন শেষে হয় না, বরং প্রথমেই হয়। যাতে এ নেক কাজে শয়তান প্রথম থেকেই ওয়াসওসাহ না দিতে পারে।

২. ফাওয়ায়েদুল কুরআন ঃ হযরত শাব্বির আহমাদ উসমানী (রহ.) প্রণীত। মৃত্যু ঃ ১৩৬৯ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

সূরা বনী ইসরাঈল

إِنَّهُنَّ مِنَ الْعِتَاقِ الْأُوَلِ : عِتَاقٌ শব্দটি عَتِيْقٌ-এর جَمْع । অর্থ অত্যন্ত ভাল, উন্নত। আর প্রাথমিক পর্যায়টা দু'দিক দিয়ে হতে পারে। (১) সংরক্ষণের (মুখস্থ) বিবেচনায় ও (২) অবতরণের বিবেচনায়। কেননা এগুলো (বনী ইসরাঈল, কাহাফ ও মারয়াম) মক্কী সূরা। ফলে তা একদিকে যেমন প্রাথমিক সূরা, তেমনি মর্যাদার দিক দিয়েও উত্তম সূরা।

وَهُنَّ مِنْ تُلَادِيْ : অর্থাৎ আমার বহুদিন পূর্বের সংরক্ষিত (হেফজকৃত) সূরার অন্তর্গত।

وَقَضٰى رَبُّكَ : আল্লামা আয়নী (রহ.) قَضَاء-এর ১৮ অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এখানে ৩টি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন। (১) اَلْأَمْرُ তথা আদেশ দেয়া (২) اَلْحُكْمُ তথা ফায়সালা করা ও (৩) اَلْخَلْقُ তথা সৃষ্টি করা।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا : এখানে أَمَرْنَا-এর কয়েকটি অর্থ বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি হলো (আমি কোন বস্তি ধ্বংসের অভিপ্রায় নিলে) সে বস্তির সুখী ও বিলাস প্রিয় লোকেরদেকে (আমার) আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করি।

দ্বিতীয় অর্থ : أَمَرْنَا অর্থ أَكْثَرْنَا অর্থাৎ সে বস্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপনকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করি। ফলে তারা আল্লাহর আনুগত্যের পরিবর্তে তথায় অন্যায়-অপকর্ম ও অবাধ্যতায় অধিকহারে লিপ্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় অর্থ : মীম শব্দে তাশদীদযোগে-اَمَّرْنَا অর্থাৎ সে বস্তির বিলাসী লোকদেরকে কওমের নেতা বানিয়ে দিই। (মাআরেফুল কুরআন)

সূরা কাহফ

لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (আপনি চাইলে তাদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন) : এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পতনোন্মুখ প্রাচীর সোজা করে দেয়া সামান্য) কাজের জন্য কিভাবে হযরত মূসা (আ.) মজুরি বা পারিশ্রমিক নিতে চাইলেন। উত্তর হলো, হযরত মূসা (আ.)-এর উদ্দেশ্য হলো, আপনি চাইলে দেয়াল সোজা করার পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তাদের সাথে আলাপ করতে পারতেন। এতে তারা কিছু পারিশ্রমিক প্রদান করত। যাতে আমাদের আহারের সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে যেত।

এখানে আরেক প্রশ্ন হয় যে, হযরত মূসা (আ.) হযরত খযির (আ.) থেকে মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষুধায় ধৈর্য ধরতে পারলেও হযরত মূসা (আ.) কেন পারলেন না? যার প্রেক্ষিতে তাকে উপকরণের প্রতি মনোনিবেশ করতে হলো? এ প্রশ্নের জওয়াব হলো, হযরত মূসা (আ.)-এর এ পদক্ষেপ তাওয়াক্কুলের

www.e-ilm.weebly.com

পরিপন্থী ছিল না। অবশ্য যদি তিনি আল্লাহর প্রতি আস্থা হারিয়ে শুধু বাহ্যিক উপকরণের প্রতিই নির্ভরশীল হতেন, তখন 'তাওয়াক্কুলের খেলাপ' হয়েছে বলে অভিহিত করা যেত। অথচ হযরত মূসা (আ.) উপকরণের দিকে দৃষ্টি দিলেও তার প্রতি তিনি ভরসা করেননি। ফলে হযরত খযির (আ.) এর তুলনায় প্রকৃত পক্ষে তার তাওয়াক্কুলই বেশি ছিল। কেননা, খযির (আ.) উপকরণ বর্জন করেছেন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) উপকরণের প্রতি দৃষ্টি দেয়া সত্ত্বেও তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভরসা করেননি। (বরং তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল একমাত্র আল্লাহর উপরেই।)

দ্বিতীয় জওয়াব হলো আহার কি হবে এবং কোথায় হবে এ সম্পর্কে হযরত খযির (আ.) আল্লাহর পক্ষ হতে পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন বিধায় তিনি ক্ষুধায় কাতর হননি। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) এ সমস্ত বিষয়ে পূর্ব ওয়াকিফহাল (জ্ঞাত) ছিলেন না, যার ফলে তিনি ক্ষুধায় কাতর অবস্থায় আল্লাহর প্রতি অগাধ ভরসা রেখেই উপকরণের প্রতি দৃষ্টি দেন।

প্রথম জ্ঞাতব্য ঃ হযরত খযির (আ.) ও হযরত মূসা (আ.)-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?

ইমাম রাজী[১] (রহ.) তার তাফসীরে কাবীরে বলেন, (১) নৌকার ঘটনা (২) বালক হত্যা এবং (৩) প্রাচীর সংস্কার-এ ঘটনায় একটি অভিন্ন সূত্র বিদ্যমান। আর তা হলো, নবীগণের (আ.) ক্রিয়াকর্ম ও বিধানাবলীর ভিত্তি থাকে বাহ্যিকের উপর। যেমন রসূল (স.) বলেন ঃ نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللّٰهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ অর্থাৎ আমরা বাহ্যিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত দিব আর আল্লাহ্ পাক দেখবেন আভ্যন্তরীণ অবস্থা। যেহেতু শুধু বাহ্যিক অবস্থা দর্শন ও বিবেচনা করে জনগণের মাল ও অন্তরের ব্যাপারে হুকুম জারী করা যায় না। তাই কারো নৌকা ছিদ্র করা তার মালিকানাকে তুচ্ছ বা হেয় করার নামান্তর। কেননা, এখানে এমন কোন বাহ্যিক কারণ নেই, যার প্রেক্ষিতে তাকে মুবাহ্ বলা যেতে পারে। অনুরূপ বাহ্যিক কারণ ছাড়া বালক হত্যা করা এক নিরাপরাধ আত্মা বিনাশেরই নামান্তর, যাকে জায়েয বলে ফতোয়া দেয়ার কোনই বাহ্যিক কারণ নেই। অনুরূপভাবে বাহ্যিক ও জরুরী কোন প্রয়োজন বা কারণ ছাড়াই প্রাচীর সংস্কার করাও এক ধরনের পণ্ডশ্রম মাত্র। বস্তুত এ সমস্ত বিষয়ে হযরত মূসা (আ.)-এর জ্ঞান ততটুকুই ছিল, যতটুকু তিনি বাহ্যিক অবস্থা দেখে অবগত হন। পক্ষান্তরে হযরত খযিরের ছিল এক বিশেষ জ্ঞান। যার ফলে তিনি আভ্যন্তরীণ অনেক বিষয় সম্পর্কে পূর্ব হতেই অবগত ছিলেন। নিঃসন্দেহে এ বিশেষ জ্ঞানের দিক বিবেচনায় হযরত খযির (আ.) হযরত মূসা (আ.) থেকে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবে এটা ক্ষেত্রবিশেষ যা তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.) ছিলেন একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন

টিকা ঃ ১. ইমাম রাজী (রহ.), জন্ম ঃ ৫৪৪ হিজরী, মৃত্যু ঃ ৬০৬ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

নবী। ফলে যদিও মূসা (আ.) উক্ত বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না তথাপি জ্ঞানের মর্তবার দিক দিয়ে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। হযরত মূসা (আ.)-এর এ সামগ্রিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বকে কখনো হযরত খযির (আ.)-এর ক্ষেত্র বিশেষ মর্যাদা ম্লান কিংবা হ্রাস করে না।

দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য ঃ হযরত খযির (আ.) বর্তমানে জীবিত না মৃত?

হযরত খযিরের (আ.) জীবিত ও মৃতের প্রশ্নে চরম মতানৈক্য রয়েছে। মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ ইন্তেকালের পক্ষে। আর সূফীগণ জীবিতের পক্ষে। তারা এ ব্যাপারে তাদের পর্যবেক্ষণের কথা বর্ণনা করেন। যেহেতু পুরো ব্যাপারটিই সৃষ্টি রহস্যকেন্দ্রিক, তাই সঙ্গত কারণেই এ বিষয়ে সূফীগণের উক্তিই অগ্রগণ্য। যেমন শরয়ী ব্যাপারে মুহাদ্দিস ও ফোকাহায়ে কেরামের উক্তি প্রাধান্য পায়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.) তাঁর মাকতুবাতে বলেন, ফিকহী বিষয়ে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর রায় প্রণিধানযোগ্য। আর তাসাউফের ক্ষেত্রে হযরত জুনাইদ বোগদাদী ও হযরত শিবলীর (রহ.) কথা প্রণিধানযোগ্য। অপর এক স্থানে তিনি বলেন, এখানে জুনাইদ ও শিবলী কাজে আসবে না। এখানে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) ও শাফেয়ী (রহ.)-এর দরকার। তদুপরি কতিপয় মুহাদ্দিসও হযরত খযির (আ.)-এর জীবিত হওয়ার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ফয়জুল বারী গ্রন্থে এসেছে হযরত খযির (আ.) জীবিত থাকার ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য সূত্রের সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ হলো, একদা হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ (রহ.) মসজিদ থেকে বের হয়ে জনৈক ব্যক্তির সাথে কথা বলতে বলতে চলছিলেন। উপস্থিত লোকজন আগন্তুক লোকটিকে চিনতে না পেরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান, ইনি খযির (আ.)। সূফীগণও তাঁর জীবিত থাকার জোর দাবী করেন। তবে তারা এ কথা স্বীকার করেন যে, তিনি মিছালী শরীরে বিরাজমান। এ প্রসঙ্গে بَحْرُ الْعُلُوْم (বিদ্যা সাগর) আল্লামা আব্দুল আলী লাখনবী (রহ.)[১] (তাঁর কিতাবে) সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন। (ইরশাদুল কারী)

তৃতীয় জ্ঞাতব্য ঃ শরয়ী জ্ঞান শ্রেয়তর না গূঢ়-রহস্যমূলক জ্ঞান?

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী[২] (রহ.) তাঁর কালীদে মসনবী নামক গ্রন্থে বলেন, শরয়ী জ্ঞানের তুলনায় ইলমে বাতেন তথা মারেফাতী জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব আয়াতোক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় না। আর তার কারণ দু'টি। (১) খোদ ইলমে বাতেন বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানই শরয়ী জ্ঞানের একটি বিশেষ অংশ বা শাখা মাত্র। কারণ, বাহ্যিক ও আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পন্থা জানার নামই হলো "শরয়ী জ্ঞান"। (আর ইলমে বাতেন হলো, শুধু

টিকা ঃ ১. আল্লামা আব্দুল আলী লাখনবী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১২২৫ হিজরী।

২. হযরত আল্লামা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), জন্ম ঃ ১২৮০ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১৩৬২ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের পন্থা জানার নাম।) বাহ্যিক পরিশুদ্ধি হলো, মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও ক্রিয়া-কর্ম সুচারু, সুন্দর ও মার্জিত করা। আর আত্মিক পরিশুদ্ধি হলো আকীদা ও আখলাক (মানবিক চরিত্র ও আচার-ব্যবহার) শুদ্ধ ও সুন্দর করা। বস্তুত এ সবই বিস্তারিতভাবে শরীয়ত বর্ণনা করেছে। যখন এ কথাই সর্বোচ্চ সত্য ও সঠিক যে, ইলমে বাতেন শরয়ী জ্ঞানেরই অংশ বিশেষ, তখন তা অংশ বিশেষ হয়ে কিভাবে সামগ্রিক বিষয়ের তুলনায় শ্রেয়তর হতে পারে?

দ্বিতীয় কারণ হলো, উল্লিখিত ঘটনায় হযরত খযির যে সমস্ত দূরবর্তী বিষয়ে অবগত হন তার সবই ইলমে বাতেন সংশ্লিষ্ট ছিল না; বরং কিছু ছিল খণ্ড ঘটনা ও ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য জাতীয়, যা তিনি সরাসরি আল্লাহ মারফত অবহিত হয়েছিলেন। আর তার প্রকৃত অবস্থা এর চেয়ে বেশী কিছু ছিল না যে, যে সকল বিষয় কাল ও স্থান হিসেবে দূরবর্তী ছিল, তা তার জ্ঞানে নিকটবর্তী হয়ে যায়। যেমন বাদশাহ্ স্থানগত দিক দিয়ে দূরে ছিল। বালকের কুফুরী কাজ করা কাল হিসেবে দূরবর্তী ছিল। প্রাচীরের নিচের অর্থভাণ্ডার কাল হিসেবে দূরে ও অপ্রকাশ্য ছিল। আর দূরের বস্তু নিকটে জানা (অর্থাৎ ভবিষ্যতে ঘটনার বিষয় বর্তমানে অবহিত হওয়া) এটা কোন ইলমে বাতেন নয়।

পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ.)-এর ছিল শরয়ী ও আধ্যাত্মিক বিপুল জ্ঞান। বাহ্যিক ও আত্মিক জ্ঞান সে বিপুল জ্ঞানেরই একটি বিশেষ অংশ বা শাখা মাত্র।

মোটকথা, খযরী জ্ঞান কোনভাবেই মূসায়ী জ্ঞান থেকে উন্নত ও শ্রেয় ছিল না। আর মূসাকে (আ.) খযিরের কাছে প্রেরণের কারণ শুধু এতটুকুই ছিল যে, তিনি জনৈক প্রশ্নকারীর জওয়াবে أنا أعلم তথা 'আমিই সর্বাধিক জ্ঞানী' বলেন। যদিও তাঁর এ জওয়াব শরয়ী জ্ঞানের দিক দিয়ে সঠিকই ছিল, তথাপি তাঁর ঐ উক্তি যেহেতু সকল জ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই তাকে সতর্ক করা হয় যে, কিছু কথা ও ব্যাপার এমন আছে, যা আপনার জ্ঞানের বাইরে রয়েছে। এ জ্ঞান অন্যকে দেয়া হয়েছে, আপনাকে তা দেয়া হয়নি। ফলে জবাব দানে আপনাকে আরও সতর্ক হতে হতো এবং অতি বিবেচনার সাথে হিসেব করে জবাব দিতে হবে।

সূরা মারয়াম

أَبْصِرْ بِهِمْ وَأَسْمِعْ ঃ যেদিন তোমরা আমার কাছে আসবে, সেদিন কতই না সুন্দর দেখবে ও শুনবে! (এটা أَفْعَالِ تَعَجُّبْ বা বিস্ময়বাচক শব্দ)।

وَنَرِثُهُ مَا يَقُوْلُ ঃ অর্থাৎ সে যা দাবী করছে যে (মৃত্যুর পরও) "আমার হাতে আমার সমস্ত মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি থাকবে" এটা কখনও হবে না; বরং তার মৃত্যুর পরপরই আমি তার সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি সব নিয়ে নেব। ফলে তার দু'পুত্র মুসলমান হয়ে যায়। অথবা আয়াতের উদ্দেশ্য হলো তার সম্পদ ও

www.e-ilm.weebly.com

সন্তান কেয়ামতের দিন তার থেকে দূরে রাখা হবে। ফলে কখনো সে এর নাগাল পাবে না। (আস ইবনে ওয়ায়েলের ব্যাপারে একথা বলা হয়েছে।)

সূরা ত্বহা

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ بِالنَّبَطِيَّةِ طه رَجُل ঃ হযরত ইবনে যুবাইর বলেন, নাবাতীয়দের ভাষায় طه অর্থ হে অমুক! আইনী গ্রন্থে আছে, نَبَطِيَّةِ শব্দটি نَبْطُ এর প্রতি সম্বন্ধিত। نَبَطِيَّةِ একটি গোত্রের নাম। যারা অনারব-ইরাক আর আরব-ইরাকের মধ্যবর্তী বাতায়েহ নামক স্থানে বসবাস করতো। অনেক সময় এর দ্বারা কৃষক বা চাষী উদ্দেশ্য নেয়া হয়। হযরত আম্বারী বলেন, এটা (طه) কুরাইশদের ভাষা অনুযায়ী বলা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ পাক কুরাইশ ছাড়া অন্য ভাষায় রসূল (স.)-কে সম্বোধন করেননি।

আল্লামা কস্তলানী প্রণীত إِرْشَادُ السَّارِىْ গ্রন্থে আছে, খলীল নাহবী থেকে বর্ণিত আছে যে, طه শব্দকে যদি অক্ষর অক্ষর করে (ط - ه) পড়া হয়, তবে তার অর্থ হবে ঃ يَا رَجُلُ অর্থাৎ হে অমুক! আর যদি দু'বর্ণকে একত্রে পড়া হয় তবে তার অর্থ হবে, আপনি পা মাটিতে রাখুন। এক হাদীসে এসেছে, রসূল (স.) (প্রথম দিকে) নামায পড়ার সময় এক পায়ের উপর দাঁড়াতেন আর অপর পা উঁচু করে রাখতেন। তখন আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করেন, "طه" অর্থাৎ طَاءُ الْأَرْضِ অর্থাৎ আপনি পা মাটিতে রাখুন। (কস্তলানী)

فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ خِيفَةٍ ঃ আল্লামা কিরমানী বলেন, এ উক্তিটি এ কিতাবের মান অনুযায়ী হয়নি। আল্লামা আইনী বলেন, যেহেতু শব্দটি (خِيفَة) ছরফীদের নিয়মের খেলাপ তথা خَوْف না হয়ে خِيفَة হয়েছে, তাই ইমাম বুখারী (রহ.) বিষয়টি আমাদের অবহিত করতে উক্ত বাক্যটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ الْحُلِيِّ الَّذِى اسْتَعَارُوْا مِنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ ঃ এটা মূলত কুরআনের আয়াত وَلٰكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ-এর ব্যাখ্যা। উদ্দেশ্য হলো, বনী ইসরাঈলরা ঈদানুষ্ঠান উদযাপনের নাম করে ফেরাউনের কওমের নিকট থেকে কিছু গহনা-অলঙ্কার ঋণ (কর্জ) নেয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা সে সমস্ত অলঙ্কার মালিককে ফেরত দেয় না। তাই অত্র আয়াতে বনী ইসরাঈলদের এহেন আচরণ কে 'অপরাধ' আখ্যা দেয়া হয়েছে।

فَقَذَفْنَاهَا فَأَلْقَيْنَاهَا ঃ কোন কোন বর্ণনামতে প্রকাশ, হযরত হারূনের (আ.) নির্দেশে এ সমস্ত অলঙ্কার একটি গর্তে নিক্ষেপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। ফলে তা বিগলিত হয়ে একটি খণ্ডে পরিণত হয়। আবার কোন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, সামেরী তার কুমতলব চরিতার্থ করতে বনী ইসরাঈলদের

www.e-ilm.weebly.com

প্ররোচিত করে অলঙ্কারাদি গর্তে নিক্ষেপ করাতো। অতঃপর স্বর্ণাদি সম্পূর্ণ গলে গেলে সামেরী তা দিয়ে গো-বৎস মূর্তি প্রস্তুত করে। প্রথমে তাতে জীবনের স্পন্দন ছিল না। অতঃপর হযরত জিবরাঈলের ঘোড়ার পায়ের নীচ থেকে গৃহীত মাটি তাতে সংযোগ করলে গো-বৎসটিতে প্রাণের সঞ্চার হয়।

সামেরীর পরিচয় ঃ কেউ কেউ বলেন, সে ফেরআউন বংশীয় কিবতী ছিল। কারো মতে, সে বনী ইসরাঈলদেরই 'সামেরা' গোত্রের নেতা ছিল। সিরিয়ার এই সামেরা গোত্র সুবিদিত। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন, সে গো-পূজারী সম্প্রদায়ের লোক ছিল। কুরতুবীর হাশিয়ায় (টিকায়) বলা হয়েছে, সে ভারতবর্ষের জনৈক হিন্দু ছিল এবং গো-পূজা করত। হযরত সাঈদ বিন যুবাইর (রযি.) বলেন, এ পারস্য বংশোদ্ভূত লোক কিরমানের অধিবাসী ছিল।

মোটকথা, এ লোকটি বাহ্যিকভাবে মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনলেও পরবর্তীতে আবার কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সামেরীর নাম ছিল মূসা বিন জফর। তার মাতা তাকে একটি গর্তে রেখে উপর থেকে গর্তটি বন্ধ করে দিলে আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে লালন-পালন করেন। এটা তখনকার ঘটনা, যখন ফেরাউন বনী ইসরাঈলদের নবজাতক হত্যার আদেশ সারাদেশে জারী করে। জনৈক কবি কত চমৎকার বলেছেন ঃ

إِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَخْلُقْ سَعِيْدًا تَحَيَّرَتْ * عُقُوْلُ مُرَبِّيْهِ وَخَابَ الْمُؤَمَّلُ

মানুষ সৎ না হলে পরে অভিভাক হয় চিন্তিত,
সাধ তার হয় না পূর্ণ আশা হয় ধুলি-ধূসরিত।

فَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ جِبْرَئِيْلُ كَافِرٌ * وَمُوْسَى الَّذِىْ رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ

জিবরাঈল প্রতিপালিত মূসা হল কাফের নরাধম,
ফেরআউন প্রতিপালিত মূসা হলেন নবী মানবোত্তম।

(মা'আরেফুল কুরআন)

فَحَجَّ اٰدَمُ مُوْسٰى (আদম মূসার প্রতিবাদ করেন) ঃ হযরত মূসা (আ.) হযরত আদম (আ.)-এর সমসাময়িক না হওয়ায় সঙ্গত কারণেই এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, এ প্রতিবাদ কিভাবে এবং কোথায় সংঘটিত হল? এ প্রশ্নের জওয়াব বিভিন্নভাবে দেয়া যেতে পারে—

(১) হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে এ ঘটনা ঘটে। আর তা এভাবে হয় যে, আল্লাহ্ পাক হযরত আদমকে (আ.) জীবিত করে দেন। অতঃপর উভয়ের কথোপকথন হয়।

(২) হযরত মূসা (আ.)-এর সম্মুখে হযরত আদম (আ.)-এর কবর উন্মোচিত করা হয় এবং তার আত্মা উপস্থিত করে দেয়া হয়।

(৩) এ কথোপকথন হযরত মূসা (আ.)-এর স্বপ্নযোগে হয়। আর নবীগণের স্বপ্নও ওহীর অন্তর্গত।

www.e-ilm.weebly.com

(৪) হযরত মূসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর এ ঘটনা ঘটে।

(৫) আজও এ ঘটনা ঘটেনি, আখেরাতে বাস্তবে ঘটবে। আখেরাতে যেহেতু তা সংঘটিত হবেই, তাই অতীতকালীন শব্দযোগে তা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৬) কারো মতে নবীদ্বয়ের মাঝে এ ঘটনা মেরাজের রাতে ঘটে, যখন সকল নবীদের রূহ একস্থানে সমবেত হয়েছিল।

(৭) হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) বলেন, এ ঘটনা হযরত আদম (আ.) অবস্থানরত আলমে কুদসে (পবিত্রাত্মাস্থিত জগতে) ঘটে। তথায় হযরত মূসা (আ.)-এর রূহকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

যদি এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, হযরত আদম (আ.) যেরূপভাবে তাঁর পদস্খলনকে তাকদীরের লিখন তথা পূর্ব নির্ধারিত খোদায়ী বাজেট বলে পার পেয়ে যান, তাহলে প্রত্যেক অপরাধীও তো একথা বলতে পারে যে, আমার থেকে প্রকাশিত গুনাহগুলো সবই তাকদীরের ব্যাপার; অর্থাৎ তাকদীরে যা ছিল তাই-ই হয়েছে, আমার অপরাধ কোথায়? উত্তর হলো, উক্ত বিতর্ক সে বিশ্বে অনুষ্ঠিত হয়নি, যেখানে কোন বান্দার শরীয়তের গণ্ডির বাইরে থাকার অধিকার নেই; বরং এটা আত্মাজগতের ঘটনা, যেখানে বান্দা শরীয়তের অধীন নয়। অতএব দুনিয়ার বিধানকে আত্মা-জগতের সাথে তুলনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক

(قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ)

দ্বিতীয় জওয়াব হলো, হাফেজ ইবনে তাইমিয়াহ (রহ.) বলেন, হযরত মূসা (আ.) হযরত আদমকে (আ.) সে দুরবস্থা ও দুর্গতির কারণে ভর্ৎসনা করেন, জান্নাত হতে বহির্গমনের কারণে তাঁর সন্তান-সন্ততি পদে পদে যার সম্মুখীন হয়েছে। হযরত আদম এ ঘটনাকে তাকদীরে ইলাহী তথা 'আল্লাহ পাক কর্তৃক বরাদ্দের বাস্তবায়ন' জওয়াব দিয়ে পাশ কেটে যান। হযরত আদম (আ.) তাঁর ঘটনাকে তাকদীরের লিখন বলে অজুহাত পেশ করলেও তার উপর কিয়াস করে গোনাহকেও তাকদীরের লিখন বলে পার পাওয়া যাবে না। কারণ, অন্যায় ও গুনাহের কাজে বান্দার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ইচ্ছা থাকে। (আর সে ইচ্ছার কারণেই তাকে পাকড়াও করা হবে।) এর ব্যতিক্রম হলো তাকদীরের লিখনী। কেননা সেখানে বান্দার কোন কর্তৃত্ব থাকে না।

যদি প্রশ্ন আসে, আলোচনায় হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর কিভাবে প্রাধান্য লাভ করেন? জওয়াব নিম্নরূপ ঃ

প্রথম জওয়াব ঃ শরীয়তের অনুমোদন ছাড়া তাকদীরের প্রশ্নে কেউ কারো উপর আক্রমণের কোনই অধিকার রাখে না। সুতরাং যখন হযরত মূসা (আ.) শরীয়তের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই হযরত আদমের প্রতি আক্রমণ (প্রশ্নবান নিক্ষেপ) করেছেন, তখন কার্যত সে আক্রমণ তাকদীরের প্রতিই হয়েছে। তাই আদম (আ.) তাকদীরের অমোঘ বিধির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দেন।

www.e-ilm.weebly.com

দ্বিতীয় জওয়াব ঃ হযরত আদম (আ.) যা কিছু করেছেন, তার মধ্যে তাকদীর ও তাঁর ইচ্ছা (كَسْب) উভয়ের দখল ছিল। মানবীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থগত ক্ষতিটা তওবার দ্বারাই পুষিয়ে যায়। আর আদমের (আ.) তওবা গৃহীত হওয়ার বিষয় সরাসরি কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। ফলে আক্রমণটা সম্পূর্ণ তাকদীরের উপরেই হয়। কিন্তু তাকদীর কারো আক্রমণ কিংবা তিরস্কারের পরোয়া করে না। কারণ, তার স্রষ্টা ও বিধাতা একমাত্র আল্লাহ্। আর আল্লাহ্ পাক তাঁর ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কাজের ব্যাপারে কারো কাছে জবাবদিহি করবেন না।

তৃতীয় জওয়াব ঃ হযরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর শ্রদ্ধেয় পিতা। আর পিতাকে তিরস্কার করার অধিকার কোন পুত্র রাখে না।

চতুর্থ জওয়াব ঃ হযরত আদম (আ.) এভাবে দলীল পেশ করেন যে আল্লাহ্ তাঁকে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব করতে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে আনেন। বস্তুতঃ এ প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই জান্নাত থেকে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। তবে তিনি নিজের কসুরকেও নাকচ করে দেননি।

কোন কোন বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সকল বাজেট (তাকদীর) নির্ধারণ ও তা চূড়ান্ত হয়। আর এ বর্ণনা হতে জানা যায় যে, আদমকে (আ.) সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ দু'বর্ণনার মাঝে সমন্বয় সাধন এভাবে হতে পারে যে, সমগ্র সৃষ্টি ও বিশ্বের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই আল্লাহর রহস্যময় আদী জগতের (عَالَمِ أَزَلِى) সবকিছু নির্ধারিত ও চূড়ান্ত হয়ে যায়। কিন্তু তা ফাইলভুক্ত বা লিখিতভাবে কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং হতে পারে আদমের (আ.) ঘটনার বিবরণ পুনঃ পর্যালোচনাসহ আবার বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হয় তাঁর জন্মের ৪০ বছর পূর্বে। আবার এটাও হতে পারে, যে, আসমান-জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বেই মূলতঃ তাকদীর লেখা হয়। আর ৪০ বছর সংক্রান্ত বর্ণনাটি হযরত আদমের দৈহিক গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও তাতে আত্মা সংযোজনের মধ্যবর্তী সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন, সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, إِنَّ بَيْنَ تَصْوِيْرِهِ طِيْنًا وَنَفْخِ الرُّوْحِ فِيْهِ كَانَ مُدَّةَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً অর্থাৎ মৃত্তিকাযোগে নির্মিত দৈহিক গঠন প্রক্রিয়াসম্পন্ন ও তাতে রূহ্ সংযোজনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল ৪০ বছর।

ইসমাতে* আম্বিয়া বা নবীগণের নিষ্পাপতা

নবী-রসূলগণ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত যাবতীয় কুফরী ও মিথ্যা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও নিষ্কলুষ ছিলেন। জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ উলামার মতে নবুওয়াত প্রাপ্তির পর কবীরা গুনাহ হতেও তাঁরা মাছুম ছিলেন। তবে নবুওয়াত লাভের পূর্বে কবীরা গুনাহ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভবের ব্যাপারে কোন

www.e-ilm.weebly.com

সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। মুতাজিলা সম্প্রদায় অসম্ভবের প্রবক্তা। জমহুরের মতে নবুওয়াত লাভের পর ইচ্ছাকৃত ছোট গুনাহ্ হওয়া বৈচিত্র্য নয় (অর্থাৎ হতে পারে)। যুবায়ী ও তার অনুসারীরাও এ মতে বিশ্বাসী। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবীদের থেকে নবুওয়াত লাভের পর অনিচ্ছাকৃতভাবে ছোট গুনাহ্ হতে পারে।

হযরত আদম (আ.)-এর ঘটনাটি হতে পারে তা নবুওয়াত লাভের পূর্বে ঘটেছিল। ফলে তখন তা ইসমতে আম্বিয়ার পরিপন্থী হবে না। অথবা এখানে عِصْيَانٌ (অপরাধ/অবাধ্যতা) দ্বারা عِصْيَانٍ صُوْرِى তথা দৃশ্যত অবাধ্যতা উদ্দেশ্য; প্রকৃত অবাধ্যতা নয়। কারণ, হযরত আদম (আ.) ভুলক্রমে গন্দম (গম) গলধঃকরণ করেন। আল্লাহ বলেন, فَنَسِىَ اٰدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا অর্থাৎ আদম নিষেধের কথা ভুলে যায়। আর আমি তাকে তার ভুলের উপর অবিচল পাইনি (বরং নিষেধাজ্ঞার কথা স্মরণ হতেই সে অনুতপ্ত হয় এবং অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে এক যুগ কাটিয়ে দেয়)।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) বলেন, এখানে অবাধ্যতা দ্বারা উদ্দেশ্য বিপরীত কাজ করা। উদ্দেশ্য হল হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশের বিপরীত কাজ করেন। এ বিষয়ে তিনি এভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে, কেউ আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম খেতে বলে তার জানা ছিল না। আর ইবলীসের কসম আল্লাহর নামেই ছিল। ফলে তিনি ইবলীসের কথা সত্য মনে করে গন্দম খেতে প্রলুব্ধ হন। অথবা তার জবাব ছিল, ইবলীসের কসম থেকে তিনি ধারণা করেন যে, সম্ভবত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। অথবা নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্ট একটি গাছের ব্যাপারে ছিল। অথবা তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ্ গাছের নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন মাত্র। ফল খেতে নিষেধ করেননি। তবে প্রকৃত কারণ যাই হোক না কেন, সবগুলোই ছিল তাঁর ইজতেহাদী তথা চিন্তা ও সিদ্ধান্তগত ভুল। আর এ ধরনের ভুল নিষ্পাপতার পরিপন্থী নয়। (অর্থাৎ এ ধরনের ভুল করা সত্ত্বেও তাঁরা যথার্থই

টীকা ঃ* ইসমত দ্বারা নবীগণের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য সাবেত হয় না। সাধারণ মানুষদের মধ্যেও কেউ কেউ এ গুণে ভূষিত হতে পারে। কুরআন-হাদীসে নবুওয়াতের মর্তবা এবং নবী-রসূলগণের প্রয়োজনীয় যে সমস্ত গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, তা গভীর পর্যালোচনা হতে জানা যায় যে, নবী-রসূলগণের মর্যাদা ও মর্তবা কথিত 'ইসমত' থেকে অনেক উর্ধ্বে। কেননা, নবুওয়াতের বর্তমানে তাঁদের থেকে গুনাহ হওয়া অসম্ভব; হতেই পারে না। তথাপি তারা যেহেতু মানুষই, সাধারণ মানুষের মতই চলে তাঁদের কাজ-কারবার, তাই মানুষ তাদেরকে নিজেদের মত 'গুনাহের উর্ধ্বে' নাও মনে করতে পারে। মূলতঃ এ কারণেই উলামায়ে কেরাম 'ইসমত' সম্পর্কে আলোচনা করতে বাধ্য হন। যাতে তারা বুঝতে পারে যে, নবীগণ আমাদের মত মানুষ হলেও 'তাঁরা সম্পূর্ণ মাসুম এবং পাপের উর্ধ্বে।' এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য হযরত আবুল হাসান আলী নদবী (রহ.) [মৃত্যু ঃ ১৪২০ হিঃ] এর 'মানসাবে নবুওয়াত আওর উসকে আলী মাকামে হামিলীন' গ্রন্থটি পড়া যেতে পারে। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

নিষ্পাপ।) অথবা غَوٰى দ্বারা উদ্দেশ্য خَابَ অর্থাৎ নিষেধের বিপরীত কাজ করায় আদম (আ.) চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে অবস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাসসির আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) তাঁর ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, আল্লাহর নিকট নবী-রসূলগণের মর্যাদা অনেক এবং বহু ঊর্ধ্বের। তাই মানুষ হিসেবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলবশতঃ এমন কোন আচরণ যদি তাঁদের থেকে প্রকাশ পায়, যা তাঁদের সুমহান মর্যাদার পরিপন্থী, তাহলে আল্লাহ পাক কঠোর সমালোচনা করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করেন এবং حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ নেককারদের সাধারণ কল্যাণ নৈকট্যশীল ব্যক্তিদের জন্য মন্দ স্বরূপ—এ সূত্র অনুযায়ী তা "অবাধ্যতা", "অপরাধ", "গুনাহ" ইত্যাদি কঠোর শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেন। হযরত আদমের (আ.) ঘটনাটি ঠিক এমনই ছিল। পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ فَنَسِىَ اٰدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا-এর জ্বলন্ত প্রমাণ।**

كُتِبَ عَلَىَّ (আমার ভাগ্যে এরকমই লেখা হয়) ঃ আল্লামা আইনী বলেন, এ বাক্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-এর জন্য গন্দম খাওয়া অত্যাবশ্যক করে দেন এবং এ গন্দম খাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোন ইখতিয়ারই ছিল না; বরং উদ্দেশ্য হলো, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ উম্মুল কিতাবে (লওহে মাহফুজে) তা লিপিবদ্ধ করেন এবং আল্লাহর আদি জ্ঞানে (عِلْمِ أَزَلِى) এ বাজেট চূড়ান্ত হয়ে পাশ থাকে যে, পরবর্তীতে বা সময়মত তা ঘটবেই। তাই হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি উল্লেখিত আদম (আ.)-এর উল্লেখিত উক্তির মর্মার্থ হলো, তুমি একদিকে আমার কৃতকর্মের সমালোচনা করছ আবার অপরদিকে আল্লাহর জ্ঞানে যা অবধারিত অর্থাৎ তাকদীরের কথাও ভুলে যাচ্ছ-এটা কেমন কথা?

সূরা হজ্জ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِىْ أُمْنِيَّتِهٖ ঃ অর্থাৎ পবিত্র কুরআনের আয়াত ঃ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُوْلٍ وَّلَا نَبِيٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنّٰى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ أُمْنِيَّتِهٖ-এর ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন ঃ إِذَا حَدَّثَ أَلْقَى

টীকা ঃ ইবনে কুতাইবা (রহ.) বলেন, হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রভুর আদেশের বরখেলাপ করলেও কোন অবস্থাতেই তাঁকে নাফরমান বলা যাবে না। কেননা নাফরমান শুধু তাকে বলা যায় যে নাফরমানীতে অভ্যস্থ হয়ে যায়। যে একবার কোন আদেশ অমান্য করে তাকে নাফরমান বলা যায় না। যেমন কেউ একবার কাপড় সেলাই করলেই তাকে দর্জি বলা যায় না; বরং যে সর্বদা এ কাজ করে তাকেই দর্জি বলা হয়। তাই عَاصِىْ-এর অর্থ নাফারমান করে হযরত আদম (আ.)-কে নাফরমান বলা সঙ্গত হবে না। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

أَلْشَّيْطَانُ فِي حَدِيثِهِ فَيُبْطِلُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ أيَاتِهِ অর্থাৎ রসূল (স.) যখন কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনান, তখন শয়তান রচিত কতিপয় পঙক্তি রসূল (স.)-এর পাঠের মাঝে সুকৌশলে প্রবিষ্ট করে দেয় (অথচ নবীজী তেলাওয়াতে একাগ্রতাহেতু তা বুঝতে না পেরে নিজের জবান মুবারক দ্বারা শয়তানের প্রবিষ্ট পংক্তিগুলোও উচ্চারণ করেন)। অতঃপর আল্লাহ শয়তান কর্তৃক প্রবিষ্ট পঙক্তি অপসারণ করে অবতারিত আয়াতসমূহ সুসংহত করেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তবারী (রহ.) প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাসের (রযি.) নিম্নোক্ত বর্ণনা উদ্ধৃত করেন যে, قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُوْرَةَ النَّجْمِ فَلَمَّا بَلَغَ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى أَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلٰى لِسَانِهِ অর্থাৎ রসূল (স.) সূরা নজম পাঠকালে أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ .... الْأُخْرٰى আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলে শয়তান রসূল (স.)-এর জবানে নিম্নোক্ত পঙক্তিটি প্রবিষ্ট করে দেয় ঃ

تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى * وَإِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْجٰى

লাত-উযযা-মানাত যেন আকাশে উড়ন্ত সাদা পাখী,
পরকালে তারা হবে সহায় সুপারিশের আশা রাখি।

রসূল (স.)-এর পবিত্র জবানে উচ্চারিত এ পঙক্তি শুনেই উপস্থিত মুশরিকরা একযেগে বলে উঠে ঃ مَاذَكَرَ اٰلِهَتَنَا بِخَيْرٍ قَبْلَ الْيَوْمِ অর্থাৎ প্রভু ইতঃপূর্বে এমন উত্তম কথা আর বলেননি। ফলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সকলে সেজদাবনত হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

উল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে ইবনে আরাবী বলেন, আল্লামা তবারী এ প্রসঙ্গে বহু রেওয়ায়েত ও বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার সবই বাতিল; ভিত্তিহীন।

আল্লামা কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন, সিহাহ সিত্তার সংকলকবৃন্দ ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের কেউ এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক সূত্রে বর্ণনা করেননি; এমনকি দুর্বল রাবী, অস্থিতিশীল বর্ণনা (রেওয়ায়েতে মুযতারিব) এবং বিচ্ছিন্ন (انقطاع) সূত্রেও নয়। অনুরূপভাবে যে সকল তাবেঈন ও মুফাসসিরীনে কেরাম এ ঘটনা সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন তাঁরাও ঘটনার ধারাবাহিক সূত্রের কোন বর্ণনা দেননি এবং পূর্ণ সনদ বর্ণনা করেননি। উপরন্তু তাদের অধিকাংশ সূত্রই দুর্বল। কেউ কেউ সনদ সংক্রান্ত উল্লিখিত আপত্তির জওয়াবে বলেন, ইবনে আরাবী ও কাজী আয়াজের কথা উসূল পরিপন্থী। কারণ, উসূল হলো, যখন কোন ঘটনা বা বিষয়ের একাধিক সূত্র থাকে এবং তার বর্ণনা ক্ষেত্রও একাধিক হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, অবশ্যই তার কোন না কোন ভিত্তি রয়েছেই।

www.e-ilm.weebly.com

তবে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহ.) এ প্রসঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, রসূল (স.)-এর সুমহান মর্যাদার দিক বিচারে ইবনে আরাবী ও কাজী আয়াজের উক্তিই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, রসূল (স.)-এর ইসমাত ও এ ধরনের অশোভনীয় বিষয় হতে তাঁর পূতপবিত্রতার ব্যাপারে সকল উম্মত একমত। এর উপর যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে। আর এটা একেবারে অসম্ভবও যে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তাঁর অন্তর ও জবানে এ ধরনের বিষয় এসে যাবে, তাঁর উপর শয়তান প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে এবং ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় তিনি আল্লাহর সম্পর্কে উদ্ভট কথাবার্তা বলবেন। বিবেক এবং বাহ্যিক অবস্থা ও পরিবেশ এটা মোটেও সমর্থন করে না। যদি উল্লিখিত ঘটনা বাস্তবেই ঘটত, তবে মুসলমানদের অনেকে মুরতাদ হয়ে যেত। অথচ কোন বর্ণনায় তা পাওয়া যায় না এবং কেউ তা বর্ণনাও করেননি। হতে পারে ঘটনাটি অনেকে জানে না; কিন্তু যে সকল সাহাবা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কাছে বিষয়টি কিভাবে গোপন থাকে? (আইনী)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) তাঁর ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ (রহ.) অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, নবীর কাছে আল্লাহর পক্ষ হতে যে খবর আসে, তাতে বিন্দুমাত্র এদিক-সেদিক হতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্তরের ধারণা ও ইজতেহাদী রায়তা কখনও সঠিক হয়, কখনও হয় না। এ অবস্থায় إِلْقَاء বা প্রবিষ্টের সম্বন্ধ শয়তানের প্রতি তদ্রূপই হবে, যেরূপ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ-এর মধ্যে হয়েছে।

অত্র আয়াত সম্পর্কে সালফে সালেহীন তথা পুণ্যাত্মা পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের পক্ষ হতে আগত ব্যাখ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম। আর তা হলো, تَمَنَّى-এর অর্থ হলো পাঠ ও তেলাওয়াত। আর أُمْنِيَّة দ্বারা উদ্দেশ্য وَحْيِ مَتْلُوْ বা হাদীস। মর্মার্থ হলো, বহু পূর্ব হতে এ নিয়ম চলে আসে যে, যখন কোন নবী বা রসূল কোন কথা বলেন অথবা আল্লাহর আয়াত পড়ে শোনান, তখন শয়তান ঐ বর্ণিত কথা বা আয়াতের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ ও ওয়াসওয়াসা প্রবিষ্ট করে। যেমন নবী (স.) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ পড়ে শোনালে শয়তান তার মধ্যে এ সন্দেহের উদ্রেক করে দেয় যে, কাণ্ড দেখ, নিজের হাতে যা মারছে তাকে হালাল বলছে আর আল্লাহ যা মারছেন তাকে হারাম বলছে! এ ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা রুখতে নবী (স.) আল্লাহর ঐ আয়াত শোনান যা অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট এবং এমন সুদৃঢ় কথা বলেন, যা শ্রবণে সংশয়-সন্দেহের আর মোটেই অবকাশ থাকে না।

www.e-ilm.weebly.com

সূরা নূর

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ ঃ লেআনের বিস্তারিত আলোচনা ফিকহের কিতাবসমূহে ভরপুর। এখানে কয়েকটি জরুরী বিষয়ের অবতারণা করা হল।

(১) অভিধানে লেআন (لِعَانٌ) অর্থ একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত ও আল্লাহর ক্রোধ বর্ষণের বদদোয়া করা। আর পরিভাষায় লেআন বলা হয়; স্বামী-স্ত্রী উভয়ের (একে অপরের বিরুদ্ধে) কয়েকটি বিশেষ হলফ করা। আর তা এভাবে যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে অথবা নিজের সন্তানকে তার ঔরসজাত নয় বলে দাবী করলে তখন প্রথমে স্বামীর কাছে তার দাবির স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী চাওয়া হবে। যদি সে সাক্ষ্য পেশ করে, তাহলে মহিলার উপর ব্যভিচারের শাস্তি কার্যকরী হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি সাক্ষী যোগাড় করতে না পারে, তখন তাকে বলা হবে যে, "আমি আমার নিজ দাবীতে সত্য" একথা উচ্চারণপূর্বক চারবার হলফ কর। আর পঞ্চমবার বল ঃ যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। স্বামী যদি এ কথা বলতে অস্বীকার করে, তবে তাকে বন্দী করা হবে এবং বিচারক তাকে এর উপর বাধ্য করবে যে, হয়ত সে তার মিথ্যা অপবাদের কথা স্বীকার করবে অথবা শপথ বাক্য উচ্চারণ করবে। যদি সে মিথ্যাবাদিতার কথা স্বীকার করে তবে তার উপর অপবাদের নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে স্বামী যদি পঞ্চম শপথ বাক্যও উচ্চারণ করে, তাহলে এবার মহিলাকে বলা হবে যে, তুমিও হলফ কর। যদি মহিলা হলফ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে যতক্ষণ না হয়ত সে স্বামীর কথা সত্যায়ন করবে এবং নিজের অপরাধ অকপটে স্বীকার করবে অথবা হলফ করবে। যদি সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে, তবে ব্যভিচারের শাস্তি তাকে প্রদান করা হবে। পক্ষান্তরে যদি হলফ করে তবে এখন লেআন পূর্ণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

(২) লেআন পরিপূর্ণ হওয়ার অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী উভয় আদালতের শাস্তি থেকে রেহাই পাবে, তবে আখেরাতে কি হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

(৩) লেআন তার সুনির্দিষ্ট পন্থায় পূর্ণ হবার পর একে অন্যের জন্য চিরদিনের তরে হারাম হয়ে যায়।

(৪) লেআনের পরে স্বামীর কর্তব্য তার স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা। যদি স্বামী তালাক না দেয়, তবে কাজী (বিচারক) তাদের মধ্যে দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। এটা আহনাফের অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহ.)-এর মতে, লেআনই বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য যথেষ্ট অর্থাৎ লেআন করা মাত্রই তাদের দাম্পত্য বন্ধন আপনা আপনিই ছিন্ন হয়ে যাবে। সম্পর্ক ছিন্ন করতে স্বামীর তালাক প্রদান কিংবা বিচারক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্নকরণের কোনই প্রয়োজন নেই।

(ফাওয়ায়েদুল কুরআন, মা'আরেফুল কুরআন, আইনী)

www.e-ilm.weebly.com

فَكَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ : রসূল (স.) কর্তৃক এ অপছন্দের কারণ নিম্নরূপ :

(১) এটা মুসলমানদের জন্য একটি চরম মানহানিকর ব্যাপার।

(২) এতে মুসলিম নর-নারীর জঘন্য ও নির্লজ্জ আচরণের কথা বলা হয়েছে।

(৩) এতে ইহুদী ও মুনাফিকদের জন্য হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করার অতিরিক্ত খোরাক রয়েছে।

لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ : আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, এ বাক্যের উদ্দেশ্য হলো, যদি শরীয়ত মহিলার থেকে রজমের (প্রস্তর বর্ষণের) হুকুম প্রত্যাহার না করত, তবে সাদৃশ্যের দাবী অনুযায়ী রসূল ঐ মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করতেন।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

(১) আল্লামা আইনী বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর মতে লেআনের যোগ্য অর্থাৎ লেআন কেবল সেই করতে পারে, যে শাহাদাত (সাক্ষ্য প্রদান) ও হলফ করার যোগ্যতা রাখে। আর যে শাহাদাতের যোগ্য নয়, সে লেআনেরও যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে আহনাফের মতে, যে ব্যক্তি হলফের যোগ্যতা রাখে সে লেআনেরও যোগ্যতা রাখে। চাই তার শাহাদাত প্রদানের যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক। আর যে ব্যক্তি শাহাদাত ও হলফের যোগ্যতা রাখে না, সর্বসম্মতিক্রমে সে লেআনের যোগ্যতা রাখে না।

(২) হাদীসে شِبْهٌ বা সাদৃশ্যকে ধর্তব্য করা হয়েছে। সুতরাং যেখানে সাদৃশ্য বা সাযুজ্য হতে উন্নত পর্যায়ের প্রমাণ বিদ্যমান থাকবে, সেখানে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বিধান কার্যকর করা হবে না। পক্ষান্তরে যেখানে শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যাবে না, সেখানে সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই হুকুম আরোপ করা হবে।

আল্লামা আইনী বলেন, এ হাদীস থেকে 'সাদৃশ্য' ধর্তব্য হবার বিষয়টি জানা যায়। কারণ, রসূল (স.) নিজেই তা ধর্তব্য করেছেন। বস্তুত এ কারণেই রসূল (স.) যামআর বাদীর ছেলের চেহারা ও শরীরে উতবার হুবহু দৈহিক গাঠনিক সাদৃশ্য দেখে বলেন, সাওদা, তুমি তার থেকে পর্দা কর। তবে الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ শরয়ী ধারা অনুযায়ী যামআর সন্তান বলেই তাকে ঘোষণা দেন। কারণ এ ধারাটি প্রমাণ হিসেবে 'সাদৃশ্যবাদ' অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে কিয়াফাতের (সনাক্তকরণ) হুকুমের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যই যেহেতু সর্বোচ্চ ও শক্তিশালী প্রমাণ, তাই সনাক্তকরণের সময় সাদৃশ্যের ভিত্তিতে সনাক্ত করেন।

(৩) লেআন ওয়াজিবের জন্য প্রমাণ পেশ করা পূর্বশর্ত। সুতরাং যদি স্বামী মহিলার ব্যভিচারের ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করতে পারে, তাহলে স্বামীর উপর আর

www.e-ilm.weebly.com

লেআন করা ওয়াজিব হবে না এবং ঐ প্রমাণের ভিত্তিতেই মহিলার উপর শাস্তির বিধান কার্যকর হবে। অনুরূপভাবে মহিলার উপর লেআন ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হলো ব্যভিচারের কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। যদি মহিলা ব্যভিচারের কথা স্বীকার করে নেয়, তবে তার উপর তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক শাস্তির বিধান কার্যকর করা হবে। অর্থাৎ অবিবাহিতা হলে ১০০ (একশত) বেত্রাঘাত আর বিবাহিতা হলে রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে।

(৪) লেআনের আয়াত অবতরণের প্রেক্ষাপট নিয়ে উলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কারো মতে, আয়াতটি হযরত উয়াইমার আযলানীর (রযি.) প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়। তাদের দলীল, হাদীসে এসেছে ঃ قَدْ أَنزَلَ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِى صَاحِبَتِكَ অর্থাৎ রসূল (স.) উয়াইমারকে ডেকে বলেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (লেআনের) আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

তবে জমহুরের মত হলো, এ আয়াত হযরত হেলাল বিন উমাইয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। হেলাল বিন উমাইয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম লেআন করেন। আর হযরত উমাইয়াকে রসূল (স.) যা বলেন, তার উদ্দেশ্য হলো হেলালের ঘটনায় আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন, তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারেও ঐ একই হুকুম বলবৎ। কারণ, এ আয়াত কেয়ামত পর্যন্ত সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। আর এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, উভয় ঘটনা এক সময়েই বা কাছাকাছি দু'সময়ে ঘটে। আর আয়াতটি উভয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়। (আইনী)

وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا ঃ এ উক্তি হযরত উম্মে রোমানের। হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটলে তাঁর মাতা উম্মে রোমান এ উক্তিটি করেন। সম্ভবত এর দ্বারা তার (উম্মে রোমান) উদ্দেশ্য হযরত আয়েশার সতীনদের কতিপয় আত্মীয়ের প্রতি ইশারা করা। যেমন, হযরত যয়নবের বোন হামনাহ বিনতে জাহশ। কেননা তাঁর সতীনদের পক্ষ হতে হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে হিংসা বা ঈর্ষামূলক কোন কিছুর প্রকাশ ঘটেনি।

وَأَنْ تَسْئَلِ الْجَارِيَةَ ঃ (আপনি বাদীকে রিমান্ডে নিন) ঃ এখানে বাদী দ্বারা হযরত বারীরাকে (রযি.) উদ্দেশ্য নেয়া হলে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, হযরত বারীরাকে ক্রয় করত আজাদের ঘটনা মক্কা বিজয়ের পর ৯ম বা ১০ম হিজরীর। পক্ষান্তরে ইফকের ঘটনা ৬ষ্ঠ বা ৪র্থ হিজরীর। অতএব ঘটনা দুয়ের মাঝে মিল কোথায়? আল্লামা যারকাশী (রহ.) এ প্রশ্নের জওয়াব এভাবে প্রদান করেন যে, বাদীর নাম মূলত বারীরা ছিল না। কতিপয় রাবী তার নাম বারীরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়। সঠিক জওয়াব দিয়েছেন শায়েখ তকী উদ্দীন সুবকী (রহ.)। তিনি বলেন, হযরত বারীরাকে ক্রয়ের পূর্বেও তিনি হযরত আয়েশার (রযি.) খেদমত করতেন।

www.e-ilm.weebly.com

فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ ঃ এখানে প্রশ্ন হলো, হযরত সাদের ইন্তেকাল ৪র্থ হিজরীতে খন্দক যুদ্ধের সময়ে হয় অথচ ইফকের ঘটনা ঘটে ৬ষ্ঠ হিজরীর মুরায়সী যুদ্ধে। তাহলে এ ঘটনায় সাদ (রযি.)-এর উল্লেখ কিভাবে ঠিক হল? এ প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেন, মুরায়সী যুদ্ধ ৪র্থ হিজরীর শা'বান মাসে আর খন্দক যুদ্ধ ঐ বছরেরই শাওয়াল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো খন্দক এবং মুরায়সী উভয় ৫ম হিজরীর ঘটনা। ফলে কোন প্রশ্ন আর বাকী থাকে না।

সূরা ফুরকান

اَلرَّسُّ الْمَعْدِنُ ঃ অভিধানে কাঁচা (মাটির) কূপকে اَلرَّسُّ বলে। আসহাবুর-রছ তথা কূপবাসীর পরিচয়-পরিচিতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কিংবা বিশুদ্ধ হাদীসে বিস্তারিত কোন বিবরণ আসেনি। তবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সামুদ গোত্রের অবশিষ্ট কিছু লোক, যারা কোন একটি কূপের পাশে বসবাস করত। তাদের উপর আগত শাস্তির বিবরণও কুরআন-হাদীসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়নি। (মা'আরেফুল কুরআন)

সূরা আহযাব

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيهِ (আপনি গোপন রাখলেও আল্লাহ আপনার অন্তরের রহস্য ফাঁস করে দেন) ঃ আলোচ্য আয়াত হযরত যয়নব বিনতে জাহশের (রযি.) ব্যাপারে অবতারিত। হযরত যয়নব[১] (রযি.) রসূল (স.)-এর ফুফাত বোন এবং কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন। তার স্বামী ছিলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রযি.)। তিনিও মূলত এক ভদ্র আরব ছিলেন। কিন্তু শৈশবে জনৈক জালেম তাকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। রসূল (স.)-এর নির্দেশে যায়েদের সাথে তার বিবাহ হলেও তিনি স্বাভাবিকভাবে এ দাম্পত্য জীবন মেনে নিতে পারেন নি। যায়েদ (রযি.) গোলাম হওয়ায় হযরত যয়নাব (রযি.)-এর দৃষ্টিতে তিনি তার মত সম্ভ্রান্ত ছিলেন না। দাম্পত্য জীবন তাদের সুখকর হয় না। সেহেতু মনোমালিন্য প্রায় লেগেই থাকত। তাই হযরত যায়েদ (রযি.) বারবার তাকে তালাক দিতে চাইতেন। কিন্তু রসূল (স.) তাঁকে নিষেধ করতেন। আল্লাহ পাক রসূল (স.)-কে জানিয়ে দেন যে, যয়নাবের সাথে যায়েদের বিবাহ হয়েছে অস্থায়ী ভিত্তিতে। ভবিষ্যতে তাঁর বিবাহ আপনার সাথেই দেয়া হবে। সুতরাং যে বিষয়টি রসূল (স.)-এর অন্তরে লুকায়িত ছিল বলে আয়াতে বলা হয়েছে তা হলো, বিবাহের সংবাদ ও তার ধারণা লাভ। পরবর্তী আয়াতাংশ زَوَّجْنٰكَهَا (আমি আপনাকে তার সাথে বিবাহ দিব)-এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়। শুধু বদনামের

টীকা ঃ ১. হযরত যয়নাব বিনতে জাহশ (রযি.), মৃত্যু ঃ ২০ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

আশঙ্কায় গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী কোন প্রয়োজন পূরণ করা হতে বিরত থাকাটা যেহেতু নবীসুলভ সমুচ্চ মর্যাদার পরিপন্থী তাই حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ لِلْمُقَرَّبِيْنَ নিয়ম অনুযায়ী নবীজীর উক্ত বিষয়টিকে বড় করে দেখে কঠিন ভাষায় তা আয়াতে প্রকাশ করা হয়েছে। (ফাওয়ায়েদুল কুরআন)

صَلٰوةُ عَلَى النَّبِيِّ ঃ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ তথা নবীর প্রতি দুরূদের মর্মার্থ হলো আন্তরিকতার সাথে ভক্তিভরে নবীর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তবে صَلَاةٌ শব্দটি যার প্রতি সম্বন্ধিত হবে তারই মর্তবা ও শান উপযোগী প্রশংসা, সম্মান এবং দয়া ও মেহেরবানী উদ্দেশ্য হবে। যেমন, পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, এক ভ্রাতা অপর ভ্রাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে মহব্বত করে, ভালবাসে, কিন্তু প্রত্যেকের ভালবাসার ধরন ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সেজন্য উলামায়ে কেরাম লিখেন, আল্লাহর صَلٰوةٌ হলো 'রহমত বর্ষণ', ফেরেশতার صَلٰوةٌ ইস্তেগফার করা আর মুমিনের صَلٰوةٌ হলো দোয়া করা।

সূরা সাবা

الْعَرِمُ ঃ اَلْعَرِمُ اَلسَّدُّ অর্থ বাঁধ। ইয়ামানের সাবা কওম হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের আট বছর পূর্বে এ বাঁধ তাদের সরকার রাজধানীর নিকটবর্তী মারির নামক নগরে নির্মাণ করেছিল। বাঁধটি প্রায় ১৫০ ফুট দৈর্ঘ এবং ৫০ ফুট প্রস্থ ছিল। বাঁধের পানি ডান-বামে বিভক্ত হয়ে ৩০০ বর্গমাইল পানিবাহিত জমিন দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সেচের কাজ আঞ্জাম দিত। শত শত ক্রোশ পর্যন্ত সুন্দর, মনোরম উদ্যান ও বাগ-বাগিচা তৈরী হয়েছিল, হরেক রকম ফল-মূল আর সুরভিত পুষ্প বৃক্ষে পুরো এলাকা ছিল ভরপুর। সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত বিলাসী জীবন-যাপন করত। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর অবাধ্যতা শুরু করে এবং পয়গম্বরগণের দাওয়াতের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলে যে, আমাদের প্রতি আল্লাহর কোন নেয়ামত আছে বলে আমরা জানি না। তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে আমাদের এবং এ বাঁধের বিরুদ্ধে বদদোয়া কর। রসূলগণ বদদোয়া করলে আল্লাহ তাদের প্রতি বাঁধভাঙ্গা বন্যার আকৃতিতে আজাব প্রেরণ করেন। ফলে পানির প্রবল স্রোতে শহর রক্ষা বাঁধটি ভেঙ্গে গিয়ে তাদের সকল বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার সহ পুরো উপত্যকা অথৈ জলে নিমজ্জিত হয়ে যায়।

সূরা ইয়াসিন

وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا (সূর্য তার সুনির্দিষ্ট অবস্থান স্থল বা মেয়াদের দিকে চলমান) ঃ অনেকে مُسْتَقَرٌّ দ্বারা مُسْتَقَرٌّ زَمَانِىْ তথা এক সুনির্দিষ্ট মেয়াদ তথা কেয়ামত নাগাদ সময় উদ্দেশ্য নিয়েছেন। এ ব্যাখ্যানুপাতে আয়াতের অর্থ

www.e-ilm.weebly.com

হবে, সূর্য তার কক্ষপথে এমন সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মে চলমান যে, এতে কখনও এক মিনিট ও এক সেকেন্ডের পার্থক্য হয় না। সহস্র বছর এভাবেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তবে এ চলা চিরন্তন নয়; বরং তার একটি সুনির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। যে মেয়াদে পৌঁছে তার অতীত নিয়মতান্ত্রিক পথচলা ও আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যাবে এবং গতি হয়ে যাবে স্তব্ধ। আর সে মেয়াদ হলো কেয়ামতের দিন। এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না। এমনকি সৌরবিজ্ঞান ও গণিতিক কোন আপত্তিও নয়। তবে কতিপয় ব্যাখ্যাকার হযরত আবু যর গিফারী বর্ণিত এ হাদীস ঃ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ সামনে রেখে مُسْتَقَرّ-এর থেকে مُسْتَقَرّ مَكَانِى তথা নির্দিষ্ট অবস্থানস্থল উদ্দেশ্য নিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, সূর্য প্রতিদিন নির্দিষ্ট অবস্থানস্থল ও গন্তব্যের দিকে (অর্থাৎ আরশ পানে) চলে। অতঃপর সেখানে পৌঁছে আল্লাহর সামনে সেজদা দিয়ে নতুন পরিভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করে। ম ্র হলে আবার পরিভ্রমণ শুরু করে। তবে এ ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত প্রশ্নের জন্ম দেয়।

(১) যেহেতু আল্লাহর আরশ সকল আসমান, সকল জমিন ও সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘিরে রয়েছে, সেহেতু সূর্য সর্বদা, সর্বাবস্থায়, সর্বসময়ে আরশের নীচেই রয়েছে। তাহলে সূর্যাস্তের পর আবার আরশের নীচে যাবার অর্থ কি?

(২) সূর্যের উদয়-অস্ত সবসময়, সর্বাবস্থায় অব্যাহত রয়েছে। তাহলে অস্তমিতের পর আরশের নীচে যাওয়ার রহস্য কি?

(৩) হাদীস থেকে অনুমিত হয় যে, সূর্য তার গন্তব্যস্থলে (অর্থাৎ আরশের নীচে) পৌঁছে থেমে যায়। অথচ সূর্যের পরিভ্রমণ বন্ধ না হওয়া একটি প্রকাশ্য ও সর্বজন স্বীকৃত ব্যাপার। এ সকল প্রশ্নের উত্তর হযরত শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহ.) তাঁর سُجُوْدُ الشَّمْسِ পুস্তিকায় এভাবে প্রদান করেছেন যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বর্ণনা করা যে, সূর্য তার নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে আবর্তন করে না; বরং আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম ও তাঁর আদেশের অনুগামী হয়েই আবর্তন করছে। কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিবরণ অনুযায়ী আল্লাহর আরশ সকল আসমান, জমিন এবং সকল কিছুকে ঘিরে রয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য সর্বসময়, সর্বস্থানে আরশের নীচেই রয়েছে। আর অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, সূর্য এক স্থানে উদিত হলে অপর স্থানে অস্তমিত হয়। এ থেকেও জানা যায় যে, আরশের নীচে সূর্যের অবস্থান সর্বদা এবং সর্বাবস্থায়। এমনকি অস্ত-উদয়েরও সকল অবস্থায়। অতএব হাদীসের সারকথা হলো, সূর্য তার আবর্তনের পূর্ণ সময়েই আরশের নীচে আল্লাহরই সামনে সেজদাবনত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর অনুমতি ও আদেশের অধীন হয়ে আবর্তন করে। আর এ আবর্তন ধারা কেয়ামতের নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। মোটকথা আল্লাহর সৃষ্টি রহস্য লীলা ও তাঁর হাকীকতকে হাদীসে একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে মানুষদের

www.e-ilm.weebly.com

সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু হচ্ছে বস্তুত সবই আল্লাহর আদেশের অধীনে আরশের নীচেই হচ্ছে। যেমন সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর আদেশের অধীন হয়ে আরশের নীচেই আবর্তন করছে। এ প্রাত্যহিক আবর্তনে সূর্যের নিজস্ব কোন শক্তি নেই। ফলে হে মানবজাতি! তোমরাও আল্লাহর আদেশের অধীন হয়ে চল অর্থাৎ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে জীবন যাপন কর। আশা করি উপরের সারগর্ভ আলোচনা ও বিস্তারিত পর্যালোচনা হতে উল্লিখিত সকল প্রশ্নের জওয়াব দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। (মা'আরেফুল কুরআন)

সূরা হা-মিম সাজদা

قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنِّى أَجِدُ فِى الْقُرْآنِ أَشْيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ ‎৪

(জনৈক ব্যক্তি [নাফে' বিন আরযাক] হযরত ইবনে আব্বাসকে বলেন, আমার কাছে কুরআনের কয়েকটি বিষয় পরস্পর বিরোধী মনে হয়েছে) ঃ হাদীসটির সারকথা হলো, হযরত নাফে' বিন আরযাক (রহ.) তাঁর দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের চার স্থানে পরস্পর বিরোধিতার কথা উল্লেখ করেন।

(১) فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ (অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে কোন বংশ পরিচয় থাকবে না আর তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করবে না।) বনাম وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَّتَسَاءَلُوْنَ (অর্থাৎ তারা একে অপরের সামনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে) ঃ এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ দ্বন্দ্ব এভাবে দূর করে দেন যে, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ হবে দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দানের পর। আর জিজ্ঞাসাবাদ না হওয়াটা হলো তার পূর্বের কথা। অর্থাৎ দ্বিতীয় ফুৎকারের পূর্বে কেউ অপরের কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না, কিন্তু দ্বিতীয় ফুৎকারের পরে পরস্পরের মধ্যে আলাপ হবে এবং প্রয়োজনে একে অপরকে জিজ্ঞাসাও করবে। মোট কথা উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে দু'সময়ে দু'অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

(২) وَلَا يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا (অর্থাৎ তারা কোন কথা গোপন রাখবে না।) বনাম مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ (আমরা মুশরিক ছিলাম না)-এর মধ্যে। কারণ প্রথম আয়াতে কথা গোপন না করার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে অথচ দ্বিতীয় আয়াত প্রমাণ করে যে তারা শিরকের কথা গোপন করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ বৈপরীত্যের সমাধান এভাবে পেশ করেন যে, গোপন করাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্যদানের পূর্বের আর গোপন না করাটা তার পরের ব্যাপার। অর্থাৎ তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের পূর্বে তারা মুশরিক হওয়ার ব্যাপারটি চেপে রাখতে চেষ্টা করবে, কিন্তু যখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দিয়ে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিবে তখন তারা আর কিছুই গোপন রাখবে না, সবই ফাঁস করে দেবে।

قام بالاعراب مولانا محمد فاروق القاسمي

www.e-ilm.weebly.com

(৩) وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا .... دَحَاهَا (আল্লাহ প্রথমে আসমান সৃষ্টি করেছেন.......।) বনাম أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (তোমরা অস্বীকার করছ সেই মহান সত্তার কথা, যিনি দু'দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন।)-এর মধ্যে। কারণ, প্রথম আয়াত দ্বারা বুঝে আসে প্রথমে আসমান সৃষ্টি হয় পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, প্রথমে জমিন সৃষ্টি হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন ঃ বস্তুত জমিন আসমানের পূর্বে সৃষ্ট। কিন্তু জমিনের স্থিতি আসমানের স্থিতির (وُجُود) পরে সংঘটিত হয়। তাই যে আয়াতে প্রথমে আসমান সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারাও উদ্দেশ্য স্থিতিগত সৃষ্টি, (মূল সৃষ্টি নয়।)

(৪) وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا অর্থাৎ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন। বাহ্যত এ আয়াত প্রমাণ করে যে, আল্লাহ পাক উল্লিখিত গুণে অতীতকালে ভূষিত ছিলেন (এখন নন)। হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) এ খটকা এভাবে দূরীভূত করেন যে, আল্লাহ কর্তৃক তার নিজ সত্তার নাম গফুর, রহীম প্রদান অতীতে ঘটেছে কিন্তু ক্ষমা ও দয়ার অর্থ ও গুণে তিনি সর্বদা গুণান্বিত। (অর্থাৎ আয়াতে নামকরণের সময়ের কথা বলা হয়েছে যে, তিনি এ নামে অতীতকালেই গুণান্বিত হন।)।

সূরা শূরা

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইবনে আব্বাস (রযি.) বলেন, إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ তাঁর এ উক্তির সারমর্ম হলো, আমি তোমাকে চিরস্থায়ী নাজাতের রাস্তা দেখিয়ে তোমার প্রতি যে সীমাহীন অনুগ্রহ করেছি, তার প্রতিদান তোমার কাছে চাই না। শুধু এতটুকু অনুরোধ করি যে, তোমাদের (কুরাইশদের) সাথে আমার যে বংশীয় ও জাতিগত সম্পর্ক আছে কমপক্ষে তা এড়িয়ে যেয়ো না। বংশগত সূত্রের দিকে তাকিয়ে হলেও অত্যাচার ও নিপীড়ন হতে বিরত হও। আমাকে এতটুকু স্বাধীনতা দাও যে, আমি নির্দ্বিধায় প্রভুর বাণী বিশ্বে প্রচার করতে থাকব। তোমরা এ কাজে আমার অন্তরায় হবে না। আমি তোমাদের থেকে এতটুকু ভালবাসা ও অনুগ্রহ পাবারও কি যোগ্য নই?

সূরা জাছিয়া

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (মানুষ সময় (কাল ও যুগ)-কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। অথচ সময় সে তো আমিই। আমারই আয়ত্তে সবকিছু। রাত-দিনের পরিবর্তন আমিই ঘটাচ্ছি) ঃ "أَنَا الدَّهْرُ" এ বাক্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লামা আইনী (রহ.)

www.e-ilm.weebly.com

বলেন, أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ বাক্যটি এ ব্যাপারে জোর প্রমাণ করে যে, أَنَا الدَّهْرُ-এর মধ্যে একটি مُضَافًا উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ মূল ভাষ্য হবে ঃ أَنَا خَالِقُ الدَّهْرِ। অর্থ, আমি সময়-স্রষ্টা। কারণ, বস্তুত دهر বলে সময় বা যুগকে। আর রাত-দিনও সময়ের অন্তর্গত। তাই সময়ের পাশাপাশি রাতদিনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, আমিই রাত-দিন পরিবর্তন করি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ পাক সময়ের مُقَلِّبُ (পরিবর্তনকারী)। সাথে সাথে এটাও জানা যায় যে, دَهْر বা সময় হলো مُقَلَّبُ (পরিবর্তিত)। আর مُقَلَّب ও مُقَلِّب কখনও একই হতে পারে না। সুতরাং ফলাফল দাঁড়াল, আল্লাহ্ دَهْر বা কাল নন; বরং তিনি خَالِق دَهْر তথা সময় বা কালের স্রষ্টা। (আইনী)

প্রকাশ থাকে যে, যারা خَالِقُ دَهْر-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না এবং কাল বা সময়ে যা কিছু ঘটে তার সম্বন্ধ বাস্তবেই যুগ বা কালের প্রতি প্রদান করে (যেমন, বর্তমান সময়টা বড় খারাপ, গরম কালটা খুবই অসহনীয়, কলি যুগটা বড়ই অনর্থের যুগ, যুগ ক্রমেই খারাপের দিকে এগুচ্ছে ইত্যাদি) তাদেরকে দাহরিয়া বা কালবাদী বলা হয়। তাদের দর্শন বা নীতি হল, কোন সময়ে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেই তারা সময়ের সমালোচনা শুরু করে এবং সময়কে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। তাই আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন যে, বিভিন্ন সময় বা যুগে যা কিছু ঘটে বা ঘটছে তাতে সময়ের নিজস্ব কোন হাত বা কর্তৃত্ব নেই। সুখ-দুখ, ভাল-মন্দ যাই হোক না কেন তার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ্। সবকিছু তাঁরই ইচ্ছা ও ইশারায় সম্পন্ন হয়। তাই ভাল-মন্দ কোন কাজের সম্বন্ধ সময়ের প্রতি প্রদান করা জায়েয নেই। যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এবং বাস্তব অর্থেই সময় বা যুগের প্রতি এহেন সম্বন্ধ দিবে, সে কাফের হিসেবে পরিগণিত হবে। আর যদি বিনা বিশ্বাসে অকস্মাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তবে কাফের হবে না সত্য, কিন্তু এটা যেহেতু কাফেরের কাজের সদৃশ তাই এর জন্য তওবা-ইস্তেগফার করা বাঞ্ছনীয়।

সূরা নজম

مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ঃ যদি কেউ তোমাকে এ কথা বর্ণনা করে যে, মুহাম্মাদ (স.) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন, তবে জানবে সে নিশ্চিত মিথ্যা বলেছে।

আল্লাহর দীদার বা দর্শন প্রসঙ্গ ঃ এ প্রসঙ্গে তিন প্রকার অভিমত রয়েছে। যথা ঃ (১) নেতিবাচক (২) ইতিবাচক ও (৩) নীরবতা অবলম্বন। হযরত আয়েশা (রযি.) দর্শন না হওয়ার প্রবক্তা, তিনি কুরআনের আয়াত لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ

www.e-ilm.weebly.com

يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ (অর্থাৎ চক্ষুষ্মানেরা তাঁকে দেখতে পায় না। কিন্তু তিনি সকল চক্ষুষ্মানকে দেখেন— এর দ্বারা নিজ দাবীর পক্ষে প্রমাণ পেশ করেন।

দর্শনের প্রবক্তারা এ দলীলের জবাবে বলেন, এখানে إِدْرَاك দ্বারা উদ্দেশ্য إِحَاطَه তথা পূর্ণ পরিবেষ্টিত করা। অর্থাৎ কোন চোখ আল্লাহর পুরো সত্তাকে পরিবেষ্টিত বা চোখের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হবে না। আর আয়ত্ত না করতে পারার দ্বারা আংশিক দর্শনের সম্ভাবনা নাকচ বা ব্যাহত হয় না।

আল্লামা নববী (রহ.) বলেন, হযরত আয়েশা (রযি.) হাদীসে মারফূর মাধ্যমে দর্শনকে নাকচ করেননি। যদি তার জানা মতে এ ব্যাপারে হাদীসে মারফূ থাকত, তবে অবশ্যই তিনি তা দলীল হিসেবে উল্লেখ করতেন। তিনি শুধু উল্লিখিত আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে দর্শন-সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সাহাবাও এ ব্যাপারে তাঁর মতের বিরোধিতা করেছেন। আর উসূল হলো এক সাহাবী কোন উক্তি করলে অন্যান্য সাহাবী যদি তার বিরোধিতা করেন, তাহলে ঐ উক্তিটি সর্বসম্মতিক্রমে 'দলীল' হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

হযরত আয়েশা তার স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলীল পেশ করেন ঃ আল্লাহ পাক বলেছেন, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰه অর্থাৎ কোন মানবের জন্য শোভনীয় নয় যে, আল্লাহ সরাসরি (মুখোমুখী) তার সাথে আলাপ করবেন।

দর্শনবাদীরা এ দলীলের জবাবে বলেন, এ আয়াতের আলোকে বিলকুল দর্শনা না হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত হয় না। অবশ্য এ কথা প্রমাণ করে যে, আয়াতে উল্লিখিত তিন অবস্থায় কেবল কথোপকথন হতে পারে। চতুর্থ আর কোন পন্থায় কথোপকথন সম্ভব নয়। কিন্তু তখন বলা হবে যে, দর্শন অবস্থায় তথা সামনাসামনি আলাপ হয়নি। (অর্থাৎ দর্শনের সময় শুধু দর্শন হয় আর পরে হয় কথাবার্তা। কারণ, হতে পারে দর্শনে তিনি এমন অভিভূত হন যে নিজের বাকশক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর আল্লাহ সম্মুখ থেকে অন্তর্হিত হলে তিনি সম্বিত ফিরে পান এবং সেই অবস্থায় আলাপ হয়।)

হযরত আয়েশার নেতিবাচক বর্ণনা আর হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখের ইতিবাচক বর্ণনার মাঝে কতিপয় সমন্বয়কারী হযরত এভাবে সমন্বয় সাধন করেন যে, যে বর্ণনায় দর্শনকে নাচক করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য 'চাক্ষুষ দর্শন'। আর যে বর্ণনায় দর্শন প্রমাণ করা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য আত্মিক বা অন্তর্দৃষ্টিগত দর্শন।

আবার কেউ কেউ বলেন, দর্শন দু'বার হয়। একবার চাক্ষুষভাবে, আরেকবার আত্মিকভাবে।

মুহাক্কিক হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী[১] (রহ.) বলেন, কুরআনের আয়াত فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى অর্থাৎ, তখন তাদের মধ্যে একটি ধনুকের

টীকা ঃ ১. হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী (রহ.), জন্ম ঃ ১২৪৪ হিজরী, মৃত্যু ঃ

www.e-ilm.weebly.com

দু'প্রান্তবর্তী দূরত্ব, অথবা তার চেয়েও কম দূরত্ব ছিল-এর মধ্যে রসূল (স.) আল্লাহর কতটুকু নিকটবর্তী হয়েছিলেন, তা ব্যক্ত করা হয়েছে, জিবরাঈলের নয়। মিরকাত গ্রন্থে মোল্লা আলী কারী (রহ.) হাদীসে জিবরাঈলের আলোচনায় এ অভিন্ন মতই ব্যক্ত করেছেন। কেননা তিনি বলেন, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى আয়াতে আল্লাহ পাক কর্তৃক ঘোষিত স্থানটি একমাত্র রসূল (স.)-এরই অবস্থান স্থল ছিল। এ পর্যায়ে জিবরাঈল (আ.) বা অন্যান্য নৈকট্যশীলগণ পৌঁছতে পারেন না। এমন কি হযরত মূসা (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.) সহ প্রবীণ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অন্যান্য নবীগণও পৌঁছতে সক্ষম হননি।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা শায়েখ জাকারিয়া [১] (রহ.) বলেন, যখনই আমি রসূল (স.)-এর রওজা শরীফে গিয়ে তাঁর কদম মোবারকের কাছে বসে তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করেছি, তাৎক্ষণিকভাবে মেরাজের রাতে রসূল (স.)-কর্তৃক আল্লাহকে দর্শনের ব্যাপারে আমার অন্তরে এ সাড়া পেয়েছি যে, নিশ্চয় দর্শনের ব্যাপারটি সত্য ও সঠিক। আর যখন দর্শন প্রসঙ্গকে 'দুনিয়ায় আল্লাহ পাক দেখা সম্ভব নয়' সূত্র দ্বারা প্রতিহত করতে প্রয়াস পেয়েছি তখন আমার অন্তরে রসূল (স.) কর্তৃক স্বশরীরে মেরাজের রাত্রে জান্নাতে প্রবেশের কথা ভেসে উঠেছে। আর জান্নাতে আল্লাহর দর্শন বা দিদার হওয়ার ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতপন্থীরা সকলেই একমত। (লামিউদ্ দারারী ৩য় খণ্ড ঃ ২২৯ পৃষ্ঠা)

তবে মুহাক্কিক আলেমগণের এক জামাত 'আল্লাহর দীদার' প্রসঙ্গে নীরবতা অবলম্বনের পক্ষপাতি। তাঁরা বলেন, এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়; বরং এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসগত ব্যাপার। তাই শুধু ধারণা ভিত্তিক দলীলের দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করা কিংবা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না বা আদৌ ঠিক হবে না। এটা আকীদাগত বিষয় বা ইস্যু। তাই এর জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় প্রমাণ ও অকাট্য দলীল।

وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ ঃ এবং রসূল (স.)-এর সাথে উপস্থিত সকল মুসলমান, মুশরিক, জ্বিন ও মানব সেজদাবনত হয়।

মুশরিকদের সেজদার ব্যাখ্যা ঃ সূরা নজমের সেজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর রসূল (স.)-এর সাথে সাথে উপস্থিত মুশরিকগণ কর্তৃক সেজদাবনত হওয়া প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

(১) আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, অবতরণের দিক দিয়ে এটিই ছিল সর্বপ্রথম সেজদার আয়াত। মুসলমানদের সেজদা করতে দেখে প্রতিবাদস্বরূপ তারাও তাদের প্রতিমাদের উদ্দেশ্যে সেজদা করে قام با لاعراب مولانا فاروق القاسمي

টীকা ঃ ১. হযরত শায়খুল হাদীস জাকারিয়া (রহ.), জন্ম ঃ ১৩১৫ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১৪০২ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

(২) কারো মতে, রসূল (স.) أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى আয়াত তেলাওয়াত করলে, তারা এতে তাদের মূর্তির নাম শুনতে পেয়ে মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে সেজদাবনত হয়।

(৩) কারো মতে, যেহেতু উক্ত বৈঠকে মুসলমানদের বিরোধিতা করার হিম্মাত তাদের ছিল না, সেহেতু তারা বাধ্য হয়ে সেজদা করে।

(৪) হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী[১] (রহ.) বলেন, ঐ সময় আল্লাহ পাকের প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল বিধায় আত্মসমর্পণ ও অবনত হয়ে সেজদা করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না।

(৫) কোন কোন ঐতিহাসিক ও মুফাস্সির বর্ণনা করেন যে, এ সূরা পড়ার মাঝে নবীজীর জবান থেকে تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى বাক্য বেরিয়ে পড়ে। এতে তাদের প্রতিমার ভূয়সী প্রশংসা ছিল। মুশরিকরা রসূল (স.)-এর মুখে তাদের মূর্তির প্রশংসা শুনে আনন্দে গদগদ হয়ে মূর্তিদের উদ্দেশ্যে সেজদা করে। তবে জমহুরে মুহাদ্দিসের উসূল অনুযায়ী এ ঘটনার সত্যতা স্বীকৃত হয় না। তাই ইমাম নববী, কাজী আয়াজ, শায়েখ ইবনে আরাবী[২] প্রমুখ এ ঘটনা প্রত্যাখ্যান ও অগ্রাহ্য করেছেন। আবার কেউ কেউ এ ঘটনাকে বিশুদ্ধ মেনে বিভিন্ন ব্যাখার অবতারণা করেছেন। হযরত শাব্বির আহমদ উসমানী (রহ.) তাঁর ফাওয়ায়েদুল কুরআন গ্রন্থে লিখেন, এ ঘটনা যে সমস্ত হাদীস থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, জমহুরে মুহাদ্দিসের উসূল অনুযায়ী তা সত্যতার স্তরে পৌঁছে না। যদি বাস্তবেই তার কোন ভিত্তি থেকে থাকে তবে সম্ভবত এটাই হবে যে, রসূল (স.) মুসলমান ও কাফেরদের সম্মিলিত এক বৈঠকে এ সূরা পড়েন। কাফেরদের অভ্যাস ছিল, তারা জনতাকে কুরআন-পাঠ শুনতে দিত না; বরং হৈ চৈ ও বিশৃঙ্খলা করে পরিবেশ নষ্ট করত। অনন্তর যখন রসূল (স.) এ আয়াত (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى) তেলাওয়াত করেন, তখন কোন কাফের শয়তান রসূল (স.)-এরই সুর ও পঠন-ভঙ্গিতে ..... تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى শব্দগুলি উচ্চারণ করে, যা তারা নিজেরা সচরাচর পড়ত।

অথবা বলা হবে যে, নবী করীম (স.) কর্তৃক জিবরাঈল (আ.) হতে ওহী গ্রহণ ও তা উম্মতের সামনে প্রকাশের সময় অসতর্কতাবশতঃ এহেন বিভ্রাট ঘটে যায়। এর অর্থ এই নয় যে, শয়তান রসূল (স.)-এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করায় এহেন অনর্থ ঘটে। কারণ শয়তানের পক্ষে এটা করাই সম্ভব নয়।

টীকা ঃ ১. হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.), জন্ম ঃ ১১১৪ হিজরী, মৃত্যু ঃ ১১৭৬ হিজরী।

২. শায়খ ইবনুল আরাবী (রহ.), মৃত্যু ঃ ৫৪২ হিজরী।

www.e-ilm.weebly.com

—(আহকামুল কুরআন[১], ফাতহুল মুলহিম[২], পার্শ্বটিকা[৩], ফাওয়ায়েদুল কুরআন প্রভৃতি।

সূরা ক্বমার

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ (চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে) ঃ চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেজার ব্যাপারে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

(১) কেউ কেউ অস্বীকার করে বলেন, এটা দুরূহ এবং অসম্ভব। তবে বিশ্লেষক উলামায়ে কেরাম সুস্পষ্ট প্রমাণাদির আলোকে চন্দ্র বিদীর্ণের সম্ভাবনা প্রমাণ করেছেন। আর নিছক দুরূহ হওয়ার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও স্বীকৃত বিষয় প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে না।

(২) কেউ কেউ বলেন, চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা মূলতঃ কেয়ামতে ঘটবে। তাদের অভিমত প্রত্যাখ্যানের জন্য কুরআনের আয়াত ঃ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ অর্থাৎ, 'যদি তারা নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এটা তো চিরাগত জাদু মাত্র।' —এটাই যথেষ্ট। কেননা কেয়ামতের দিন কাফেররা এ কথা বলবে না। —লামআত।

(৩) এ মোজেজা বাস্তবেই সংঘটিত হয়েছে। আল্লামা কাজী আয়াজ (রহ.) বলেন, أَجْمَعَ الْمُفَسِّرُوْنَ وَأَهْلُ السُّنَّةِ عَلٰى وُقُوْعِهٖ অর্থাৎ সকল মুফাসসির ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চন্দ্র বিদীর্ণের ঘটনা সংঘটিত হয়ে যাবার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম তহাবী, ইবনে কাছীর প্রমুখ উলামায়ে কিরাম এ ঘটনা মুতাওয়াতির বলে দাবী করেছেন। আর ইতিহাসে এ ঘটনা না থাকার যে প্রশ্ন ওঠে, তার জওয়াব হলো, এ ঘটনা রাত্রি-নিশীথে ঘটে। চাঁদের উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়ায় সঙ্গত কারণে ঐ মুহূর্তে তখন অনেক দেশে 'দিন' থাকে। অনেক স্থানে অর্ধ রাত থাকে। মানুষজন সাধারণত বিশ্রাম বা শয্যাগত ছিল। যারা জাগ্রত থাকে তাদের অধিকাংশই ছিল ছাদের নীচে বসা। আর যারা খোলা আকাশের নীচে ছিল, তারাও যে সদা আসমানের দিকে চেয়ে থাকবে।এটা জরুরী নয়। উপরন্তু ঘটনার স্থায়ী কালও ছিল সামান্য সময়। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে দুনিয়ায় বারবার চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং তা যথেষ্ট দীর্ঘক্ষণও থাকে। তথাপি লাখো মানুষ তা জানতেই

টীকা ঃ ১. আহকামুল কুরআন ঃ আল্লামা আবু বকর জাচ্ছাস (রহ.), মৃত্যু ঃ ৩৭০ হিজরী।

২. ফাতহুল মুলহিম ঃ আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ.) প্রণীত, মৃত্যু ঃ ১৩৬৯ হিজরী।

৩. বুখারী শরীফের তিন চতুর্থাংশেরও বেশি হাশিয়া বা পার্শ্বটিকা লিখেছেন শায়েখ আহমদ আলী সাহানপুরী (রহ.), মৃত্যু ঃ ১২৯৭ হিজরী। আর বাকী শেষ অংশের হাশিয়া লিখেছেন হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)। তিনিও ১২৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। (অনুবাদক)

www.e-ilm.weebly.com

পারে না। মোটকথা ইতিহাসে কোন একটি বিষয় উল্লেখ না থাকার দ্বারাই তার অস্তিত্ব ও ঘটনাকে মিথ্যা বা অসত্য বলে প্রতিপন্ন করা যায় না। তারপরও 'তারীখে ফেরেশতা' ইত্যাদি ইতিহাস গ্রন্থে চন্দ্র বিদীর্ণের বিবরণ রয়েছে। ভারতের 'মহারাজা মালিবার'-এর ইসলাম গ্রহণের পিছনে এ ঘটনাই মূল কারণ ছিল বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকার যে সমস্ত নভোচারীগণ বিশেষ রকেটের সাহায্যে চাঁদে অবতরণ করেছেন, তাদের মধ্যে মিস্টার নীল আর্মস্ট্রং এর বক্তব্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, তিনি চাঁদের গায়ে দ্বিখণ্ডের দাগ সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পর্যবেক্ষণ করেছেন। বুখারী প্রথম খণ্ডের ৫১৩ পৃষ্ঠার হাশিয়ায় আল্লামা আইনী হতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সিরিয়া হতে মক্কাভিমুখী আগত কাফেলাও পথিমধ্যে চাঁদ খণ্ডিত হওয়ার দৃশ্য চাক্ষুষ অবলোকন করে।

চাঁদ বিদীর্ণের এ মোজেজায় দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ না হওয়ার রহস্য হল, যদি এ মোজেজা দীর্ঘায়িত হত এবং সাধারণ-বিশেষ সব শ্রেণীর লোক তা দেখা সত্ত্বেও আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ (স.)-এর প্রতি ঈমান না আনত, তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত। তাই এ মোজেজার স্থায়িত্ব দীর্ঘক্ষণ না হওয়া এ উম্মতের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট রহমতই ছিল। মরহুম আজীজ লাখনবী কি চমৎকারই না বলেছেন ঃ

معجزه شق القمركا ہے مدينة سے عياں

مه نے شق ہركر ليا ہے دين كو آغوش ميں

চন্দ্র বিদীর্ণের অভিনব ঘটনা সে তো মদীনারই দান,
দ্বীনের প্রেমে চাঁদ সেদিন নিজেকেই করে কোরবান।

(বুখারী প্রথম খণ্ডের ৫১৩ পৃষ্ঠার পার্শ্বটীকা ও আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী (রহ.) রচিত ফাওয়ায়েদুল কুরআন দ্রঃ)।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمُصَنِّفِهٖ وَلِجَمِيْعِ أَسَاتِذَتِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِأَهْلِىْ وَلِأَوْلَادِىْ وَلِمَنْ يُعِيْنُنِىْ وَلِنَاشِرِهٖ

وَأَنْجِنَا كُلَّنَا مِنَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِى الْجَنَّةِ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ أَبَدًا

وَاجْعَلْ اٰخِرَ كَلِمَتِنَا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ ﷺ وَاٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ وَعَلٰى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اٰمِيْن، يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ !

www.e-ilm.weebly.com